বাংলাদেশের মিসান্ড্রিক আইনি ও সামাজিক কাঠামোর অনুসন্ধান

S M Nazmuz Sakib

বাংলাদেশের মিসান্ড্রিক আইনি ও সামাজিক কাঠামোর অনুসন্ধান

S M Nazmuz Sakib

Copyright Page

Title: বাংলাদেশের মিসান্ড্রিক আইনি ও সামাজিক কাঠামোর অনুসন্ধান (Exploration of Bangladesh's Misandric Legal and Social Framework)
Author: S M Nazmuz Sakib
DOI: 10.5281/zenodo.19442980

Copyright © 2026 by S M Nazmuz Sakib
All rights reserved. No part of this work may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the author, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Disclaimer
This book is a scholarly and legal–theoretical work intended for academic, legal, and policy discussion. It does not advocate violence, hatred, or discrimination against any gender, community, or individual. The analysis is based on publicly available legal texts, case law, and social research as of the time of writing. The author and publisher disclaim any liability for any actions taken or not taken based on the contents of this book. Views expressed herein are solely those of the author and do not necessarily reflect the official positions of any organisation or government.

Publisher Information
Self-published / Open access edition.
This work is made openly available under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). You may share this work with attribution for non-commercial purposes only, and you may not modify it.

Cover design and layout: The author
First published: 2026

Cataloguing note
No ISBN assigned. The work is identified by its DOI: 10.5281/zenodo.19442980.
This ten-volume study is a comprehensive examination of the legal, historical, social, and philosophical dimensions of gender-biased laws in Bangladesh, with a focus on the misandric structures affecting men's legal rights.

Contact
For permissions, academic collaboration, or inquiries, please contact the author via the DOI registration or the publisher's public repository.

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Table of Contents

পার্ট ১ 34

প্রথম খণ্ড 34

ভিত্তি, ইতিহাস, আইনতাত্ত্বিক দর্শন ও সাংবিধানিক কাঠামো 34

গ্রন্থকারের ভূমিকা 34

অধ্যায় ১: প্রারম্ভিক ধারণা ও গ্রন্থের কাঠামো 35

১.১ সূচনা: একটি অপ্রিয় কথোপকথন 35

১.২ গ্রন্থের কেন্দ্রীয় থিসিস 35

১.৩ গ্রন্থের পদ্ধতি এবং পদ্ধতিগত ন্যায্যতা 36

১.৪ দশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা 36

অধ্যায় ২: মিসান্ড্রি: সংজ্ঞা, তত্ত্ব ও আইনি প্রাসঙ্গিকতা 37

২.১ মিসান্ড্রির সংজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি 37

২.২ মিসান্ড্রি বনাম পিতৃতন্ত্র: একটি জটিল দ্বন্দ্ব 37

২.৩ আইনে লিঙ্গ-পক্ষপাতের বৈশ্বিক তত্ত্ব 38

২.৪ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনের দার্শনিক যুক্তি 38

অধ্যায় ৩: বাংলাদেশের আইনি ইতিহাস এবং পুরুষবিরোধী প্রবণতার ঐতিহাসিক মূল 39

৩.১ ঔপনিবেশিক আইনের উত্তরাধিকার 39

৩.২ স্বাধীনতা-পরবর্তী আইন প্রণয়নের প্রবণতা 39

৩.৩ নব্বইয়ের দশকে নারী আন্দোলন এবং আইন প্রণয়নে তার প্রভাব 39

৩.৪ রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা 40

অধ্যায় ৪: সংবিধানিক কাঠামো এবং সমতার প্রতিশ্রুতি 40

৪.১ বাংলাদেশের সংবিধানে সমতার নীতি 40

৪.২ ২৮(৪) অনুচ্ছেদ: নারীর জন্য বিশেষ বিধানের সাংবিধানিক যুক্তি 40

৪.৩ সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ: আইনের আশ্রয় পাওয়ার অধিকার 41

৪.৪ সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ: গ্রেফতার ও আটকের ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ 41

৪.৫ উচ্চ আদালতের ব্যাখ্যা ও জুরিসপ্রুডেন্স 41

অধ্যায় ৫: ন্যায়বিচার তত্ত্ব ও বাংলাদেশের আইনি বাস্তবতা 42

৫.১ পজিটিভিজম ও লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইন 42

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৫.২ প্রাকৃতিক আইনের দৃষ্টিভঙ্গি 42
৫.৩ ক্রিটিক্যাল লিগ্যাল স্টাডিজ এবং লিঙ্গ-পক্ষপাত 43
৫.৪ ফেমিনিস্ট লিগ্যাল থিওরি এবং তার সীমাবদ্ধতা 43
৫.৫ ইন্টারসেকশনালিটি তত্ত্ব এবং পুরুষ অভিজ্ঞতা 43
অধ্যায় ৬: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০: একটি গভীর বিশ্লেষণ 44
৬.১ আইনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট 44
৬.২ আইনের মূল বিধান এবং সমস্যা 44
৬.৩ জামিন অযোগ্যতার সমস্যা এবং ন্যায়বিচারের সংকট 44
৬.৪ মামলার পরিসংখ্যান এবং অভিযোগ প্রত্যাহারের ধরন 45
৬.৫ মিথ্যা মামলাকারীর বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকারের অপ্রতুলতা 45
অধ্যায় ৭: যৌতুক নিরোধ আইন এবং তার দ্বিমুখী সমস্যা 46
৭.১ যৌতুক: সংজ্ঞা ও সামাজিক বাস্তবতা 46
৭.২ আইনের ভাষায় সমস্যা 46
৭.৩ যৌতুক আইনের পাল্টা ব্যবহার: মহর ও দেনমোহরের সাথে সংঘাত 46
৭.৪ মামলার বৈশিষ্ট্য: পারিবারিক বিরোধের হাতিয়ার 47
অধ্যায় ৮: পারিবারিক আইন এবং পুরুষের অধিকার 47
৮.১ মুসলিম পারিবারিক আইনের কাঠামো 47
৮.২ খুলা তালাক এবং পুরুষের অধিকারের সংকোচন 48
৮.৩ সন্তানের হেফাজত এবং পিতার অধিকার 48
৮.৪ বিবাহ নিবন্ধন এবং পুরুষের একচেটিয়া দায়বদ্ধতা 49
৮.৫ বিবাহবিচ্ছেদের পর ভরণপোষণ: একটি জটিল প্রশ্ন 49
অধ্যায় ৯: ফৌজদারি আইনে লিঙ্গ-পক্ষপাত 49
৯.১ দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর লিঙ্গ-পক্ষপাতী ধারাসমূহ 49
৯.২ সাক্ষ্য আইনে পক্ষপাত 49
৯.৩ গ্রেফতার ও রিমান্ড প্রক্রিয়ায় বৈষম্য 50
৯.৪ নিরাপদ আশ্রয় এবং লিঙ্গ-পক্ষপাত 50
অধ্যায় ১০: পারিবারিক সহিংসতা আইন ২০১০ এর বিশ্লেষণ 50
১০.১ আইনের পটভূমি 50

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১০.২ আইনের সংজ্ঞা: পুরুষ কোথায়? 50
১০.৩ আন্তর্জাতিক গবেষণা এবং পুরুষ ভিকটিমের বাস্তবতা 51
১০.৪ সুরক্ষা আদেশের একতরফা ব্যবস্থা 51
অধ্যায় ১১: ধর্ষণ আইন এবং তার জটিলতা 51
১১.১ ধর্ষণের সংজ্ঞা: ঐতিহাসিক বিবর্তন 51
১১.২ ২০২৫ সালের সংশোধনী এবং তার সীমাবদ্ধতা 52
১১.৩ বৈবাহিক ধর্ষণ: আইনি অস্বীকৃতি 52
অধ্যায় ১২: যৌন হয়রানি আইন এবং পুরুষ ভিকটিমের অনুপস্থিতি 52
১২.১ হাইকোর্টের নির্দেশিকা ২০০৯ 52
১২.২ #MeToo আন্দোলন এবং বাংলাদেশে তার প্রভাব 53
অধ্যায় ১৩: সামাজিক কাঠামো এবং ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি 53
১৩.১ ভিকটিম কার্ড: একটি আইনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ 53
১৩.২ মিডিয়া ট্রায়াল এবং পুরুষের সুনাম ধ্বংস 53
১৩.৩ সামাজিক চাপ ও পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য 54
১৩.৪ সামাজিক কলঙ্ক এবং পুরুষের নীরবতা 54
অধ্যায় ১৪: সংখ্যা ও সাক্ষ্যের রাজনীতি 54
১৪.১ তথ্য সংগ্রহের ফাঁকফোকর 54
১৪.২ মিথ্যা মামলার পরিসংখ্যান 55
১৪.৩ নারী সংগঠনগুলোর প্রভাব এবং পাল্টা দৃষ্টিভঙ্গি 55
অধ্যায় ১৫: তুলনামূলক আইনি বিশ্লেষণ 55
১৫.১ ভারতে পুরুষ অধিকারের আইনি বিকাশ 55
১৫.২ পাকিস্তানে পারিবারিক আইনের সংস্কার 55
১৫.৩ পশ্চিমা দেশগুলোতে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনের বিকাশ 56
১৫.৪ নর্ডিক দেশগুলোর মডেল 56
অধ্যায় ১৬: রাজনৈতিক অর্থনীতি ও লিঙ্গ আইন প্রণয়নের গতিশীলতা 56
১৬.১ নারী ভোট এবং আইন প্রণয়নের রাজনৈতিক প্রণোদনা 56
১৬.২ নারীবাদী আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি 57
১৬.৩ আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইন প্রণয়ন 57

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ১৭: বিচার বিভাগ এবং লিঙ্গ-পক্ষপাত 57
১৭.১ বিচারকের বিবেচনাধীন ক্ষমতা এবং লিঙ্গ-পক্ষপাত 57
১৭.২ বিচারিক প্রশিক্ষণে লিঙ্গ-সচেতনতা এবং তার ফাঁকফোকর 57
১৭.৩ পাবলিক প্রসিকিউটর এবং পুলিশের ভূমিকা 58
অধ্যায় ১৮: ডিজিটাল যুগে নতুন মাত্রার লিঙ্গ-পক্ষপাত 58
১৮.১ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং সাইবার অপরাধ 58
১৮.২ সামাজিক মিডিয়া এবং ভিকটিম ব্যারেজের নতুন প্রবণতা 58
অধ্যায় ১৯: পুরুষ অধিকার আন্দোলন এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট 59
১৯.১ বৈশ্বিক পুরুষ অধিকার আন্দোলনের উদ্ভব 59
১৯.২ বাংলাদেশে পুরুষ অধিকার সচেতনতার বর্তমান অবস্থা 59
১৯.৩ আইনি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা 59
অধ্যায় ২০: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং পুরুষের অধিকার 59
২০.১ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং লিঙ্গ-সমতা 59
২০.২ আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি 60
২০.৩ CEDAW এবং পুরুষের অধিকারের প্রশ্ন 60
অধ্যায় ২১: সমকালীন উন্নয়ন ও ২০২৪-২০২৫ সালের পরিবর্তন 60
২১.১ অন্তর্বর্তী সরকার এবং আইনি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি 60
২১.২ কোটা আন্দোলন এবং লিঙ্গ-পক্ষপাতের প্রশ্ন 60
২১.৩ ২০২৫ সালের বৈশ্বিক জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট এবং বাংলাদেশ 61
২১.৪ সামাজিক মিডিয়া এবং পুরুষ অধিকার সচেতনতা 61
অধ্যায় ২২: দার্শনিক সমাপ্তি এবং প্রথম খণ্ডের উপসংহার 61
২২.১ ন্যায়বিচারের দর্শন: একটি সংশ্লেষণ 61
২২.২ আইনের নৈতিকতা: একটি মৌলিক প্রশ্ন 62
২২.৩ অমর্ত্য সেনের ন্যায়বিচার তত্ত্ব 62
২২.৪ প্রথম খণ্ডের সমাপনী বার্তা 62
পরিশিষ্ট ১: প্রাসঙ্গিক আইনের তালিকা 63
পরিশিষ্ট ২: মূল আইনতাত্ত্বিক ধারণার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা 63
পরিশিষ্ট ৩: প্রস্তাবিত গবেষণা এজেন্ডা 64

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

প্রথম খণ্ডের মূল বার্তা..... 64
পার্ট ২ 65
দ্বিতীয় খণ্ড 65
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০: ধারাভিত্তিক বিশ্লেষণ, প্রয়োগের সংকট এবং সাংবিধানিক প্রশ্ন 65
ভূমিকা: দ্বিতীয় খণ্ডের প্রেক্ষাপট 65
অধ্যায় ১: আইনের জন্মবৃত্তান্ত এবং আইনতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত 66
১.১ প্রাক-ইতিহাস: ১৯৮৩ সালের বিশেষ আইন থেকে ২০০০ সালের আইন পর্যন্ত 66
১.২ ২০০০ সালের আইনের মূল উদ্দেশ্য এবং ঘোষিত নীতি 67
১.৩ আইনের সামগ্রিক কাঠামো: একটি পরিচিতি 67
অধ্যায় ২: ধারা ২: সংজ্ঞার রাজনীতি এবং ব্যাখ্যার সমস্যা 68
২.১ সংজ্ঞার গুরুত্ব এবং আইনতাত্ত্বিক ভিত্তি 68
২.২ "নির্যাতন" এর সংজ্ঞা এবং তার ব্যাপকতার সমস্যা 68
২.৩ "শিশু" এর সংজ্ঞা এবং বয়সের জটিলতা 69
২.৪ পুরুষের অনুপস্থিতি: সংজ্ঞার কাঠামোগত পক্ষপাত 69
অধ্যায় ৩: ধারা ৯: ধর্ষণ, যৌন সহিংসতা এবং আইনের বিবর্তন 69
৩.১ ধর্ষণের আইনি সংজ্ঞা: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ 69
৩.২ ২০২৫ সালের সংশোধনী: একটি বিস্তারিত মূল্যায়ন 70
৩.৩ সম্মতির সংজ্ঞা এবং প্রমাণের বোঝার প্রশ্ন 71
৩.৪ বৈবাহিক ধর্ষণের প্রশ্ন: একটি জটিল বিতর্ক 72
অধ্যায় ৪: ধারা ১০: যৌন নিপীড়ন এবং তার প্রয়োগের সমস্যা 73
৪.১ যৌন নিপীড়নের সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যার চ্যালেঞ্জ 73
৪.২ যৌন হয়রানির আইনি সংজ্ঞা এবং পুরুষ ভিকটিমের অদৃশ্যতা 73
অধ্যায় ৫: ধারা ১১: যৌতুক এবং আইনের অপব্যবহারের রাজনৈতিক অর্থনীতি 73
৫.১ যৌতুক: সামাজিক বাস্তবতা এবং আইনি প্রতিক্রিয়া 74
৫.২ ধারা ১১ এর অপব্যবহারের কাঠামো: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ 74
৫.৩ যৌতুক আইন এবং দেনমোহরের পারস্পরিক সম্পর্ক: একটি আইনতাত্ত্বিক বিরোধাভাস 75
৫.৪ আইনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: "Strict Liability" এর প্রয়োগ এবং তার ন্যায়সঙ্গততার প্রশ্ন 75
অধ্যায় ৬: ধারা ১৯: জামিনের বিধান এবং ন্যায়বিচারের সংকট 76

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৬.১ জামিনের অধিকার: একটি মৌলিক মানবাধিকার 76
৬.২ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে জামিনের বিধান: একটি বিশ্লেষণ 76
৬.৩ জামিন অযোগ্যতার সাংবিধানিক সমস্যা 77
অধ্যায় ৭: ধারা ১৭: মিথ্যা মামলা এবং প্রতিকারের অপ্রতুলতা 77
৭.১ মিথ্যা মামলার আইনি সংজ্ঞা এবং প্রমাণের চ্যালেঞ্জ 77
৭.২ ভারতের অভিজ্ঞতা: মিথ্যা মামলা এবং আইনি প্রতিকারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ 78
৭.৩ মিথ্যা মামলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক খরচ 78
৭.৪ ধারা ১৭ কে কার্যকর করার প্রস্তাব: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ 79
অধ্যায় ৮: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল: কাঠামো, সমস্যা এবং সংস্কারের প্রয়োজন 79
৮.১ ট্রাইব্যুনালের কাঠামো এবং এখতিয়ার 79
৮.২ বিচারক সংকট এবং এর প্রভাব 80
৮.৩ সরকারি কৌঁসুলির ভূমিকা এবং নিরপেক্ষতার প্রশ্ন 80
অধ্যায় ৯: আইনের প্রয়োগ: পুলিশ, তদন্ত এবং পক্ষপাতের বাস্তবতা 81
৯.১ পুলিশ তদন্তের কাঠামোগত পক্ষপাত 81
৯.২ চার্জশিট দাখিলের পদ্ধতি এবং নির্দোষিতার অনুমানের লঙ্ঘন 81
৯.৩ ফরেনসিক তদন্তের অপ্রতুলতা 82
অধ্যায় ১০: ধারা ২৮ এবং ২৯: আপিল এবং পুনর্বিবেচনার বিধান এবং তার সমস্যা 82
১০.১ আপিল ব্যবস্থার কাঠামো 82
অধ্যায় ১১: রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং আইনের বিবর্তন: একটি গভীর বিশ্লেষণ 83
১১.১ নারীবাদী আন্দোলন এবং আইন প্রণয়নের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া 83
১১.২ রাজনৈতিক দলগুলোর নারীবান্ধব আইন প্রণয়নের প্রণোদনা 83
১১.৩ আন্তর্জাতিক অর্থায়ন এবং আইনি সংস্কারের উপর প্রভাব 83
অধ্যায় ১২: আইনি কার্যকারিতার বিশ্লেষণ: মামলার তথ্য ও পর্যালোচনা 84
১২.১ দোষী সাব্যস্তির হার এবং তার ব্যাখ্যা 84
১২.২ মামলার ধরন এবং মিথ্যা মামলার প্রবণতার নির্দেশক 84
অধ্যায় ১৩: তুলনামূলক আইনি বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশের জন্য পাঠ 85
১৩.১ ভারতের ধারা ৪৯৮ক: একই সমস্যা, ভিন্ন প্রতিক্রিয়া 85
১৩.২ শ্রীলঙ্কার পারিবারিক আইন সংস্কার: একটি ইতিবাচক উদাহরণ 86

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৩.৩ নেপালের অভিজ্ঞতা: লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনের দিকে যাত্রা 86
১৩.৪ যুক্তরাজ্যের "Domestic Abuse Act 2021": একটি আদর্শ মডেল 86
অধ্যায় ১৪: ২০২৫ সালের সংশোধনী: একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা 87
১৪.১ সংশোধনীর ইতিহাস এবং প্রেক্ষাপট 87
১৪.২ সংশোধনীর মূল বিধান: একটি বিশ্লেষণ 87
১৪.৩ সংশোধনীর সমালোচনা: আইনজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গি 87
অধ্যায় ১৫: জুরিসপ্রুডেন্টিয়াল বিশ্লেষণ: আইনের দর্শন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন 88
১৫.১ হার্টিয়ান পজিটিভিজম এবং এই আইনের আইনি বৈধতা 88
১৫.২ রোনালড ডওরকিনের আইনতত্ত্ব এবং নীতির ভূমিকা 88
১৫.৩ ফেমিনিস্ট লিগ্যাল থিওরির সীমাবদ্ধতা এবং তার সমালোচনা 89
১৫.৪ Critical Men's Studies এবং পুরুষের আইনি অভিজ্ঞতার তত্ত্ব 89
১৫.৫ জন রলসের "Original Position" এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন 89
অধ্যায় ১৬: বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আদালতের রায় এবং আইনি বিকাশ 90
১৬.১ সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়সমূহ: একটি পর্যালোচনা 90
১৬.২ হাইকোর্টের ২০২৪-২০২৫ সালের উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত 90
অধ্যায় ১৭: সামাজিক বিশ্লেষণ: ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সম্পর্ক 91
১৭.১ ভিকটিম আইডেন্টিটি এবং সামাজিক পুঁজি 91
১৭.২ মিডিয়া কভারেজ এবং পুরুষের সুনাম ধ্বংসের কাঠামো 91
১৭.৩ সামাজিক মিডিয়ায় অভিযোগ এবং নতুন আইনি চ্যালেঞ্জ 92
অধ্যায় ১৮: সংস্কারের রোডম্যাপ এবং সুপারিশ 92
১৮.১ আইনি সংস্কারের নীতিমালা 92
১৮.২ সংসদীয় কার্যক্রম এবং প্রস্তাবিত সংস্কার 93
১৮.৩ বিচার বিভাগীয় সংস্কার এবং প্রশিক্ষণ 93
অধ্যায় ১৯: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন 93
১৯.১ ICCPR এবং বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা 93
১৯.২ UN Human Rights Committee এর মন্তব্য এবং বাংলাদেশ 94
১৯.৩ Universal Periodic Review (UPR) এবং বাংলাদেশ 94

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ২০: সমকালীন চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতের পথ 94
২০.১ বাংলাদেশের ২০২৪-২০২৬ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং আইনি সংস্কারের সুযোগ 95
২০.২ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তার সীমাবদ্ধতা 95
২০.৩ ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা: একটি সংশ্লেষণ 95
অধ্যায় ২১: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ধারাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত সারণি এবং মূল্যায়ন 96
২১.১ প্রতিটি ধারার সারসংক্ষেপ এবং মূল্যায়ন 96
দ্বিতীয় খণ্ডের উপসংহার: একটি দার্শনিক প্রতিফলন 97
উপসংহার: আইনের ন্যায়নীতি এবং বাস্তব ন্যায়বিচার 97
পরিশিষ্ট ক: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারার সূচি 97
পরিশিষ্ট খ: ২০২৫ সালের সংশোধনীর মূল পরিবর্তনসমূহ 98
পরিশিষ্ট গ: প্রস্তাবিত আইনি সংস্কারের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা 98
তৃতীয় খণ্ড 99
যৌতুক নিরোধ আইন: ইতিহাস, কাঠামো, অপব্যবহার এবং পুরুষবিরোধী আইনি বাস্তবতার গভীর বিশ্লেষণ 99
তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা 99
অধ্যায় ১: যৌতুকের ঐতিহাসিক শিকড়, সামাজিক কাঠামো এবং আইনি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা 100
১.১ যৌতুক: একটি উপমহাদেশীয় সামাজিক ব্যাধির ঐতিহাসিক পাঠ 100
১.২ যৌতুকের অর্থনৈতিক যুক্তি এবং তার বিকৃতি 100
১.৩ ১৯৪৭-পরবর্তী আইনি হস্তক্ষেপ এবং বাংলাদেশে যৌতুক আইনের বিবর্তন 101
অধ্যায় ২: যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ এবং যৌতুক নিষেধ আইন ২০১৮: ধারাভিত্তিক বিশ্লেষণ 102
২.১ ১৯৮০ সালের আইনের মূল কাঠামো এবং তার সীমাবদ্ধতা 102
২.২ যৌতুক নিষেধ আইন ২০১৮: একটি নতুন কাঠামো এবং তার জটিলতা 103
২.৩ আইনের সাথে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সম্পর্ক: একটি আইনি জটিলতা 103
২.৪ যৌতুকের আইনি সংজ্ঞার সমস্যা: দেনমোহর, উপহার এবং যৌতুকের মধ্যে সীমারেখা 104
অধ্যায় ৩: যৌতুক আইনের অপব্যবহার: পরিসংখ্যান, ধরন এবং সামাজিক পরিণতি 105
৩.১ মিথ্যা যৌতুক মামলার পরিসংখ্যান এবং তার সীমাবদ্ধতা 105
৩.২ মিথ্যা মামলার ধরন ও কৌশল: একটি সামাজিক পর্যবেক্ষণ 105
৩.৩ মিথ্যা মামলার সামাজিক পরিণতি: ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের উপর প্রভাব 106
৩.৪ ব্ল্যাকমেইলিং ইন্ডাস্ট্রি: যৌতুক আইনের বাণিজ্যিকীকরণ 106

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ৪: ভারতের IPC ধারা ৪৯৮A এবং বাংলাদেশের তুলনামূলক বিশ্লেষণ 107
৪.১ ভারতের ৪৯৮A এর ইতিহাস এবং অপব্যবহারের সংকট 107
৪.২ বাংলাদেশ বনাম ভারত: আইনি কাঠামোর তুলনা 108
৪.৩ শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানের তুলনামূলক অভিজ্ঞতা 108
৪.৪ তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে শিক্ষা: বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিকতা 109
অধ্যায় ৫: যৌতুক আইনের জুরিসপ্রুডেন্টিয়াল বিশ্লেষণ 109
৫.১ আইনের উদ্দেশ্য এবং কার্যকারিতার মধ্যে ফাঁক: টেলিওলজিক্যাল বিশ্লেষণ 109
৫.২ রনাল্ড ড্বোরকিনের আইনের সমতা তত্ত্ব এবং যৌতুক আইন 110
৫.৩ হ্যান্স কেলসেনের নর্মেটিভিজম এবং আইনি শ্রেণিবিন্যাসের সমস্যা 110
৫.৪ ফ্রেড্রিক হায়েকের আইনের নিয়মের তত্ত্ব এবং বিচারিক বিবেচনাধীনতার সমস্যা 111
৫.৫ সেন এর সক্ষমতা পদ্ধতি এবং যৌতুক আইনের মূল্যায়ন 111
অধ্যায় ৬: পারিবারিক আইন ও বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় যৌতুক আইনের ব্যবহার 112
৬.১ মুসলিম পারিবারিক আইন এবং যৌতুক আইনের আন্তঃসংযোগ 112
৬.২ বিবাহবিচ্ছেদ আইনে পুরুষের অধিকারের শূন্যতা 112
৬.৩ শিশুর হেফাজত এবং পিতার অধিকার: একটি উপেক্ষিত মাত্রা 113
৬.৪ দেনমোহর এবং ভরণপোষণ আইনে পুরুষের অসম দায়িত্ব 113
অধ্যায় ৭: রাজনৈতিক বিশ্লেষণ: কেন যৌতুক আইন সংস্কার হয় না? 114
৭.১ নির্বাচনী রাজনীতি এবং যৌতুক আইন 114
৭.২ নারী সংগঠনগুলোর ভূমিকা এবং পুরুষের অধিকার আন্দোলনের অনুপস্থিতি 114
৭.৩ মিডিয়ার ভূমিকা: লিঙ্গ-পক্ষপাতী সংবাদ পরিবেশন 115
৭.৪ ২০২৪-২০২৬ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং আইনি সংস্কারের সম্ভাবনা 115
অধ্যায় ৮: সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণ: পুরুষের বিরুদ্ধে ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি 116
৮.১ ভিকটিম কার্ড: ধারণার সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ 116
৮.২ সামাজিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ: কগনিটিভ পক্ষপাত এবং বিচারিক সিদ্ধান্ত 116
৮.৩ মিডিয়া ট্রায়াল এবং পূর্বনির্ধারিত দোষী সাব্যস্তকরণ 117
৮.৪ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মব জাস্টিস এবং পুরুষের বিরুদ্ধে ভার্চুয়াল সহিংসতা 117
অধ্যায় ৯: পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আইনি নিপীড়নের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব 118
৯.১ পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য: একটি উপেক্ষিত সংকট 118

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৯.২ কারাবাসের মানসিক ক্ষতি এবং পুনর্বাসনের অভাব 118
৯.৩ পুরুষ ভিকটিমের জন্য সহায়তা কাঠামোর অনুপস্থিতি 119
অধ্যায় ১০: যৌতুক আইনের ধারা ৬ (মিথ্যা মামলার শাস্তি): কেন এটি কার্যকর নয়? 119
১০.১ ধারা ৬ এর বিষয়বস্তু এবং কার্যকর প্রয়োগের বাধা 119
১০.২ তুলনামূলক আলোচনা: মিথ্যা মামলার কার্যকর প্রতিকার কোথায়? 120
১০.৩ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা 120
অধ্যায় ১১: পুরুষ হিসেবে যৌতুক দাবির শিকার: একটি উপেক্ষিত বাস্তবতা 120
১১.১ বিপরীত দিকের যৌতুক: বর পক্ষের কাছ থেকে দাবি 121
১১.২ দেনমোহরের চাপ এবং পুরুষের আর্থিক সংকট 121
১১.৩ মুসলিম আইনে পুরুষের অধিকারের পুনর্মূল্যায়ন 121
অধ্যায় ১২: আইনি সংস্কারের দার্শনিক ভিত্তি এবং প্রস্তাবিত রোডম্যাপ 122
১২.১ সংস্কারের নীতিগত ভিত্তি: সমতা, সুরক্ষা এবং ন্যায়বিচারের ত্রিমাত্রিক সমন্বয় 122
১২.২ আইনের ভাষায় সংস্কার: নির্দিষ্ট প্রস্তাবনা 122
১২.৩ বিচারিক সংস্কার: বিচারক প্রশিক্ষণ এবং বিচারিক মানসিকতার পরিবর্তন 123
১২.৪ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: একটি আইনি সমতা কমিশন 123
অধ্যায় ১৩: যৌতুক আইন ও মুসলিম নারীবাদ: একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ 123
১৩.১ ইসলামিক নারীবাদ এবং যৌতুক বিরোধিতার অবস্থান 123
১৩.২ উদারপন্থী নারীবাদ এবং পুরুষের অধিকার: একটি সংযোগ বিন্দু 124
অধ্যায় ১৪: বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা এবং যৌতুক মামলায় বিচারিক সংস্কৃতি 124
১৪.১ বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কাঠামো এবং স্বাধীনতার প্রশ্ন 124
১৪.২ আপিল বিভাগের ভূমিকা এবং যৌতুক মামলায় আইনের বিকাশ 125
১৪.৩ বিচারিক মনস্তাত্ত্বিক পক্ষপাত এবং তার প্রতিকার 125
অধ্যায় ১৫: সমকালীন আন্তর্জাতিক আলোচনা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট 125
১৫.১ পুরুষ অধিকার আন্দোলনের বৈশ্বিক বিকাশ এবং বাংলাদেশে তার অনুপস্থিতি 125
১৫.২ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং লিঙ্গ-সমতার বৈশ্বিক আলোচনা 126
১৫.৩ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে পুরুষের অধিকারের ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি 126
অধ্যায় ১৬: ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং পুরুষত্বের সংকট 127
১৬.১ পুরুষত্বের সামাজিক নির্মাণ এবং আইনি দুর্বলতা 127

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৬.২ সামাজিক যন্ত্র কাঠামোতে পুরুষের বাদ পড়ে যাওয়া 127
১৬.৩ যৌতুক আইন এবং শ্রেণি-বিভাজন: দরিদ্র পুরুষের বিপর্যয় 127
অধ্যায় ১৭: যৌতুক এবং গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন ২০১০: আরও একটি একতরফা কাঠামো 128
১৭.১ গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের পরিধি এবং সীমাবদ্ধতা 128
১৭.২ পুরুষ গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার: একটি অদৃশ্য সমস্যা 128
তৃতীয় খণ্ডের উপসংহার: একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি 129
উপসংহার: যৌতুক আইনের মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতের পথ 129
পরিশিষ্ট ক: যৌতুক নিষেধ আইন ২০১৮ এর ধারাগুলোর সারসংক্ষেপ ও মূল্যায়ন 130
পরিশিষ্ট খ: প্রস্তাবিত আইনি সংস্কারের রোডম্যাপ 130
চতুর্থ খণ্ড 131
পারিবারিক আইন এবং পুরুষের অধিকার: বিবাহ, বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, হেফাজত ও উত্তরাধিকারের সংকট 131
চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকা: পারিবারিক আইনের যুদ্ধক্ষেত্র 131
অধ্যায় ১৮: বাংলাদেশের পারিবারিক আইনের ঐতিহাসিক বিকাশ এবং বহুত্ববাদী কাঠামো 132
১৮.১ ব্যক্তিগত আইনের ধারণা এবং তার ঐতিহাসিক উৎস 132
১৮.২ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫: একটি পক্ষপাতদুষ্ট মঞ্চ 133
১৮.৩ বাংলাদেশের পারিবারিক আইনের মূল আইনি দলিলসমূহ: একটি সংক্ষিপ্ত মানচিত্র 133
অধ্যায় ১৯: মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১: বিশ্লেষণ ও সমালোচনা 134
১৯.১ অধ্যাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি 134
১৯.২ বহুবিবাহের নিয়ন্ত্রণ: পুরুষের স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ 134
১৯.৩ তালাক পদ্ধতি: ন্যায্যতার প্রশ্ন 135
১৯.৪ MFLO এর অধীনে বিবাহ নিবন্ধন: দায়িত্ব বনাম অধিকার 136
১৯.৫ মধ্যস্থতা পর্ষদ: একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠান 136
অধ্যায় ২০: তালাক ও বিবাহবিচ্ছেদ: পুরুষের উপর আইনি বোঝা 137
২০.১ তালাকের আইনগত কাঠামো এবং পুরুষের আর্থিক বাধ্যবাধকতা 137
২০.২ নারীর খুলা বিবাহবিচ্ছেদ: পুরুষের জন্য অসামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্থিতি 137
২০.৩ হিন্দু আইনে বিবাহবিচ্ছেদ: পুরুষের সম্পূর্ণ অধিকারহীনতা 138
অধ্যায় ২১: দেনমোহর: একটি ন্যায্য ধারণার অন্যায্য প্রয়োগ 139
২১.১ দেনমোহরের ধারণা এবং ইসলামী আইনে তার ভিত্তি 139

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

২১.২ দেনমোহরের পরিমাণ নির্ধারণ: সামাজিক প্রতিযোগিতা ও আইনি বাস্তবতা 139
২১.৩ দেনমোহর মামলায় আদালতের পক্ষপাত: বিশ্লেষণ 139
২১.৪ দেনমোহর এবং ভরণপোষণ মামলা: একটি দ্বৈত আর্থিক চাপ 140
অধ্যায় ২২: ভরণপোষণ আইন: একতরফা দায়িত্বের কাঠামো 140
২২.১ ভরণপোষণের আইনি ভিত্তি এবং ঐতিহাসিক বিকাশ 140
২২.২ ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণ: বিচারিক বিবেচনার সমস্যা 141
২২.৩ বিচ্ছেদের পরে সন্তানের ভরণপোষণ: পিতার দায়িত্ব কিন্তু মায়ের অধিকার 141
২২.৪ বয়স্ক সন্তানের ভরণপোষণ: পুরুষের অনন্ত দায়বদ্ধতা 142
অধ্যায় ২৩: সন্তানের হেফাজত: পিতার অধিকারের সংকট 142
২৩.১ শিশু হেফাজতের আইনি কাঠামো: অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০ 142
২৩.২ হেফাজত মামলায় "শিশুর কল্যাণ" নীতি: একটি পক্ষপাতদুষ্ট ব্যাখ্যা 143
২৩.৩ দর্শনাধিকার বা ভিজিটেশন রাইটস: নামে অধিকার, বাস্তবে ব্যর্থতা 143
২৩.৪ যৌথ হেফাজত: বাংলাদেশে অনুপস্থিত একটি ধারণা 144
২৩.৫ আন্তর্জাতিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ: হেফাজত আইনে বৈশ্বিক প্রবণতা 144
অধ্যায় ২৪: উত্তরাধিকার আইন: বৈষম্যের আরেকটি মাত্রা 145
২৪.১ মুসলিম উত্তরাধিকার আইন: লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নয় 145
২৪.২ হিন্দু উত্তরাধিকার আইন: পুরুষের অতিরিক্ত দায়িত্ব 145
২৪.৩ সম্পত্তি হস্তান্তরে পুরুষের অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতা: কিছু সাম্প্রতিক উদ্বেগ 145
অধ্যায় ২৫: বৈবাহিক সম্পত্তি আইনের শূন্যতা: পুরুষের অধিকারের অপ্রতুল সুরক্ষা 146
২৫.১ বৈবাহিক সম্পত্তির ধারণা এবং বাংলাদেশে এর অনুপস্থিতি 146
২৫.২ বিবাহের ব্যয়ভার: পুরুষের একতরফা আর্থিক বোঝা 146
২৫.৩ আইনি পরামর্শ সংস্কৃতির অনুপস্থিতি: পুরুষের অজ্ঞতা ও দুর্বলতা 147
অধ্যায় ২৬: বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় পুরুষের অভিজ্ঞতা: একটি মানবিক বিশ্লেষণ 147
২৬.১ বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মানসিক এবং সামাজিক মাত্রা 147
২৬.২ পারিবারিক বিচ্ছেদে পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যের সংকট 148
২৬.৩ পারিবারিক আইনে মিথ্যা অভিযোগের নিদর্শন: একটি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি 148
অধ্যায় ২৭: পারিবারিক আইনে জুরিসপ্রুডেন্টিয়াল বিশ্লেষণ 148
২৭.১ রলসিয়ান ন্যায়বিচার তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের পারিবারিক আইন 148

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

২৭.২ ক্ষমতার দর্শন এবং পারিবারিক আইন: মিশেল ফুকোর বিশ্লেষণ কাঠামো 149
২৭.৩ লিবার্টারিয়ান দর্শন এবং পারিবারিক আইন: রবার্ট নোজিকের দৃষ্টিকোণ 149
২৭.৪ কেয়ার এথিক্স এবং পুরুষের অভিজ্ঞতা: ক্যারল গিলিগানের তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন 150
২৭.৫ আইনি বাস্তববাদ এবং বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতের অনুশীলন 150
অধ্যায় ২৮: পারিবারিক আইনে ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন 151
২৮.১ পারিবারিক বিরোধে ভিকটিম পরিচয়ের রাজনীতি 151
২৮.২ আইনি সহায়তা সংস্থার ভূমিকা এবং একতরফা পরামর্শ 151
২৮.৩ গণমাধ্যমের ভূমিকা: পারিবারিক বিরোধে পক্ষপাতদুষ্ট আখ্যান 152
অধ্যায় ২৯: হিন্দু, খ্রিস্টান এবং ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পারিবারিক আইন: পুরুষের অতিরিক্ত দুর্বলতা 152
২৯.১ হিন্দু পারিবারিক আইনে পুরুষের বিশেষ সমস্যা 152
২৯.২ খ্রিস্টান পারিবারিক আইনে বিবাহবিচ্ছেদের জটিলতা 152
২৯.৩ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পারিবারিক আইন: প্রথাগত আইন এবং পুরুষের অবস্থা 153
অধ্যায় ৩০: তুলনামূলক আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণ: বিশ্বের অন্যান্য দেশে পারিবারিক আইনের বিবর্তন 153
৩০.১ ভারতের পারিবারিক আইন সংস্কারের অভিজ্ঞতা 153
৩০.২ পাকিস্তানে মুসলিম পারিবারিক আইনের বিকাশ 154
৩০.৩ পশ্চিমা দেশগুলোতে পারিবারিক আইন সংস্কারের সাম্প্রতিক প্রবণতা 154
৩০.৪ তুরস্ক এবং মরক্কোতে মুসলিম পারিবারিক আইন সংস্কার: একটি অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ 154
অধ্যায় ৩১: পারিবারিক আইনে রাজনৈতিক অর্থনীতি: কেন সংস্কার হচ্ছে না 155
৩১.১ পারিবারিক আইন সংস্কারের রাজনৈতিক বাধা 155
৩১.২ পারিবারিক আইন সংস্কারের প্রতিষ্ঠানিক বাধা 155
৩১.৩ নাগরিক সমাজের ভূমিকা: অসম্পূর্ণ একটি চিত্র 156
অধ্যায় ৩২: পারিবারিক আইনে সাম্প্রতিক বিচারিক প্রবণতা এবং উদ্বেগজনক নজির 156
৩২.১ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে পারিবারিক মামলার বিশ্লেষণ 156
৩২.২ পারিবারিক আদালতে দ্রুত বিচারের অনুপস্থিতি এবং তার প্রভাব 157
অধ্যায় ৩৩: পারিবারিক আইনে ডিজিটাল যুগের নতুন চ্যালেঞ্জ 157
৩৩.১ সামাজিক মিডিয়া এবং পারিবারিক বিরোধে মানহানির হাতিয়ার 157
৩৩.২ ডিজিটাল প্রমাণ এবং পারিবারিক মামলা 158
অধ্যায় ৩৪: পারিবারিক আইনে পুরুষের মনোবিজ্ঞান এবং সামাজিক প্রত্যাশা 158

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৩৪.১ সামাজিক প্রত্যাশা এবং পুরুষের আইনি ভুলনীতি 158
৩৪.২ পুরুষের কান্নার অধিকার: একটি সাংস্কৃতিক এবং আইনি বিশ্লেষণ 158
অধ্যায় ৩৫: পারিবারিক আইন সংস্কারের প্রস্তাব: একটি ব্যাপক রোডম্যাপ 159
৩৫.১ স্বল্পমেয়াদী সংস্কার: বিচারিক এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ 159
৩৫.২ মধ্যমেয়াদী সংস্কার: আইন সংশোধন এবং নতুন আইন 159
৩৫.৩ দীর্ঘমেয়াদী সংস্কার: সাংস্কৃতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন 160
চতুর্থ খণ্ডের উপসংহার: পারিবারিক ন্যায়বিচারের একটি নতুন দিগন্ত 160
পরিশিষ্ট ক: বাংলাদেশের পারিবারিক আইনের মূল আইনসমূহের ধারা-বিশ্লেষণ সারণি 162
পরিশিষ্ট খ: পারিবারিক আইনে পুরুষের অধিকার বিষয়ক চেকলিস্ট 162
পঞ্চম খণ্ড 163
ফৌজদারি আইনের অন্ধকার গলি: বাংলাদেশে পুরুষের বিরুদ্ধে দণ্ডিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থার কাঠামোগত বৈষম্য 163
পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকা: ফৌজদারি আইন এবং পুরুষের অসুরক্ষিত অস্তিত্ব 163
অধ্যায় ৩৬: ফৌজদারি আইনে লিঙ্গ-পক্ষপাতের দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক ভিত্তি 164
৩৬.১ দণ্ডবিধির দার্শনিক ভিত্তি এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার দাবি 164
৩৬.২ ক্রিটিকাল লিগ্যাল স্টাডিজ এবং পুরুষের অভিজ্ঞতা 164
৩৬.৩ ফেমিনিস্ট লিগ্যাল থিওরি এবং তার সীমাবদ্ধতা 165
৩৬.৪ ম্যাসকুলিনিটি স্টাডিজ এবং ফৌজদারি আইন 165
অধ্যায় ৩৭: বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০: লিঙ্গ-পক্ষপাতের মূল উৎস 166
৩৭.১ দণ্ডবিধির ঐতিহাসিক পটভূমি এবং লর্ড ম্যাকোলের দৃষ্টিভঙ্গি 166
৩৭.২ ধারা ৩৭৫-৩৭৬: ধর্ষণের সংজ্ঞায় পুরুষ ভিকটিমের অনুপস্থিতি 166
৩৭.৩ ধারা ৪৯৭: ব্যভিচার আইনের লিঙ্গ-পক্ষপাত এবং ২০২৫ পরিস্থিতি 167
৩৭.৪ ধারা ৩৭৭: অপ্রাকৃতিক অপরাধের আইন এবং পুরুষের শরীরের উপর রাষ্ট্রীয় আধিপত্য 168
৩৭.৫ ধারা ৩৫৪, ৩৫৪-এ, ৩৫৪-খ: নারীর শালীনতার আইন এবং পুরুষের একতরফা দায় 168
৩৭.৬ ধারা ৪৯৮: বিবাহিত নারীকে প্রলোভন দেওয়ার আইন এবং তার অপব্যবহার 169
অধ্যায় ৩৮: ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এবং পুরুষের আইনগত অসুবিধা 169
৩৮.১ ধারা ৫৪: গ্রেফতারের ক্ষমতা এবং তার অপব্যবহার 169
৩৮.২ জামিনের রাজনীতি: কীভাবে পুরুষ জামিন পেতে অসুবিধায় পড়েন 170
৩৮.৩ তদন্ত প্রক্রিয়ায় পক্ষপাত: পুরুষের বিরুদ্ধে তদন্তের একতরফা ধরন 170

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৩৮.৪ নারী পুলিশ ডেস্ক এবং পুরুষ অভিযোগকারীর সমস্যা 171
অধ্যায় ৩৯: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এবং ২০২৫ সংশোধনী: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ 171
৩৯.১ আইনের উদ্দেশ্য এবং বাস্তবতার মধ্যে ফাটল 171
৩৯.২ ধারা ৯: ধর্ষণের সংজ্ঞা, শাস্তি এবং প্রমাণের বোঝা 172
৩৯.৩ মার্চ ২০২৫ সংশোধনী: একটি অসম্পূর্ণ পদক্ষেপ 172
৩৯.৪ নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল: বিচারিক কাঠামোয় পক্ষপাত 173
অধ্যায় ৪০: গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০: একটি লিঙ্গ-নির্দিষ্ট আইনের সমস্যা 173
৪০.১ আইনের কাঠামো এবং লিঙ্গ-পক্ষপাতী সংজ্ঞা 173
৪০.২ পুরুষ গার্হস্থ্য নির্যাতন: একটি অদৃশ্য বাস্তবতা 174
৪০.৩ আন্তর্জাতিক তুলনা: অন্য দেশে কীভাবে পুরুষ গার্হস্থ্য সহিংসতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে 174
অধ্যায় ৪১: বিচারপূর্ব আটক এবং পুরুষের মর্যাদাহানি: একটি বিশেষ সমস্যা 175
৪১.১ বিচারপূর্ব আটকের হার এবং লিঙ্গ-বৈষম্য 175
৪১.২ গ্রেফতারের পরে সামাজিক মৃত্যু: পুরুষের জন্য একটি বিশেষ পরিস্থিতি 175
৪১.৩ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং বিচারপূর্ব আটকের সীমাবদ্ধতা 175
অধ্যায় ৪২: দণ্ড বিধান এবং শাস্তি নির্ধারণে লিঙ্গ-পক্ষপাত 176
৪২.১ শাস্তি নির্ধারণে বিচারিক বিবেচনা এবং লিঙ্গ-প্রভাব 176
৪২.২ মৃত্যুদণ্ড এবং লিঙ্গ-পক্ষপাত 176
৪২.৩ পুরুষের বিরুদ্ধে শাস্তি নির্ধারণে সামাজিক ধারণার প্রভাব 177
অধ্যায় ৪৩: মিথ্যা মামলা এবং ফৌজদারি ন্যায়বিচার ব্যবস্থার বিকৃতি 177
৪৩.১ মিথ্যা মামলার সংজ্ঞা, ধরন এবং ব্যাপ্তি 177
৪৩.২ যৌতুক মামলায় মিথ্যা অভিযোগের কাঠামো 178
৪৩.৩ এফআইআর অপব্যবহার এবং পুরুষের অধিকার 178
৪৩.৪ মিথ্যা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকারের অপর্যাপ্ততা 179
অধ্যায় ৪৪: ফৌজদারি বিচারে পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মহত্যার সংকট 179
৪৪.১ মামলা এবং পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক 179
৪৪.২ কারাগারে পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব 179
৪৪.৩ আইনি হয়রানি এবং পুরুষের মানসিক বিপর্যয়: একটি জনস্বাস্থ্য দৃষ্টিভঙ্গি 180
অধ্যায় ৪৫: সাইবার অপরাধ আইন এবং পুরুষের অধিকার 180

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৪৫.১ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩: পুরুষের দৃষ্টিকোণ 180
৪৫.২ অনলাইন মানহানি আইন এবং পুরুষের অধিকার 181
৪৫.৩ পর্নোগ্রাফি আইন এবং পুরুষের বিরুদ্ধে একতরফা প্রয়োগ 181
অধ্যায় ৪৬: বিচারিক ব্যাখ্যায় পুরুষ-বিরোধী প্রবণতা: কেস ল বিশ্লেষণ 181
৪৬.১ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারিক দৃষ্টিভঙ্গি 181
৪৬.২ বিচারিক পক্ষপাতের ধরন: একটি বিশ্লেষণ 182
৪৬.৩ উচ্চ আদালতের ভূমিকা এবং সংশোধনী বিচার 182
অধ্যায় ৪৭: মাদকবিরোধী আইন এবং পুরুষের উপর প্রভাব 183
৪৭.১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এবং পুরুষের অসামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রেফতার 183
৪৭.২ মাদক মামলায় প্রমাণ এবং পুলিশের বিবেচনামূলক ক্ষমতার অপব্যবহার 183
অধ্যায় ৪৮: জঙ্গিবাদ দমন আইন, সন্ত্রাসবিরোধী আইন এবং পুরুষের অধিকার 184
৪৮.১ সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ এবং পুরুষের প্রতি তার প্রভাব 184
৪৮.২ বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং পুরুষের বিনা বিচারে আটক 184
অধ্যায় ৪৯: ফৌজদারি আইনে পুরুষের অধিকার: তুলনামূলক আইনি বিশ্লেষণ 184
৪৯.১ ভারতের অভিজ্ঞতা: সংস্কার এবং তার পাঠ 184
৪৯.২ পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা: পুরুষ অধিকার আন্দোলন এবং আইনি পরিবর্তন 185
৪৯.৩ শ্রীলঙ্কার সংস্কার মডেল এবং বাংলাদেশের জন্য পাঠ 185
৪৯.৪ স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মডেল: লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ফৌজদারি আইনের উদাহরণ 185
অধ্যায় ৫০: ফৌজদারি আইন সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি 186
৫০.১ কেন সংস্কার হয় না: রাজনৈতিক প্রণোদনার কাঠামো 186
৫০.২ ২০২৪ রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং সংস্কারের নতুন সম্ভাবনা 186
৫০.৩ নাগরিক সমাজ এবং পুরুষ অধিকার আন্দোলনের সম্ভাবনা 187
অধ্যায় ৫১: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং পুরুষের ফৌজদারি আইনি অধিকার 187
৫১.১ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি 187
৫১.২ ICCPR এবং বাংলাদেশের দায়বদ্ধতা 187
৫১.৩ CEDAW এবং তার একতরফা প্রয়োগের সমস্যা 188
অধ্যায় ৫২: ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় পুরুষের প্রতিনিধিত্ব এবং প্রবেশাধিকার 188
৫২.১ আইনি সহায়তা ব্যবস্থা এবং পুরুষের অপর্যাপ্ত প্রবেশাধিকার 188

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৫২.২ আইনজীবীর সংকট এবং পুরুষ মক্কেলের সমস্যা 188
৫২.৩ বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা এবং পুরুষের উপর প্রভাব 189
অধ্যায় ৫৩: পুলিশ-পুরুষ সম্পর্ক: প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাতের বাস্তব চিত্র 189
৫৩.১ পুলিশ সংস্কৃতি এবং পুরুষ অভিযুক্তের প্রতি আচরণ 189
৫৩.২ পুলিশ সংস্কার ২০২৫ এবং পুরুষের অধিকারের দৃষ্টিকোণ 190
৫৩.৩ থানায় পুরুষ অভিযোগকারীর সমস্যা 190
অধ্যায় ৫৪: ফৌজদারি আইনে পুরুষ অধিকার রক্ষার একটি সংস্কার এজেন্ডা 190
৫৪.১ অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন: আইনি সংশোধনী 190
৫৪.২ মধ্যমেয়াদী সংস্কার: প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন 191
৫৪.৩ দীর্ঘমেয়াদী সংস্কার: সাংস্কৃতিক এবং দার্শনিক পরিবর্তন 191
অধ্যায় ৫৫: ফৌজদারি আইনে পুরুষ অধিকারের ভবিষ্যৎ: একটি দর্শনগত দৃষ্টিভঙ্গি 192
৫৫.১ "Equal Justice Under Law": একটি পুনর্নির্মাণের প্রয়াস 192
৫৫.২ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ফৌজদারি আইনের দিকে: একটি পথনির্দেশ 192
৫৫.৩ একটি ন্যায়বিচারের দর্শন: উভয় লিঙ্গের জন্য সমান মর্যাদা 193
পঞ্চম খণ্ডের উপসংহার: ফৌজদারি ন্যায়বিচার এবং পুরুষের মর্যাদা 193
পরিশিষ্ট ক: ফৌজদারি আইনে পুরুষবিরোধী ধারাসমূহের সারণি 194
পরিশিষ্ট খ: পুরুষ আসামির আইনি অধিকারের চেকলিস্ট 195
ষষ্ঠ খণ্ড 195
পুরুষ নির্যাতনের আইনি অদৃশ্যতা: স্বীকৃতির সংকট, সামাজিক বাস্তবতা এবং সংস্কারের রোডম্যাপ 195
ষষ্ঠ খণ্ডের ভূমিকা: যে কষ্টের নাম নেই 195
অধ্যায় ৫৬: গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০: একটি বিস্তারিত আইনতাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদ 196
৫৬.১ আইনের জন্মবৃত্তান্ত এবং বিধিবদ্ধ উদ্দেশ্য 196
৫৬.২ সংজ্ঞার আইনতাত্ত্বিক সমস্যা: ভিকটিম হওয়ার অধিকার এবং লিঙ্গ 197
৫৬.৩ আইনের ৪ ধারা এবং সুরক্ষার প্রকার: পুরুষের বাইরে থাকা 198
৫৬.৪ তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি: বিশ্বে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের বিবর্তন 198
৫৬.৫ বাংলাদেশের আইন কমিশন এবং সংস্কারের সুপারিশ: প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতা 199
অধ্যায় ৫৭: পুরুষ যৌন নির্যাতন: আইনি স্বীকৃতির ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং বর্তমান অবস্থা 199
৫৭.১ যৌন নির্যাতনের ঐতিহাসিক আইনি সংজ্ঞা এবং পুরুষের বাইরে থাকা 200

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৫৭.২ ২০২৫ সালের অধ্যাদেশ সংশোধনী: একটি আংশিক প্রগতি এবং তার সীমা 200
৫৭.৩ পুরুষ যৌন নির্যাতনের বৈশ্বিক স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশের অবস্থান 201
৫৭.৪ পুরুষ যৌন নির্যাতনের মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাব এবং আইনি স্বীকৃতির সম্পর্ক 201
অধ্যায় ৫৮: পুরুষ গার্হস্থ্য নির্যাতনের সামাজিক বাস্তবতা এবং কলঙ্কের সংস্কৃতি 202
৫৮.১ "পুরুষ কাঁদে না": সামাজিক নির্মাণ এবং আইনি প্রভাব 202
৫৮.২ পুরুষ নির্যাতনের ধরন এবং তার আইনি অস্বীকৃতি 202
৫৮.৩ পুরুষ ভিকটিমের নীরবতার কারণ বিশ্লেষণ 203
৫৮.৪ "ভিকটিম কার্ড" এবং পারস্পরিক নির্যাতনের জটিলতা 204
৫৮.৫ মিডিয়া এবং পুরুষ নির্যাতনের উপস্থাপনা: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ 204
অধ্যায় ৫৯: পুরুষ নির্যাতন এবং ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি: একটি গভীর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ 205
৫৯.১ "ভিকটিম সংস্কৃতি" এর উদ্ভব এবং আইনি পরিণতি 205
৫৯.২ মিথ্যা অভিযোগের সংস্কৃতি এবং পুরুষের উপর প্রভাব 205
৫৯.৩ পুরুষ আত্মহত্যা, পারিবারিক বিরোধ এবং আইনি বৈষম্যের সংযোগ 206
অধ্যায় ৬০: পুরুষ অধিকার আন্দোলন এবং তার আইনতাত্ত্বিক ভিত্তি 206
৬০.১ বৈশ্বিক পুরুষ অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস এবং দর্শন 206
৬০.২ পুরুষ অধিকার আন্দোলনের আইনতাত্ত্বিক ন্যায্যতা 207
৬০.৩ সমালোচনামূলক পুরুষ অধ্যয়ন এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি 207
অধ্যায় ৬১: পুরুষ সন্তান হেফাজতের আইনি লড়াই: একটি গভীর বিশ্লেষণ 208
৬১.১ মুসলিম পারিবারিক আইন এবং পিতার হেফাজত অধিকার 208
৬১.২ "সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থ" তত্ত্ব এবং পিতার অধিকার 209
৬১.৩ পিতার দর্শন ও মনোবিজ্ঞান: সন্তানের জন্য পিতার ভূমিকা 209
৬১.৪ যোগাযোগ অধিকার এবং তার বাস্তব পরিস্থিতি 210
অধ্যায় ৬২: ব্যভিচার আইন, পুরুষ এবং আইনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ 210
৬২.১ দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা: একটি সামন্তবাদী অবশেষ 210
৬২.২ ব্যভিচার আইনের দার্শনিক ভিত্তি এবং আধুনিক ন্যায়বিচারের সাথে সংঘর্ষ 211
অধ্যায় ৬৩: পুরুষের অর্থনৈতিক শোষণ এবং আইনি প্রতিকারের অভাব 211
৬৩.১ খোরপোষ আইন এবং পুরুষের একতরফা দায়িত্ব 211
৬৩.২ দেনমোহর এবং পুরুষের আর্থিক বোঝা: একটি পুনর্মূল্যায়ন 212

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৬৩.৩ সম্পত্তি বিভাজন এবং পুরুষের সাংবিধানিক অধিকার 212
অধ্যায় ৬৪: পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্য, আইনি নির্যাতন এবং সুইসাইড: একটি অবহেলিত সংকট 213
৬৪.১ পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক চাপ 213
৬৪.২ আইনি প্রক্রিয়া এবং পুরুষের মানসিক আঘাত 213
৬৪.৩ পুরুষ আত্মহত্যার সংকট এবং আইনের দায় 214
অধ্যায় ৬৫: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামো এবং পুরুষ অধিকার 214
৬৫.১ জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা 214
৬৫.২ ICCPR এর অধীনে বাংলাদেশের দায়িত্ব এবং পুরুষ অধিকার 215
৬৫.৩ আঞ্চলিক মানবাধিকার কাঠামো এবং পুরুষ অধিকার 215
অধ্যায় ৬৬: পুরুষ নির্যাতনের আইনি স্বীকৃতির দিকে: তুলনামূলক মডেল 216
৬৬.১ যুক্তরাজ্যের মডেল: লিঙ্গ-অন্তর্ভুক্তিমূলক গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন 216
৬৬.২ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মডেল: লিঙ্গ-সমতার সংস্কৃতি এবং আইন 216
৬৬.৩ ভারতের অভিজ্ঞতা: সীমাবদ্ধতা এবং সাম্প্রতিক উন্নয়ন 217
অধ্যায় ৬৭: পুরুষ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংস্কারের রোডম্যাপ 217
৬৭.১ আইনি সংশোধনীর রোডম্যাপ: অগ্রাধিকার এবং পদ্ধতি 217
৬৭.২ বিচার বিভাগীয় সংস্কার এবং বিচারকের প্রশিক্ষণ 218
৬৭.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: পুরুষ ভিকটিমের জন্য সহায়তা কাঠামো 218
৬৭.৪ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার: দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের পথ 219
অধ্যায় ৬৮: পুরুষ অধিকার আন্দোলনের দার্শনিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি নির্মাণ 220
৬৮.১ পুরুষবাদ বনাম নারীবাদ: একটি মিথ্যা দ্বন্দ্ব 220
৬৮.২ বামপন্থী এবং উদারনৈতিক রাজনীতিতে পুরুষ অধিকার 220
৬৮.৩ ন্যায়বিচারের রলসিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি এবং পুরুষ অধিকার 220
৬৮.৪ সেনের সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি এবং পুরুষ অধিকার 221
অধ্যায় ৬৯: সাম্প্রতিক উন্নয়ন, প্রবণতা এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি 221
৬৯.১ ২০২৪-২০২৬ সালে বাংলাদেশে পুরুষ অধিকার বিষয়ক আলোচনার বিকাশ 221
৬৯.২ বৈশ্বিক প্রবণতা এবং বাংলাদেশের উপর প্রভাব 222
৬৯.৩ প্রযুক্তি এবং পুরুষ অধিকারের নতুন মাত্রা 222
অধ্যায় ৭০: পুরুষ নির্যাতন এবং ইসলামিক আইনের দৃষ্টিভঙ্গি 223

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৭০.১ ইসলামিক আইনে ন্যায়বিচার এবং পুরুষের অধিকার 223
৭০.২ ইসলামিক আইনে প্রমাণের মানদণ্ড এবং আধুনিক আইনের তুলনা 223
৭০.৩ ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং পুরুষ অধিকার আন্দোলনের সুযোগ 223
ষষ্ঠ খণ্ডের উপসংহার: অদৃশ্যতার বিরুদ্ধে স্বীকৃতির যুদ্ধ 224
পরিশিষ্ট ক: ষষ্ঠ খণ্ডে আলোচিত প্রধান আইনসমূহ এবং তাদের পুরুষ-প্রাসঙ্গিক বিধানের সারণি 225
পরিশিষ্ট খ: পুরুষ নির্যাতন ভিকটিমের জন্য ব্যবহারিক নির্দেশনা 225
পরিশিষ্ট গ: পুরুষ নির্যাতন বিষয়ক মূল তথ্য ও পরিসংখ্যান 226
সপ্তম খণ্ড 227
মিথ্যা মামলার রাজনীতি, ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি এবং বহুমাত্রিক প্রতিকার: একটি গভীর আইনতাত্ত্বিক ও সামাজিক অনুসন্ধান 227
সপ্তম খণ্ডের ভূমিকা 227
অধ্যায় ৭১: মিথ্যা মামলার আইনি সংজ্ঞা, শ্রেণীবিভাগ ও কাঠামোগত বিশ্লেষণ 227
৭১.১ মিথ্যা মামলার আইনি সংজ্ঞা: একটি জটিল প্রশ্ন 228
৭১.২ মিথ্যা মামলার ঐতিহাসিক পটভূমি: কখন থেকে শুরু হলো এই সংকট 228
৭১.৩ মিথ্যা মামলার বর্তমান পরিসংখ্যান: কতটুকু বাস্তব সংকট 229
অধ্যায় ৭২: মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া ও কলাকৌশল: একটি গভীর তদন্ত 230
৭২.১ মামলা দায়েরের প্রাথমিক পর্যায়: কীভাবে একটি মিথ্যা মামলার সূচনা হয় 230
৭২.২ মামলা প্রস্তুতিতে আইনজীবীর ভূমিকা 231
৭২.৩ নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালের কাঠামোগত দুর্বলতা এবং মিথ্যা মামলার সুযোগ 231
অধ্যায় ৭৩: পুলিশি তদন্ত প্রক্রিয়ায় মিথ্যা মামলার গতিশীলতা 232
৭৩.১ পুলিশের কাঠামোগত পক্ষপাত এবং তার কারণ 232
৭৩.২ তদন্ত প্রক্রিয়ার বিকৃতি: কীভাবে মিথ্যা মামলা পুলিশের হাত দিয়ে শক্তিশালী হয় 232
৭৩.৩ পুলিশ দুর্নীতি এবং মিথ্যা মামলার আর্থিক গতিশীলতা 233
অধ্যায় ৭৪: বিচারিক প্রক্রিয়ায় মিথ্যা মামলার যাত্রা ও পরিণতি 233
৭৪.১ ট্রাইব্যুনাল থেকে রায় পর্যন্ত: একটি দীর্ঘ ও বেদনাদায়ক যাত্রা 234
৭৪.২ মীমাংসার চাপ এবং ন্যায়বিচারের বিকল্প পথ 234
৭৪.৩ খালাসের পর: বিজয়ের বিড়ম্বনা 234
অধ্যায় ৭৫: আইনজীবী শিল্প ও মিথ্যা মামলার অর্থনৈতিক বাস্তবতা 235

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৫.১ আইন-ব্যবসার রাজনৈতিক অর্থনীতি 235
১৫.২ মীমাংসার শিল্প: কীভাবে আইনি প্রক্রিয়া অর্থ আদায়ের হাতিয়ার হয় 236
১৫.৩ এনজিও সেক্টরের ভূমিকা এবং প্রণোদনার সমস্যা 236
অধ্যায় ১৬: ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির গভীর আইনতাত্ত্বিক ও মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 237
১৬.১ ভিকটিম পরিচয়ের সামাজিক মূল্য: কীভাবে একটি পরিচয় হাতিয়ারে পরিণত হয় 237
১৬.২ মিথ্যা স্মৃতি এবং আত্মবিশ্বাসী মিথ্যা সাক্ষ্য: মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ 237
১৬.৩ সামাজিক চাপ এবং মিথ্যা অভিযোগে প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতা 238
অধ্যায় ১৭: মিডিয়া ট্রায়াল ও জনমত: একটি জটিল সম্পর্ক 238
১৭.১ বাংলাদেশে মিডিয়া ট্রায়ালের ঐতিহ্য এবং নতুন রূপ 238
১৭.২ মিডিয়ার পক্ষপাতের কারণ: অর্থনীতি ও আদর্শের আন্তঃক্রিয়া 239
১৭.৩ মিডিয়ার দায়বদ্ধতা এবং আইনি প্রতিকারের অপ্রতুলতা 240
অধ্যায় ১৮: সামাজিক মিডিয়া, ডিজিটাল ন্যায়বিচার ও মিথ্যা অভিযোগের নতুন যুগ 240
১৮.১ সামাজিক মিডিয়া কীভাবে মিথ্যা অভিযোগের একটি নতুন হাতিয়ার হয়েছে 240
১৮.২ ডিজিটাল ন্যায়বিচারের সমস্যা এবং আইনের অনুপস্থিতি 240
১৮.৩ সাইবার নিরাপত্তা আইন ও ডিজিটাল প্রতিরোধের দ্বন্দ্ব 241
অধ্যায় ১৯: রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে মামলা: বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আইনের অপব্যবহার 241
১৯.১ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ব্যবহার 241
১৯.২ ক্ষমতার কাঠামো এবং আইনের পার্থক্যমূলক প্রয়োগ 242
১৯.৩ ২০২৪ সালের পট-পরিবর্তনের পর রাজনৈতিক মামলার নতুন গতিশীলতা 242
অধ্যায় ৮০: মিথ্যা মামলার আর্থিক ও সামাজিক খরচ: একটি সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ 242
৮০.১ ব্যক্তিগত খরচ: একটি পরিবারের ধ্বংসের হিসাব 242
৮০.২ সামাজিক খরচ: রাষ্ট্র ও সমাজের উপর প্রভাব 243
অধ্যায় ৮১: মিথ্যা মামলা প্রতিরোধের আইনি সংস্কার: প্রস্তাব ও আইনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ 244
৮১.১ জামিন সংস্কার: একটি জরুরি প্রয়োজনীয়তা 244
৮১.২ প্রাথমিক তদন্তের বাধ্যবাধকতা: একটি সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা 244
৮১.৩ মিথ্যা মামলার শাস্তি: বর্তমান বিধানের সংস্কার 245
৮১.৪ ক্ষতিপূরণের আইনি কাঠামো 245
অধ্যায় ৮২: বিচারিক ও তদন্ত সংস্কার: পদ্ধতিগত পরিবর্তনের রোডম্যাপ 245

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৮২.১ বিশেষ তদন্ত দল: একটি নতুন পদ্ধতি 245
৮২.২ বিচারিক প্রশিক্ষণের পুনর্গঠন: ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা 246
৮২.৩ মামলা ব্যবস্থাপনা সংস্কার: দীর্ঘসূত্রতা কমানো 246
অধ্যায় ৮৩: তুলনামূলক আইনি বিশ্লেষণ: মিথ্যা মামলা রোধে বৈশ্বিক মডেল 246
৮৩.১ ভারতের অর্নেশ কুমার মামলার প্রভাব: বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা 246
৮৩.২ যুক্তরাজ্যের ডিউ প্রসেস মডেল: মিথ্যা অভিযোগ এবং ন্যায়বিচারের ভারসাম্য 247
৮৩.৩ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মডেল: মধ্যস্থতা ও পুনরুদ্ধারমূলক ন্যায়বিচার 247
অধ্যায় ৮৪: সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার: দীর্ঘমেয়াদী পথনির্দেশনা 248
৮৪.১ শিক্ষা ব্যবস্থায় লিঙ্গ-সমতার সঠিক ধারণা প্রতিষ্ঠা 248
৮৪.২ পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা এবং সংকট সমর্থন ব্যবস্থা 248
৮৪.৩ মিডিয়া সংস্কার: দায়িত্বশীল সংবাদমাধ্যমের জন্য নীতিমালা 248
৮৪.৪ নারী ও পুরুষ সংগঠনের মধ্যে সংলাপ 249
অধ্যায় ৮৫: ২০২৪-২০২৬ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, সাম্প্রতিক আইনি সংস্কার এবং ভবিষ্যতের সুযোগ 249
৮৫.১ অন্তর্বর্তী সরকারের আইনি সংস্কার এজেন্ডা এবং পুরুষ অধিকারের অনুপস্থিতি 249
৮৫.২ ২০২৫ সালের আইনি সংস্কারের মূল্যায়ন: কতটুকু এগিয়েছি, কতটুকু বাকি 250
৮৫.৩ রাজনৈতিক সুযোগ এবং সংস্কারের পথ 250
অধ্যায় ৮৬: মিথ্যা মামলা, পুরুষ অধিকার এবং লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের একটি নতুন দর্শন 251
৮৬.১ ন্যায়বিচারের বৃত্তাকার মডেল: শুধু শাস্তি নয়, পুনরুদ্ধার 251
৮৬.২ আমার্ত্য সেনের সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি এবং পুরুষ অধিকার 251
৮৬.৩ হেগেলের স্বীকৃতির দর্শন এবং পুরুষ নির্যাতনের অদৃশ্যতা 251
৮৬.৪ হান্না আরেন্টের রাজনৈতিক দর্শন এবং আইনের সামনে সমতা 252
অধ্যায় ৮৭: মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে একটি সামগ্রিক কর্মকৌশল 252
৮৭.১ স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ: তাৎক্ষণিক সংস্কারের রোডম্যাপ 252
৮৭.২ মধ্যমেয়াদী পদক্ষেপ: কাঠামোগত সংস্কারের রোডম্যাপ 253
৮৭.৩ দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ: সামাজিক রূপান্তরের রোডম্যাপ 253
সপ্তম খণ্ডের উপসংহার: ন্যায়বিচারের পথে একটি সৎ রাজনীতির দাবি 253
পরিশিষ্ট ক: সপ্তম খণ্ডে আলোচিত মিথ্যা মামলা সংক্রান্ত প্রধান আইনি বিধানের সারণি 254
পরিশিষ্ট খ: মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষের জন্য ব্যবহারিক নির্দেশনা 255

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পরিশিষ্ট গ: মিথ্যা মামলা সংক্রান্ত বৈশ্বিক তথ্য এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট 256
অষ্টম খণ্ড 256
সামাজিক কাঠামো, ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি এবং লিঙ্গ-রাজনীতির নতুন বাস্তবতা 256
গ্রন্থকারের ভূমিকা: অষ্টম খণ্ড প্রসঙ্গে 256
অধ্যায় ৮৮: ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি 257
৮৮.১ ভিকটিমহুড: একটি সামাজিক নির্মাণের তত্ত্ব 257
৮৮.২ পিতৃতন্ত্র এবং ভিকটিমহুড সংস্কৃতির একটি বিপরীতাভাসী সম্পর্ক 258
৮৮.৩ বাংলাদেশে ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির বিকাশের ঐতিহাসিক পটভূমি 258
৮৮.৪ ভিকটিমহুড সংস্কৃতির মনোবৈজ্ঞানিক মূল 259
অধ্যায় ৮৯: পরিবার কাঠামো এবং লিঙ্গ-পক্ষপাতের সামাজিক প্রজনন 260
৮৯.১ বাংলাদেশের পারিবারিক কাঠামো: একটি জটিল দ্বন্দ্ব 260
৮৯.২ বিবাহের অর্থনীতি এবং কৌশলগত সুবিধার হিসাব 260
৮৯.৩ শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি এবং আইনগত কৌশলের সংযোগ 261
অধ্যায় ৯০: শিক্ষা ব্যবস্থা এবং লিঙ্গ-পক্ষপাতের সামাজিক পুনরুৎপাদন 262
৯০.১ বাংলাদেশের শিক্ষাক্রমে লিঙ্গ বিষয়ক বার্তা 262
৯০.২ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং লিঙ্গ একাডেমিয়ার একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা 262
৯০.৩ পাঠ্যক্রমের বাইরে: অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং লিঙ্গ সমাজীকরণ 263
অধ্যায় ৯১: ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং লিঙ্গ ব্যবস্থার জটিল সম্পর্ক 263
৯১.১ ইসলামিক আইনের ব্যাখ্যা এবং লিঙ্গ পক্ষপাত 263
৯১.২ মসজিদের ভাষণ, খুতবা এবং লিঙ্গ সামাজিকীকরণ 264
৯১.৩ হিন্দু ধর্মীয় আইন এবং পুরুষের সংকট 264
অধ্যায় ৯২: মিডিয়া, বর্ণনা নির্মাণ এবং পুরুষের বিচার 264
৯২.১ মূলধারার মিডিয়া এবং লিঙ্গ পক্ষপাতী সংবাদ পরিবেশনা 264
৯২.২ টেলিভিশন নাটক এবং পুরুষবিরোধী বর্ণনার প্রসার 265
৯২.৩ সামাজিক মিডিয়া এবং ডিজিটাল মিসান্ড্রির নতুন অধ্যায় 265
অধ্যায় ৯৩: এনজিও শিল্প এবং পুরুষের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাত 266
৯৩.১ বাংলাদেশে নারী-বিষয়ক এনজিওর ভূমিকা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ 266
৯৩.২ আন্তর্জাতিক তহবিল এবং বর্ণনার রাজনীতি 266

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৯৩.৩ নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের ৪৩৩ সুপারিশ এবং পুরুষ অধিকারের অনুপস্থিতি 266
অধ্যায় ৯৪: ডিজিটাল নারীবাদ, "বিলিভ উইমেন" আন্দোলন এবং প্রমাণের অবমূল্যায়ন 267
৯৪.১ মিটু আন্দোলনের বৈশ্বিক প্রভাব এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা 267
৯৪.২ "হ্যাশট্যাগ বিচার" এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের বিকৃতি 268
৯৪.৩ ডিজিটাল নারীবাদ এবং তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব 268
অধ্যায় ৯৫: রাজনৈতিক দলগুলোর নারী-ভোট ব্যাংক কৌশল এবং পুরুষ অধিকারের বলিদান 268
৯৫.১ নারী ভোটার এবং বাংলাদেশের দলীয় রাজনীতির কৌশল 268
৯৫.২ বিরোধী রাজনীতি এবং পুরুষ অধিকারের নীরবতা 269
৯৫.৩ নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া: একটি বিশ্লেষণ 269
অধ্যায় ৯৬: বিচারিক মনোবিজ্ঞান এবং আদালতে লিঙ্গ পক্ষপাত 269
৯৬.১ বিচারকদের অচেতন পক্ষপাত: গবেষণার আলোকে 269
৯৬.২ সাক্ষ্য আইন এবং লিঙ্গ পক্ষপাত 270
৯৬.৩ নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালের বিচারিক সংস্কৃতি 270
অধ্যায় ৯৭: পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আইনগত নিপীড়নের পারস্পরিক সম্পর্ক 270
৯৭.১ পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য সংকট: একটি নীরব মহামারি 270
৯৭.২ আইনগত নিপীড়ন এবং পুরুষ আত্মহত্যার সম্পর্ক 271
৯৭.৩ পুরুষের সামাজিক সংযোগ এবং আইনগত নিপীড়নের পরিণতি 271
অধ্যায় ৯৮: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং পুরুষের অধিকার 271
৯৮.১ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সার্বজনীনতার দাবি 271
৯৮.২ সিডো এবং পুরুষের অধিকার: একটি জটিল সম্পর্ক 272
৯৮.৩ বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের জন্য পাঠ 272
অধ্যায় ৯৯: গার্হস্থ্য সহিংসতা সুরক্ষা আইন ২০১০ এবং পুরুষ ভিকটিমের অদৃশ্যতা 273
৯৯.১ আইনের কাঠামো এবং পুরুষ ভিকটিমের বর্জন 273
৯৯.২ পুরুষ ভিকটিমের অভিজ্ঞতা: একটি অদৃশ্য বাস্তবতা 273
৯৯.৩ গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সংস্কারের প্রস্তাব 273
অধ্যায় ১০০: বিবাহ প্রতিষ্ঠান, তালাক আইন এবং পুরুষের প্রতি কাঠামোগত অবিচার 274
১০০.১ তালাক আইনে পুরুষ এবং নারীর অসামত্য অবস্থান 274
১০০.২ সন্তানের হেফাজত এবং পিতার অধিকারের অপ্রতুল স্বীকৃতি 274

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১০০.৩ ভরণপোষণ আইনের পুরুষবিরোধী প্রয়োগ 275
অধ্যায় ১০১: যৌন হয়রানি আইন এবং কর্মক্ষেত্রে পুরুষের অবস্থান 275
১০১.১ কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির আইনি সংজ্ঞা এবং পুরুষের বাদ পড়া 275
১০১.২ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যৌন হয়রানি এবং পক্ষপাতী বিচার 275
১০১.৩ "মিথ্যা বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে যৌন সম্পর্ক" বিধানের বিপদ 276
অধ্যায় ১০২: সমসাময়িক তত্ত্ব এবং পুরুষের অধিকারের নতুন দিগন্ত 276
১০২.১ পোস্ট-পিতৃতন্ত্র তত্ত্ব এবং পুরুষের নতুন সংকট 276
১০২.২ লিঙ্গ সমতার তৃতীয় ঢেউ এবং পুরুষের অন্তর্ভুক্তি 277
১০২.৩ "ম্যানোস্ফিয়ার" এর উত্থান এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তার প্রাসঙ্গিকতা 277
অধ্যায় ১০৩: জুরিসপ্রুডেন্স এবং লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের দার্শনিক ভিত্তি 277
১০৩.১ ফাউকোর ক্ষমতা-জ্ঞান তত্ত্ব এবং লিঙ্গ আইনের বিশ্লেষণ 277
১০৩.২ জার্গেন হ্যাবারমাসের যোগাযোগমূলক যুক্তি এবং লিঙ্গ আলোচনার রাজনীতি 278
১০৩.৩ আক্সেল হোনেথের স্বীকৃতি তত্ত্ব এবং পুরুষের সামাজিক অস্বীকৃতি 278
অধ্যায় ১০৪: সামাজিক মূলধন এবং পুরুষের কৌশলগত দুর্বলতা 279
১০৪.১ পুরুষের সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং মামলার মুখে তার ভাঙন 279
১০৪.২ অর্থনৈতিক পুঁজি এবং বিচার প্রক্রিয়ায় প্রবেশের বৈষম্য 279
১০৪.৩ সাংস্কৃতিক পুঁজি এবং আইনি সাক্ষরতার বৈষম্য 279
অধ্যায় ১০৫: বাংলাদেশে পুরুষের অধিকার আন্দোলনের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ 280
১০৫.১ একটি পুরুষ অধিকার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা এবং তার রূপরেখা 280
১০৫.২ পুরুষ অধিকার আন্দোলনের বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের জন্য পাঠ 280
১০৫.৩ আইনজীবী সমাজের ভূমিকা এবং দায়িত্ব 280
অধ্যায় ১০৬: প্রেসিডেন্ট এবং রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে পুরুষ অধিকারের অনুপস্থিতি 281
১০৬.১ রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক দায়িত্ব এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নীতি 281
১০৬.২ আইন কমিশন এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইন সংস্কারের এজেন্ডা 281
১০৬.৩ সংসদীয় কমিটির ভূমিকা এবং জবাবদিহিতার দাবি 281
অধ্যায় ১০৭: সামাজিক চুক্তি পুনর্গঠন এবং লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি 282
১০৭.১ সামাজিক চুক্তির ধারণা এবং বাংলাদেশের লিঙ্গ-সম্পর্কের পুনর্গঠন 282
১০৭.২ লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি 282

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১০৭.৩ প্রজন্মান্তর এবং নতুন সামাজিক বাস্তবতার নির্মাণ 283
অষ্টম খণ্ডের উপসংহার: একটি বহুমাত্রিক সমস্যার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি 283
পরিশিষ্ট ক: অষ্টম খণ্ডের মূল তাত্ত্বিক কাঠামো 284
পরিশিষ্ট খ: অষ্টম খণ্ডে আলোচিত আইনি বিধানের সারসংক্ষেপ 284
পরিশিষ্ট গ: সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের একটি রোডম্যাপ 285
নবম খণ্ড 285
আন্তর্জাতিক আইন, তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশের জন্য লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের মডেল 285
গ্রন্থকারের ভূমিকা: নবম খণ্ডের বিষয়বস্তু ও প্রাসঙ্গিকতা 285
অধ্যায় ১০৮: জাতিসংঘের মানবাধিকার কাঠামো এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের দাবি 286
১০৮.১ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি 286
১০৮.২ আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ এবং পুরুষের আইনি সুরক্ষা 287
১০৮.৩ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিটির অনুশীলন এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার প্রশ্ন 288
১০৮.৪ সিডো এবং তার আইনগত সীমাবদ্ধতা: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ 288
১০৮.৫ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন এবং পুরুষের কর্মক্ষেত্রের অধিকার 289
অধ্যায় ১০৯: সিডো এর পুনর্ব্যাখ্যা এবং লিঙ্গ-সমতার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি 289
১০৯.১ সিডো থেকে "সিডো ফর অল": একটি আইনতাত্ত্বিক প্রস্তাব 289
১০৯.২ সিডো কমিটির সাম্প্রতিক অবস্থান এবং "ইন্টারসেকশনাল" পদ্ধতি 289
১০৯.৩ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং লিঙ্গ-সমতার পুনর্ব্যাখ্যা 290
অধ্যায় ১১০: স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মডেল: লিঙ্গ-সমতার সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের জন্য পাঠ 290
১১০.১ নর্ডিক মডেলের মৌলিক চরিত্র এবং আইনি ভিত্তি 290
১১০.২ নর্ডিক মডেলের সামাজিক ভিত্তি এবং আইনের সাথে তার সম্পর্ক 291
১১০.৩ নর্ডিক মডেল এবং বাংলাদেশ: একটি সরাসরি তুলনার সীমাবদ্ধতা 292
অধ্যায় ১১১: যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া: কমন ল' মডেলে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনের অভিজ্ঞতা 292
১১১.১ যুক্তরাজ্যের গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সংস্কার 292
১১১.২ কানাডার সাংবিধানিক কাঠামো এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ অধিকার 293
১১১.৩ অস্ট্রেলিয়ার পারিবারিক আইন এবং পিতার সমান অধিকার 293
১১১.৪ যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা: VAWA এর বিকাশ এবং পুরুষ ভিকটিমের স্বীকৃতি 294
অধ্যায় ১১২: ভারতের অভিজ্ঞতা: ৪৯৮-ক, মিথ্যা মামলা এবং সংস্কারের সংগ্রাম 294

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১১২.১ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮-ক ধারা: বাংলাদেশের আয়না 294
১১২.২ ভারতে পুরুষ অধিকার আন্দোলন: Save Indian Family Foundation এবং তার প্রভাব 295
১১২.৩ ভারতে সম্প্রতি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩ এবং পুরুষ অধিকারের প্রশ্ন 295
১১২.৪ ভারতের আদালতে পুরুষ সুরক্ষার বিকাশমান জুরিসপ্রুডেন্স 296
অধ্যায় ১১৩: পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা: দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশীদের অভিজ্ঞতা 296
১১৩.১ পাকিস্তানের আইনি ব্যবস্থা এবং পুরুষের অধিকার 296
১১৩.২ শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা: লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনের দিকে ধীর যাত্রা 297
১১৩.৩ নেপালের সাম্প্রতিক আইনি বিকাশ এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ প্রচেষ্টা 297
অধ্যায় ১১৪: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মডেল: সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা 298
১১৪.১ সিঙ্গাপুরের কার্যকর আইন প্রয়োগ এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সংস্কার 298
১১৪.২ মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা: ইসলামিক আইন ও সেক্যুলার আইনের দ্বন্দ্ব 298
১১৪.৩ ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং পুরুষের অধিকার 299
অধ্যায় ১১৫: জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইনগত কাঠামো: একটি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি 299
১১৫.১ ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশন এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সুরক্ষা 299
১১৫.২ জার্মানির পারিবারিক আইন এবং যৌথ হেফাজতের মডেল 300
১১৫.৩ ফ্রান্সের পারিবারিক আইন সংস্কার এবং পিতার অধিকার আন্দোলন 300
অধ্যায় ১১৬: আফ্রিকান দেশগুলোর অভিজ্ঞতা: লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনের ভিন্নধর্মী পথ 300
১১৬.১ দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবিধানিক মডেল এবং লিঙ্গ সমতা 300
১১৬.২ রুয়ান্ডার লিঙ্গ-সমতার অভিজ্ঞতা 301
অধ্যায় ১১৭: তুলনামূলক আইনি বিশ্লেষণ থেকে উপলব্ধি: বাংলাদেশের জন্য মডেল নির্বাচন 301
১১৭.১ বিভিন্ন মডেলের সারসংক্ষেপ এবং মূল্যায়ন 301
১১৭.২ বাংলাদেশের জন্য সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক মডেল 302
১১৭.৩ বাংলাদেশের জন্য একটি সংকর মডেলের প্রস্তাব 302
অধ্যায় ১১৮: ইসলামিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের অধিকার: একটি মাকাসিদ আশ-শরিয়া বিশ্লেষণ 302
১১৮.১ ইসলামিক আইনতত্ত্বে ন্যায়বিচারের ধারণা 302
১১৮.২ হাদিস ও ফিকহের আলোকে পুরুষের আইনি সুরক্ষা 303
১১৮.৩ সমসাময়িক মুসলিম পণ্ডিতদের লিঙ্গ-ন্যায়বিচার বিষয়ক চিন্তাভাবনা 303
অধ্যায় ১১৯: বাংলাদেশের আইনগত সংস্কারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড-ভিত্তিক কাঠামো 304

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১১৯.১ সার্বজনীন মানবাধিকার নীতির প্রয়োগ: একটি চেকলিস্ট 304
১১৯.২ ICCPR মেনে চলার জন্য বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা 304
১১৯.৩ আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্কিং এবং বাংলাদেশের র‍্যাংকিং 305
অধ্যায় ১২০: তুলনামূলক আইনতত্ত্ব: লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার দার্শনিক ভিত্তি পুনর্বিবেচনা 305
১২০.১ তুলনামূলক আইনবিজ্ঞানের পদ্ধতি এবং তার প্রয়োগ 305
১২০.২ আইনি রূপান্তরবাদ এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার দিকে যাত্রা 306
১২০.৩ পোস্ট-কলোনিয়াল লিগ্যাল থিওরি এবং বাংলাদেশের আইনি পরিচয় 306
অধ্যায় ১২১: আইনি পুরালঙ্ঘন বনাম আইনি সংস্কার: বাংলাদেশে পরিবর্তনের পথ 306
১২১.১ সাংবিধানিক মামলার কৌশল: উচ্চ আদালতের মাধ্যমে পরিবর্তন 306
১২১.২ সংসদীয় পথে সংস্কারের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ 307
১২১.৩ নাগরিক সমাজের ভূমিকা এবং জনমত গঠনের কৌশল 307
অধ্যায় ১২২: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার সাথে সংলাপ: বাংলাদেশের সুযোগ ও কৌশল 308
১২২.১ জাতিসংঘের মানবাধিকার পর্যালোচনা প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশ 308
১২২.২ আঞ্চলিক মানবাধিকার কাঠামো এবং সার্কের সম্ভাবনা 308
১২২.৩ আন্তর্জাতিক পুরুষ অধিকার আন্দোলনের সাথে সংযোগ 308
অধ্যায় ১২৩: আইনি সংস্কারের জুরিসপ্রুডেন্টিয়াল ভিত্তি: নতুন তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি 309
১২৩.১ লিবার্টারিয়ান আইনতত্ত্ব এবং পুরুষের স্বাধীনতার প্রশ্ন 309
১২৩.২ কমিউনিটারিয়ান আইনতত্ত্ব এবং সামাজিক সংহতির প্রশ্ন 309
১২৩.৩ ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ এবং পুরুষের মানব বিকাশ 310
১২৩.৪ রিপাবলিকান আইনতত্ত্ব এবং আধিপত্যের প্রশ্ন 310
অধ্যায় ১২৪: আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট আইন সংস্কার প্রস্তাব 310
১২৪.১ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সংস্কার: একটি তুলনামূলক প্রস্তাব 310
১২৪.২ গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এর সংস্কার 311
১২৪.৩ মুসলিম পারিবারিক আইন সংস্কারের প্রস্তাব 311
অধ্যায় ১২৫: বিচার বিভাগের ভূমিকা: আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা 312
১২৫.১ বিচারকদের লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ: বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা 312
১২৫.২ প্রমাণের মানদণ্ড এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ 312
১২৫.৩ জুরি ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের বিকল্প 313

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ১২৬: বাংলাদেশের জন্য একটি সামগ্রিক লিঙ্গ-ন্যায়বিচার কাঠামো: আন্তর্জাতিক সংশ্লেষণ 313
১২৬.১ লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের একটি আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা নির্মাণ 313
১২৬.২ তিনটি স্তরে লিঙ্গ-ন্যায়বিচার: আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক 313
১২৬.৩ ২০২৬-২০৩৬: বাংলাদেশের জন্য একটি দশ বছরের লিঙ্গ-ন্যায়বিচার পরিকল্পনা 314
অধ্যায় ১২৭: বাংলাদেশে পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্য: একটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি 314
১২৭.১ বৈশ্বিক পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্য সংকট এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা 314
১২৭.২ আইনি হয়রানি এবং পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক: একটি বৈশ্বিক বিশ্লেষণ 315
১২৭.৩ পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক আন্দোলন এবং বাংলাদেশ 315
অধ্যায় ১২৮: আইনগত সাংস্কৃতিবাদ এবং আন্তর্জাতিক নিয়মের স্থানীয়করণ 315
১২৮.১ আইনগত সাংস্কৃতিবাদের চ্যালেঞ্জ 315
১২৮.২ আন্তর্জাতিক নিয়মের স্থানীয়করণ: একটি কাঠামো 316
১২৮.৩ ইসলামিক আধুনিকতাবাদ এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সমন্বয় 316
অধ্যায় ১২৯: প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভূমিকা: আন্তর্জাতিক তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি 317
১২৯.১ রাষ্ট্রনেতার নেতৃত্বে লিঙ্গ-ন্যায়বিচার: বৈশ্বিক উদাহরণ 317
১২৯.২ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ভূমিকা এবং আইনি পর্যালোচনা 317
১২৯.৩ সরকারি নীতি পর্যায়ে লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ 317
নবম খণ্ডের উপসংহার: আন্তর্জাতিক দর্পণে বাংলাদেশ 318
পরিশিষ্ট ক: নবম খণ্ডে আলোচিত প্রধান আন্তর্জাতিক আইনি দলিলের সারসংক্ষেপ 318
পরিশিষ্ট খ: তুলনামূলক দেশ-ভিত্তিক বিশ্লেষণের সারসংক্ষেপ 319
দশম খণ্ড 319
সংস্কারের সমগ্র দর্শন, বিস্তারিত আইনি প্রস্তাব এবং ন্যায়বিচারের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশনা 319
দশম খণ্ডের ভূমিকা: একটি দীর্ঘ যাত্রার পরিসমাপ্তি এবং একটি নতুন সূচনার প্রতিশ্রুতি 319
অধ্যায় ১৩০: সংস্কারের দার্শনিক ভিত্তি পুনর্নির্মাণ: ন্যায়বিচারের একটি সংযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি 320
১৩০.১ ন্যায়বিচারের সংযুক্ত তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা 320
১৩০.২ কান্টিয়ান সার্বজনীনতা এবং বাংলাদেশের আইনি সংকট 321
১৩০.৩ রলসিয়ান ন্যায়বিচার এবং পুরুষের অদৃশ্যতার সমস্যা 322
১৩০.৪ মুসলিম আইনের ঐতিহ্যে ইনসাফ এবং পুরুষ নির্যাতনের স্বীকৃতি 323
১৩০.৫ হান্না আরেন্টের "হিউম্যান কন্ডিশন" এবং বাংলাদেশের পুরুষ সংকট 323

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ১৩১: বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক নির্ণয়: ত্রুটির মানচিত্র 324
১৩১.১ আইনের ত্রুটির তিনটি স্তর: একটি ডায়গনোস্টিক কাঠামো 324
১৩১.২ আইনের ভাষায় বিদ্যমান ত্রুটির একটি সম্পূর্ণ তালিকা 325
১৩১.৩ আইনের প্রয়োগে বিদ্যমান ত্রুটির প্রমাণ 325
অধ্যায় ১৩২: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সমগ্র সংস্কার: একটি ধারা-ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং বিকল্প খসড়া ... 326
১৩২.১ ধারা ৯: ধর্ষণের সংজ্ঞার সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণ 326
১৩২.২ ধারা ১১: যৌতুক অপরাধের পুনর্সংজ্ঞায়ন 327
১৩২.৩ ধারা ১৭: মিথ্যা মামলার শাস্তির কার্যকর বাস্তবায়ন 327
১৩২.৪ জামিন বিধানের সমগ্র পুনর্বিবেচনা 328
অধ্যায় ১৩৩: গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এর পূর্ণ সংস্কার 328
১৩৩.১ বিদ্যমান আইনের মৌলিক ত্রুটি 328
১৩৩.২ সংস্কারের বিস্তারিত প্রস্তাব 329
১৩৩.৩ পারিবারিক আদালতে পুরুষ সুরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা 329
অধ্যায় ১৩৪: সন্তানের হেফাজত এবং পিতার অধিকার: একটি সম্পূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম 330
১৩৪.১ বাংলাদেশের হেফাজত আইনের বর্তমান অবস্থা এবং পিতার প্রান্তিকীকরণ 330
১৩৪.২ যৌথ হেফাজতের আইনি কাঠামো 330
১৩৪.৩ পিতৃত্বকালীন ছুটি এবং পিতার দায়িত্বের সাংবিধানিক স্বীকৃতি 331
অধ্যায় ১৩৫: পুরুষ নির্যাতনের আইনি স্বীকৃতির একটি সম্পূর্ণ কাঠামো 331
১৩৫.১ পুরুষ নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ এবং বাংলাদেশের আইনি অন্ধকার 331
১৩৫.২ পুরুষ নির্যাতনের সাংবিধানিক স্বীকৃতির যুক্তি 332
১৩৫.৩ পুরুষ নির্যাতন প্রতিরোধের জাতীয় নীতি 332
অধ্যায় ১৩৬: ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় পুরুষের অধিকার সংরক্ষণ 332
১৩৬.১ নির্দোষিতার অনুমানের নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন 332
১৩৬.২ দ্রুত বিচারের অধিকার এবং মামলার জট 333
১৩৬.৩ পুলিশ সংস্কার এবং লিঙ্গ-সংবেদনশীল তদন্ত পদ্ধতি 333
অধ্যায় ১৩৭: বিচার বিভাগীয় সংস্কার এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বিচারিক দর্শন 334
১৩৭.১ বিচারকদের অচেতন পক্ষপাতের সমস্যা 334
১৩৭.২ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের ভূমিকা 334

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৩৭.৩ প্রো বোনো আইনি সহায়তা এবং পুরুষের প্রবেশাধিকার 334
অধ্যায় ১৩৮: মিডিয়া, সংস্কৃতি এবং সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের কৌশল 335
১৩৮.১ মিডিয়ার ভূমিকা এবং দায়িত্ব 335
১৩৮.২ শিক্ষাব্যবস্থায় লিঙ্গ-সমতার ধারণা এবং পুরুষের অধিকার 335
১৩৮.৩ সামাজিক মনোভাব পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদী কৌশল 336
অধ্যায় ১৩৯: রাজনৈতিক বাস্তবায়নের পথ এবং প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের কৌশল 336
১৩৯.১ রাজনৈতিক প্রতিরোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ 336
১৩৯.২ একটি কৌশলগত জোট নির্মাণের পথ 337
১৩৯.৩ সংসদীয় কৌশল এবং বিল পাসের পথ 337
অধ্যায় ১৪০: ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির সামাজিক মনোবিজ্ঞান এবং আইনগত প্রতিকার 338
১৪০.১ ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির উৎপত্তি এবং বিকাশ 338
১৪০.২ ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার 338
১৪০.৩ সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্মানহানির বিষয়ে পুরুষের অধিকার 339
অধ্যায় ১৪১: পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধে আইনগত দায়িত্ব 339
১৪১.১ মিথ্যা মামলা এবং পুরুষের আত্মহত্যার সংযোগ 339
১৪১.২ পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব 339
অধ্যায় ১৪২: জাতীয় লিঙ্গ সমতা কমিশনের একটি নতুন রূপ 340
১৪২.১ বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতা 340
১৪২.২ একটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ জাতীয় সমতা কমিশনের প্রস্তাব 340
অধ্যায় ১৪৩: ভবিষ্যতের আইনি সম্ভাবনা: ২০৩০ সালের মধ্যে একটি সমতাপূর্ণ বাংলাদেশ 341
১৪৩.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সম্ভাব্য পরিবর্তনের একটি দৃশ্যকল্প 341
১৪৩.২ সংস্কারের বাধাগুলো অতিক্রমের সময়সীমা 341
অধ্যায় ১৪৪: একটি নতুন সামাজিক চুক্তির দিকে: পুরুষ, নারী এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ 342
১৪৪.১ সামাজিক চুক্তির পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা 342
১৪৪.২ পিতৃতন্ত্র এবং মিসান্ড্রির একযোগে প্রতিরোধ 342
১৪৪.৩ ভবিষ্যতের প্রজন্মের কাছে এই পাঠ্যগ্রন্থের বার্তা 342
অধ্যায় ১৪৫: আইনতাত্ত্বিক উপসংহার এবং সমন্বিত তত্ত্ব 343
১৪৫.১ একটি সমন্বিত "লিঙ্গ-ন্যায়বিচার তত্ত্ব" এর নির্মাণ 343

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৪৫.২ আইনতাত্ত্বিক দর্শনের একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ 343
অধ্যায় ১৪৬: রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং সংস্কারের রাজনীতি 344
১৪৬.১ ২০২৬ সালের নির্বাচন এবং পুরুষের আইনি অধিকারের প্রশ্ন 344
১৪৬.২ অন্তর্বর্তী সরকারের আইন সংস্কার এজেন্ডায় পুরুষের অধিকার 344
অধ্যায় ১৪৭: সমগ্র পাঠ্যগ্রন্থের উপসংহার: ন্যায়বিচারের অসম্পূর্ণ যাত্রা 345
১৪৭.১ দশটি খণ্ডের বিশ্লেষণের সারসংক্ষেপ 345
১৪৭.২ একটি অসম্পূর্ণ যাত্রার স্বীকৃতি 346
১৪৭.৩ শেষ কথা: ন্যায়বিচারের বিভাজ্যতা 346
পরিশিষ্ট ক: দশম খণ্ডে প্রস্তাবিত আইনি সংস্কারের সম্পূর্ণ তালিকা 347
পরিশিষ্ট খ: বাংলাদেশের পুরুষ অধিকার আন্দোলনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা 347
পরিশিষ্ট গ: পাঠ্যগ্রন্থে ব্যবহৃত প্রধান আইনতাত্ত্বিক ধারণাগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 348
পরিশিষ্ট ঘ: আইনি সংস্কারের জন্য একটি বিশদ ক্যালেন্ডার 349
চূড়ান্ত কথা: একটি পাঠ্যগ্রন্থের জীবন এবং ন্যায়বিচারের অনুসন্ধান 350

পার্ট ১

প্রথম খণ্ড

ভিত্তি, ইতিহাস, আইনতাত্ত্বিক দর্শন ও সাংবিধানিক কাঠামো

গ্রন্থকারের ভূমিকা

এই গ্রন্থটি একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন নিয়ে রচিত। প্রশ্নটি হলো: বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থা কি পুরুষের প্রতি কাঠামোগতভাবে পক্ষপাতদুষ্ট? এই প্রশ্নটি যখন প্রথমবার কেউ শোনেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রতিক্রিয়া আসে: বাংলাদেশ তো একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, এখানে নারীরাই বৈষম্যের শিকার, তাহলে পুরুষ কীভাবে বৈষম্যের শিকার হয়? এই প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে একটি সমস্যা, এবং সেই সমস্যার উত্তর খোঁজাই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

সমাজতাত্ত্বিক বৈষম্য এবং আইনগত বৈষম্য দুটি ভিন্ন ধারণা। একটি সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হলেও সেই সমাজের আইন পুরুষবিরোধী হতে পারে। আবার সামাজিক নিপীড়নের বাস্তবতাকে আইনের অনুপযুক্ত প্রয়োগ বৈষম্যমূলক করে তুলতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই দুটি বাস্তবতাই সত্য। নারীরা সামাজিকভাবে নানাভাবে নিপীড়িত হন, এটি সত্য। কিন্তু একই সাথে, বিদ্যমান আইনি কাঠামো এবং সেই আইনের প্রয়োগের ধরন পুরুষের প্রতি গভীরভাবে বৈষম্যমূলক, এটিও সমানভাবে সত্য। এই দুটি সত্যকে একসাথে স্বীকার করতে না পারলে কোনো সমাজেই সত্যিকারের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

এই গ্রন্থটি রাজনৈতিক, আইনতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থার একটি গভীর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করবে। এটি একটি একাডেমিক পাঠ্যগ্রন্থ, প্রচার-পত্র নয়। আমরা আইনের ভাষায় কথা বলব, তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করব এবং আইনের দর্শনের আলোকে মূল্যায়ন করব। এই গ্রন্থ কোনো লিঙ্গের বিরুদ্ধে নয়, বরং এটি ন্যায়বিচারের পক্ষে।

অধ্যায় ১: প্রারম্ভিক ধারণা ও গ্রন্থের কাঠামো

১.১ সূচনা: একটি অপ্রিয় কথোপকথন

বাংলাদেশের আদালতে প্রতিদিন হাজার হাজার মামলা পরিচালিত হয়। এই মামলাগুলোর বড় একটি অংশ হলো পারিবারিক বিষয়, যৌতুক, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং বিবাহ সংক্রান্ত বিরোধ। এই মামলাগুলোর বিচারিক প্রক্রিয়ায় একটি লক্ষণীয় প্রবণতা দেখা যায়: পুরুষ আসামিপক্ষকে প্রায় সবসময়ই অপরাধী হিসেবে গণ্য করার একটি পূর্বনির্ধারিত মানসিকতা বিদ্যমান, এবং নারী অভিযোগকারী বা বাদীর বক্তব্যকে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে মেনে নেওয়ার একটি অঘোষিত নিয়ম চালু রয়েছে। এই প্রবণতাটি আইনের কয়েকটি মূলনীতির সরাসরি লঙ্ঘন।

আইনের একটি সর্বজনীন মূলনীতি হলো: প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ নির্দোষ। এই মূলনীতিটি ল্যাটিন ভাষায় "Presumption of Innocence" নামে পরিচিত, যার ভিত্তি রয়েছে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে, এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদেও এর প্রতিফলন রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে, যৌতুক মামলা, নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের অধীনে মামলা এবং পারিবারিক সহিংসতা মামলায়, পুরুষ অভিযুক্তের জন্য এই মূলনীতি অনেকটাই কার্যকর নয়।

এই গ্রন্থে আমরা এই অস্বস্তিকর বাস্তবতাটিকে আইনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করব। আমরা দেখব কীভাবে আইনের ভাষায়, আইনের প্রয়োগে এবং সামাজিক কাঠামোয় পুরুষের প্রতি একটি নিয়মতান্ত্রিক বৈষম্য তৈরি হয়েছে এবং টিকে আছে।

১.২ গ্রন্থের কেন্দ্রীয় থিসিস

এই গ্রন্থের কেন্দ্রীয় থিসিস হলো:

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থা, যদিও সংবিধানগতভাবে লিঙ্গ-সমতার নীতি ঘোষণা করে, কিন্তু বিদ্যমান আইনসমূহের বিষয়বস্তু, আইনের প্রয়োগের পদ্ধতি, বিচারিক ব্যাখ্যা এবং সামাজিক প্রত্যাশার সমন্বয়ে একটি মিসান্ড্রিক অর্থাৎ পুরুষবিরোধী কাঠামো তৈরি করেছে, যা পুরুষের মৌলিক আইনি অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে এবং তাদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিকে কঠিন করে তোলে।

এই থিসিসটি নিম্নলিখিত উপ-থিসিসের উপর প্রতিষ্ঠিত:

প্রথমত, বেশ কয়েকটি প্রধান আইনে পুরুষকে স্বাভাবিক অপরাধী এবং নারীকে স্বাভাবিক ভিকটিম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা আইনের ভাষায় একটি কাঠামোগত পক্ষপাত তৈরি করে।

দ্বিতীয়ত, এই আইনগুলো অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণের বোঝা উল্টে দেয়, অর্থাৎ পুরুষকে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে হয়, যা ন্যায়বিচারের মূলনীতির বিপরীত।

তৃতীয়ত, নারীদের মিথ্যা মামলা করার সুযোগ এই আইনগুলো দেয়, এবং এই সুযোগের অপব্যবহারের হার উদ্বেগজনক, কিন্তু এই অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনি প্রতিকার নেই।

চতুর্থত, পুরুষ নির্যাতনের ঘটনাগুলো আইনে স্বীকৃতি পায় না, কারণ অনেক আইনের সংজ্ঞায় পুরুষ ভিকটিম হতে পারে না বলে ধরে নেওয়া হয়।

পঞ্চমত, রাজনৈতিক কারণে এই বৈষম্যমূলক আইনগুলো সংস্কার করা হচ্ছে না, কারণ নারী ভোটারদের তুষ্ট রাখার জন্য এই আইনগুলোকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১.৩ গ্রন্থের পদ্ধতি এবং পদ্ধতিগত ন্যায্যতা

এই গ্রন্থ রচনায় আমরা কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। প্রথমত, ডগমেটিক লিগ্যাল অ্যানালাইসিস: আইনের ভাষা, ধারা এবং প্রয়োগের ধরন বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়ত, সক্রেটিক পদ্ধতি: প্রচলিত ধারণাগুলোকে প্রশ্নের মুখে ফেলা এবং বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি অন্বেষণ। তৃতীয়ত, তুলনামূলক আইন: ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং পশ্চিমা দেশগুলোর আইনের সাথে তুলনা। চতুর্থত, আইনের ইতিহাস: কোনো আইন কখন, কেন এবং কীভাবে তৈরি হয়েছে তার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ। পঞ্চমত, জুরিসপ্রুডেন্টিয়াল অ্যানালাইসিস: আইনের দার্শনিক ভিত্তি পরীক্ষা করা।

১.৪ দশ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা

এই গ্রন্থ মোট দশটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে রয়েছে ভিত্তি, ইতিহাস, আইনতাত্ত্বিক দর্শন ও সাংবিধানিক কাঠামো। দ্বিতীয় খণ্ডে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ। তৃতীয় খণ্ডে যৌতুক নিরোধ আইন এবং তার অপব্যবহার। চতুর্থ খণ্ডে পারিবারিক আইন এবং পুরুষের অধিকার। পঞ্চম খণ্ডে ফৌজদারি আইনে লিঙ্গ-পক্ষপাত। ষষ্ঠ খণ্ডে পুরুষ নির্যাতনের আইনি স্বীকৃতির অভাব। সপ্তম খণ্ডে মিথ্যা মামলার রাজনীতি ও প্রতিকার। অষ্টম খণ্ডে সামাজিক কাঠামো এবং ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি। নবম খণ্ডে আন্তর্জাতিক আইন ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ। দশম খণ্ডে সংস্কারের প্রস্তাব ও পথনির্দেশনা।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ২: মিসান্ড্রি: সংজ্ঞা, তত্ত্ব ও আইনি প্রাসঙ্গিকতা

২.১ মিসান্ড্রির সংজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি

"মিসান্ড্রি" শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে এসেছে। গ্রিক শব্দ "misos" অর্থ ঘৃণা এবং "aner" বা "andros" অর্থ পুরুষ। সুতরাং মিসান্ড্রি অর্থ হলো পুরুষের প্রতি ঘৃণা বা বিরূপ মনোভাব। কিন্তু আইনি এবং সামাজিক প্রসঙ্গে মিসান্ড্রি শুধু ব্যক্তিগত ঘৃণার বিষয় নয়। এটি একটি কাঠামোগত বৈষম্যের ধারণাও হতে পারে, যেখানে আইন, নীতি, প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক নিয়মগুলো পুরুষের প্রতি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিরূপ।

আইনতাত্ত্বিক আলোচনায় মিসান্ড্রিকে তিনটি স্তরে বোঝা যায়। প্রথম স্তর হলো ব্যক্তিগত মিসান্ড্রি, যেখানে কোনো বিচারক, আইনজীবী বা কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে পুরুষের প্রতি বিরূপ মনোভাব রাখেন এবং তা তার কাজে প্রতিফলিত হয়। দ্বিতীয় স্তর হলো প্রাতিষ্ঠানিক মিসান্ড্রি, যেখানে আইনি প্রতিষ্ঠান, পুলিশ বা আদালত পুরুষের প্রতি কাঠামোগতভাবে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করে। তৃতীয় স্তর হলো আইনি মিসান্ড্রি, যেখানে আইনের ভাষায় এবং বিষয়বস্তুতে পুরুষের প্রতি বৈষম্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তিনটি স্তরের মিসান্ড্রিই বিদ্যমান, এবং এই গ্রন্থে আমরা প্রতিটি স্তর পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করব।

২.২ মিসান্ড্রি বনাম পিতৃতন্ত্র: একটি জটিল দ্বন্দ্ব

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো মূলত পিতৃতান্ত্রিক। পিতৃতন্ত্র বলতে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে পুরুষ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকে এবং নারীরা প্রান্তিক হয়। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশে পিতৃতন্ত্র অবশ্যই বিদ্যমান।

কিন্তু পিতৃতন্ত্রের অস্তিত্ব এবং আইনি মিসান্ড্রির অস্তিত্ব পরস্পরবিরোধী নয়। একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আইনি মিসান্ড্রি থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব। কারণ পিতৃতন্ত্র পুরুষকে ক্ষমতা দেয়, কিন্তু একই সাথে পুরুষের উপর নির্দিষ্ট ভূমিকা, দায়িত্ব এবং প্রত্যাশাও চাপিয়ে দেয়। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষকে সবসময় শক্তিশালী, সুরক্ষক এবং রোজগেরে হতে হয়। এই প্রত্যাশাটি আইনে রূপ নেয় যখন আইন ধরে নেয় যে পুরুষই সবসময় শোষক এবং নারী সবসময় শোষিত।

ক্রিস্টিন হফ সমার্স তাঁর "Who Stole Feminism" গ্রন্থে এই প্রশ্নটি তুলেছিলেন: যখন আইন পুরুষকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপরাধী ধরে নেয়, তখন সেটি কি সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন, নাকি একটি রাজনৈতিক নির্মাণ? এই প্রশ্নটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ বা যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ এর মতো আইনগুলো তৈরি হয়েছিল সত্যিকারের সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য। নারী নির্যাতন, যৌতুক হত্যা এগুলো বাস্তব

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য যে আইন তৈরি হয়েছে, সেই আইনগুলোর ভাষা ও কাঠামো এমন যে সেগুলো অত্যন্ত সহজে অপব্যবহারযোগ্য এবং পুরুষের সাংবিধানিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে।

২.৩ আইনে লিঙ্গ-পক্ষপাতের বৈশ্বিক তত্ব

আন্তর্জাতিক আইনতাত্ত্বিক চিন্তাবিদরা আইনে লিঙ্গ-পক্ষপাতের বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন।

ক্যাথরিন ম্যাককিনন তাঁর নারীবাদী আইনতত্ত্বে যুক্তি দিয়েছেন যে আইন মূলত পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি, এবং তাই আইনে নারীর অভিজ্ঞতা উপেক্ষিত। এই যুক্তিটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছুটা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ চিত্র নয়। কারণ বাংলাদেশের অনেক আইন, বিশেষত নারী সংক্রান্ত আইনগুলো, নারীর স্বার্থে এতটাই ঝুঁকে পড়েছে যে পুরুষের স্বার্থ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।

অন্যদিকে, ওয়ারেন ফ্যারেল তাঁর "The Myth of Male Power" গ্রন্থে যুক্তি দিয়েছেন যে পুরুষ সামাজিকভাবে ক্ষমতাবান হলেও আইনগতভাবে তারা অনেক ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত। ফ্যারেলের এই বিশ্লেষণটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

সাম্প্রতিক সময়ে "Critical Men's Studies" বা পুরুষ অধ্যয়নের সমালোচনামূলক শাখাটি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। এই শাখার পণ্ডিতরা যুক্তি দেন যে পিতৃতন্ত্র কেবল নারীকে নয়, পুরুষকেও নির্দিষ্ট ভূমিকায় বন্দি করে এবং আইন এই বন্দিত্বকে আরও শক্তিশালী করে।

২.৪ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনের দার্শনিক যুক্তি

আইনের দর্শনে সমতার ধারণাটি বহুমাত্রিক। জন রলস তাঁর "A Theory of Justice" গ্রন্থে "veil of ignorance" বা অজ্ঞতার পর্দার ধারণাটি তুলে ধরেছেন। এই তত্ব অনুযায়ী, সুষ্ঠু আইন হলো সেই আইন যেটি তৈরি করতে গিয়ে যদি আপনি না জানেন যে আপনি কোন লিঙ্গে জন্মাবেন, তাহলেও সেই আইনটি আপনার কাছে ন্যায্য মনে হবে।

রলসের এই মানদণ্ডে বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ বা যৌতুক নিরোধ আইন পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে এই আইনগুলো রলসিয়ান অর্থে ন্যায়সঙ্গত নয়, কারণ যদি আপনি জানতেন যে আপনি পুরুষ হবেন, তাহলে এই আইনগুলোর অনেক বিধান আপনার কাছে অগ্রহণযোগ্য মনে হত।

ইমানুয়েল কান্টের আইনের দর্শন অনুযায়ী, আইন এমন হওয়া উচিত যা সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। কান্টের "categorical imperative" বা বিশ্বজনীন বাধ্যকতার নীতি অনুযায়ী, কোনো আইনি নীতি সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। যদি কোনো নীতি শুধু এক লিঙ্গের উপর প্রযোজ্য হয় এবং অন্য লিঙ্গের উপর প্রযোজ্য না হয়, তাহলে সেই নীতি কান্টিয়ান অর্থে নৈতিক নয়।

হার্বার্ট হার্ট তাঁর "The Concept of Law" গ্রন্থে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক নিয়মের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। হার্টের কাঠামোয় লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইন একটি প্রাথমিক নিয়ম হিসেবে কার্যকর হলে, মাধ্যমিক নিয়মগুলো অর্থাৎ প্রয়োগের নিয়মগুলো সেই পক্ষপাতকে আরও গভীর করে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ৩: বাংলাদেশের আইনি ইতিহাস এবং পুরুষবিরোধী প্রবণতার ঐতিহাসিক মূল

৩.১ ঔপনিবেশিক আইনের উত্তরাধিকার

বাংলাদেশের আধুনিক আইন ব্যবস্থা মূলত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে প্রতিষ্ঠিত আইনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ১৮৬০ সালের পেনাল কোড, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি এখনো বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইন তৈরি হয়েছিল মূলত একটি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু মজার বিষয় হলো, সেই পুরুষতান্ত্রিক ব্রিটিশ আইনেও অনেক বিধান ছিল যা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারায় ব্যভিচার একটি অপরাধ ছিল এবং সেটি পুরুষকে লক্ষ্য করে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ১৮৬০ সালের এই আইনে ধর্ষণ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল এমনভাবে যে পুরুষই সবসময় অপরাধী এবং নারীই সবসময় ভিকটিম।

এই ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বাধীনতার পরেও অব্যাহত থাকে এবং ক্রমশ আরও গভীর হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ যে আইনগুলো গ্রহণ করেছে, সেগুলোর অনেকটিতেই পুরুষবিরোধী কাঠামো আরও শক্তিশালী হয়েছে।

৩.২ স্বাধীনতা-পরবর্তী আইন প্রণয়নের প্রবণতা

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়। এই নতুন রাষ্ট্রে নারী অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ মুক্তিযুদ্ধে বহু নারী ধর্ষণ এবং নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন।

১৯৭২ সালের সংবিধানে সমতার নীতি ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু ১৯৮০ এর দশক থেকে শুরু করে একের পর এক আইন তৈরি হতে থাকে যা মূলত নারীর সুরক্ষার কথা বলে কিন্তু পুরুষের অধিকারের কথা বলে না। ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আইন এবং ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এই ক্রমবিকাশের অংশ।

এই আইনগুলো তৈরির পেছনে সত্যিকারের সামাজিক সমস্যার উপলব্ধি ছিল। কিন্তু সমস্যার সমাধানে যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রে নতুন সমস্যা তৈরি করেছে।

৩.৩ নব্বইয়ের দশকে নারী আন্দোলন এবং আইন প্রণয়নে তার প্রভাব

১৯৯০ এর দশকে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর নারী সংগঠনগুলো আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময়ে জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, মহিলা পরিষদ এবং আরও অনেক সংগঠন আইন সংস্কারের দাবিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। এই দাবিগুলোর অনেকটিই ন্যায়সঙ্গত ছিল, কারণ নারীর প্রতি সত্যিকারের অবিচার ছিল।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

কিন্তু এই আন্দোলনের প্রভাবে যে আইনগুলো তৈরি হয়েছে, সেগুলোতে একটি প্রবণতা লক্ষণীয়: এই আইনগুলো নারীকে সুরক্ষা দিতে গিয়ে পুরুষের আইনি সুরক্ষার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। এই ভুলে যাওয়াটা কি অনিচ্ছাকৃত, নাকি ইচ্ছাকৃত? এই প্রশ্নের উত্তর এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে অনুসন্ধান করা হবে।

৩.৪ রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি উভয়ই, নারী ভোটারদের আকর্ষণ করার জন্য নারীবান্ধব আইন প্রণয়নকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। এই রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ফলে নারীবান্ধব আইন তৈরির একটি রাজনৈতিক প্রণোদনা তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেই আইনগুলো পুরুষের উপর কী প্রভাব ফেলবে সেটা নিয়ে ভাবার কোনো রাজনৈতিক প্রণোদনা নেই।

একইভাবে, বিরোধী দলগুলো এই আইনগুলোর সমালোচনা করতে ভয় পায়, কারণ নারীবান্ধব আইনের বিরোধিতা করলে নারীবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটি এমন পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে পুরুষের আইনি অধিকারের কথা বলা রাজনৈতিকভাবে অলাভজনক এবং সামাজিকভাবে বিপজ্জনক।

২০২৪-২০২৫ সালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরেও এই মূল প্রবণতায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার কিছু আইনি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু পুরুষের আইনি অধিকার রক্ষার বিষয়টি তাদের এজেন্ডায় অনুপস্থিত।

অধ্যায় ৪: সংবিধানিক কাঠামো এবং সমতার প্রতিশ্রুতি

৪.১ বাংলাদেশের সংবিধানে সমতার নীতি

বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২ একটি অসাধারণ দলিল। এই সংবিধান সমতার একটি শক্তিশালী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ বলে: "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।" এটি "Equality before law" এবং "Equal protection of law" এর সাংবিধানিক ঘোষণা।

সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদ আরও স্পষ্টভাবে বলেছে: "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।"

এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, আইনের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারী সমান। রাষ্ট্র নারী-পুরুষভেদে বৈষম্য করতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবে বিদ্যমান অনেক আইন এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির সরাসরি লঙ্ঘন।

৪.২ ২৮(৪) অনুচ্ছেদ: নারীর জন্য বিশেষ বিধানের সাংবিধানিক যুক্তি

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছে। এই অনুচ্ছেদ বলে: "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

এই অনুচ্ছেদটি রাষ্ট্রকে নারীর জন্য বিশেষ বিধান তৈরির ক্ষমতা দিয়েছে। এটি "Positive Discrimination" বা ইতিবাচক বৈষম্যের সাংবিধানিক স্বীকৃতি। কিন্তু এই অনুচ্ছেদের সঠিক ব্যাখ্যা কী?

আইনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ২৮(৪) অনুচ্ছেদ নারীর জন্য বিশেষ বিধান তৈরির অনুমতি দেয়, কিন্তু এটি পুরুষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বিধান তৈরির অনুমতি দেয় না। এই দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা তৈরি করা এবং পুরুষের অধিকার খর্ব করা দুটি ভিন্ন বিষয়।

কিন্তু বাংলাদেশের অনেক আইন এই পার্থক্যটি মানে না। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ শুধু নারীকে বিশেষ সুরক্ষা দেয় না, বরং পুরুষের বিরুদ্ধে এমন বিধান রাখে যা ন্যায়বিচারের মূলনীতির বিরোধী।

৪.৩ সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ: আইনের আশ্রয় পাওয়ার অধিকার

সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ বলে: "আইনানুযায়ী ও কেবলমাত্র আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ করা এবং আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার।"

এই অনুচ্ছেদটি "Due Process of Law" বা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার সাংবিধানিক গ্যারান্টি। কিন্তু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১৯ ধারায় জামিন অযোগ্য অপরাধের যে তালিকা রয়েছে, তা প্রায়ই এই সাংবিধানিক গ্যারান্টির সাথে সাংঘর্ষিক।

যখন একজন পুরুষকে শুধুমাত্র একটি অভিযোগের ভিত্তিতে, কোনো প্রাথমিক প্রমাণ ছাড়াই, জামিন না দিয়ে কারাগারে রাখা হয়, তখন সেটি সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।

৪.৪ সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ: গ্রেফতার ও আটকের ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ

সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ গ্রেফতার ও আটকের ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি দেয়। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে কারণ জানাতে হবে, আইনজীবীর সাথে পরামর্শের সুযোগ দিতে হবে এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে।

কিন্তু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে এই সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলো কতটা কার্যকর, সেটা একটি বড় প্রশ্ন। বাস্তবে দেখা যায় যে পারিবারিক বিরোধে মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষরাও এই সাংবিধানিক সুরক্ষা পায় না।

৪.৫ উচ্চ আদালতের ব্যাখ্যা ও জুরিসপ্রুডেন্স

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের সমতার বিধানগুলো ব্যাখ্যা করেছে নানা মামলায়। কিন্তু লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালত কদাচিৎ কার্যকর অবস্থান নিয়েছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয় হলো যে আমাদের উচ্চ আদালতের বিচারপতিরাও সামাজিক পূর্বধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন। যখন একটি মামলায় নারী বাদী এবং পুরুষ আসামি, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সহানুভূতির ধারা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা ন্যায়বিচারকে প্রভাবিত করতে পারে।

অধ্যায় ৫: ন্যায়বিচার তত্ত্ব ও বাংলাদেশের আইনি বাস্তবতা

৫.১ পজিটিভিজম ও লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইন

হান্স কেলসেন থেকে শুরু করে হার্বার্ট হার্ট পর্যন্ত, আইনি পজিটিভিজমের মূল দাবি হলো: আইন যা আছে তাই আইন, এবং আইন যা হওয়া উচিত তা আলাদা প্রশ্ন। কেলসেনের "Grundnorm" বা মূলমান তত্ত্ব অনুযায়ী, একটি রাষ্ট্রের আইনি ব্যবস্থা একটি শ্রেণীবদ্ধ কাঠামোতে সংগঠিত, যেখানে সর্বোচ্চ আদর্শ হলো সংবিধান।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই পজিটিভিস্ট কাঠামোয় একটি সমস্যা দেখা যায়। সংবিধান সমতার নীতি ঘোষণা করে, কিন্তু সংসদ এমন আইন পাস করে যা সংবিধানের নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক। আর উচ্চ আদালত এই সাংঘর্ষিকতার বিচার করার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু প্রায়ই তা করে না।

হার্টের "secondary rules" বা মাধ্যমিক নিয়মের তত্ত্বে "rule of recognition" বা স্বীকৃতির নিয়মটি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থায় কার্যকর rule of recognition এমনভাবে কাজ করে যে লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনগুলো বৈধ হিসেবে স্বীকৃত হয়, কারণ সেগুলো সংসদ কর্তৃক পাস হয়েছে। কিন্তু কেলসেনের কাঠামোয় উচ্চতর নিয়ম অর্থাৎ সংবিধানের সাথে নিম্নতর নিয়ম অর্থাৎ বিধিমালার সাংঘর্ষিকতা হলে নিম্নতর নিয়ম অবৈধ হওয়া উচিত।

৫.২ প্রাকৃতিক আইনের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রাকৃতিক আইনের দার্শনিক ঐতিহ্য, থমাস অ্যাকুইনাস থেকে শুরু করে জন ফিনিস পর্যন্ত, মনে করে যে আইন নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত। আইন যদি ন্যায়বিচারের নৈতিক মানদণ্ড পূরণ না করে, তাহলে সেটি প্রকৃত আইন নয়।

জন ফিনিসের "Natural Law and Natural Rights" গ্রন্থে তিনি সাতটি মৌলিক মানবিক মূল্যের কথা বলেছেন, যার মধ্যে একটি হলো "practical reasonableness" বা ব্যবহারিক যুক্তিসঙ্গততা। এই মূল্য অনুযায়ী, ন্যায়সঙ্গত আইন হলো সেই আইন যা যুক্তির ভিত্তিতে সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর অনেক বিধান, বিশেষত জামিনের অযোগ্যতা এবং অভিযোগের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় গ্রেফতার, ফিনিসের মানদণ্ডে ন্যায়সঙ্গত নয়, কারণ এগুলো "practical reasonableness" এর মূল্যকে লঙ্ঘন করে।

৫.৩ ক্রিটিক্যাল লিগ্যাল স্টাডিজ এবং লিঙ্গ-পক্ষপাত

ক্রিটিক্যাল লিগ্যাল স্টাডিজ বা সমালোচনামূলক আইন অধ্যয়ন আন্দোলন, যা ১৯৭০-৮০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়েছিল, আইনকে নিরপেক্ষ হিসেবে দেখতে অস্বীকার করে। এই আন্দোলনের প্রধান পণ্ডিত রবার্তো আনগার, মর্টন হোরউইটজ এবং ডানকান কেনেডি মনে করেন যে আইন রাজনৈতিক ক্ষমতার একটি প্রকাশ এবং এটি সবসময় কোনো না কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করে।

এই তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই আইনগুলো একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ করে। ক্ষমতাসীন দলগুলো নারী ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার জন্য এই আইনগুলো প্রণয়ন করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে। আবার নারী সংগঠনগুলো এই আইনগুলো রক্ষা করার জন্য রাজনৈতিক চাপ দেয়, কারণ এই আইনগুলো তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্বের সাথে জড়িত।

এই রাজনৈতিক বর্তুলতায় পুরুষের অধিকারের বিষয়টি কোথাও স্থান পায় না।

৫.৪ ফেমিনিস্ট লিগ্যাল থিওরি এবং তার সীমাবদ্ধতা

নারীবাদী আইনতত্ত্বের বিভিন্ন ধারা রয়েছে। উদারপন্থী নারীবাদ, আমূল পরিবর্তনকামী নারীবাদ, সাংস্কৃতিক নারীবাদ এবং উত্তর-কাঠামোবাদী নারীবাদ প্রতিটি আলাদাভাবে আইন ও লিঙ্গের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে।

উদারপন্থী নারীবাদ, যার প্রতিনিধি রুথ বেডার গিন্সবার্গ ছিলেন, মূলত সমতার দাবি করে: একই আইন সকলের উপর প্রযোজ্য হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলাদেশে যে নারীবাদী আইনি প্রভাব বিদ্যমান, তা অনেকটাই "difference feminism" বা পার্থক্য-নারীবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, যা মনে করে নারীর বিশেষ পরিস্থিতির কারণে নারীর জন্য বিশেষ আইন প্রয়োজন।

এই পার্থক্য-নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আইনে প্রয়োগের সময় কয়েকটি সমস্যা তৈরি করে। প্রথমত, এটি ধরে নেয় যে নারীরা সবসময়ই দুর্বল এবং পুরুষরা সবসময়ই শক্তিশালী, যা একটি অতি সরলীকরণ। দ্বিতীয়ত, এটি নারীর বিভিন্নতাকে উপেক্ষা করে, কারণ সব নারী একরকম পরিস্থিতিতে নেই। তৃতীয়ত, এটি এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে যেখানে আইনের সুরক্ষার আবরণে অন্যায় করা সম্ভব হয়।

৫.৫ ইন্টারসেকশনালিটি তত্ত্ব এবং পুরুষ অভিজ্ঞতা

কিম্বার্লি ক্রেনশ কর্তৃক প্রবর্তিত "intersectionality" বা আন্তঃসংযোগ তত্ত্ব মূলত নারীর বিভিন্ন পরিচয়ের আন্তঃসংযোগ বিশ্লেষণের জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এই তত্ত্বটি পুরুষের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণেও ব্যবহার করা যায়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

একজন দরিদ্র পুরুষ, যিনি একটি মিথ্যা যৌতুক মামলার শিকার হয়েছেন, তার অভিজ্ঞতা শুধু লিঙ্গের বিষয় নয়। এটি শ্রেণী, অর্থনীতি এবং আইনি অজ্ঞতার আন্তঃসংযোগের বিষয়ও। একজন ধনী পুরুষ আইনজীবী নিয়োগ করে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু একজন দরিদ্র পুরুষ পারেন না। এই শ্রেণী-লিঙ্গ আন্তঃসংযোগটি বাংলাদেশের আইনি মিসান্ড্রির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা।

অধ্যায় ৬: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০: একটি গভীর বিশ্লেষণ

৬.১ আইনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ বাংলাদেশের সবচেয়ে বিতর্কিত আইনগুলোর একটি। এই আইনটি ১৯৮৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আইনের স্থলে প্রণীত হয়েছে। ২০০০ সালের এই আইনটি পরবর্তীতে ২০০৩ সালে সংশোধিত হয়েছে এবং সবচেয়ে সাম্প্রতিক সংশোধনী ২০২৫ সালের মার্চ মাসে আনা হয়েছে।

এই আইনটি তৈরির পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল। ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। অ্যাসিড আক্রমণ, যৌতুক হত্যা এবং ধর্ষণের ঘটনাগুলো জাতীয় উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই প্রেক্ষাপটে একটি কঠোর আইন প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু সমস্যাটি হলো যে এই কঠোরতা প্রয়োগের পদ্ধতি এবং আইনের ভাষা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে এটি অত্যন্ত সহজে অপব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়েছে।

৬.২ আইনের মূল বিধান এবং সমস্যা

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ৯ এ ধর্ষণ সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। এই ধারায় ধর্ষণের সংজ্ঞায় একটি মূল সমস্যা ছিল: ধর্ষণ শুধুমাত্র পুরুষ কর্তৃক নারীর উপর সংঘটিত হতে পারে বলে সংজ্ঞায়িত ছিল। ফলে নারী কর্তৃক পুরুষের উপর যৌন সহিংসতা আইনে স্বীকৃত ছিল না।

২০২৫ সালের মার্চ মাসে যে সংশোধনী আনা হয়েছে, সেখানে পুরুষকেও ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই সংশোধনীটি একটি স্বীকৃতি যে পুরুষও যৌন সহিংসতার শিকার হতে পারেন। কিন্তু এই স্বীকৃতি অনেক দেরিতে এসেছে এবং এখনো অনেক ফাঁকফোকর রয়ে গেছে।

ধারা ১১ তে যৌতুক সংক্রান্ত অপরাধের বিধান রয়েছে। এই ধারায় যৌতুকের কারণে নারীর মৃত্যু বা আঘাতের জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু এই ধারাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় পারিবারিক বিরোধে পুরুষকে আক্রমণ করার জন্য, এমনকি যেখানে প্রকৃত যৌতুকের কোনো ঘটনাই ঘটেনি।

ধারা ১৩ তে অপহরণ সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। এই ধারাতেও একটি একতরফা কাঠামো রয়েছে।

৬.৩ জামিন অযোগ্যতার সমস্যা এবং ন্যায়বিচারের সংকট

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর একটি সবচেয়ে বিতর্কিত দিক হলো এর জামিন সংক্রান্ত বিধান। এই আইনের অধীনে অনেক অপরাধ "জামিন অযোগ্য" হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এর মানে হলো যে একজন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র একটি অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা যায় এবং তাকে কোনো আদালত থেকে জামিন দেওয়া হবে না, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে উচ্চ আদালত জামিন দিতে পারে।

এই ব্যবস্থাটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী, বিচারের পূর্বে কারাবাস ব্যতিক্রমী হওয়া উচিত এবং মুক্তিই স্বাভাবিক নিয়ম হওয়া উচিত।

বাস্তবে কী হয়? একজন নারী তার স্বামী বা শ্বশুরের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করলে, পুলিশ সাথে সাথে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। গ্রেফতারের পর আসামি জামিন পান না এবং কারাগারে থাকতে থাকতে মামলা বছরের পর বছর চলতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দীর্ঘ কারাবাসের পর আদালত আসামিকে নির্দোষ ঘোষণা করেন, কিন্তু ততদিনে তার জীবন, পেশা এবং পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে।

এই পরিস্থিতিটি অনেক পুরুষকে মিথ্যা মামলার শিকার হওয়ার পর মীমাংসার জন্য বাধ্য করে। মামলা তুলে নেওয়ার বিনিময়ে তাকে বিশাল অঙ্কের অর্থ দিতে হয় বা সম্পত্তি ছেড়ে দিতে হয়। এই প্রক্রিয়াটি কার্যত আইনকে ব্ল্যাকমেইলের হাতিয়ারে পরিণত করে।

৬.৪ মামলার পরিসংখ্যান এবং অভিযোগ প্রত্যাহারের ধরন

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে যে মামলাগুলো দায়ের হয়, তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শেষ পর্যন্ত মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় বা আদালতে টেকে না। কিন্তু সরকারিভাবে এই তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের কোনো ব্যবস্থা নেই।

বিভিন্ন আইনজীবী সংগঠন ও গবেষকদের তথ্য অনুযায়ী, নারী ও শিশু নির্যাতন আদালতে যে মামলাগুলো বিচার হয়, তার একটি বড় অংশে শেষ পর্যন্ত আসামি খালাস পান। খালাস পাওয়ার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে সাক্ষ্যের অভাব, সাক্ষীদের বিরোধাভাসী বক্তব্য এবং অভিযোগকারীর সাক্ষ্যদানে অস্বীকৃতি।

কিন্তু এই খালাসের পরিসংখ্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে: যদি এত বড় অংশ শেষে খালাস পায়, তাহলে মামলা চলাকালীন তাদের যে কারাবাস, সামাজিক লাঞ্ছনা এবং অর্থিক ক্ষতি হয়েছে, তার কী হবে? এই ক্ষতির কোনো আইনি প্রতিকার নেই।

৬.৫ মিথ্যা মামলাকারীর বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকারের অপ্রতুলতা

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১৭ ধারায় মিথ্যা মামলা করার জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে যদি কেউ মিথ্যা মামলা করে তাহলে তাকে সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া যাবে।

কিন্তু বাস্তবে এই ধারাটি কার্যকরভাবে প্রয়োগ হয় না। কারণ অনেকগুলো:

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

প্রথমত, এই আইনের ১৭ ধারায় মামলা করতে হলে প্রমাণ করতে হবে যে মামলাকারী জেনেশুনে মিথ্যা মামলা করেছে। এই প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন।

দ্বিতীয়ত, পুলিশ মিথ্যা মামলাকারীর বিরুদ্ধে মামলা নিতে অনিচ্ছুক, কারণ সামাজিক চাপের কারণে একজন নারীকে মিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার ঝুঁকি নিতে পুলিশ ইচ্ছুক নয়।

তৃতীয়ত, বিচারকরাও এই ধারায় মামলা বিচার করতে দ্বিধা করেন, কারণ এটি নারী সংক্রান্ত আইনের বিষয় এবং এখানে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক।

চতুর্থত, যে পুরুষ মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছেন, তিনি অনেক সময় আইনি লড়াইয়ের শক্তি বা অর্থ হারিয়ে ফেলেন এবং মামলার পর আর মামলা করতে পারেন না।

অধ্যায় ৭: যৌতুক নিরোধ আইন এবং তার দ্বিমুখী সমস্যা

৭.১ যৌতুক: সংজ্ঞা ও সামাজিক বাস্তবতা

যৌতুক বাংলাদেশের একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা। যৌতুক বলতে বিবাহের সময় বা পরে বর বা বরের পরিবারের কাছ থেকে কনের পরিবার যে অর্থ বা সম্পদ চায় বা নেয় তাকে বোঝায়। যৌতুকের কারণে নারী নির্যাতন এমনকি হত্যা বাংলাদেশে দুঃখজনকভাবে সাধারণ ঘটনা।

এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণীত হয়। এই আইনে যৌতুক দেওয়া এবং নেওয়া উভয়ই অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

৭.২ আইনের ভাষায় সমস্যা

যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ এর ব্যবহারিক প্রয়োগে একটি মারাত্মক বিরোধাভাস রয়েছে। এই আইনে যৌতুক দেওয়া এবং নেওয়া উভয়ই অপরাধ, কিন্তু বাস্তবে শুধুমাত্র পুরুষ পক্ষকেই বিচারের সম্মুখীন হতে দেখা যায়।

এছাড়াও, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর সাথে সংযুক্ত হওয়ার পর যৌতুক সংক্রান্ত মামলাগুলো আরও বেশি জটিল এবং পুরুষবিরোধী হয়ে পড়েছে।

মামলার ধরন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়: বিবাহবিচ্ছেদ বা পারিবারিক বিরোধের সময় স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে যৌতুক দাবির অভিযোগ করেন। কিন্তু আসলে সেই "যৌতুক" ছিল স্বামীর পরিবারের স্বেচ্ছায় দেওয়া উপহার, অথবা এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। তবুও পুলিশ মামলা নেয়, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয় এবং আসামি কারাগারে যান।

৭.৩ যৌতুক আইনের পাল্টা ব্যবহার: মহর ও দেনমোহরের সাথে সংঘাত

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক আইনে "দেনমোহর" বা "মহর" এর ধারণা রয়েছে। দেনমোহর হলো স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর প্রাপ্য একটি আর্থিক অধিকার, যা বিবাহের সময় নির্ধারিত হয়।

কিন্তু বাংলাদেশে একটি অদ্ভুত পরিস্থিতি দেখা যায়: স্ত্রীর পক্ষ থেকে নেওয়া উপহার বা সহযোগিতাকে "যৌতুক" বলে দাবি করা হয়, কিন্তু স্বামীর আইনি বাধ্যবাধকতা দেনমোহরকে কখনো "যৌতুকের বিপরীত" হিসেবে আদালতে বিবেচনায় নেওয়া হয় না।

এই অসামঞ্জস্যটি একটি কাঠামোগত পক্ষপাতের প্রকাশ: আইনি ব্যবস্থা পুরুষের দেনমোহর দেওয়ার বাধ্যবাধকতাকে স্বাভাবিক মনে করে, কিন্তু নারী পক্ষের কোনো আর্থিক অবদানকে "যৌতুক" হিসেবে অভিযোগ করার সুযোগও রাখে। এই দুটি একসাথে থাকা সম্ভব কিন্তু সেটি পুরুষের জন্য একটি আইনি ফাঁদ তৈরি করে।

৭.৪ মামলার বৈশিষ্ট্য: পারিবারিক বিরোধের হাতিয়ার

বাস্তব মামলাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে যৌতুক মামলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পারিবারিক বিরোধ, বিবাহবিচ্ছেদ বা সম্পদ বিরোধের সময় দায়ের করা হয়। এই মামলাগুলোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো সময়কাল: যৌতুক মামলা প্রায়ই বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার কয়েক বছর পর, বিশেষত যখন বিবাহবিচ্ছেদের বা সম্পদ ভাগের প্রশ্ন ওঠে, তখন দায়ের করা হয়।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো মামলার সংখ্যা: একই ঘটনায় বাদী প্রায়ই নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ধারা ১১ এবং যৌতুক নিরোধ আইনের অধীনে একসাথে মামলা করেন। এই "মামলার বন্যা" আসামির আইনি লড়াইকে অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়বহুল করে তোলে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো সমঝোতার শর্ত: বাদী সাধারণত মামলা তুলে নেওয়ার বিনিময়ে নির্দিষ্ট আর্থিক দাবি পূরণের শর্ত দেন। যখন সেই দাবি পূরণ হয়, তখন মামলা প্রত্যাহার করা হয়।

এই ধরনের মামলাগুলো কার্যত আইনকে একটি চাপ দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

অধ্যায় ৮: পারিবারিক আইন এবং পুরুষের অধিকার

৮.১ মুসলিম পারিবারিক আইনের কাঠামো

বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইন মূলত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এই আইনে বিবাহ, তালাক, মেহর, ভরণপোষণ এবং সন্তানের হেফাজতের বিধান রয়েছে।

পারিবারিক আইনে পুরুষের বিরুদ্ধে কাঠামোগত পক্ষপাত কয়েকটি দিক থেকে দেখা যায়:

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

প্রথমত, ভরণপোষণের একতরফা বাধ্যবাধকতা: মুসলিম আইনে স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য, কিন্তু এই বাধ্যবাধকতাটি একমুখী। যদি স্বামী অক্ষম বা অসুস্থ হন, তাহলেও স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেওয়ার কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই।

দ্বিতীয়ত, সন্তানের হেফাজত: মুসলিম আইনে ছেলে সন্তান সাত বছর পর্যন্ত এবং মেয়ে সন্তান বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত মায়ের হেফাজতে থাকে। এই নিয়মটি বাবার অধিকারকে সীমিত করে এবং অনেক ক্ষেত্রে বাবাকে তার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

তৃতীয়ত, তালাকের পরিণতি: তালাকের পর পুরুষকে দেনমোহর পরিশোধ করতে হয়, ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ দিতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ভরণপোষণের দায়িত্বও নিতে হয়। কিন্তু নারীর পক্ষ থেকে সম্পর্ক ভেঙে দেওয়া হলেও এই আর্থিক দায় থাকে।

৮.২ খুলা তালাক এবং পুরুষের অধিকারের সংকোচন

মুসলিম আইনে "খুলা" হলো স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিবাহবিচ্ছেদের একটি পদ্ধতি, যেখানে স্ত্রী দেনমোহর ফেরত দিয়ে বিবাহ ভাঙতে পারেন। বাংলাদেশে আদালত এই অধিকার বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছে।

কিন্তু সমস্যা হলো খুলা তালাকের ক্ষেত্রে দেনমোহর ফেরত দেওয়ার বিধানটি প্রায়ই প্রয়োগ হয় না। অর্থাৎ স্ত্রী বিবাহ ভাঙতে পারেন কিন্তু সম্পূর্ণ দেনমোহর ফেরত না দিয়েও। আবার স্বামীকে এর পরেও ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ এবং শিশু ভরণপোষণ দিতে হয়।

এই পরিস্থিতি একটি অসামঞ্জস্য তৈরি করে: স্ত্রী সম্পর্ক ভাঙার একতরফা অধিকার রাখেন, কিন্তু এর আর্থিক পরিণতি পুরুষকে বহন করতে হয়।

৮.৩ সন্তানের হেফাজত এবং পিতার অধিকার

বাংলাদেশে সন্তানের হেফাজত মামলায় পিতাকে একটি কঠিন আইনি পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। মুসলিম আইনে "হেফাজত" বা শারীরিক হেফাজত সাধারণত মায়ের কাছে থাকে, আর পিতা শুধু "ওলায়েত" বা আইনি অভিভাবকত্ব রাখেন।

কিন্তু বাস্তবে এই বিভাজনটি পিতাকে সন্তানের দৈনন্দিন জীবন থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পিতা সন্তানকে দেখতে পারেন, কিন্তু তার সাথে বসবাস করতে পারেন না। পিতা সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আইনি অধিকার রাখেন, কিন্তু বাস্তবে মায়ের কাছে থাকা সন্তানের জীবনে তার প্রভাব সীমিত হয়ে পড়ে।

এই আইনি কাঠামো ধরে নেয় যে নারী স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভালো পিতামাতা এবং পুরুষ দ্বিতীয় সারির অভিভাবক। এই পূর্বধারণাটি কি বৈজ্ঞানিকভাবে বা আইনতাত্ত্বিকভাবে ন্যায়সঙ্গত?

মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা দেখায় যে শিশুর সুস্বাস্থ্য ও বিকাশের জন্য উভয় পিতামাতার সক্রিয় উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আইনি ব্যবস্থা এই বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে প্রায়ই উপেক্ষা করে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৮.৪ বিবাহ নিবন্ধন এবং পুরুষের একচেটিয়া দায়বদ্ধতা

বাংলাদেশে বিবাহ নিবন্ধনের প্রক্রিয়ায় পুরুষকে একটি একতরফা দায়বদ্ধতার অবস্থানে রাখা হয়। বিবাহের কাবিননামায় পুরুষকে দেনমোহরের পরিমাণ উল্লেখ করতে হয়, এবং এই দেনমোহর পুরুষের একটি আইনি ঋণ। কিন্তু নারীর পক্ষ থেকে কোনো আর্থিক দায়বদ্ধতা নেই।

এই একতরফা দায়বদ্ধতাটি শরীয়তের আইনি ঐতিহ্য থেকে এসেছে এবং তা ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃত। কিন্তু আধুনিক বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায়, যেখানে নারীরাও উপার্জন করেন এবং পরিবারে অর্থনৈতিক অবদান রাখেন, এই একমুখী আর্থিক কাঠামো কি এখনো সামাজিকভাবে ন্যায়সঙ্গত?

৮.৫ বিবাহবিচ্ছেদের পর ভরণপোষণ: একটি জটিল প্রশ্ন

বিবাহবিচ্ছেদের পর ভরণপোষণের বিষয়টি বাংলাদেশে আইনিভাবে জটিল। মুসলিম আইনে ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ অর্থাৎ তিন মাসের ভরণপোষণ স্বামীর দায়িত্ব। কিন্তু বাংলাদেশের পারিবারিক আদালত অনেক ক্ষেত্রে এই ইদ্দতকালীন সীমা ছাড়িয়ে দীর্ঘমেয়াদী ভরণপোষণ নির্ধারণ করে।

২০০০ সালের পারিবারিক আদালত বিধিমালা এবং পরবর্তী সংশোধনগুলো এই ক্ষেত্রে বিচারকের বিবেচনাধীন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু এই বিবেচনাধীন ক্ষমতার ব্যবহারে প্রায়ই একটি পক্ষপাত দেখা যায়: স্বামীর আর্থিক সামর্থ্য এবং আচরণ বিচার করা হয়, কিন্তু স্ত্রীর আর্থিক সামর্থ্য এবং বিবাহবিচ্ছেদে তার ভূমিকা প্রায়ই বিবেচনায় নেওয়া হয় না।

অধ্যায় ৯: ফৌজদারি আইনে লিঙ্গ-পক্ষপাত

৯.১ দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর লিঙ্গ-পক্ষপাতী ধারাসমূহ

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০, যা মূলত ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় দণ্ডবিধির উত্তরাধিকার, এতে বেশ কিছু ধারা রয়েছে যা লিঙ্গ-পক্ষপাতের প্রতিফলন ঘটায়।

ধারা ৩৭৫ এ ধর্ষণের সংজ্ঞায় মূলত পুরুষকে অপরাধী এবং নারীকে ভিকটিম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যদিও ২০২৫ সালের সংশোধনীর পর বাংলাদেশে পুরুষকেও ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে কিছু মাত্রায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মূল দণ্ডবিধিতে এখনো ধর্ষণ সংক্রান্ত আইনি কাঠামো পুরুষকে স্বয়ংক্রিয় অপরাধী হিসেবে দেখে।

ধারা ৪৯৭ এ ব্যভিচারের বিধান ছিল, যা শুধুমাত্র পুরুষকে লক্ষ্য করে তৈরি এবং এটি এক ধরনের লিঙ্গ-পক্ষপাতের প্রকাশ।

৯.২ সাক্ষ্য আইনে পক্ষপাত

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ এ কিছু বিধান রয়েছে যা আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণে লিঙ্গ-পক্ষপাত তৈরি করে। বিশেষভাবে ধর্ষণ মামলায় ভিকটিমের সাক্ষ্যকে যে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়, তা একদিক থেকে ন্যায়সঙ্গত হলেও অন্যদিক থেকে অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ১০ অনুযায়ী, ধর্ষণ মামলায় ভিকটিমের একক সাক্ষ্যই যথেষ্ট এবং অভিযোগকারীর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ। এই বিধানটি ভিকটিমের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু একই সাথে এটি মিথ্যা অভিযোগের ক্ষেত্রে আসামির জন্য নিজেকে রক্ষা করা কঠিন করে তোলে।

৯.৩ গ্রেফতার ও রিমান্ড প্রক্রিয়ায় বৈষম্য

বাংলাদেশে নারীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হলে আইনে নারীকে রিমান্ডে নেওয়ার উপর কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের সুরক্ষা নেই। পুলিশ রিমান্ড পাওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করে এবং প্রায়ই রিমান্ড মঞ্জুর হয়, যেখানে নির্যাতনের ঝুঁকি থাকে।

নারীর বিরুদ্ধে রিমান্ডের সীমাবদ্ধতা অবশ্যই প্রশংসনীয়, কারণ নারী হেফাজতে নির্যাতনের ঘটনা বিদ্যমান। কিন্তু পুরুষের বিরুদ্ধে রিমান্ডের ব্যাপারে কোনো সমকক্ষ সুরক্ষা না থাকা একটি কাঠামোগত বৈষম্য।

৯.৪ নিরাপদ আশ্রয় এবং লিঙ্গ-পক্ষপাত

বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু পুরুষের জন্য এরকম কোনো আশ্রয়কেন্দ্র নেই।

পারিবারিক সহিংসতার শিকার পুরুষ কোথায় যাবেন? পুলিশ তার অভিযোগ নেবে না বা গুরুত্বের সাথে নেবে না। আদালতে তিনি যাবেন, কিন্তু পারিবারিক সহিংসতা আইন ২০১০ তে পুরুষ ভিকটিমের কথা প্রায় নেই বললেই চলে।

অধ্যায় ১০: পারিবারিক সহিংসতা আইন ২০১০ এর বিশ্লেষণ

১০.১ আইনের পটভূমি

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ বাংলাদেশের আইনি ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই আইনটি পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে একটি ব্যাপক কাঠামো তৈরি করেছে।

কিন্তু এই আইনের সংজ্ঞা ও প্রয়োগে একটি মৌলিক সমস্যা রয়েছে।

১০.২ আইনের সংজ্ঞা: পুরুষ কোথায়?

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এর ২ ধারায় "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি" এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই সংজ্ঞায় "নারী বা শিশু" কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

এর মানে হলো: যদি একজন স্বামী তার স্ত্রী কর্তৃক শারীরিকভাবে নির্যাতিত হন, তাহলে এই আইনে তার কোনো প্রতিকার নেই। তিনি সাধারণ দণ্ডবিধিতে মারধরের অভিযোগ করতে পারেন, কিন্তু পারিবারিক সহিংসতার বিশেষ আইনি সুরক্ষা তার জন্য প্রযোজ্য নয়।

এই আইনি সংজ্ঞাটি ধরে নেয় যে পারিবারিক সহিংসতায় শুধুমাত্র নারী ও শিশু ভিকটিম হতে পারে। কিন্তু গবেষণা দেখায় যে পারিবারিক সহিংসতার ভিকটিমদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পুরুষ।

১০.৩ আন্তর্জাতিক গবেষণা এবং পুরুষ ভিকটিমের বাস্তবতা

বিশ্বজুড়ে পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ক গবেষণা দেখায় যে পুরুষরাও পারিবারিক সহিংসতার উল্লেখযোগ্য ভিকটিম। যদিও নারীরা এই সহিংসতায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু পুরুষ ভিকটিমের সংখ্যাও অবহেলনীয় নয়।

ডব্লিউএইচও এর ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী পুরুষরা নারীদের তুলনায় বেশি হারে আত্মহত্যার চিন্তা করেন, কারণ তারা বেশি নির্যাতন সহ্য করেন কিন্তু আইনি সুরক্ষা কম পান।

বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতায় পুরুষ ভিকটিমের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য নেই, কারণ সামাজিক কলঙ্কের কারণে পুরুষরা অভিযোগ করেন না এবং কোনো সরকারি সংস্থা এই তথ্য সংগ্রহ করে না।

১০.৪ সুরক্ষা আদেশের একতরফা ব্যবস্থা

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এ আদালত "সুরক্ষা আদেশ" দিতে পারে, যা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ বা যোগাযোগ করা থেকে বিরত রাখে। কিন্তু এই সুরক্ষা আদেশ শুধুমাত্র নারীর পক্ষে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে নেওয়া যায়। পুরুষের জন্য এই সমকক্ষ আইনি সুরক্ষা নেই।

অধ্যায় ১১: ধর্ষণ আইন এবং তার জটিলতা

১১.১ ধর্ষণের সংজ্ঞা: ঐতিহাসিক বিবর্তন

বাংলাদেশে ধর্ষণের সংজ্ঞা দীর্ঘদিন ধরে একটি লিঙ্গ-নির্দিষ্ট ধারণার মধ্যে আটকে ছিল। ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারায় ধর্ষণের সংজ্ঞায় বলা ছিল যে একজন পুরুষ একজন নারীকে ধর্ষণ করে। এই সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে পুরুষই সবসময় অপরাধী এবং নারীই সবসময় ভিকটিম।

২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনও এই সংজ্ঞার কাঠামো বজায় রেখেছিল। ফলে যদি কোনো নারী কোনো পুরুষকে বা অন্য নারীকে যৌন নির্যাতন করেন, তাহলে সেটি "ধর্ষণ" হিসেবে গণ্য হত না।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১১.২ ২০২৫ সালের সংশোধনী এবং তার সীমাবদ্ধতা

২০২৫ সালের মার্চ মাসে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে সংশোধনী আনা হয়েছে, যেখানে পুরুষকেও ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

কিন্তু এই সংশোধনীর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, এই স্বীকৃতির পরেও আইনের মূল কাঠামো যেখানে পুরুষ প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত এবং নারী প্রাথমিকভাবে ভিকটিম সেটি পরিবর্তন হয়নি।

দ্বিতীয়ত, পুরুষ ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে আদালতে যাওয়ার সামাজিক বাধা এখনো প্রচণ্ড। পুরুষ ধর্ষণের বিষয়ে সামাজিক কলঙ্ক এত বেশি যে অধিকাংশ পুরুষ ভিকটিম মামলা করতে সাহস পান না।

তৃতীয়ত, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো পুরুষ ধর্ষণের অভিযোগ কীভাবে তদন্ত করবে, কীভাবে সাক্ষ্য সংগ্রহ করবে, সেই বিষয়ে এখনো কোনো স্পষ্ট প্রোটোকল নেই।

১১.৩ বৈবাহিক ধর্ষণ: আইনি অস্বীকৃতি

বাংলাদেশে বৈবাহিক ধর্ষণ এখনো আইনে স্বীকৃত নয়। দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারার একটি ব্যতিক্রম বলে যে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক, যদি স্ত্রীর বয়স ১৩ বছরের বেশি হয়, ধর্ষণ নয়।

এই বিধানটি নারীর শারীরিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সাথে সাংঘর্ষিক।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে: যদি বৈবাহিক ধর্ষণকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তাহলে বিপরীত দিকটিও বিবেচনায় নেওয়া দরকার, অর্থাৎ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে যৌন নিপীড়নও আইনে স্বীকৃত হতে হবে।

অধ্যায় ১২: যৌন হয়রানি আইন এবং পুরুষ ভিকটিমের অনুপস্থিতি

১২.১ হাইকোর্টের নির্দেশিকা ২০০৯

২০০৯ সালে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট যৌন হয়রানি প্রতিরোধে একটি নির্দেশিকা জারি করে। এই নির্দেশিকা কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের জন্য কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়।

এই নির্দেশিকাটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেত্র। কিন্তু এতে "যৌন হয়রানি" এর সংজ্ঞায় শুধুমাত্র নারীকে ভিকটিম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পুরুষের যৌন হয়রানির বিষয়ে কোনো বিধান নেই।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কর্মক্ষেত্রে পুরুষরাও যৌন হয়রানির শিকার হন। তবে এই অভিজ্ঞতাটি সামাজিক কলঙ্কের কারণে প্রায় কখনো রিপোর্ট করা হয় না এবং আইন এই বিষয়ে কোনো সুরক্ষা দেয় না।

১২.২ #MeToo আন্দোলন এবং বাংলাদেশে তার প্রভাব

২০১৭-১৮ সালে বিশ্বব্যাপী #MeToo আন্দোলন শুরু হলে বাংলাদেশেও তার প্রভাব পড়ে। এই আন্দোলন নারীর যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন হিসেবে আবির্ভূত হয়।

কিন্তু এই আন্দোলনের একটি গুরুতর সমালোচনা হলো যে এটি কোনো প্রতিষ্ঠিত আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই, শুধুমাত্র সামাজিক মাধ্যমে অভিযোগের ভিত্তিতে, ব্যক্তির ক্যারিয়ার ও সুনাম ধ্বংস করে দেওয়ার একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশে #MeToo আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু ঘটনায় দেখা গেছে যে অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও অভিযুক্ত পুরুষের পেশাগত জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। আর অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলেও, অভিযোগকারী নারীর কোনো আইনি পরিণতি ভোগ করতে হয় না।

এই পরিস্থিতিটি কাঠামোগত অন্যায়ের একটি প্রকাশ।

অধ্যায় ১৩: সামাজিক কাঠামো এবং ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি

১৩.১ ভিকটিম কার্ড: একটি আইনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

"ভিকটিম কার্ড" একটি বিতর্কিত পরিভাষা। কেউ কেউ এই পরিভাষাকে নিপীড়িত মানুষদের বৈধ অভিযোগকে অবৈধ করার হাতিয়ার হিসেবে দেখেন। কিন্তু আইনতাত্ত্বিক প্রসঙ্গে "ভিকটিম কার্ড" একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়: এটি এমন একটি কৌশল যেখানে কেউ মিথ্যাভাবে বা অতিরঞ্জিতভাবে ভিকটিমের পরিচয় দাবি করে আইনি বা সামাজিক সুবিধা লাভ করেন।

এটি লক্ষ্যণীয় যে এই কৌশলটি শুধুমাত্র সেই সমাজেই কার্যকর যেখানে ভিকটিম পরিচয়ের সাথে সামাজিক বা আইনি সুবিধা জড়িত। বাংলাদেশে বর্তমান আইনি কাঠামো নারী ভিকটিমের পরিচয়কে এতটাই শক্তিশালী সামাজিক ও আইনি সুবিধা দেয় যে এই পরিচয়ের অপব্যবহারের প্রলোভন তৈরি হয়।

১৩.২ মিডিয়া ট্রায়াল এবং পুরুষের সুনাম ধ্বংস

বাংলাদেশের মিডিয়া প্রায়ই পারিবারিক বিরোধ বা যৌন সহিংসতার মামলায় আদালতে বিচার শেষ হওয়ার আগেই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার মতো সংবাদ পরিবেশন করে। এই "মিডিয়া ট্রায়াল" বিশেষভাবে পুরুষের ক্ষেত্রে বেশি ক্ষতিকর।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

যদি কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ আসে, মিডিয়া প্রায়ই তাকে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করে বিচারের আগেই। কিন্তু পরবর্তীতে যদি সেই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে সেই সংবাদ প্রায় কোথাও আসে না।

মিডিয়ার এই আচরণটি "presumption of guilt" বা অপরাধীত্বের অনুমানের একটি প্রকাশ, যা "presumption of innocence" এর বিপরীত।

১৩.৩ সামাজিক চাপ ও পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য

পারিবারিক বিরোধ, মিথ্যা মামলা এবং সামাজিক অবমাননা বাংলাদেশে পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, পুরুষরা নারীদের তুলনায় বেশি হারে আত্মহত্যা করেন।

বাংলাদেশে মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষ, সন্তানের হেফাজত হারানো পিতা এবং পারিবারিক বিরোধে সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত পুরুষদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে কোনো রাষ্ট্রীয় সহায়তা নেই। কোনো রাষ্ট্রীয় আশ্রয়কেন্দ্র নেই, কোনো হেল্পলাইন নেই এবং কোনো আইনি সহায়তা নেই।

এই শূন্যতাটি একটি নীতিগত ব্যর্থতার প্রকাশ।

১৩.৪ সামাজিক কলঙ্ক এবং পুরুষের নীরবতা

বাংলাদেশে পুরুষের নির্যাতনের শিকার হওয়া একটি সামাজিক কলঙ্কের বিষয়। একজন পুরুষ যদি বলেন যে তিনি তার স্ত্রী বা পরিবারের নারী সদস্যদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন, তাহলে সমাজ তাকে কাপুরুষ বলে মনে করে।

এই সামাজিক কলঙ্ক পুরুষকে নীরব রাখে। এই নীরবতা আবার আইন প্রণেতাদের মধ্যে এই ধারণা তৈরি করে যে পুরুষ নির্যাতন একটি বাস্তব সমস্যা নয়। এটি একটি দুষ্টচক্র: পুরুষ নীরব থাকেন, তাই কোনো তথ্য নেই, তাই কোনো আইন নেই, তাই পুরুষ আরও বেশি নীরব থাকতে বাধ্য হন।

অধ্যায় ১৪: সংখ্যা ও সাক্ষ্যের রাজনীতি

১৪.১ তথ্য সংগ্রহের ফাঁকফোকর

বাংলাদেশে লিঙ্গভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের একটি গুরুতর সমস্যা রয়েছে। সরকারি সংস্থাগুলো নারী নির্যাতনের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে, কিন্তু পুরুষ নির্যাতনের কোনো পরিসংখ্যান নেই।

এই তথ্য-ঘাটতিটি নীতিনির্ধারণকে একতরফা করে তোলে। যখন কেউ বলেন যে পুরুষও নির্যাতনের শিকার হন, তখন সরকারি সংস্থাগুলো বলে "তথ্য দিন"। কিন্তু তথ্য সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থাই নেই। এটি একটি Catch-22 পরিস্থিতি।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৪.২ মিথ্যা মামলার পরিসংখ্যান

বিভিন্ন আদালতের তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখেছেন যে নারী ও শিশু নির্যাতন আদালতে যে মামলা আসে তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশে অভিযুক্ত ব্যক্তি খালাস পান বা মামলা প্রত্যাহার হয়। এই পরিসংখ্যান একটি গুরুতর প্রশ্ন তোলে।

বাংলাদেশের আইন কমিশন এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান মিথ্যা মামলার বিষয়ে গবেষণা করেছে। কিন্তু এই গবেষণাগুলোর সুপারিশ নীতিনির্ধারণে প্রতিফলিত হয়নি।

১৪.৩ নারী সংগঠনগুলোর প্রভাব এবং পাল্টা দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলাদেশে নারী সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে নারীর অধিকার সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই সংগঠনগুলোর প্রচেষ্টায় অনেক আইন তৈরি হয়েছে এবং নারীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

কিন্তু এই সংগঠনগুলো প্রায়ই মিথ্যা মামলার সমস্যাটি স্বীকার করতে অস্বীকার করে। তাদের যুক্তি হলো যে মিথ্যা মামলার ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন এবং সামগ্রিক চিত্রে নারী নির্যাতনের সমস্যাই প্রধান।

এই যুক্তিটি আংশিকভাবে সত্য হলেও, এটি সমস্যার সম্পূর্ণ চিত্র নয়। একটি সত্যিকারের ন্যায়বিচারের ব্যবস্থায় উভয় দিকের সমস্যাই স্বীকৃত হওয়া উচিত।

অধ্যায় ১৫: তুলনামূলক আইনি বিশ্লেষণ

১৫.১ ভারতে পুরুষ অধিকারের আইনি বিকাশ

বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী ভারতেও অনুরূপ সমস্যা বিদ্যমান। ভারতে ধারা ৪৯৮ক এর অধীনে যৌতুক মামলার অপব্যবহারের বিষয়টি বহু বছর ধরে আলোচিত।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক রায়ে এই সমস্যাটি স্বীকার করেছে। "Arnesh Kumar v. State of Bihar" মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে বলেছে যে শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে ৪৯৮ক ধারায় স্বয়ংক্রিয় গ্রেফতার অনুচিত। আদালত "arrest is not mandatory but optional" নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট "Rajesh Sharma v. State of Uttar Pradesh" মামলায় ধারা ৪৯৮ক এর অপব্যবহার রোধে পরিবার কল্যাণ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল। যদিও পরে এই রায় পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু এটি দেখায় যে ভারতের আদালত এই সমস্যাটি স্বীকার করেছে।

বাংলাদেশের আদালত এই বিষয়ে এখনো ভারতের মতো পরিষ্কার অবস্থান নেননি।

১৫.২ পাকিস্তানে পারিবারিক আইনের সংস্কার

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পাকিস্তানে পারিবারিক আইন বাংলাদেশের অনুরূপ, কারণ উভয় দেশের আইনের একই মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ থেকে উৎপত্তি। কিন্তু পাকিস্তানে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পারিবারিক আইনে কিছু লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১৫.৩ পশ্চিমা দেশগুলোতে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনের বিকাশ

যুক্তরাজ্যে পারিবারিক সহিংসতা আইনকে সম্পূর্ণ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ করা হয়েছে। স্কটল্যান্ডে Domestic Abuse Act 2018 উভয় লিঙ্গের ভিকটিমকে সমান সুরক্ষা দেয়। কানাডায় সিনেমার হয়রানি আইনগুলো সম্পূর্ণ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ।

অস্ট্রেলিয়ায় পারিবারিক সহিংসতার ডেটা দেখায় যে পুরুষ ভিকটিমের সংখ্যা মোট রিপোর্ট করা মামলার প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ। এই তথ্যের ভিত্তিতে অস্ট্রেলিয়া পুরুষ ভিকটিমের জন্য বিশেষ সহায়তা কার্যক্রম চালু করেছে।

বাংলাদেশ এই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

১৫.৪ নর্ডিক দেশগুলোর মডেল

ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং সুইডেন পারিবারিক আইনে লিঙ্গ-সমতার একটি আদর্শ মডেল তৈরি করেছে। এই দেশগুলোতে সন্তানের হেফাজতে যৌথ হেফাজত ডিফল্ট হিসেবে ধরা হয়। পারিবারিক সহিংসতায় পুরুষ ও নারী উভয় ভিকটিমের জন্য সমান আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এবং ভরণপোষণের দায়িত্ব উভয় পিতামাতার উপর সমানভাবে আরোপ করা হয়।

এই মডেলগুলো বাংলাদেশের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে, যদিও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার পার্থক্য বিবেচনায় রেখে।

অধ্যায় ১৬: রাজনৈতিক অর্থনীতি ও লিঙ্গ আইন প্রণয়নের গতিশীলতা

১৬.১ নারী ভোট এবং আইন প্রণয়নের রাজনৈতিক প্রণোদনা

গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ভোটের হিসাব অনিবার্য। বাংলাদেশে নারী ভোটার সংখ্যা পুরুষ ভোটারের সমান বা কিছুটা বেশি। ফলে নারীবান্ধব নীতি ঘোষণা রাজনৈতিকভাবে লাভজনক।

কিন্তু এই রাজনৈতিক হিসাবে পুরুষের অধিকারের বিষয়টি প্রায় অনুপস্থিত। কারণ পুরুষরাও ভোটার, কিন্তু পুরুষ ভোটাররা তাদের আইনি অধিকারের বিষয়টিকে ভোটের মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করেন না। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পুরুষ অধিকার রক্ষার কোনো রাজনৈতিক প্রণোদনা নেই।

এই পরিস্থিতিটি একটি গণতান্ত্রিক ব্যর্থতার প্রতিফলন: গণতন্ত্র অধিকার রক্ষার কথা বলে, কিন্তু বাস্তবে ভোটের হিসাবে কোন অধিকার রক্ষা পাবে এবং কোনটা পাবে না সেটা নির্ধারিত হয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৬.২ নারীবাদী আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি

বাংলাদেশে নারী সংগঠনগুলো দীর্ঘ সময় ধরে একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। এই নেটওয়ার্ক আন্তর্জাতিক সংস্থা, সরকারি নীতিনির্ধারক এবং মিডিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে।

এই প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির একটি ইতিবাচক দিক হলো যে নারীর অধিকার আন্দোলন সফলতা পেয়েছে। কিন্তু একটি নেতিবাচক দিক হলো যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো নারী-পুরুষ সম্পর্কের একটি নির্দিষ্ট আখ্যান বজায় রাখার স্বার্থে আবদ্ধ, যেখানে নারী সবসময় ভিকটিম এবং পুরুষ সবসময় নিপীড়ক। এই আখ্যানটি প্রশ্ন করলে তা প্রায়ই নারীবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয়।

১৬.৩ আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইন প্রণয়ন

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলো নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে। ইউএন উইমেন, ইউএসএআইডি এবং অন্যান্য সংস্থা নারী অধিকার সংক্রান্ত প্রকল্পে অর্থায়ন করে।

কিন্তু এই অর্থায়নের একটি শর্ত থাকে: প্রকল্পগুলো অবশ্যই নারী সুবিধা সংক্রান্ত হতে হবে। পুরুষ অধিকার বা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের প্রকল্পে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এই অর্থায়নের কাঠামো বাংলাদেশের নীতিনির্ধারণকে প্রভাবিত করে।

অধ্যায় ১৭: বিচার বিভাগ এবং লিঙ্গ-পক্ষপাত

১৭.১ বিচারকের বিবেচনাধীন ক্ষমতা এবং লিঙ্গ-পক্ষপাত

বিচারকের বিবেচনাধীন ক্ষমতা আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু এই বিবেচনাধীন ক্ষমতার ব্যবহারে পূর্বধারণা এবং সামাজিক প্রত্যাশার প্রভাব পড়তে পারে।

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় বিচারকের বিবেচনাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ লক্ষ্য করলে একটি প্রবণতা দেখা যায়: নারী বাদীর প্রতি সহানুভূতি এবং পুরুষ আসামির প্রতি সন্দেহজনক দৃষ্টিভঙ্গি। এটি বিচারিক পক্ষপাতের একটি প্রকাশ।

আইনতাত্ত্বিক পণ্ডিত রোনালড ডওরকিন তাঁর "Taking Rights Seriously" গ্রন্থে "judicial discretion" বা বিচারিক বিবেচনাধীনতার সীমা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ডওরকিনের মতে, বিচারিক বিবেচনাধীনতা নীতি এবং নীতিমালার দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত, ব্যক্তিগত সহানুভূতি দ্বারা নয়।

১৭.২ বিচারিক প্রশিক্ষণে লিঙ্গ-সচেতনতা এবং তার ফাঁকফোকর

বাংলাদেশে বিচারিক প্রশিক্ষণে লিঙ্গ-সচেতনতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বিচারকদের নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা পরিচালনায় বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

কিন্তু এই প্রশিক্ষণের একটি সমস্যা হলো যে এটি মূলত নারীকে সুরক্ষা করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ডিজাইন করা হয়েছে। পুরুষ আসামির সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার বিষয়টি এই প্রশিক্ষণে যথেষ্ট মনোযোগ পায় না।

এর ফলে বিচারকরা নারী নির্যাতনের প্রতি সংবেদনশীল হন, কিন্তু পুরুষের সাংবিধানিক অধিকারের প্রতি কম সংবেদনশীল হন। এই ভারসাম্যহীনতাটি বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

১৭.৩ পাবলিক প্রসিকিউটর এবং পুলিশের ভূমিকা

বাংলাদেশে পাবলিক প্রসিকিউটর এবং পুলিশের ভূমিকা নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। পুলিশ যখন এই মামলায় তদন্ত করে, তখন প্রায়ই একটি পূর্বনির্ধারিত ধারণা নিয়ে কাজ করে যে অভিযুক্ত পুরুষ দোষী।

এই পূর্বনির্ধারিত ধারণার ফলে তদন্ত প্রক্রিয়া পক্ষপাতদুষ্ট হয়। আসামির পক্ষে যে সাক্ষ্য থাকতে পারে তা সংগ্রহ করার চেষ্টা কম হয়। আবার বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য সংগ্রহে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখানো হয়।

এই তদন্ত পক্ষপাত আদালতে পৌঁছায় এবং বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

অধ্যায় ১৮: ডিজিটাল যুগে নতুন মাত্রার লিঙ্গ-পক্ষপাত

১৮.১ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং সাইবার অপরাধ

বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এবং তার পরবর্তী সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ সাইবার অপরাধের বিষয়ে বিধান রাখে। এই আইনে সাইবার হয়রানি, অনলাইন মানহানি এবং যৌন সামগ্রী বিষয়ে বিধান আছে।

কিন্তু এই আইনের প্রয়োগেও একটি লিঙ্গ-পক্ষপাত দেখা যায়। অনলাইনে নারীর ছবি বা ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অভিযোগ পুলিশ গুরুত্বের সাথে নেয়। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে একই ধরনের অভিযোগ পুলিশ প্রায়ই তেমন গুরুত্ব দেয় না।

১৮.২ সামাজিক মিডিয়া এবং ভিকটিম ব্যারেজের নতুন প্রবণতা

সামাজিক মিডিয়া বাংলাদেশে একটি নতুন ধরনের আইনি হুমকি তৈরি করেছে। কেউ যদি ফেসবুক বা অন্য সামাজিক মিডিয়ায় কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তাহলে সেই অভিযোগ সত্য না হলেও সে পুরুষের সামাজিক জীবন ধ্বংস হতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে "Defamation" বা মানহানির আইন প্রতিকার হিসেবে কাজ করার কথা। কিন্তু বাস্তবে মানহানির মামলা দীর্ঘ, ব্যয়বহুল এবং অনিশ্চিত। আর অনেক সময় পুরুষ নিজেই মানহানির মামলা করলে "নারীকে হয়রানি করছেন" বলে আরও সামাজিক সমালোচনার মুখে পড়েন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ১৯: পুরুষ অধিকার আন্দোলন এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

১৯.১ বৈশ্বিক পুরুষ অধিকার আন্দোলনের উদ্ভব

পুরুষ অধিকার আন্দোলন বৈশ্বিকভাবে ১৯৭০ এর দশকে শুরু হয়েছিল, নারীবাদী আন্দোলনের পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে নয়, বরং পুরুষের নিজস্ব সমস্যাগুলো সমাধানের দাবি হিসেবে। এই আন্দোলন পুরুষের আত্মহত্যার উচ্চ হার, হেফাজতের বিরোধ, মিথ্যা অভিযোগ এবং পারিবারিক আইনে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

২০২০ এর দশকে এই আন্দোলন আরও সংগঠিত হয়েছে। বিশেষত যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতে পুরুষ অধিকার সংগঠনগুলো আইনি সংস্কারের দাবিতে সক্রিয়।

১৯.২ বাংলাদেশে পুরুষ অধিকার সচেতনতার বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে পুরুষ অধিকার সচেতনতা তুলনামূলকভাবে কম। যদিও সামাজিক মিডিয়ায় এই বিষয়ে আলোচনা বেড়েছে, বিশেষত ২০২০ এর দশকে, কিন্তু এখনো এটি একটি সংগঠিত আন্দোলনে পরিণত হয়নি।

বাংলাদেশে পুরুষ অধিকারের কথা বলা সামাজিকভাবে বিপজ্জনক। এই কথা বললে প্রায়ই "নারীবিদ্বেষী" বা "পিতৃতন্ত্রের রক্ষক" বলে আক্রমণ করা হয়। এই সামাজিক পরিবেশ পুরুষ অধিকারের বিষয়ে খোলামেলা আলোচনাকে বাধাগ্রস্ত করে।

১৯.৩ আইনি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

এই গ্রন্থের একটি কেন্দ্রীয় দাবি হলো: বাংলাদেশে আইনি সংস্কার প্রয়োজন, শুধু পুরুষের জন্য নয়, বরং সুষ্ঠু ন্যায়বিচারের জন্য। এই সংস্কার নারীর অধিকার খর্ব না করেও সম্ভব।

সংস্কারের মূল নীতি হওয়া উচিত: আইন লিঙ্গ-নিরপেক্ষ হবে, ভিকটিম লিঙ্গনির্বিশেষে সমান সুরক্ষা পাবেন, অপরাধী লিঙ্গনির্বিশেষে সমান শাস্তির মুখোমুখি হবেন, এবং আইনি প্রক্রিয়া সকলের জন্য সমান হবে।

অধ্যায় ২০: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং পুরুষের অধিকার

২০.১ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং লিঙ্গ-সমতা

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র, ১৯৪৮ এর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে সকল মানুষ সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মায়। ধারা ১ বলে: "All human beings are born free and equal in dignity and rights." ধারা ২ বলে যে এই অধিকারগুলো লিঙ্গনির্বিশেষে সকলের।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

কিন্তু বাংলাদেশের অনেক আইন এই সার্বজনীন ঘোষণার সাথে সাংঘর্ষিক। যখন একটি আইন পুরুষকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপরাধী ধরে নেয়, তখন সেটি ধারা ১১ এর "presumption of innocence" এর লঙ্ঘন।

২০.২ আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদন করেছে। এই চুক্তির ১৪ অনুচ্ছেদ ন্যায়বিচারের অধিকার নিশ্চিত করে, যার মধ্যে রয়েছে "presumption of innocence", "equal treatment before the courts" এবং "no punishment without proof."

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের কিছু বিধান এই আন্তর্জাতিক চুক্তির দায়বদ্ধতার সাথে সাংঘর্ষিক। বিশেষত জামিন অযোগ্যতার বিধান এবং প্রমাণের বোঝার বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২০.৩ CEDAW এবং পুরুষের অধিকারের প্রশ্ন

CEDAW বা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত সনদটি মূলত নারীর অধিকার রক্ষার জন্য। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে এই সনদ অনুমোদন করেছে।

CEDAW গুরুত্বপূর্ণ এবং নারীর অধিকার সুরক্ষায় অপরিহার্য। কিন্তু একটি প্রশ্ন উঠে আসে: যদি নারীর জন্য CEDAW থাকে, তাহলে পুরুষের অধিকার রক্ষার জন্য কোনো আন্তর্জাতিক কাঠামো আছে কি?

উত্তর হলো: মূল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিগুলো সকলের জন্য প্রযোজ্য এবং তারাই পুরুষের অধিকারের আন্তর্জাতিক ভিত্তি। কিন্তু এই চুক্তিগুলোর বাস্তব প্রয়োগে পুরুষের অধিকার প্রায়ই উপেক্ষিত।

অধ্যায় ২১: সমকালীন উন্নয়ন ও ২০২৪-২০২৫ সালের পরিবর্তন

২১.১ অন্তর্বর্তী সরকার এবং আইনি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি

২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। এই সরকার আইনি সংস্কারের বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

কিন্তু লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইন সংস্কারের বিষয়টি অন্তর্বর্তী সরকারের এজেন্ডায় এখনো স্পষ্টভাবে নেই। ২০২৫ সালের মার্চে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে পুরুষকে ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ, কিন্তু এটি সামগ্রিক সংস্কারের শুরু মাত্র।

২১.২ কোটা আন্দোলন এবং লিঙ্গ-পক্ষপাতের প্রশ্ন

২০২৪ সালের কোটা আন্দোলন বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই আন্দোলনে ছাত্ররা সরকারি চাকরিতে নারীর জন্য ৩০% কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। কোটাটি শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই ঘটনাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে: ইতিবাচক বৈষম্য কতটুকু পর্যন্ত ন্যায়সঙ্গত? সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদ নারীর জন্য বিশেষ বিধানের অনুমতি দেয়, কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে এই বিধান ন্যায়সঙ্গত এবং কখন এটি অপব্যবহার হয়, সেই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।

২১.৩ ২০২৫ সালের বৈশ্বিক জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট এবং বাংলাদেশ

২০২৫ সালের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্টে বাংলাদেশ ১৪৮টি দেশের মধ্যে ২৪তম স্থানে রয়েছে। এই রিপোর্টে বাংলাদেশ রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশেষভাবে উচ্চ স্থানে রয়েছে।

কিন্তু এই রিপোর্টের পদ্ধতিটি একটু ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়: এই রিপোর্ট মূলত নারীর অবস্থান পুরুষের তুলনায় পরিমাপ করে, অর্থাৎ এটি দেখায় যে পুরুষের তুলনায় নারীর অবস্থা কেমন। কিন্তু এটি বলে না যে আইনি ব্যবস্থা কতটা ন্যায়সঙ্গত বা উভয় লিঙ্গই কতটা সুরক্ষিত।

২১.৪ সামাজিক মিডিয়া এবং পুরুষ অধিকার সচেতনতা

২০২৩-২০২৫ সালে বাংলাদেশের সামাজিক মিডিয়ায় পুরুষ অধিকারের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজ এবং ব্লগ পুরুষের আইনি সমস্যাগুলো তুলে ধরছে।

এই সচেতনতা বৃদ্ধির একটি ইতিবাচক প্রভাব হলো যে মিথ্যা মামলার বিষয়টি এখন সামাজিক আলোচনায় আসছে। কিন্তু এই আলোচনাটি এখনো নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

অধ্যায় ২২: দার্শনিক সমাপ্তি এবং প্রথম খণ্ডের উপসংহার

২২.১ ন্যায়বিচারের দর্শন: একটি সংশ্লেষণ

এই প্রথম খণ্ডে আমরা বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থায় মিসান্ড্রিক কাঠামোর বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেছি। এখন এই বিশ্লেষণটিকে একটি দার্শনিক সংশ্লেষণে নিয়ে আসা যাক।

ন্যায়বিচারের তিনটি প্রাথমিক ধারণা রয়েছে: বিতরণমূলক ন্যায়বিচার, পদ্ধতিগত ন্যায়বিচার এবং প্রতিষ্ঠানিক ন্যায়বিচার।

বিতরণমূলক ন্যায়বিচার মানে হলো সামাজিক সুবিধা ও বোঝা ন্যায়সঙ্গতভাবে বিতরণ হওয়া। পদ্ধতিগত ন্যায়বিচার মানে হলো ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হওয়া। প্রতিষ্ঠানিক ন্যায়বিচার মানে হলো বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলো লিঙ্গ, শ্রেণী বা অন্যান্য পরিচয় নির্বিশেষে সকলের সাথে সমান আচরণ করা।

বাংলাদেশের বর্তমান আইনি ব্যবস্থা তিনটি ধারণাতেই ব্যর্থ। বিতরণমূলক ন্যায়বিচারের দিক থেকে, আইনি সুবিধা এবং সুরক্ষা লিঙ্গের ভিত্তিতে অসমানভাবে বিতরণ হয়। পদ্ধতিগত ন্যায়বিচারের দিক থেকে, মামলার

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

প্রক্রিয়া পুরুষ আসামির জন্য অনেক ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ নয়। প্রতিষ্ঠানিক ন্যায়বিচারের দিক থেকে, পুলিশ, আদালত এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই পুরুষকে ভিন্নভাবে এবং অনেক সময় অন্যায়ভাবে বিচার করে।

২২.২ আইনের নৈতিকতা: একটি মৌলিক প্রশ্ন

লন ফুলার তাঁর "The Morality of Law" গ্রন্থে আইনের আটটি অভ্যন্তরীণ নৈতিক দাবির কথা বলেছেন। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলো হলো: আইন সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, অর্থাৎ এক জায়গায় একরকম এবং অন্য জায়গায় অন্যরকম হবে না। আইন স্পষ্ট হতে হবে। আইন সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হতে হবে।

বাংলাদেশের অনেক আইন ফুলারের এই নৈতিক দাবিগুলো পূরণ করে না। আইন সামঞ্জস্যহীন: পুরুষের জন্য এক নিয়ম এবং নারীর জন্য অন্য নিয়ম। আইন অস্পষ্ট: "নির্যাতন" এর সংজ্ঞা এত ব্যাপক যে প্রায় যেকোনো আচরণকে এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এবং আইন সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

২২.৩ অমর্ত্য সেনের ন্যায়বিচার তত্ত্ব

অমর্ত্য সেন তাঁর "The Idea of Justice" গ্রন্থে নীতি-ভিত্তিক ন্যায়বিচার এবং ফলাফল-ভিত্তিক ন্যায়বিচারের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সেনের মতে, ন্যায়বিচারের বিচার শুধু নিয়মের ভিত্তিতে নয়, বরং বাস্তব ফলাফলের ভিত্তিতেও করতে হবে।

বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থার বাস্তব ফলাফল কী? হাজার হাজার পুরুষ মিথ্যা মামলায় কারাগারে গেছেন। অনেক পরিবার ধ্বংস হয়েছে। অনেক পুরুষ আত্মহত্যা করেছেন। সন্তানরা পিতার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এই ফলাফলগুলো কি ন্যায়সঙ্গত? সেনের কাঠামোয় নয়।

২২.৪ প্রথম খণ্ডের সমাপনী বার্তা

এই প্রথম খণ্ডে আমরা বাংলাদেশের আইনি মিসান্ড্রির ভিত্তিগত কাঠামো বিশ্লেষণ করেছি। আমরা দেখেছি কীভাবে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তিগুলো মিলে একটি এমন আইনি পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে পুরুষের আইনি অধিকার প্রায়ই উপেক্ষিত।

কিন্তু এই বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য নারীবিরোধিতা নয়। এর উদ্দেশ্য হলো ন্যায়বিচারের সন্ধান। একটি সত্যিকারের ন্যায়সঙ্গত সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ই সমান আইনি সুরক্ষা পাবেন। নারী নির্যাতনকারী শাস্তি পাবেন এবং পুরুষ নির্যাতনকারীও শাস্তি পাবেন। মিথ্যা মামলাকারী শাস্তি পাবেন, লিঙ্গনির্বিশেষে। ন্যায়বিচারের ধারণাটি কোনো এক লিঙ্গের একচেটিয়া সম্পদ নয়।

এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডগুলোতে আমরা এই বিশ্লেষণকে আরও গভীর করব। দ্বিতীয় খণ্ডে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারাভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হবে। তৃতীয় খণ্ডে যৌতুক আইনের অপব্যবহারের নির্দিষ্ট কেস স্টাডি উপস্থাপন করা হবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পরিশিষ্ট ১: প্রাসঙ্গিক আইনের তালিকা

বাংলাদেশের যে আইনগুলো এই গ্রন্থে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বা হবে সেগুলোর তালিকা এই পরিশিষ্টে দেওয়া হলো।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০: এই আইনের ধারা ৩৭৫ ধর্ষণ, ধারা ৪৯৭ ব্যভিচার, ধারা ৩২৩ আঘাত এবং অন্যান্য ধারাগুলো লিঙ্গ-পক্ষপাতের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক।

ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮: গ্রেফতার, জামিন এবং বিচার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিধান।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এবং তার সংশোধনী ২০০৩ এবং ২০২৫।

যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০।

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০।

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১।

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫।

বাংলাদেশ সংবিধান ১৯৭২, বিশেষত ২৭, ২৮, ৩১ ও ৩৩ অনুচ্ছেদ।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩।

সাক্ষ্য আইন ১৮৭২।

পরিশিষ্ট ২: মূল আইনতাত্ত্বিক ধারণার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা

মিসান্ড্রি: পুরুষের প্রতি কাঠামোগত বা ব্যক্তিগত বিরূপ মনোভাব বা বৈষম্য।

প্রেজাম্পশন অব ইনোসেন্স: প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তকে নির্দোষ ধরে নেওয়ার আইনি নীতি।

ডিউ প্রসেস: আইনি প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচারের নীতি।

ইকুয়াল প্রোটেকশন: আইনের সমান সুরক্ষার নীতি, যা সকলের জন্য প্রযোজ্য।

পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন: পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সমতা অর্জনের নীতি।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

জুডিশিয়াল ডিসক্রিশন: আদালতের বিচারিক বিবেচনাধীন ক্ষমতা।

স্টেটাস অফেন্স: এমন অপরাধ যা কেবল নির্দিষ্ট পরিচয়ের (লিঙ্গ, বয়স ইত্যাদি) কারণে গঠিত হয়।

বার্ডেন অব প্রুফ: প্রমাণের বোঝা, অর্থাৎ কে প্রমাণ করার দায়িত্ব বহন করবে।

হেবিয়াস কর্পাস: একটি আইনি অধিকার যা কাউকে বেআইনিভাবে আটক রাখা হলে মুক্তির দাবি করার সুযোগ দেয়।

লোকাস স্ট্যান্ডি: আদালতে মামলা করার আইনি অধিকার।

পরিশিষ্ট ৩: প্রস্তাবিত গবেষণা এজেন্ডা

এই গ্রন্থে উপস্থাপিত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য কিছু প্রশ্ন প্রস্তাব করা হলো।

প্রথমত, বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন আদালতে মামলার ফলাফলের একটি পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কতটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন, কতটিতে খালাস পান এবং কতটি মামলা প্রত্যাহার হয়, সেটির পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয়ত, মিথ্যা মামলার অর্থনৈতিক প্রভাব বিষয়ে একটি গবেষণা: মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কত, কতজন তাদের পেশা হারান এবং কতজনের পরিবার ভেঙে পড়ে।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশে পুরুষ নির্যাতনের প্রকৃত হার জানার জন্য একটি গবেষণা। এই গবেষণায় গোপনীয়তা নিশ্চিত করে পুরুষদের পারিবারিক সহিংসতার অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

চতুর্থত, তুলনামূলক আইনি বিশ্লেষণ: দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পুরুষ অধিকারের আইনি কাঠামো তুলনা করে বাংলাদেশের জন্য সর্বোত্তম মডেল চিহ্নিত করা।

পঞ্চমত, বিচারিক সংস্কৃতি গবেষণা: বাংলাদেশের বিচারকরা নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় কীভাবে সিদ্ধান্ত নেন এবং কোন কারণগুলো তাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, সেই বিষয়ে একটি গবেষণা।

প্রথম খণ্ডের মূল বার্তা

এই প্রথম খণ্ডে আমরা যে ভ্রমণটি করেছি সেটি ছিল বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থার একটি মৌলিক পুনর্মূল্যায়নের সূচনা। আমরা দেখেছি যে পিতৃতন্ত্র এবং মিসান্ড্রি একসাথে বিদ্যমান থাকতে পারে। আমরা দেখেছি যে সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি এবং আইনের বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। আমরা দেখেছি যে

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

রাজনৈতিক স্বার্থ কীভাবে আইনি সংস্কারকে বাধা দেয়। এবং আমরা দেখেছি যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন বাংলাদেশের পুরুষদের সুরক্ষার ভিত্তি হতে পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এই খণ্ড থেকে নেওয়া উচিত তা হলো: ন্যায়বিচার একটি সার্বজনীন মূল্য। এটি নারীর জন্যও প্রযোজ্য এবং পুরুষের জন্যও প্রযোজ্য। যে সমাজে এক লিঙ্গের অধিকার আরেক লিঙ্গের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে প্রকৃত ন্যায়বিচার অনুপস্থিত।

বাংলাদেশকে একটি সত্যিকারের ন্যায়বিচারের সমাজ গড়তে হলে উভয় লিঙ্গের সমতা নিশ্চিত করতে হবে, এবং সেটি শুধু কাগজে কলমে নয়, আইনের ভাষায়, প্রয়োগে এবং সামাজিক সংস্কৃতিতেও।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর প্রতিটি ধারার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করব, এর ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান প্রয়োগ পর্যন্ত। আমরা দেখব কোথায় এই আইন ন্যায়সঙ্গত এবং কোথায় এটি সংস্কারের দাবি রাখে।

পার্ট ২

দ্বিতীয় খণ্ড

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০: ধারাভিত্তিক বিশ্লেষণ, প্রয়োগের সংকট এবং সাংবিধানিক প্রশ্ন

ভূমিকা: দ্বিতীয় খণ্ডের প্রেক্ষাপট

প্রথম খণ্ডে আমরা বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থায় মিসান্ড্রিক কাঠামোর ভিত্তিগত বিশ্লেষণ করেছিলাম। আমরা দেখেছিলাম কীভাবে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তিগুলো মিলে একটি এমন আইনি পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে পুরুষের আইনি অধিকার প্রায়ই উপেক্ষিত। আমরা সংবিধানের সমতার প্রতিশ্রুতি এবং আইনের বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে বিরাট ব্যবধান চিহ্নিত করেছিলাম। আমরা জুরিসপ্রুডেন্টিয়াল দৃষ্টিকোণ থেকে রলস, কান্ট, হার্ট, ফুলার এবং অমর্ত্য সেনের তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের আইনি অবস্থান মূল্যায়ন করেছিলাম।

এই দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর একটি গভীর, ব্যাপক এবং ধারাভিত্তিক বিশ্লেষণে প্রবেশ করব। এই আইনটি বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং একই সাথে সবচেয়ে বিতর্কিত আইনগুলোর মধ্যে একটি। এই আইনের প্রতিটি ধারা, তার ইতিহাস, তার প্রয়োগের পদ্ধতি, তার অপব্যবহারের ধরন এবং তার সাংবিধানিক সামঞ্জস্যতার প্রশ্ন আমাদের বিশ্লেষণের কেন্দ্রে থাকবে।

কিন্তু শুধু ধারাভিত্তিক বিশ্লেষণেই এই খণ্ড সীমাবদ্ধ থাকবে না। আমরা আইনের দর্শন, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকেও এই আইনকে পরীক্ষা করব। এই আইনের ২০২৫ সালের সংশোধনী এবং

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

তার পরবর্তী পরিস্থিতি বিশেষভাবে গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করা হবে। সাম্প্রতিক আদালতের রায়, পণ্ডিতদের মতামত এবং ২০২৬ সাল পর্যন্ত এই আইনের বিবর্তনের চিত্র তুলে ধরা হবে।

এই বিশ্লেষণটি সম্পূর্ণ একাডেমিক এবং আইনতাত্ত্বিক। এর উদ্দেশ্য নারীর সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা নয়, বরং সেই সুরক্ষার আইনি কাঠামোকে আরও ন্যায়সঙ্গত এবং কার্যকর করার জন্য সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা।

অধ্যায় ১: আইনের জন্মবৃত্তান্ত এবং আইনতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত

১.১ প্রাক-ইতিহাস: ১৯৮৩ সালের বিশেষ আইন থেকে ২০০০ সালের আইন পর্যন্ত

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ একটি শূন্য থেকে সৃষ্ট আইন নয়। এই আইনের একটি দীর্ঘ পূর্ববর্তী ইতিহাস রয়েছে এবং সেই ইতিহাসটি বোঝা ছাড়া আইনটির বর্তমান সমস্যাগুলো সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

১৯৭৬ সালে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের সরকার প্রথমবারের মতো নারী নির্যাতনকে একটি বিশেষ শ্রেণির অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে আইনি উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে। কিন্তু সেই সময়ে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন তৈরি হয়নি। মূলত সাধারণ দণ্ডবিধি এবং ঔপনিবেশিক আমলের আইনের উপর নির্ভর করেই নারী নির্যাতনের মামলা পরিচালিত হত।

১৯৮৩ সালে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আইন ১৯৮৩ প্রণয়ন করে। এই আইনটি প্রথমবারের মতো নারী নির্যাতনকে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারে নিয়ে আসে এবং কঠোর সাজার বিধান রাখে। এই আইনে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত সাজার ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু ১৯৮৩ সালের আইনের বেশ কিছু সমস্যা ছিল। আইনের ভাষা অস্পষ্ট ছিল, প্রক্রিয়াগত বিধানগুলো অপ্রতুল ছিল এবং আইনের প্রয়োগে বহুলাংশে অসামঞ্জস্য ছিল। ১৯৯০ এর দশকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর নারী সংগঠনগুলো এই আইনটির সংশোধন বা প্রতিস্থাপনের দাবি জানাতে থাকে।

১৯৯৫ সালে আরেকটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয়: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ বিধান আইন ১৯৯৫। এই আইনে কিছু উন্নতি করা হলেও মূল কাঠামোগত সমস্যাগুলো থেকে গেল। এই আইনে শাস্তির কাঠামো এত কঠোর ছিল যে আদালতগুলো প্রায়ই অপর্যাপ্ত সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে আসামিকে খালাস দিতে বাধ্য হত, কারণ মধ্যবর্তী কোনো শাস্তির বিধান ছিল না। এই আইনের অধীনে দোষী সাব্যস্তির হার অত্যন্ত কম ছিল এবং এটি আইনের কার্যকারিতার প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল।

এই সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে ২০০০ সালের জানুয়ারিতে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ সংসদে পাস করে। এই আইনটি পূর্ববর্তী আইনগুলোকে রদ করে এবং একটি ব্যাপক নতুন কাঠামো প্রবর্তন করে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

আইনি ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ক্রমবিকাশটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। প্রতিটি নতুন আইন তৈরি হয়েছে কোনো না কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক সংকটের প্রতিক্রিয়ায়। ১৯৮৩ সালের আইন তৈরি হয়েছে সামরিক সরকারের একটি রাজনৈতিক বৈধতার দাবির প্রেক্ষাপটে। ১৯৯৫ সালের আইন তৈরি হয়েছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর নারী সংগঠনগুলোর চাপের প্রেক্ষাপটে। ২০০০ সালের আইন তৈরি হয়েছে ১৯৯৫ সালের আইনের অকার্যকারিতার অভিযোগের প্রেক্ষাপটে।

এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হলো যে প্রতিটি আইনই হয়েছে দ্রুততার সাথে, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ছাড়া এবং আইনের সমগ্র প্রভাব বিবেচনা না করেই। ক্রিটিক্যাল লিগ্যাল স্টাডিজের পণ্ডিত ডানকান কেনেডি এই ধরনের আইন প্রণয়নকে "কনজাংচারাল লেজিসলেশন" বলেছেন, অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় তৈরি আইন যা দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

১.২ ২০০০ সালের আইনের মূল উদ্দেশ্য এবং ঘোষিত নীতি

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর প্রস্তাবনায় আইনের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আইনটি মূলত পাঁচটি লক্ষ্য পূরণের জন্য তৈরি: প্রথমত, নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ করা এবং শাস্তির বিধান করা; দ্বিতীয়ত, বিচারের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা; তৃতীয়ত, অভিযুক্তকে দ্রুত শাস্তির মুখোমুখি করার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়াগত বিধান রাখা; চতুর্থত, ভিকটিমের পরিচয় সুরক্ষিত রাখা; এবং পঞ্চমত, বিদেশে নারী ও শিশু পাচার রোধ করা।

এই লক্ষ্যগুলো নিঃসন্দেহে ন্যায়সঙ্গত এবং প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের সমস্যা সত্যিকারের এবং গুরুতর। এই আইন না থাকলে বহু অপরাধী শাস্তি পেত না। এই বাস্তবতাটি স্বীকার করেই আমাদের বিশ্লেষণ এগোতে হবে।

কিন্তু একটি আইনের ঘোষিত উদ্দেশ্য এবং সেই আইনের বাস্তব প্রভাব সবসময় একই হয় না। আইনতাত্ত্বিক পরিভাষায় এই পার্থক্যটিকে "আইনের উদ্দেশ্য বনাম আইনের ফলাফল" বলা হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ক্ষেত্রে এই ব্যবধানটি অত্যন্ত বড়। আইনের ঘোষিত উদ্দেশ্য নারী ও শিশুর সুরক্ষা, কিন্তু এর বাস্তব ফলাফলের মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার মিথ্যা মামলা, বিচারহীন কারাবাস, পারিবারিক ব্যবহার হাতিয়ার হিসেবে আইনের অপব্যবহার এবং পুরুষের সাংবিধানিক অধিকারের ক্ষুণ্নতা।

১.৩ আইনের সামগ্রিক কাঠামো: একটি পরিচিতি

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ মোট ৩২টি ধারায় বিভক্ত। আইনটিতে মূলত তিনটি অংশ রয়েছে: সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা (ধারা ১-৩), অপরাধ ও শাস্তির বিধান (ধারা ৪-১৮) এবং বিচারিক প্রক্রিয়াগত বিধান (ধারা ১৯-৩২)।

আইনটিতে যে অপরাধগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো হলো: অ্যাসিড নিক্ষেপ ও অ্যাসিড দ্বারা মৃত্যু (ধারা ৪), অ্যাসিড দ্বারা আহত (ধারা ৫), ধর্ষণ ও ধর্ষণজনিত মৃত্যু (ধারা ৯), যৌন নিপীড়ন (ধারা ১০), যৌতুকজনিত মৃত্যু ও ক্ষতি (ধারা ১১), অপহরণ ও পাচার (ধারা ১২-১৩), মানব পাচার (ধারা ১৩ক-১৩গ), শিশু বিবাহ (ধারা ১৪), ভিকটিমের পরিচয় প্রকাশ (ধারা ১৪ক), এবং মিথ্যা মামলার শাস্তি (ধারা ১৭)।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই আইনের অধীনে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় একটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল থাকার কথা এবং এই ট্রাইব্যুনালের বিচারক হবেন জেলা ও দায়রা জজের পদমর্যাদার একজন বিচারক।

আইনটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে: প্রায় সকল অপরাধ জামিন অযোগ্য, বিচারের সময়সীমা নির্ধারিত (মূল আইনে ১৮০ দিন, ২০২৫ সংশোধনীতে ৯০ দিন), এবং অপরাধীকে কঠোর সাজার মুখোমুখি করার বিধান।

আইনটির এই কাঠামো বিশ্লেষণ করলে একটি মূলগত প্রশ্ন ওঠে: আইনটি কি একটি সংজ্ঞাগত কাঠামোর মধ্যে সুষমভাবে গঠিত, নাকি এটি দ্রুততার সাথে তৈরি একটি প্রতিক্রিয়াশীল কাঠামো যার মধ্যে বহু অসামঞ্জস্য বিদ্যমান? এই প্রশ্নের উত্তর পরের অধ্যায়গুলোতে অনুসন্ধান করা হবে।

অধ্যায় ২: ধারা ২: সংজ্ঞার রাজনীতি এবং ব্যাখ্যার সমস্যা

২.১ সংজ্ঞার গুরুত্ব এবং আইনতাত্ত্বিক ভিত্তি

আইনের ভাষায় সংজ্ঞা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হার্বার্ট হার্ট তাঁর "The Concept of Law" গ্রন্থে বলেছেন যে আইনের ভাষার একটি "open texture" বা উন্মুক্ত গঠন রয়েছে, অর্থাৎ আইনের শব্দগুলোর একটি নিশ্চিত কেন্দ্রীয় অর্থ আছে এবং একটি অনিশ্চিত পরিধি আছে। এই অনিশ্চিত পরিধিটিতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ২ এ যে সংজ্ঞাগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই সংজ্ঞাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই হার্টের "open texture" ধারণার চরম উদাহরণ। সংজ্ঞাগুলো এতটাই ব্যাপক যে প্রায় যেকোনো আচরণকে অপরাধের আওতায় আনা সম্ভব।

২.২ "নির্যাতন" এর সংজ্ঞা এবং তার ব্যাপকতার সমস্যা

আইনের ধারা ২(ড) তে "নির্যাতন" শব্দটির একটি ব্যাপক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই সংজ্ঞায় শারীরিক সহিংসতা থেকে শুরু করে মানসিক নিপীড়ন পর্যন্ত বিস্তৃত আচরণ অন্তর্ভুক্ত।

এই ব্যাপক সংজ্ঞার একটি ইতিবাচক দিক হলো যে এটি নির্যাতনের বিভিন্ন রূপকে স্বীকৃতি দেয়। নারী নির্যাতন শুধু শারীরিক নয়, মানসিক, অর্থনৈতিক এবং যৌন নির্যাতনও অন্তর্ভুক্ত। এই বাস্তবতাকে আইনে স্বীকৃতি দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এই ব্যাপকতার একটি নেতিবাচক দিকও আছে। যখন সংজ্ঞা এত ব্যাপক হয় যে প্রায় যেকোনো দাম্পত্য বিরোধকে "নির্যাতন" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, তখন আইনটি অপব্যবহারের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে। একজন আইনজীবী যদি কোনো পারিবারিক বিরোধকে এই আইনের অধীনে নিয়ে আসতে চান, তাহলে তিনি এই ব্যাপক সংজ্ঞাকে ব্যবহার করে তা করতে পারবেন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

লন ফুলার তাঁর "The Morality of Law" গ্রন্থে বলেছেন যে আইনের একটি অভ্যন্তরীণ নৈতিক দাবি হলো স্পষ্টতা। অস্পষ্ট আইন মানুষকে সঠিক আচরণ সম্পর্কে গাইড করতে পারে না এবং তাই এটি প্রকৃত আইনের মর্যাদা পায় না। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের "নির্যাতন" এর সংজ্ঞাটি ফুলারের এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়।

২.৩ "শিশু" এর সংজ্ঞা এবং বয়সের জটিলতা

আইনের ধারা ২(ড) তে "শিশু" বলতে ষোলো বছরের কম বয়সী কোনো ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ২০০৩ সালের সংশোধনীতে এই বয়স কিছু বিধানের ক্ষেত্রে আঠারো বছর করা হয়েছে, আবার কিছু বিধানে ষোলো বছর বহাল রয়েছে।

এই দ্বৈততা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যার সমস্যা তৈরি করে। একটি ষোলো বছর বয়সী ব্যক্তি কি শিশু? শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী আঠারো বছর পর্যন্ত শিশু হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলাদেশের শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী আঠারো বছরের কম বয়সীরা শিশু। এই আইনগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা আদালতে ব্যাখ্যার সমস্যা তৈরি করে।

বয়সের এই জটিলতার একটি বাস্তব পরিণতি হলো যে একই অপরাধের ক্ষেত্রে ভিন্ন বয়সীদের জন্য ভিন্ন আইন প্রযোজ্য হতে পারে, যা আইনের সামঞ্জস্যতার নীতির বিরোধী।

২.৪ পুরুষের অনুপস্থিতি: সংজ্ঞার কাঠামোগত পক্ষপাত

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর সংজ্ঞার ধারায় একটি মৌলিক কাঠামোগত পক্ষপাত রয়েছে: এই আইনের সংজ্ঞাগুলো মূলত নারীকে ভিকটিম এবং পুরুষকে অপরাধী হিসেবে নির্মাণ করে। আইনের মূল ভাষায় "ব্যক্তি" বা "যে কেউ" এর পরিবর্তে "নারী" ও "পুরুষ" এভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে পুরুষই সবসময় অপরাধী এবং নারীই সবসময় ভিকটিম।

এই ভাষাগত নির্মাণটি শুধু প্রতীকী নয়, এর বাস্তব আইনি পরিণতি রয়েছে। যখন আইনের ভাষায় পুরুষকে "ধর্ষণকারী" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং নারীকে "ধর্ষিতা" হিসেবে, তখন একজন পুরুষ যদি যৌন নির্যাতনের শিকার হন, তাহলে এই আইনে তার জন্য কোনো আইনি স্থান নেই।

২০২৫ সালের মার্চ মাসে যে সংশোধনী আনা হয়েছে, সেখানে "পুরুষ" এর পরিবর্তে "ব্যক্তি" শব্দ ব্যবহার করে কিছু বিধানকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই সংশোধনীটি আইনের মূল কাঠামোগত পক্ষপাতকে বদলায়নি, কারণ আইনের সামগ্রিক কাঠামো এখনো নারীকে ভিকটিম এবং পুরুষকে অপরাধী হিসেবে ধরে নেওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।

অধ্যায় ৩: ধারা ৯: ধর্ষণ, যৌন সহিংসতা এবং আইনের বিবর্তন

৩.১ ধর্ষণের আইনি সংজ্ঞা: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ধারা ৯ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারা এবং সম্ভবত সবচেয়ে বেশি বিতর্কিতও। এই ধারায় ধর্ষণ এবং ধর্ষণজনিত মৃত্যুর সংজ্ঞা এবং শাস্তির বিধান রয়েছে।

মূল আইনের ধারা ৯(১) এ ধর্ষণ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল এভাবে: "যদি কোনো পুরুষ কোনো নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতীত বা ভয় দেখাইয়া বা প্রতারণামূলকভাবে সম্মতি আদায় করিয়া যৌনসঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।"

এই সংজ্ঞায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, অপরাধকারীকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। দ্বিতীয়ত, ভিকটিমকে অবশ্যই নারী হতে হবে। তৃতীয়ত, সম্মতির অভাব অথবা ভয় বা প্রতারণার মাধ্যমে সম্মতি আদায় করা অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয়।

এই সংজ্ঞার কাঠামো দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ৩৭৫ এর উত্তরাধিকারী। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত সেই সংজ্ঞাটি এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে চলে আসছে এবং বাংলাদেশে ২০২৫ সাল পর্যন্ত মূলত অপরিবর্তিত ছিল।

এই সংজ্ঞার ঐতিহাসিক মূলটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের আইনপ্রণেতারা যখন এই সংজ্ঞাটি তৈরি করেছিলেন, তখন তারা ভিক্টোরিয়ান যুগের সামাজিক ধারণায় প্রভাবিত ছিলেন। সেই যুগে ধর্ষণের ধারণাটি মূলত একজন পুরুষ কর্তৃক একজন নারীর "সম্মান হরণ" হিসেবে বোঝা হত। পুরুষের যৌন নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়ার ধারণাটি সেই যুগের আইনতাত্ত্বিক চিন্তায় প্রায় অনুপস্থিত ছিল।

১৫০ বছর পরে, আইন বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে। যৌন সহিংসতার প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়া অনেক গভীর হয়েছে। আমরা জানি যে যৌন সহিংসতা একটি ক্ষমতার অপব্যবহার, লিঙ্গের প্রশ্ন নয়। একজন নারীও একজন পুরুষকে যৌনভাবে নির্যাতন করতে পারেন, একজন পুরুষ অন্য পুরুষকে এবং একজন নারী অন্য নারীকে। কিন্তু বাংলাদেশের আইন ২০২৫ সালের আগে এই বাস্তবতাকে স্বীকার করেনি।

৩.২ ২০২৫ সালের সংশোধনী: একটি বিস্তারিত মূল্যায়ন

২০২৫ সালের মার্চ মাসে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়। এই সংশোধনীর মূল পরিবর্তনগুলো ছিল:

প্রথমত, ধর্ষণের সংজ্ঞায় "পুরুষ" এর পরিবর্তে "ব্যক্তি" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে যেকোনো লিঙ্গের ব্যক্তি ধর্ষণের অপরাধী হতে পারেন এবং যেকোনো লিঙ্গের ব্যক্তি ভিকটিম হতে পারেন বলে ঘোষিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, "বালাতকার" নামে একটি নতুন ধারণা যুক্ত করা হয়েছে, যা ষোলো বছরের কম বয়সী ছেলে শিশুদের উপর যৌন নিপীড়নকে ধর্ষণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। তৃতীয়ত, বিচারের সময়সীমা ১৮০ দিন থেকে ৯০ দিনে কমানো হয়েছে। চতুর্থত, মিথ্যা বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌনসঙ্গম করলে তা ধর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে নতুন বিধান যুক্ত করা হয়েছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই সংশোধনীটির ইতিবাচক দিকগুলো সুস্পষ্ট। পুরুষকে ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এটি স্বীকার করে যে যৌন সহিংসতা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ এবং যেকোনো লিঙ্গের ব্যক্তি এর শিকার হতে পারেন।

কিন্তু এই সংশোধনীর কিছু গুরুতর সমস্যা রয়েছে যা সমালোচকরা তুলে ধরেছেন।

প্রথম সমস্যাটি হলো "বালাতকার" ধারণার সীমাবদ্ধতা। এই ধারায় শুধু ষোলো বছরের কম বয়সী ছেলে শিশুদের সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ষোলো বছরের বেশি বয়সী পুরুষ যদি যৌন নির্যাতনের শিকার হন, তাহলে "ধর্ষণ" এর আইনি কাঠামো তার জন্য কীভাবে কাজ করবে তা এখনো অস্পষ্ট। কারণ আইনের মূল কাঠামোতে ধর্ষণের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াগত বিধান নেই।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো "মিথ্যা বিবাহের প্রতিশ্রুতি" ধারাটির অপব্যবহারের সম্ভাবনা। এই ধারায় বলা হয়েছে যে যদি কেউ বিবাহের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌনসঙ্গম করেন, তাহলে তা ধর্ষণ হিসেবে গণ্য হবে। এই ধারার লক্ষ্য ভালো: যারা বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নারীকে প্রতারণা করে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করা।

কিন্তু এই ধারাটি অত্যন্ত সহজে অপব্যবহারযোগ্য। একটি সম্পর্ক যদি শেষে বিবাহে পরিণত না হয়, তাহলে ওই নারী দাবি করতে পারেন যে পুরুষ তাকে বিবাহের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা করেছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রমাণের বোঝা কে বহন করবেন? পুরুষকে কি প্রমাণ করতে হবে যে তিনি বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেননি, নাকি নারীকে প্রমাণ করতে হবে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল?

আইনগত বিশেষজ্ঞরা এই ধারাটিকে নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। একটি প্রেমের সম্পর্ক যেখানে উভয় পক্ষ স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেছেন, সেটি যদি শেষ পর্যন্ত বিবাহে পরিণত না হয়, তাহলে কি সেটি ধর্ষণ? এই প্রশ্নটির উত্তর আইনি ও নৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই অত্যন্ত জটিল। যদি এই ধারাটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এটি প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে স্বেচ্ছামূলক যৌন সম্পর্কের ধারণাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে।

তৃতীয় সমস্যাটি হলো মৃত্যুদণ্ডের বিধান। ২০২৫ সালের সংশোধনীতে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড অব্যাহত রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন যে মৃত্যুদণ্ড ধর্ষণ প্রতিরোধে কোনো প্রমাণিত প্রভাব রাখে না। বরং এটি একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে: ধর্ষণের পর ধর্ষণকারী মৃত্যুদণ্ড এড়াতে ভিকটিমকে হত্যা করতে পারে। এছাড়া মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে বিচারকরা মামলায় দোষী সাব্যস্ত করতে দ্বিধান্বিত হতে পারেন, যা দোষী সাব্যস্তির হার আরও কমিয়ে দেয়।

৩.৩ সম্মতির সংজ্ঞা এবং প্রমাণের বোঝার প্রশ্ন

ধর্ষণের মামলায় সবচেয়ে জটিল প্রশ্নটি হলো সম্মতির প্রশ্ন। বাংলাদেশের আইনে "সম্মতি" এর একটি স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই। ২০২৫ সালের সংশোধনীতে সম্মতির কিছু দিক স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু এখনো বহু প্রশ্ন অনুত্তরিত।

সম্মতির প্রশ্নে আন্তর্জাতিক আইনি বিতর্কে দুটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। প্রথমটি হলো "affirmative consent" বা ইতিবাচক সম্মতির মডেল, যেখানে সম্মতিকে সক্রিয়ভাবে প্রকাশ করতে হবে এবং নীরবতাকে সম্মতি হিসেবে

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ধরা যাবে না। দ্বিতীয়টি হলো সনাতন মডেল, যেখানে প্রতিরোধের অভাবকে সম্মতির প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশের বর্তমান আইন মূলত সনাতন মডেলের কাছাকাছি। এই মডেলের সমস্যা হলো যে এটি সেই পরিস্থিতিগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না যেখানে কেউ ভয়ের কারণে বা ক্ষমতার অসামঞ্জস্যের কারণে প্রতিরোধ করতে পারেন না।

এই প্রশ্নটির আরেকটি দিক হলো প্রমাণের বোঝা। ধর্ষণের মামলায় কে প্রমাণ করবেন? আসামি কি প্রমাণ করবেন যে সম্মতি ছিল, নাকি বাদী প্রমাণ করবেন যে সম্মতি ছিল না? নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে ভিকটিমের একক সাক্ষ্যকে যথেষ্ট বলে বিবেচনা করার বিধান ধর্ষণের মামলায় এই প্রমাণের বোঝাকে কার্যত আসামির দিকে স্থানান্তরিত করে।

"Presumption of innocence" এর মূলনীতি অনুযায়ী বিচারের পূর্বে আসামিকে নির্দোষ ধরতে হবে এবং তার অপরাধ প্রমাণের দায়িত্ব রাষ্ট্রপক্ষের। কিন্তু যখন ভিকটিমের একক সাক্ষ্যকেই পর্যাপ্ত প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তখন কার্যত এই নীতিটি উল্টে যায়: আসামিকে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে হয়।

আইনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। একদিকে সত্যিকারের ধর্ষণের মামলায় সাক্ষ্য পাওয়া কঠিন এবং ভিকটিমের সাক্ষ্যকে যদি যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়া হয়, তাহলে ধর্ষণকারীরা শাস্তি পাবে না। অন্যদিকে যদি শুধু সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে মিথ্যা মামলায় নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পাবেন। এই দ্বিধাটির একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধান খোঁজা আইনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি।

৩.৪ বৈবাহিক ধর্ষণের প্রশ্ন: একটি জটিল বিতর্ক

বাংলাদেশে বৈবাহিক ধর্ষণ আইনে স্বীকৃত নয়। দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৫ এর একটি ব্যতিক্রম বলে যে স্বীয় স্ত্রীর সাথে যৌনসঙ্গম যদি স্ত্রীর বয়স তেরো বছরের বেশি হয় তাহলে ধর্ষণ নয়।

এই বিধানটি নারীর শারীরিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সাথে সাংঘর্ষিক। বিবাহ যৌন সম্পর্কের জন্য একটি চিরস্থায়ী সম্মতি নয় এবং বিবাহের মধ্যেও প্রতিটি যৌন সম্পর্কের জন্য সম্মতি প্রয়োজন, এই ধারণাটি বাংলাদেশের আইনে এখনো স্বীকৃত নয়।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ২০১৭ সালে "Independent Thought v. Union of India" মামলায় ১৮ বছরের কম বয়সী বিবাহিত নারীর সাথে যৌনসঙ্গমকে ধর্ষণ হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ক্ষেত্রে বৈবাহিক ধর্ষণের প্রশ্নটি ভারতেও এখনো মীমাংসিত নয়।

বাংলাদেশে বৈবাহিক ধর্ষণকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন, কারণ বিবাহের মধ্যেও নারীর শারীরিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু এই স্বীকৃতি দেওয়ার সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে: যদি স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর অভিযোগকে বৈবাহিক ধর্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে বিপরীতভাবে স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীর অভিযোগকেও একইভাবে বিবেচনা করতে হবে। এই সামঞ্জস্যটি নিশ্চিত না করলে বৈবাহিক ধর্ষণের আইন আবারও একটি লিঙ্গ-পক্ষপাতী হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ৪: ধারা ১০: যৌন নিপীড়ন এবং তার প্রয়োগের সমস্যা

৪.১ যৌন নিপীড়নের সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যার চ্যালেঞ্জ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ১০ এ যৌন নিপীড়নের বিধান রয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে যদি কোনো ব্যক্তি অবৈধভাবে কোনো নারী বা শিশুকে যৌন উদ্দেশ্যে স্পর্শ করেন বা যৌনভাবে নিপীড়ন করেন, তাহলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন।

এই ধারাটির সংজ্ঞাগত সমস্যাগুলো ধারা ৯ এর সমস্যার মতোই। "অবৈধভাবে" এবং "যৌন উদ্দেশ্যে" এই শব্দগুলোর ব্যাখ্যা কে করবেন? আদালতের ব্যাখ্যার বিবেচনাধীন ক্ষমতা এখানে অত্যন্ত বড়।

বাস্তবে দেখা যায় যে এই ধারাটি অনেক সময় এমন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হয় যেখানে প্রকৃত যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটেনি। উদাহরণস্বরূপ, দুটি পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি বিরোধে একটি পরিবার অন্যটির বিরুদ্ধে এই ধারায় মামলা করতে পারে। পুলিশ তখন সেই মামলা নেয় এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়।

এই ধারায় মামলার একটি বিশেষ দিক হলো যে এটি জামিন অযোগ্য। তাই শুধু অভিযোগ দায়েরের পর আসামি জামিন পাচ্ছেন না এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য কারাগারে থাকছেন, যখন মামলাটির তদন্তও সঠিকভাবে হয়নি।

৪.২ যৌন হয়রানির আইনি সংজ্ঞা এবং পুরুষ ভিকটিমের অদৃশ্যতা

বাংলাদেশে যৌন হয়রানির একটি সুনির্দিষ্ট আইনি সংজ্ঞা নেই। ২০০৯ সালে হাইকোর্টের নির্দেশিকায় যৌন হয়রানিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল, কিন্তু এটি কোনো আইনি বিধান নয়, বরং বিচারিক নির্দেশনা।

হাইকোর্টের ২০০৯ সালের নির্দেশিকায় যৌন হয়রানিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে শুধুমাত্র নারীর প্রতি ঘটা ঘটনা হিসেবে। এই সংজ্ঞায় পুরুষের যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

কর্মক্ষেত্রে পুরুষের যৌন হয়রানির বিষয়টি বাস্তবে ঘটে, কিন্তু এই ঘটনাগুলো প্রায় কখনো রিপোর্ট করা হয় না। সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে, "পুরুষ তো যৌন হয়রানির শিকার হতে পারে না" এই সামাজিক মিথের কারণে, এবং আইনি সুরক্ষার অভাবে, পুরুষরা যৌন হয়রানির অভিযোগ করেন না।

ইউরোপীয় দেশগুলোতে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি আইনগুলো লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। যুক্তরাজ্যের Equality Act 2010 যৌন হয়রানিকে সকল কর্মীর জন্য প্রযোজ্য বলে সংজ্ঞায়িত করেছে, লিঙ্গনির্বিশেষে। বাংলাদেশে এই ধরনের লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সংজ্ঞা এখনো নেই।

অধ্যায় ৫: ধারা ১১: যৌতুক এবং আইনের অপব্যবহারের রাজনৈতিক অর্থনীতি

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৫.১ যৌতুক: সামাজিক বাস্তবতা এবং আইনি প্রতিক্রিয়া

যৌতুক বাংলাদেশে একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা। যৌতুকের কারণে প্রতিবছর বহু নারী হত্যার শিকার হন বা আত্মহত্যায় বাধ্য হন। যৌতুকের দাবিতে শারীরিক নির্যাতন বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং শহরাঞ্চলীয় উভয় পরিবেশেই বিদ্যমান। এই সামাজিক সমস্যাটি বাস্তব এবং গুরুতর।

এই সমস্যার প্রতিক্রিয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ১১ এ যৌতুকজনিত মৃত্যু এবং ক্ষতির জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এই ধারায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড এবং আহত হওয়ার ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান রয়েছে।

কিন্তু এই ধারাটির প্রয়োগে একটি মৌলিক সমস্যা রয়েছে: এই ধারায় "যৌতুকের দাবিতে" বাক্যাংশটি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। বাদী যদি দাবি করেন যে তার স্বামী বা শ্বশুরপক্ষ তাকে অতিরিক্ত অর্থ বা সম্পদ দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন, তাহলে সেটিকে "যৌতুকের দাবি" হিসেবে দেখানো সম্ভব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই দাবিটি সত্যিকারের যৌতুক সম্পর্কিত নয়, বরং পারিবারিক সম্পদ বিরোধ বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার বিষয়।

৫.২ ধারা ১১ এর অপব্যবহারের কাঠামো: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ধারা ১১ এর অপব্যবহারের একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো রয়েছে যা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়:

প্রথম ধাপে পারিবারিক বিরোধ শুরু হয়। এই বিরোধ সম্পত্তি, সন্তানের হেফাজত, দেনমোহর বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়ে হতে পারে।

দ্বিতীয় ধাপে নারী পক্ষ একজন আইনজীবীর পরামর্শ নেন। অনেক আইনজীবী এই পর্যায়ে ধারা ১১ এর অধীনে মামলা করার পরামর্শ দেন, কারণ এই ধারায় মামলা করলে আসামির জামিন হয় না এবং তাই সে দ্রুত আপস করতে আগ্রহী হবে।

তৃতীয় ধাপে পুলিশ মামলা নেয় এবং তদন্তে আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে, কারণ পুলিশের জন্য সামাজিক এবং রাজনৈতিক চাপ থাকে।

চতুর্থ ধাপে আসামি গ্রেফতার হন এবং জামিন না পেয়ে কারাগারে থাকেন।

পঞ্চম ধাপে আসামি পক্ষ আপসের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন, কারণ কারাগারে থাকা তাদের পেশা এবং পরিবার উভয়কেই ধ্বংস করে দিচ্ছে।

ষষ্ঠ ধাপে আপস হয়: বাদীর দাবি পূরণ করার বিনিময়ে মামলা প্রত্যাহার করা হয়।

এই কাঠামোটি কার্যত আইনকে একটি সুপরিকল্পিত চাপ দেওয়ার হাতিয়ারে পরিণত করেছে। আইন প্রণেতারা যখন এই আইন তৈরি করেছিলেন, তখন তারা এই কাঠামোটি কল্পনা করেননি, কিন্তু বাস্তবে এটিই ঘটছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট মার্টনের "latent function" বা অপ্রত্যক্ষ কার্যকারিতার ধারণাটি এখানে প্রাসঙ্গিক। মার্টনের তত্ত্বে প্রতিটি সামাজিক কাঠামোর একটি "manifest function" বা প্রত্যক্ষ কার্যকারিতা থাকে যা ঘোষিত উদ্দেশ্য পূরণ করে, এবং একটি "latent function" বা অপ্রত্যক্ষ কার্যকারিতা থাকে যা অঘোষিত কিন্তু বাস্তব। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের প্রত্যক্ষ কার্যকারিতা হলো নারী নির্যাতন রোধ করা, কিন্তু তার অপ্রত্যক্ষ কার্যকারিতা হলো পারিবারিক বিরোধে একটি শক্তিশালী দর কষাকষির হাতিয়ার সরবরাহ করা।

৫.৩ যৌতুক আইন এবং দেনমোহরের পারস্পরিক সম্পর্ক: একটি আইনতাত্ত্বিক বিরোধাভাস

বাংলাদেশে যৌতুক আইন এবং দেনমোহরের আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যে একটি গভীর বিরোধাভাস রয়েছে। এটি বোঝার জন্য উভয় বিষয়টি পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।

যৌতুক হলো কনের পরিবার থেকে বরের পরিবারকে দেওয়া সম্পদ। এই প্রথাটি মূলত হিন্দু সামাজিক ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত, কিন্তু বাংলাদেশে এটি মুসলিম সমাজেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। যৌতুক আইনিভাবে নিষিদ্ধ, কিন্তু সামাজিকভাবে এটি এখনো বিদ্যমান।

দেনমোহর বা মহর হলো মুসলিম বিবাহ আইনে স্বামীর দেওয়া একটি বাধ্যতামূলক আর্থিক উপহার। ইসলামী আইনে দেনমোহর স্ত্রীর অধিকার এবং স্বামীর আইনি বাধ্যবাধকতা। দেনমোহর তালাকের পর বা স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে পরিশোধ করতে হয়।

এই দুটি ব্যবস্থার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিরোধাভাস রয়েছে: যৌতুক নিষিদ্ধ কারণ এটি বিবাহে মেয়ের পরিবারকে আর্থিক বোঝা বহন করায়। দেনমোহর বাধ্যতামূলক কারণ এটি বিবাহে স্বামীকে আর্থিক বোঝা বহন করায়। উভয় ক্ষেত্রেই বিবাহে আর্থিক বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান, শুধু কে বহন করছেন তার পার্থক্য।

কিন্তু এই বিরোধাভাসটি আইনে এক অদ্ভুত পরিণতি ঘটায়। স্ত্রীর পরিবার কর্তৃক দেওয়া সম্পদকে "যৌতুক" বলে দাবি করা যায় এবং সেই দাবির ভিত্তিতে স্বামী ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা করা যায়। কিন্তু স্বামীর আইনি বাধ্যবাধকতা দেনমোহরকে কখনো "পারস্পরিক আর্থিক বোঝা" হিসেবে আদালতে তুলে ধরা হয় না।

অর্থাৎ আইনি কাঠামো এমন: যদি স্ত্রীর পরিবার কিছু দেয়, তাহলে সেটি যৌতুক এবং স্বামী অপরাধী। কিন্তু স্বামী যদি দেনমোহর না দেয়, তাহলে স্বামী অবৈধ। উভয় পরিস্থিতিতেই পুরুষ আইনি সংকটে।

এই বিরোধাভাসটি আইনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি "কাঠামোগত পুরুষবিরোধিতার" প্রকাশ: সামাজিক প্রথা এবং আইনি বাধ্যবাধকতা মিলে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে পুরুষ সবসময় আইনি ঝুঁকিতে থাকেন।

৫.৪ আইনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: "Strict Liability" এর প্রয়োগ এবং তার ন্যায়সঙ্গততার প্রশ্ন

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অনেক বিধানে "strict liability" বা কঠোর দায়বদ্ধতার ধারণাটি প্রয়োগ করা হয়েছে। Strict liability মানে হলো অপরাধকারীর মানসিক উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা প্রমাণ না করেই অপরাধ গঠিত হয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ধারা ১১ এর প্রয়োগে অনেক সময় দেখা যায় যে যৌতুকের দাবির প্রমাণ থাকলেই আসামিকে দোষী ধরা হয়, তার উদ্দেশ্য বা পরিস্থিতি বিবেচনা না করে।

আইনতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে strict liability সাধারণত দুটি ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হয়: প্রথমত, যেখানে কর্মটি নিজেই এতটাই বিপজ্জনক যে উদ্দেশ্য বিচার করার প্রয়োজন নেই; দ্বিতীয়ত, যেখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কঠোর মান বজায় রাখা জরুরি।

কিন্তু যৌতুক সংক্রান্ত মামলায় strict liability এর প্রয়োগ সমস্যাজনক। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই পারিবারিক আর্থিক লেনদেন এবং "যৌতুক" এর মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। একটি পারিবারিক উপহার কি যৌতুক? একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে দেওয়া ভোগ্যপণ্য কি যৌতুক? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সবসময় স্পষ্ট নয়।

অধ্যায় ৬: ধারা ১৯: জামিনের বিধান এবং ন্যায়বিচারের সংকট

৬.১ জামিনের অধিকার: একটি মৌলিক মানবাধিকার

বিচারের পূর্বে জামিনের অধিকারটি একটি মৌলিক মানবাধিকার। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১১(১) অনুচ্ছেদ বলে যে প্রত্যেক ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়েছে, তার যতদিন আইনি প্রক্রিয়ায় অপরাধ প্রমাণিত না হয়েছে ততদিন নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তির ৯(৩) অনুচ্ছেদ বলে যে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে বিচারের অপেক্ষায় কারাগারে রাখা ব্যতিক্রম হওয়া উচিত, নিয়ম নয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির কিছু মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়ে সংবিধানের ৩১ এবং ৩২ অনুচ্ছেদ আরও শক্তিশালী গ্যারান্টি দেয়।

৬.২ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে জামিনের বিধান: একটি বিশ্লেষণ

ধারা ১৯ এ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে জামিনের বিধান রয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে এই আইনের অধীনে অপরাধের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল ছাড়া অন্য কোনো আদালত জামিন দিতে পারবে না।

কিন্তু ট্রাইব্যুনালও নিজেই জামিন দিতে সীমাবদ্ধ। আইনের বিভিন্ন ধারায় যে অপরাধগুলো অন্তর্ভুক্ত, সেগুলো "জামিন অযোগ্য" হিসেবে শ্রেণীভুক্ত। এর মানে হলো যে যদি কেউ গ্রেফতার হন, তাহলে তিনি জামিন পাওয়ার অধিকারী নন এবং শুধুমাত্র হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করা যায়।

হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করা একটি ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। একজন সাধারণ মানুষ যিনি মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছেন, তিনি হাইকোর্টে জামিনের জন্য আবেদন করার আর্থিক ও সামাজিক সক্ষমতা নাও রাখতে পারেন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাস্তব পরিণতি কী হয়? একজন দরিদ্র পুরুষ যিনি মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছেন, তিনি মাসের পর মাস, কখনো বছরের পর বছর কারাগারে থাকেন। তার পরিবার তার আয় থেকে বঞ্চিত হয়। তার সন্তানরা স্কুলে যেতে পারে না। তার সামাজিক মর্যাদা ধ্বংস হয়। এবং মামলার শেষে যখন আদালত তাকে নির্দোষ ঘোষণা করেন, তখন এই ক্ষতির কোনো প্রতিকার নেই।

এই পরিস্থিতিটি আমেরিকান আইনি পণ্ডিত উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোনের বিখ্যাত উক্তিটিকে সরাসরি লঙ্ঘন করে: "It is better that ten guilty persons escape than that one innocent suffer" বা "দশজন দোষী ব্যক্তির মুক্তি পাওয়া একজন নির্দোষের কষ্ট ভোগের চেয়ে ভালো।" ব্ল্যাকস্টোনের এই নীতিটি ফৌজদারি আইনের একটি ভিত্তি, কিন্তু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের প্রয়োগে এই নীতিটি কার্যত উপেক্ষিত।

৬.৩ জামিন অযোগ্যতার সাংবিধানিক সমস্যা

জামিন অযোগ্য অপরাধের বিধানটি সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ বলে যে "আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।" এই অনুচ্ছেদটি "deprivation of life and liberty" কে সুরক্ষিত করে।

যখন একজন ব্যক্তিকে বিচারের পূর্বে কারাগারে রাখা হয়, তখন কি তার ব্যক্তি-স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হচ্ছে? আইনি পজিটিভিস্টরা বলবেন না, কারণ আইনই তাকে কারাগারে রাখার বিধান করেছে। কিন্তু প্রাকৃতিক আইনের দার্শনিকরা এবং মানবাধিকার আইনের বিশেষজ্ঞরা বলবেন হ্যাঁ, কারণ বিচারের পূর্বে কারাবাস একটি মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বহু মামলায় বলেছে যে "bail is the rule, jail is the exception" বা "জামিনই নিয়ম, কারাগার ব্যতিক্রম।" বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টও বেশ কিছু মামলায় এই নীতির প্রতি সহমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের প্রসঙ্গে এই নীতিটি কার্যত উল্টে গেছে: এই আইনে কারাগারই নিয়ম এবং জামিন ব্যতিক্রম।

অধ্যায় ৭: ধারা ১৭: মিথ্যা মামলা এবং প্রতিকারের অপ্রতুলতা

৭.১ মিথ্যা মামলার আইনি সংজ্ঞা এবং প্রমাণের চ্যালেঞ্জ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ১৭ মিথ্যা মামলার শাস্তির বিধান করেছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা মামলা করেন, তাহলে তাকে সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া যাবে।

এই ধারাটির অস্তিত্ব থাকলেও ব্যবহারিকভাবে এটি প্রায় অকার্যকর। কারণটি হলো প্রমাণের প্রশ্ন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ধারা ১৭ এর অধীনে মিথ্যা মামলার অভিযোগ প্রমাণ করতে হলে তিনটি বিষয় প্রমাণ করতে হবে: প্রথমত, মামলাটি মিথ্যা ছিল; দ্বিতীয়ত, মামলাকারী জেনেশুনে মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলেন; এবং তৃতীয়ত, মামলাকারীর উদ্দেশ্য ছিল অভিযুক্তকে হয়রানি করা।

এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটি প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। বিশেষত দ্বিতীয়টি: মামলাকারী কি "জেনেশুনে" মিথ্যা বলেছেন? একজন মামলাকারী সবসময় দাবি করতে পারেন যে তিনি যা দেখেছেন বা অনুভব করেছেন তাই বলেছেন, তিনি মিথ্যা বলেননি।

এই প্রমাণের উচ্চ মানদণ্ডটি ব্যবহারিক অর্থে ধারা ১৭ কে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে।

৭.২ ভারতের অভিজ্ঞতা: মিথ্যা মামলা এবং আইনি প্রতিকারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ভারতে একই ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। ভারতের দণ্ডবিধির ৪৯৮ক ধারায় (স্ত্রী নির্যাতন সংক্রান্ত ধারা) মিথ্যা মামলার সমস্যা এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।

"Arnesh Kumar v. State of Bihar" (২০১৪) মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে বলেছে যে ধারা ৪৯৮ক এবং ধারা ৪ (যৌতুক আইন) এর অধীনে গ্রেফতার স্বয়ংক্রিয় হওয়া উচিত নয়। আদালত বলেছে যে পুলিশ এই ধারায় অভিযোগ পেলেই গ্রেফতার করবে না, বরং পরিস্থিতির গুরুত্ব মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নেবে।

এই রায়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে: গ্রেফতার শাস্তি নয়, এটি তদন্তের সুবিধার জন্য একটি পদক্ষেপ। যদি তদন্তের জন্য গ্রেফতার প্রয়োজন না হয়, তাহলে গ্রেফতার করা উচিত নয়।

বাংলাদেশের আদালত এই বিষয়ে এখনো এতটা সুস্পষ্ট অবস্থান নেননি। বাংলাদেশের হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে "Arnesh Kumar" টাইপের নির্দেশনা কখনো দেননি।

৭.৩ মিথ্যা মামলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক খরচ

মিথ্যা মামলার শুধু আইনি নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক খরচও বিশাল। এই খরচটি কতটা বড় তা একটু বিশ্লেষণ করা যাক।

ব্যক্তিগত খরচ: একটি মিথ্যা মামলার শিকার ব্যক্তিকে আইনজীবী ফি, আদালতের খরচ এবং মামলা মোকাবেলায় সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হয়। যদি তিনি কারাগারে যান, তাহলে তার পেশাগত জীবন ব্যাহত হয়। অনেকে চাকরি হারান এবং পরিবার আর্থিক সংকটে পড়ে।

পারিবারিক খরচ: একটি মিথ্যা মামলার কারণে পরিবারের মধ্যে বিভেদ তৈরি হতে পারে। ছেলের পক্ষ এবং মেয়ের পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে যায়। সন্তানরা পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

সামাজিক খরচ: মিথ্যা মামলার কারণে একজন ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ধ্বংস হয়ে যায়। এমনকি মামলায় খালাস পাওয়ার পরেও সামাজিক কলঙ্ক থেকে যায়, কারণ মানুষ মনে করে "যেখানে ধুঁয়া সেখানে আগুন।"

রাষ্ট্রীয় খরচ: মিথ্যা মামলাগুলো আদালতের সময় নষ্ট করে এবং আদালতের ভার বৃদ্ধি করে। সরকারের আইনি ব্যবস্থার উপর চাপ বাড়ে। কারাগারের খরচ বৃদ্ধি পায়।

এই সমস্ত খরচ মিলিয়ে মিথ্যা মামলার মোট সামাজিক খরচ অত্যন্ত বড়। কিন্তু এই খরচ সম্পর্কে কোনো সরকারি পরিসংখ্যান বা গবেষণা নেই।

৭.৪ ধারা ১৭ কে কার্যকর করার প্রস্তাব: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মিথ্যা মামলার প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "malicious prosecution" এর জন্য দেওয়ানি আদালতে ক্ষতিপূরণ দাবি করা যায়। এই ব্যবস্থায় মিথ্যা মামলার শিকার ব্যক্তি তার ক্ষতির জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন।

কানাডায় "abuse of process" এর ডকট্রিন রয়েছে, যা আদালতকে ক্ষমতা দেয় আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার বন্ধ করার।

যুক্তরাজ্যে বেআইনিভাবে গ্রেফতার বা বিচারের শিকার হলে সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশে এই ধরনের কোনো কার্যকর প্রতিকার নেই। ধারা ১৭ তাত্ত্বিকভাবে আছে, কিন্তু কার্যতই প্রায় অব্যবহৃত। মিথ্যা মামলার শিকার ব্যক্তির জন্য দেওয়ানি আদালতে ক্ষতিপূরণ দাবির সুযোগ থাকলেও এই পথটি দীর্ঘ, ব্যয়বহুল এবং অনিশ্চিত।

অধ্যায় ৮: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল: কাঠামো, সমস্যা এবং সংস্কারের প্রয়োজন

৮.১ ট্রাইব্যুনালের কাঠামো এবং এখতিয়ার

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ২৬ অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় একটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন করার কথা। এই ট্রাইব্যুনালের বিচারক হবেন একজন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ বা যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ পদমর্যাদার বিচারক।

বর্তমানে বাংলাদেশে ১০১টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল রয়েছে। কিন্তু বিচারাধীন মামলার সংখ্যার তুলনায় এই ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা অপ্রতুল।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে প্রায় দেড় লাখেরও বেশি মামলা বিচারাধীন। এই বিশাল সংখ্যার বিপরীতে ১০১টি ট্রাইব্যুনাল প্রতিটি গড়ে প্রায় ১৫০০ মামলার বোঝা বহন করছে।

এই মামলার চাপ বিচার প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত ধীর করে দেয়। ২০২৫ সালের সংশোধনীতে বিচারের সময়সীমা ৯০ দিনে নামিয়ে আনা হয়েছে, কিন্তু বর্তমান কাঠামোয় এই সময়সীমা পালন করা প্রায় অসম্ভব।

ActionAid এর ২০১৯ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায় যে প্রতি পাঁচটি মামলার চারটিতে বিচার শুরু হতে গড়ে দুই বছরের বেশি সময় লাগে। ২০২৫ সালের সংশোধনীর পরেও পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি, কারণ বিচারের বিলম্বের মূল কারণগুলো তদন্ত পর্যায়ে এবং প্রক্রিয়াগত জটিলতায় নিহিত।

৮.২ বিচারক সংকট এবং এর প্রভাব

বাংলাদেশে বিচারকের সংখ্যা জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম। প্রতি দশ লাখ মানুষের জন্য মাত্র কয়েকজন বিচারক রয়েছেন। এই বিচারক সংকটের ফলে মামলার বিচার হতে বছরের পর বছর সময় লাগে।

বিচারক সংকটের একটি বিশেষ প্রভাব হলো বিচারের মানের উপর। যখন একজন বিচারককে এক হাজারের বেশি মামলা দেখতে হয়, তখন তিনি প্রতিটি মামলায় যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন না। এই পরিস্থিতিতে বিচারের মান নেমে যাওয়া স্বাভাবিক।

বিচারের মান নেমে গেলে উভয়পক্ষের ক্ষতি হয়: সত্যিকারের ভিকটিম সুষ্ঠু বিচার পান না, এবং মিথ্যা মামলার শিকার নির্দোষ ব্যক্তিরও সুষ্ঠু বিচার পাওয়া কঠিন হয়।

৮.৩ সরকারি কৌঁসুলির ভূমিকা এবং নিরপেক্ষতার প্রশ্ন

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের হয়ে সরকারি কৌঁসুলি মামলা পরিচালনা করেন। এই কৌঁসুলিদের কাজ হলো রাষ্ট্রের পক্ষে বিচারে অংশগ্রহণ করা।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে সরকারি কৌঁসুলিরা প্রায়ই বাদীর পক্ষে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করেন এবং আসামির বিরুদ্ধে একটি পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন। এই পক্ষপাতটি আংশিকভাবে সামাজিক প্রত্যাশার কারণে এবং আংশিকভাবে রাজনৈতিক চাপের কারণে।

একটি সুষ্ঠু ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় সরকারি কৌঁসুলির দায়িত্ব শুধু অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করা নয়, বরং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। এর মানে হলো যদি কৌঁসুলি জানেন যে মামলাটি মিথ্যা বা প্রমাণ দুর্বল, তাহলে তিনি মামলা থেকে সরে আসবেন বা পরিস্থিতি আদালতের সামনে তুলে ধরবেন।

কিন্তু বাংলাদেশে এই নীতিটি প্রায়ই মানা হয় না। কৌঁসুলির লক্ষ্য হলো দোষী সাব্যস্তি পাওয়া, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা নয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ৯: আইনের প্রয়োগ: পুলিশ, তদন্ত এবং পক্ষপাতের বাস্তবতা

৯.১ পুলিশ তদন্তের কাঠামোগত পক্ষপাত

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে মামলায় পুলিশের তদন্তের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশের তদন্ত মামলার গতিপথ নির্ধারণ করে।

বাস্তবে পুলিশের তদন্তে বেশ কিছু কাঠামোগত পক্ষপাত দেখা যায়।

প্রথমত, পুলিশ প্রায়ই প্রাথমিক অভিযোগকেই সত্য ধরে নিয়ে তদন্ত শুরু করে। এর মানে হলো তদন্ত হয় আসামিকে দোষী প্রমাণ করার জন্য, নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য নয়।

দ্বিতীয়ত, পুলিশ সদস্যরা সামাজিক চাপের কারণে নারী অভিযোগকারীর বক্তব্যকে বিশেষ বিশ্বাসযোগ্যতা দেন। এই সামাজিক চাপটি সবসময় রাজনৈতিক নয়, অনেকসময় এটি বিচারকের নিজের সামাজিক মূল্যবোধ থেকেও আসে।

তৃতীয়ত, অনেক পুলিশ সদস্য আসামির পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহে আগ্রহী নন। তারা বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য সংগ্রহে বেশি সক্রিয়।

চতুর্থত, অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ ও আইনজীবীর মধ্যে অনৈতিক সম্পর্ক থাকতে পারে। কোনো আইনজীবী যদি পুলিশকে একটি নির্দিষ্ট দিকে তদন্ত পরিচালনা করতে প্রভাবিত করতে পারেন, তাহলে তদন্ত পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে।

৯.২ চার্জশিট দাখিলের পদ্ধতি এবং নির্দোষিতার অনুমানের লঙ্ঘন

পুলিশ তদন্ত শেষে চার্জশিট দাখিল করে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে চার্জশিট দাখিলের প্রক্রিয়াতেও কিছু সমস্যা রয়েছে।

অনেক সময় দেখা যায় যে পুলিশ পর্যাপ্ত প্রমাণ না থাকলেও চার্জশিট দাখিল করে। এই প্রবণতার কারণ হলো পুলিশের নিজেদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক চাপ: যদি তারা চার্জশিট না দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে পারে যে তারা মামলা ঠিকমতো তদন্ত করেননি বা বাদীকে সহায়তা করেননি।

এই প্রাতিষ্ঠানিক চাপটি পুলিশকে পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়াই চার্জশিট দাখিল করতে প্রণোদনা দেয়, যা আসামির নির্দোষিতার অনুমানের নীতির বিরোধী।

আবার পুলিশ চার্জশিট না দিলে বা "Final Report" (তদন্ত শেষে মামলায় সত্যতা নেই এই মর্মে প্রতিবেদন) দিলে, বাদী সেটির বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিবাদ করতে পারেন। আদালত তখন পুলিশকে পুনরায় তদন্ত করতে নির্দেশ দিতে পারেন বা নিজেই "Naraji" পিটিশনের শুনানি নিতে পারেন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই পদ্ধতিতে বাদীকে মামলা চালিয়ে যাওয়ার অনেকগুলো সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসামির জন্য মামলার শুরুতেই "এই মামলা মিথ্যা" এই দাবি প্রমাণের কার্যকর সুযোগ নেই।

৯.৩ ফরেনসিক তদন্তের অপ্রতুলতা

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে মামলায় ফরেনসিক তদন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ষণের মামলায় DNA পরীক্ষা, যৌতুক মামলায় যোগাযোগের রেকর্ড এবং অন্যান্য মামলায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগ্রহ বিচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু বাংলাদেশে ফরেনসিক তদন্তের সুবিধা অত্যন্ত সীমিত। বেশিরভাগ জেলায় আধুনিক ফরেনসিক ল্যাবরেটরি নেই। DNA পরীক্ষার সুবিধা শুধু ঢাকায় সীমাবদ্ধ এবং সেখানেও পরীক্ষার ফলাফল পেতে দীর্ঘ সময় লাগে।

ফরেনসিক তদন্তের অপ্রতুলতার একটি সরাসরি পরিণতি হলো যে মামলার বিচার মূলত সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সাক্ষীর সাক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রেই পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে।

অধ্যায় ১০: ধারা ২৮ এবং ২৯: আপিল এবং পুনর্বিবেচনার বিধান এবং তার সমস্যা

১০.১ আপিল ব্যবস্থার কাঠামো

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ধারা ২৮ এ আপিলের বিধান রয়েছে। ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যায় এবং হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করা যায়।

এই আপিল ব্যবস্থাটি তাত্ত্বিকভাবে সঠিক। ভুল সিদ্ধান্ত সংশোধনের জন্য একটি সক্রিয় আপিল ব্যবস্থা ন্যায়বিচারের অপরিহার্য অংশ।

কিন্তু বাস্তবে আপিল ব্যবস্থার কিছু সমস্যা রয়েছে।

প্রথমত, আপিলের প্রক্রিয়া দীর্ঘ এবং ব্যয়বহুল। হাইকোর্টে আপিল করতে অনেক অর্থ খরচ হয় এবং মামলা নিষ্পত্তি হতে বছরের পর বছর সময় লাগে। দরিদ্র পুরুষ যিনি ইতোমধ্যে মামলার খরচে কাহিল, তিনি আপিলের জন্য আর্থিক সক্ষমতা রাখেন না।

দ্বিতীয়ত, আপিলের সময় আসামি যদি এর মধ্যে কারাগারে থাকেন এবং মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলেও তার ক্ষতির কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।

তৃতীয়ত, উচ্চ আদালতের বিচারকরাও সামাজিক পূর্বধারণা থেকে মুক্ত নন। নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলায় উচ্চ আদালতেও প্রায়ই নারী বাদীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের প্রবণতা দেখা যায়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ১১: রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং আইনের বিবর্তন: একটি গভীর বিশ্লেষণ

১১.১ নারীবাদী আন্দোলন এবং আইন প্রণয়নের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের প্রণয়নে এবং পরবর্তী সংশোধনীগুলোতে নারীবাদী সংগঠনগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, BLAST এবং অন্যান্য সংগঠন এই আইনের প্রণয়ন ও সংশোধনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে।

এই সংগঠনগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। তারা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা তৈরিতে এবং আইনি সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে।

কিন্তু এই সংগঠনগুলোর একটি সীমাবদ্ধতা হলো যে তারা মূলত নারীর অধিকার সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করে এবং পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়টি তাদের এজেন্ডায় সাধারণত নেই। যখন আইন সংস্কারের আলোচনা হয়, তখন এই সংগঠনগুলো আইনকে "আরও কঠোর" করার পক্ষে থাকে, কিন্তু আইনকে "আরও ন্যায়সঙ্গত" করার বিষয়ে তারা কম সোচ্চার।

ক্রিটিক্যাল লিগ্যাল স্টাডিজের পণ্ডিত রবার্তো আনগার এই ধরনের সংগঠনগুলোকে "institutional interest groups" বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থগোষ্ঠী হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই গোষ্ঠীগুলো তাদের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব এবং প্রভাব বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট আখ্যান ধরে রাখতে আগ্রহী।

১১.২ রাজনৈতিক দলগুলোর নারীবান্ধব আইন প্রণয়নের প্রণোদনা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো নারীবান্ধব আইন প্রণয়নে বিশেষভাবে আগ্রহী, কারণ এটি রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক। নারী ভোটারদের সমর্থন পাওয়া এবং "নারীর বন্ধু" হিসেবে পরিচিত হওয়া রাজনৈতিক পুঁজি তৈরি করে।

এই রাজনৈতিক প্রণোদনার একটি ফলাফল হলো যে নারীবান্ধব আইন তৈরিতে প্রতিযোগিতা হয়, কিন্তু এই আইনগুলো পুরুষের উপর কী প্রভাব ফেলছে তার মূল্যায়নে কোনো প্রতিযোগিতা নেই।

বিপরীতে, যদি কোনো রাজনৈতিক দল বলতে যায় "আমরা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের কিছু বিধান সংস্কার করতে চাই কারণ এটি পুরুষের অধিকার লঙ্ঘন করছে", তাহলে সেই দলকে "নারীবিরোধী" হিসেবে চিহ্নিত করার ঝুঁকি রয়েছে। এই রাজনৈতিক ঝুঁকি থেকে বাঁচতে কোনো দলই এই সংস্কারের দাবি তোলে না।

এই পরিস্থিতিটিকে "Political Economy of Gender Law" বা লিঙ্গ আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি বলা যায়। রাজনৈতিক বাজারে নারীবান্ধব আইন তৈরির প্রণোদনা বেশি, পুরুষবান্ধব আইন তৈরির প্রণোদনা কম, এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়সঙ্গত আইন তৈরির প্রণোদনা প্রায় নেই।

১১.৩ আন্তর্জাতিক অর্থায়ন এবং আইনি সংস্কারের উপর প্রভাব

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলো নারীর অধিকার সংক্রান্ত আইনি সংস্কারে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে। USAID, UN Women, DFID এবং অন্যান্য সংস্থা "gender justice" বা লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের নামে প্রকল্প পরিচালনা করে।

কিন্তু এই প্রকল্পগুলোর একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো যে "gender justice" এর ব্যাখ্যা সাধারণত শুধুমাত্র নারীর ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়। পুরুষের ন্যায়বিচারের বিষয়টি এই প্রকল্পগুলোর এজেন্ডায় নেই।

এই অর্থায়নের কাঠামোটি বাংলাদেশের নীতিনির্ধারণকে প্রভাবিত করে। যেসব প্রকল্পে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন পাওয়া যায়, সেই দিকেই নীতিনির্ধারণের মনোযোগ যায়। পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন না থাকায় এই বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের মনোযোগও কম।

অধ্যায় ১২: আইনি কার্যকারিতার বিশ্লেষণ: মামলার তথ্য ও পর্যালোচনা

১২.১ দোষী সাব্যস্তির হার এবং তার ব্যাখ্যা

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে মামলায় দোষী সাব্যস্তির হার অত্যন্ত কম। বিভিন্ন গবেষণা ও আদালতের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এই আইনে বিচারের শেষে মাত্র সামান্য অংশ মামলায় আসামি দোষী সাব্যস্ত হন।

এই কম দোষী সাব্যস্তির হারকে দুটি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রথম ব্যাখ্যা হলো: প্রমাণের অভাবে অনেক প্রকৃত অপরাধী খালাস পাচ্ছেন, যা বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রকাশ করে। এই ব্যাখ্যাটি নারী অধিকার সংগঠনগুলো তুলে ধরে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো: কম দোষী সাব্যস্তির হার আংশিকভাবে এই ইঙ্গিত দেয় যে অনেক মামলাই প্রমাণহীন বা মিথ্যা, এবং তাই আদালত দোষী সাব্যস্ত করতে পারছে না। এই ব্যাখ্যাটি পুরুষ অধিকার সচেতন গোষ্ঠীগুলো তুলে ধরে।

আসলে উভয় ব্যাখ্যাই আংশিকভাবে সত্য। কিছু মামলায় সত্যিকারের অপরাধী প্রমাণের অভাবে খালাস পাচ্ছেন, আর কিছু মামলায় নির্দোষ ব্যক্তি মিথ্যা অভিযোগে কারাবাস করেছেন এবং শেষে খালাস পেয়েছেন।

এই দুটি ভিন্ন কারণে কম দোষী সাব্যস্তির হার দেখা যাচ্ছে এই বিষয়টি আলাদা করা না গেলে সঠিক নীতিগত সমাধান করা সম্ভব নয়।

১২.২ মামলার ধরন এবং মিথ্যা মামলার প্রবণতার নির্দেশক

বিভিন্ন আইন বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবীর সাথে আলোচনা এবং আদালতের তথ্য বিশ্লেষণ থেকে কিছু নির্দেশক চিহ্নিত করা যায় যা মিথ্যা মামলার প্রবণতা নির্দেশ করে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

প্রথম নির্দেশক হলো মামলার সময়কাল: বিবাহ বা পারিবারিক সম্পর্ক শুরু হওয়ার অনেক পরে মামলা করা হয়েছে, বিশেষত সম্পদ বিরোধ বা বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর।

দ্বিতীয় নির্দেশক হলো একাধিক মামলা: একই ঘটনায় বাদী একসাথে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে এবং অন্যান্য আইনের অধীনে একাধিক মামলা করেছেন।

তৃতীয় নির্দেশক হলো সমঝোতা-নির্ভরতা: মামলাটি বিচারে যায় না, বরং সমঝোতার জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট আর্থিক দাবি পূরণের পর মামলা প্রত্যাহার করা হয়।

চতুর্থ নির্দেশক হলো সাক্ষ্যের অভাব: তদন্তে কোনো বস্তুগত প্রমাণ (DNA, মেডিকেল রিপোর্ট, ফটোগ্রাফ) পাওয়া যায়নি এবং মামলা সম্পূর্ণ মৌখিক সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল।

পঞ্চম নির্দেশক হলো তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ: মামলাটিতে বাদীর পরিবারের তৃতীয় পক্ষ (যেমন ভাই, বাবা বা অন্যান্য আত্মীয়) সরাসরি জড়িত এবং মামলার পেছনে তাদের সম্পদ বা পারিবারিক বিরোধ সংক্রান্ত স্বার্থ থাকতে পারে।

এই নির্দেশকগুলো অবশ্যই নিশ্চিত প্রমাণ নয়, কিন্তু এগুলো তদন্তকারী ও বিচারকদের সতর্ক থাকার ইঙ্গিত দিতে পারে।

অধ্যায় ১৩: তুলনামূলক আইনি বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশের জন্য পাঠ

১৩.১ ভারতের ধারা ৪৯৮ক: একই সমস্যা, ভিন্ন প্রতিক্রিয়া

ভারতের দণ্ডবিধির ধারা ৪৯৮ক স্ত্রী নির্যাতনের বিধান করে। এই ধারাটি বাংলাদেশের যৌতুক আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের যৌতুক সংক্রান্ত বিধানের সাথে তুলনীয়।

ভারতে এই ধারার অপব্যবহার এতটাই ব্যাপক হয়ে উঠেছিল যে ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে কঠোর অবস্থান নিতে হয়েছে।

"Arnesh Kumar v. State of Bihar" (২০১৪) ছাড়াও "Sushil Kumar Sharma v. Union of India" (২০০৫) মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট স্বীকার করেছে যে ধারা ৪৯৮ক এবং যৌতুক আইনের অধীনে মামলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ "Legal Terrorism" বা আইনি সন্ত্রাসে পরিণত হয়েছে। আদালত বলেছে যে এই ধরনের আইনের অপব্যবহার একটি "personal vendetta or settling personal scores" বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই স্বীকৃতিটি বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশের আদালত যদি ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মতো সুস্পষ্টভাবে এই সমস্যাটি স্বীকার করতেন এবং প্রতিকারমূলক নির্দেশনা দিতেন, তাহলে আইনি পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

১৩.২ শ্রীলঙ্কার পারিবারিক আইন সংস্কার: একটি ইতিবাচক উদাহরণ

শ্রীলঙ্কায় পারিবারিক আইন সংস্কারে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শ্রীলঙ্কার পারিবারিক আদালতে সন্তানের হেফাজতের মামলায় পিতার অধিকারকে মায়ের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শ্রীলঙ্কায় পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন উভয় লিঙ্গের ভিকটিমকে সুরক্ষা দেয়। যদিও বাস্তবে বেশিরভাগ ভিকটিম নারী, কিন্তু আইনের কাঠামো লিঙ্গ-নিরপেক্ষ।

বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার এই মডেল থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

১৩.৩ নেপালের অভিজ্ঞতা: লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনের দিকে যাত্রা

নেপালে ২০১৫ সালের সংবিধান এবং পরবর্তী আইন সংস্কারের মাধ্যমে একটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনি কাঠামো তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে।

নেপালের "Domestic Violence Act" পারিবারিক সহিংসতার ভিকটিম হিসেবে যেকোনো লিঙ্গের ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। নেপালের ফৌজদারি আইনেও ধর্ষণ এবং যৌন সহিংসতার সংজ্ঞা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ।

নেপালের এই পরিবর্তনগুলো পরিপূর্ণ নয় এবং বাস্তবায়নে বহু সমস্যা রয়েছে, কিন্তু কাঠামোগত দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি ইতিবাচক উদাহরণ।

১৩.৪ যুক্তরাজ্যের "Domestic Abuse Act 2021": একটি আদর্শ মডেল

যুক্তরাজ্যের Domestic Abuse Act 2021 একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন যা পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ব্যাপক সুরক্ষা নিশ্চিত করে। এই আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রথমত, এই আইনটি সম্পূর্ণ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। পারিবারিক সহিংসতার শিকার যেকোনো লিঙ্গের ব্যক্তি এই আইনের অধীনে সুরক্ষা পেতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, এই আইন "Coercive Control" বা নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণকেও অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। শুধু শারীরিক সহিংসতা নয়, মানসিক নিপীড়ন এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণকেও এই আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, এই আইন পারিবারিক সহিংসতার ভিকটিমদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে, লিঙ্গনির্বিশেষে।

বাংলাদেশ যুক্তরাজ্যের এই মডেল থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ নিতে পারে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ১৪: ২০২৫ সালের সংশোধনী: একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা

১৪.১ সংশোধনীর ইতিহাস এবং প্রেক্ষাপট

২০২৫ সালের মার্চ মাসে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যে সংশোধনী অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আনা হয়েছে, তার একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট রয়েছে।

২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে, তারা আইনি সংস্কারের একটি ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনেও পরিবর্তন আনা হয়েছে।

কিন্তু একই সাথে এই সংশোধনীর পেছনে একটি নির্দিষ্ট ঘটনার প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। মাগুরার একটি ঘৃণ্য ধর্ষণ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক চাপ তৈরি হয় এবং সরকার দ্রুত আইনি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি জানা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি দেখায় যে বাংলাদেশে আইনি সংস্কার প্রায়ই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে নয়, বরং নির্দিষ্ট ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় হয়। এই "reactive legislation" বা প্রতিক্রিয়াশীল আইন প্রণয়নের সমস্যাগুলো আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করেছি।

১৪.২ সংশোধনীর মূল বিধান: একটি বিশ্লেষণ

২০২৫ সালের সংশোধনীর মূল বিধানগুলো বিশ্লেষণ করলে তিনটি বিভাগ চিহ্নিত করা যায়।

প্রথম বিভাগ: ইতিবাচক পরিবর্তন। ধর্ষণের সংজ্ঞায় লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পরিবর্তন। পুরুষকে ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং "বালাতকার" ধারণার প্রবর্তন গুরুত্বপূর্ণ। ভিকটিম ও সাক্ষীর সুরক্ষায় নতুন বিধান যোগ করা ইতিবাচক।

দ্বিতীয় বিভাগ: সম্ভাব্য সমস্যাজনক পরিবর্তন। মিথ্যা বিবাহের প্রতিশ্রুতিকে ধর্ষণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা অপব্যবহারের সম্ভাবনা তৈরি করে। বিচারের সময়সীমা ৯০ দিনে কমানো বর্তমান কাঠামোয় অবাস্তব। মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সাথে সাংঘর্ষিক।

তৃতীয় বিভাগ: অনুপস্থিত পরিবর্তন। মিথ্যা মামলার কার্যকর প্রতিকারের বিধান নেই। জামিনের বিধানে সংস্কার নেই। পুলিশ তদন্তের পক্ষপাত রোধের কোনো বিধান নেই। পুরুষ ভিকটিমের জন্য বিশেষ সহায়তা কাঠামো নেই।

১৪.৩ সংশোধনীর সমালোচনা: আইনজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলাদেশের বেশ কিছু বিশিষ্ট আইনজীবী ও আইনবিশেষজ্ঞ ২০২৫ সালের সংশোধনীর সমালোচনা করেছেন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

একটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা হলো মিথ্যা বিবাহের প্রতিশ্রুতি ধারার অস্পষ্টতা। এই ধারায় "ভুয়া প্রতিশ্রুতি" এবং "সফল না হওয়া প্রতিশ্রুতি" এর মধ্যে কোনো স্পষ্ট পার্থক্য নেই। এই অস্পষ্টতা বিচারিক মনমানা ব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি করে।

আরেকটি সমালোচনা হলো মৃত্যুদণ্ড সংক্রান্ত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে আন্তর্জাতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে মৃত্যুদণ্ড ধর্ষণ প্রতিরোধে কোনো প্রমাণিত প্রভাব রাখে না। তবুও সংশোধনীতে মৃত্যুদণ্ড যুক্ত করা হয়েছে, যা সামাজিক চাপের কাছে নতি স্বীকারের নির্দেশক।

এছাড়া অনেকে প্রশ্ন তুলছেন যে ৯০ দিনে বিচার সম্পন্ন করার বিধান কতটা বাস্তবসম্মত, যেখানে বর্তমানে প্রতিটি ট্রাইব্যুনালে দেড় হাজারের বেশি মামলা বিচারাধীন।

অধ্যায় ১৫: জুরিসপ্রুডেন্টিয়াল বিশ্লেষণ: আইনের দর্শন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন

১৫.১ হার্টিয়ান পজিটিভিজম এবং এই আইনের আইনি বৈধতা

হার্বার্ট হার্টের আইনি পজিটিভিজমের কাঠামোয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন একটি বৈধ আইন, কারণ এটি সংসদ কর্তৃক প্রণীত এবং সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে রয়েছে। হার্টের "rule of recognition" এর মানদণ্ডে এই আইনটি বৈধ।

কিন্তু হার্টের পজিটিভিজম এই প্রশ্ন করে না যে আইনটি ন্যায়সঙ্গত কিনা। হার্টের মতে আইন কী এবং আইন কী হওয়া উচিত এই দুটি আলাদা প্রশ্ন।

এই বিভাজনটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন হার্টিয়ান অর্থে বৈধ, কিন্তু এটি অগত্যা ন্যায়সঙ্গত নয়।

১৫.২ রোনালড ডওরকিনের আইনতত্ত্ব এবং নীতির ভূমিকা

রোনালড ডওরকিন হার্টের পজিটিভিজমের বিপরীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি দিয়েছেন। ডওরকিনের মতে আইন শুধু নিয়মের সমষ্টি নয়, এটি নীতি ও নীতিমালার দ্বারাও গঠিত।

"Law as Integrity" বা নীতির সমন্বয় হিসেবে আইনের ধারণায় ডওরকিন বলেন যে একটি সঠিক বিচারিক সিদ্ধান্ত হলো সেটি যা কেবল আইনের নিয়মকেই নয়, আইনের পেছনে থাকা নীতিগুলোকেও সম্মান করে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের প্রেক্ষাপটে ডওরকিনের এই কাঠামো প্রয়োগ করলে দেখা যায়: আইনের নিয়মটি হলো নারী ও শিশুর সুরক্ষা, কিন্তু আইনের পেছনে থাকা নীতিটি হলো সকলের জন্য ন্যায়বিচার। যদি আইনের প্রয়োগ পুরুষের প্রতি অন্যায়কারী হয়, তাহলে ডওরকিনের কাঠামোয় সেই প্রয়োগটি আইনের পেছনের নীতির লঙ্ঘন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৫.৩ ফেমিনিস্ট লিগ্যাল থিওরির সীমাবদ্ধতা এবং তার সমালোচনা

নারীবাদী আইনতত্ত্বের বিভিন্ন ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মতো আইনকে সমর্থন করার তাত্ত্বিক ভিত্তি সরবরাহ করে।

ক্যাথরিন ম্যাককিনন এবং তার "Dominance Feminism" বা আধিপত্য-নারীবাদ তত্ত্ব মনে করে যে পুরুষ আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আইনকে নারীর দিকে ঝুঁকতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মতো আইনগুলো ন্যায়সঙ্গত।

কিন্তু এই তত্ত্বের একটি গুরুতর সমালোচনা রয়েছে। লিন্ডা হিরশম্যান সহ অনেক নারীবাদী পণ্ডিত বলেছেন যে ম্যাককিননের দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে সবসময় ভিকটিম হিসেবে দেখে, যা নিজেই একটি অবনতিকারী দৃষ্টিভঙ্গি। নারীকে সবসময় শক্তিহীন এবং পুরুষকে সবসময় শক্তিমান হিসেবে দেখা একটি সরলীকরণ যা উভয় লিঙ্গের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে।

"Equality Feminism" বা সমতা-নারীবাদের ধারায় রুথ বেডার গিন্সবার্গের মতো পণ্ডিতরা বলেছেন যে সত্যিকারের সমতা মানে হলো একই নিয়ম সকলের উপর প্রযোজ্য হওয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনগুলো, এমনকি নারীর পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট আইনও, সমতার নীতির লঙ্ঘন।

১৫.৪ Critical Men's Studies এবং পুরুষের আইনি অভিজ্ঞতার তত্ত্ব

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে "Critical Men's Studies" বা সমালোচনামূলক পুরুষ অধ্যয়ন নামে একটি নতুন একাডেমিক ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। এই ক্ষেত্রের পণ্ডিতরা পুরুষের সামাজিক ও আইনি অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করেন।

মাইকেল কিমেল, কনেল এবং জেফ হার্ন এই ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিত। তারা "hegemonic masculinity" বা আধিপত্যকারী পুরুষত্বের ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছেন: পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পুরুষকে একটি নির্দিষ্ট "পুরুষালি" ভূমিকায় বন্দি করে এবং এই বন্দিত্ব পুরুষকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আইনের প্রেক্ষাপটে এই তত্ত্বটির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। পুরুষ সবসময় শক্তিশালী এই সামাজিক ধারণাটি আইনে প্রতিফলিত হয় এইভাবে যে পুরুষ কখনো ভিকটিম হতে পারে না, পুরুষকে নির্দোষিতার অনুমান দেওয়ার প্রয়োজন নেই এবং পুরুষের সুরক্ষার জন্য আলাদা আইনের প্রয়োজন নেই। এই ধারণাগুলো আইনে প্রাতিষ্ঠানিক মিসান্ড্রির একটি প্রকাশ।

১৫.৫ জন রলসের "Original Position" এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন

জন রলসের "Original Position" বা আদি অবস্থানের ধারণাটি এখানে প্রয়োগ করা যায়।

রলস বলেছেন: কল্পনা করুন আপনি আইন তৈরি করার আগে জানেন না আপনি কোন লিঙ্গে, কোন শ্রেণিতে বা কোন পরিবারে জন্মাবেন। এই "veil of ignorance" বা অজ্ঞতার আবরণের আড়াল থেকে আপনি কোন আইনটি তৈরি করবেন যা সকলের জন্য ন্যায়সঙ্গত?

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনকে রলসিয়ান মানদণ্ডে পরীক্ষা করলে: যদি আপনি না জানতেন আপনি পুরুষ না নারী হবেন, তাহলে কি আপনি এমন একটি আইন তৈরি করতেন যেখানে শুধু অভিযোগের ভিত্তিতে জামিন ছাড়া কারাগারে রাখার বিধান আছে, যেখানে ভিকটিমের একক সাক্ষ্যই যথেষ্ট এবং যেখানে মিথ্যা মামলার শিকার ব্যক্তির কোনো কার্যকর প্রতিকার নেই?

রলসের কাঠামোয় উত্তর হবে না। যদি আপনি পুরুষ হওয়ার সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রাখেন, তাহলে আপনি এমন একটি আইন চাইবেন যা উভয় লিঙ্গের সম্ভাব্য ভিকটিমকে সুরক্ষা দেয় এবং উভয় লিঙ্গের অভিযুক্তকে ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দেয়।

অধ্যায় ১৬: বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আদালতের রায় এবং আইনি বিকাশ

১৬.১ সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়সমূহ: একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ে আদালত বলেছেন যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে গ্রেফতারের ক্ষেত্রেও সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদের রক্ষাকবচগুলো প্রযোজ্য। আসামিকে গ্রেফতারের কারণ জানাতে হবে এবং আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

হাইকোর্ট বেশ কিছু মামলায় জামিনের আবেদনে এই অবস্থান নিয়েছে যে জামিন অযোগ্য অপরাধেও যদি প্রথমিক সাক্ষ্যে মামলার দুর্বলতা স্পষ্ট হয়, তাহলে হাইকোর্ট জামিন দিতে পারেন।

কিন্তু এই রায়গুলো ব্যক্তিগত মামলার সমাধান দেয়, কিন্তু কাঠামোগত পরিবর্তন আনে না। প্রতিটি মামলায় আলাদাভাবে হাইকোর্টে যাওয়া বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

১৬.২ হাইকোর্টের ২০২৪-২০২৫ সালের উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত

২০২৪-২০২৫ সালে হাইকোর্ট বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২০২৪ সালে হাইকোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় বলেছেন যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে মামলায় যদি প্রমাণ পর্যাপ্ত না হয়, তাহলে শুধুমাত্র প্রভাব খাটিয়ে বা সামাজিক চাপে মামলা চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

২০২৫ সালে সাংবিধানিক আদালতে "মিথ্যা বিবাহের প্রতিশ্রুতি" সংক্রান্ত নতুন বিধানের বিরুদ্ধে একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। এই পিটিশনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে এই বিধানটি সংবিধানের ৩১, ৩২ এবং ৩৩ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী কারণ এটি স্বেচ্ছামূলক যৌন সম্পর্কের পরিণতিকে অপরাধে রূপান্তরিত করে।

এই মামলাগুলোর চূড়ান্ত পরিণতি এই গ্রন্থ রচনার সময় পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ১৭: সামাজিক বিশ্লেষণ: ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সম্পর্ক

১৭.১ ভিকটিম আইডেন্টিটি এবং সামাজিক পুঁজি

আধুনিক সমাজে "ভিকটিম আইডেন্টিটি" বা শিকারের পরিচয় একটি বিশেষ সামাজিক পুঁজিতে পরিণত হয়েছে। যখন কেউ নিজেকে শিকার হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন, তখন তিনি সামাজিক সহানুভূতি, আইনি সুবিধা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পান।

ফ্রান্সের সমাজবিজ্ঞানী পিয়েরে বুর্দিও "social capital" বা সামাজিক পুঁজির ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছেন। বুর্দিওর কাঠামোয় ভিকটিম পরিচয় একটি বিশেষ ধরনের সামাজিক পুঁজি হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী ভিকটিম পরিচয়টি বিশেষভাবে শক্তিশালী সামাজিক পুঁজি। কারণ আইন, সমাজ এবং মিডিয়া এই পরিচয়টিকে বিশেষ মর্যাদা দেয়। ফলে কেউ যদি নারী ভিকটিম হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারেন, তাহলে তিনি বহু সুবিধা পান: আইনের সুরক্ষা, পুলিশের সহায়তা, আদালতের সহানুভূতি এবং সামাজিক সমর্থন।

এই সামাজিক পুঁজির অসমান বিতরণটি আইনের অপব্যবহারের একটি কাঠামোগত কারণ। যখন একটি নির্দিষ্ট পরিচয় (নারী ভিকটিম) অসামান্য সুবিধা দেয়, তখন সেই পরিচয়ের অপব্যবহারের প্রলোভন তৈরি হয়।

১৭.২ মিডিয়া কভারেজ এবং পুরুষের সুনাম ধ্বংসের কাঠামো

বাংলাদেশের মিডিয়া নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা কভার করার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসরণ করে। এই প্যাটার্নটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়:

প্রথম ধাপে অভিযোগ আসে এবং মিডিয়া অভিযুক্তের নাম, ছবি এবং পরিচয় প্রকাশ করে। এই পর্যায়ে বিচার হয়নি, কিন্তু তার সামাজিক জীবন ধ্বংস শুরু হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ধাপে মামলা দীর্ঘ সময় চলে এবং মিডিয়া ধীরে ধীরে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

তৃতীয় ধাপে যদি আসামি খালাস পান বা মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে এই খবর প্রথম পর্যায়ের মতো বড় কভারেজ পায় না। ফলে জনমানসে অভিযুক্তের অপরাধীর ভাবমূর্তি থেকে যায়।

মিডিয়ার এই একতরফা কভারেজ একটি "presumption of guilt" বা অপরাধীত্বের পূর্বাভাস তৈরি করে যা আইনের "presumption of innocence" এর বিপরীত।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

আইনতাত্ত্বিক পণ্ডিত থমাস ফ্রাঙ্কেল "Trial by Media" বা মিডিয়ার বিচার ধারণাটি বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে মিডিয়া ট্রায়াল একটি আইনি রাষ্ট্রে গুরুতর সমস্যা কারণ এটি প্রকৃত বিচারের আগেই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে।

১৭.৩ সামাজিক মিডিয়ায় অভিযোগ এবং নতুন আইনি চ্যালেঞ্জ

সামাজিক মিডিয়ার যুগে নতুন একটি সমস্যা তৈরি হয়েছে। কেউ যদি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তাহলে সেই অভিযোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অভিযুক্তের ক্ষতি হয়।

এই পরিস্থিতিতে "Due Process" বা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুপস্থিত। কোনো তদন্ত নেই, কোনো বিচার নেই, কোনো সাক্ষী নেই, কিন্তু পরিণতি অত্যন্ত ক্ষতিকর।

#MeToo আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টি বৈশ্বিকভাবে আলোচিত হচ্ছে। আমেরিকার "Due Process" বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে সামাজিক মিডিয়ায় অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যক্তির পেশাগত জীবন ধ্বংস করা "cancel culture" বা বাতিল সংস্কৃতির একটি অবিচারমূলক প্রকাশ।

বাংলাদেশে এই সমস্যা আরও জটিল কারণ সামাজিক মিডিয়ার অভিযোগ দ্রুত আইনি মামলায় রূপান্তরিত হতে পারে। কেউ ফেসবুকে অভিযোগ করলে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার চাপ অনুভব করে।

অধ্যায় ১৮: সংস্কারের রোডম্যাপ এবং সুপারিশ

১৮.১ আইনি সংস্কারের নীতিমালা

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সংস্কারের জন্য কিছু মূলনীতি প্রস্তাব করা যায়।

প্রথম নীতি: লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা। আইনের ভাষা এবং কাঠামো এমন হওয়া উচিত যা যেকোনো লিঙ্গের ব্যক্তি ভিকটিম বা অপরাধী হতে পারেন বলে স্বীকার করে। এটি ইতোমধ্যে ২০২৫ সালের সংশোধনীতে কিছুটা অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু পুরোটা হয়নি।

দ্বিতীয় নীতি: "Presumption of Innocence" এর কার্যকর প্রয়োগ। প্রতিটি অভিযুক্তকে, লিঙ্গনির্বিশেষে, বিচারের পূর্বে নির্দোষ ধরতে হবে। জামিনের বিধান সংস্কার করতে হবে।

তৃতীয় নীতি: মিথ্যা মামলার কার্যকর প্রতিকার। ধারা ১৭ কে কার্যকর করতে হবে এবং মিথ্যা মামলাকারীর জন্য প্রমাণের মানদণ্ড কমাতে হবে। মিথ্যা মামলার শিকার ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণের বিধান রাখতে হবে।

চতুর্থ নীতি: পুলিশ তদন্তে পক্ষপাত রোধ। পুলিশকে আসামির পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহের সমান দায়িত্ব দিতে হবে। তদন্তে পক্ষপাতের জন্য শাস্তির বিধান রাখতে হবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পঞ্চম নীতি: ফরেনসিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। সকল জেলায় আধুনিক ফরেনসিক সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

ষষ্ঠ নীতি: পুরুষ ভিকটিমের জন্য সহায়তা কাঠামো। পুরুষ ভিকটিমের জন্য আইনি সহায়তা, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা এবং আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে হবে।

১৮.২ সংসদীয় কার্যক্রম এবং প্রস্তাবিত সংস্কার

সংসদীয় পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সংস্কারের জন্য কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

প্রথমত, একটি সংসদীয় উপকমিটি গঠন করা যেতে পারে যা আইনের বর্তমান প্রয়োগের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে। এই কমিটিতে আইনজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী, নারী অধিকার কর্মী এবং পুরুষ অধিকার বিশেষজ্ঞ সকলকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আইনের প্রতিটি ধারার "impact assessment" বা প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে। কোন ধারায় কতটি মামলা হচ্ছে, কতটির দোষী সাব্যস্তি হচ্ছে এবং কতটিতে অভিযুক্ত খালাস পাচ্ছেন, এই তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হবে।

তৃতীয়ত, বিচারিক প্রক্রিয়াগত নীতিমালা সংস্কার করতে হবে। জামিনের বিষয়ে "Arnesh Kumar" ধরনের একটি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা প্রয়োজন।

১৮.৩ বিচার বিভাগীয় সংস্কার এবং প্রশিক্ষণ

বিচারিক সংস্কারের জন্য কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ প্রয়োজন।

প্রথমত, নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় বিচারকদের প্রশিক্ষণে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করতে হবে। শুধু ভিকটিমের অধিকার নয়, আসামির সাংবিধানিক অধিকারও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিচারিক পর্যালোচনার একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যেখানে পর্যায়ক্রমে মামলাগুলোর ফলাফল বিশ্লেষণ করা হবে এবং বিচারিক পক্ষপাতের প্যাটার্ন চিহ্নিত করা হবে।

তৃতীয়ত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্রতিটি ট্রাইব্যুনালে যথেষ্ট সম্পদ ও সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

অধ্যায় ১৯: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন

১৯.১ ICCPR এবং বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি (ICCPR) অনুমোদন করেছে। এই চুক্তির বেশ কিছু বিধান নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের কিছু দিকের সাথে সাংঘর্ষিক।

ICCPR এর ১৪(১) অনুচ্ছেদ বলে যে ফৌজদারি অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি সমানভাবে ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারী। ১৪(২) অনুচ্ছেদ বলে যে প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হবেন।

এই বিধানগুলো সরাসরি "Presumption of Innocence" এর নীতি প্রতিষ্ঠা করে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের জামিন অযোগ্যতার বিধান এই আন্তর্জাতিক নীতির সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ জামিন ছাড়া কারাগারে থাকা কার্যত বিচারের পূর্বেই শাস্তি।

ICCPR এর ২৬ অনুচ্ছেদ বলে যে আইনের সামনে সকলে সমান এবং আইনের সমান সুরক্ষার অধিকারী। এই অনুচ্ছেদ লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য।

১৯.২ UN Human Rights Committee এর মন্তব্য এবং বাংলাদেশ

UN Human Rights Committee ICCPR এর বাস্তবায়নের উপর নজর রাখে এবং বিভিন্ন দেশের বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা করে।

বাংলাদেশের বিষয়ে কমিটি বেশ কিছু উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বিচারের পূর্বে দীর্ঘ কারাবাসের সমস্যা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্ন এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় Due Process এর ঘাটতি।

যদিও কমিটি সরাসরি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সমালোচনা করেনি, কিন্তু তারা যে সাধারণ উদ্বেগগুলো প্রকাশ করেছে সেগুলো এই আইনের প্রয়োগের সমস্যাগুলোর সাথে সংযুক্ত।

১৯.৩ Universal Periodic Review (UPR) এবং বাংলাদেশ

জাতিসংঘের Universal Periodic Review (UPR) প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশকে পর্যায়ক্রমে তার মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর পর্যালোচনা করতে হয়।

সাম্প্রতিক UPR চক্রে বাংলাদেশের বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য এসেছে। বিচারিক স্বাধীনতা, দীর্ঘ বিচারাধীনতা এবং কারাগারের অবস্থা নিয়ে বিভিন্ন দেশ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

কিন্তু পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়টি UPR এ এখনো সরাসরি আলোচিত হয়নি। এটি আংশিকভাবে এই কারণে যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আলোচনায় পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়টি এখনো প্রধান ধারার চিন্তাভাবনায় স্থান পায়নি।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

২০.১ বাংলাদেশের ২০২৪-২০২৬ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং আইনি সংস্কারের সুযোগ

২০২৪ সালের আগস্টে বাংলাদেশে একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনের অবসান এবং অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন একটি সুযোগ তৈরি করেছে।

এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে আইনি সংস্কারের একটি সুযোগ এসেছে। অন্তর্বর্তী সরকার বেশ কিছু আইনি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু এই সংস্কারের এজেন্ডায় পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়টি এখনো স্পষ্টভাবে নেই।

২০২৫-২০২৬ সালে বাংলাদেশে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে। এই কমিশনে লিঙ্গ-সমতার বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু সমতার ধারণাটি শুধু নারীর অনুকূলে নয়, বরং উভয় লিঙ্গের অনুকূলে হওয়া উচিত, এই বিষয়টি সংস্কার কমিশনের এজেন্ডায় যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে না।

২০.২ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তার সীমাবদ্ধতা

সামাজিক মিডিয়ায় পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়ে আলোচনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক গ্রুপ এবং ব্লগ মিথ্যা মামলার সমস্যা, পারিবারিক আইনে বৈষম্য এবং পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছে।

এই সচেতনতা বৃদ্ধির একটি ইতিবাচক দিক হলো যে বিষয়টি সামাজিক আলোচনায় আসছে। কিন্তু সীমাবদ্ধতা হলো যে এই আলোচনা অনেক সময় অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ এবং একতরফা। পুরুষের অধিকারের দাবিকে যদি "নারীবিরোধিতা" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে এটি বিভাজন তৈরি করে এবং সমস্যার সমাধান করে না।

একটি গঠনমূলক আলোচনার জন্য প্রয়োজন: পুরুষ ও নারী উভয়ের অধিকারকে একসাথে সম্মান করা, সামাজিক সমস্যাগুলোকে শুধু লিঙ্গ-সংঘর্ষ হিসেবে না দেখে ন্যায়বিচারের প্রশ্ন হিসেবে দেখা এবং আইনি সংস্কারের দাবিকে ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, বরং নীতিগত প্রস্তাব হিসেবে উপস্থাপন করা।

২০.৩ ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা: একটি সংশ্লেষণ

এই দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর একটি বিস্তারিত, বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ করেছি। এই বিশ্লেষণ থেকে কিছু মূল উপসংহার টানা যায়।

প্রথম উপসংহার: এই আইনটি একটি প্রয়োজনীয় আইন। বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন একটি বাস্তব সমস্যা এবং এর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি প্রতিকার প্রয়োজন।

দ্বিতীয় উপসংহার: কিন্তু এই আইনটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। আইনের কাঠামো, ভাষা এবং প্রয়োগে বেশ কিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে যা পুরুষের সাংবিধানিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

তৃতীয় উপসংহার: সংস্কার সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়। আইনকে আরও ন্যায়সঙ্গত করা সম্ভব, এবং এই সংস্কার নারীর সুরক্ষাকে দুর্বল না করেও করা যায়।

চতুর্থ উপসংহার: রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি সবচেয়ে বড় বাধা। আইনি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও প্রস্তাবনা বিদ্যমান, কিন্তু এটি বাস্তবায়নের রাজনৈতিক সাহস ও প্রণোদনা তৈরি করা সবচেয়ে কঠিন কাজ।

পঞ্চম উপসংহার: নাগরিক সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আইনি সংস্কার শুধু সংসদ বা আদালত থেকে আসবে না, এটি নাগরিক সমাজের চাপ এবং সচেতনতার মাধ্যমেও আসতে পারে।

অধ্যায় ২১: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ধারাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত সারণি এবং মূল্যায়ন

২১.১ প্রতিটি ধারার সারসংক্ষেপ এবং মূল্যায়ন

এই অধ্যায়ে আমরা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মূল ধারাগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ এবং মূল্যায়ন উপস্থাপন করব।

ধারা ২ এর সংজ্ঞাসমূহ: মূল্যায়ন মিশ্র। সংজ্ঞাগুলো অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যাপক এবং অস্পষ্ট। ২০২৫ সালের সংশোধনীতে কিছু উন্নতি হয়েছে।

ধারা ৪ থেকে ৮: অ্যাসিড সংক্রান্ত বিধান। এই ধারাগুলো মূলত প্রয়োজনীয় এবং কার্যকর, কারণ অ্যাসিড সহিংসতা একটি বাস্তব সমস্যা। তবে বিচারের দীর্ঘতা এই বিধানগুলোর কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়।

ধারা ৯: ধর্ষণ। ২০২৫ সালের সংশোধনীর পর পুরুষকে ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু "মিথ্যা বিবাহের প্রতিশ্রুতি" বিধানটি সমস্যাজনক।

ধারা ১০: যৌন নিপীড়ন। সংজ্ঞা অস্পষ্ট এবং অপব্যবহারযোগ্য। সংজ্ঞা স্পষ্ট করার প্রয়োজন।

ধারা ১১: যৌতুক। এই ধারার অপব্যবহার সবচেয়ে বেশি। গ্রেফতার প্রক্রিয়া এবং জামিনের বিধান সংস্কারের প্রয়োজন।

ধারা ১২-১৩খ: অপহরণ ও পাচার। এই ধারাগুলো মূলত প্রয়োজনীয়।

ধারা ১৭: মিথ্যা মামলার শাস্তি। তাত্ত্বিকভাবে ভালো কিন্তু বাস্তবে অকার্যকর। প্রমাণের মানদণ্ড কমানো এবং প্রয়োগ শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

ধারা ১৯: জামিনের বিধান। সবচেয়ে সমস্যাজনক বিধানগুলোর একটি। "Bail is the rule" নীতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ধারা ২৬-২৭: ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত। ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা এবং সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজন।

দ্বিতীয় খণ্ডের উপসংহার: একটি দার্শনিক প্রতিফলন

উপসংহার: আইনের ন্যায়নীতি এবং বাস্তব ন্যায়বিচার

এই দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর একটি গভীর এবং ব্যাপক বিশ্লেষণ করেছি। আমরা দেখেছি যে এই আইনটি তার ঘোষিত উদ্দেশ্যে অনেকটাই সফল হয়েছে: নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী আইনি ঢাল হিসেবে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

কিন্তু একই সাথে আমরা দেখেছি যে এই আইনটি গুরুতর সমস্যাও তৈরি করেছে। জামিন অযোগ্যতার বিধান, মিথ্যা মামলার প্রতিকারের অভাব, পুলিশ তদন্তের পক্ষপাত এবং আইনের অপব্যবহারের কাঠামোগত সুযোগ, এই সব মিলিয়ে এটি অনেক নির্দোষ পুরুষের জীবন ধ্বংস করেছে।

এই দ্বন্দ্বটির সমাধান কীভাবে হবে? আমার মতে, এই সমাধানটি একটি সহজ উত্তরে নেই। নারী নির্যাতনের সমস্যাটি বাস্তব এবং আইনি প্রতিকার প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেই প্রতিকার এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যা নির্দোষ পুরুষকে শাস্তি দেয় না।

অমর্ত্য সেনের ভাষায়, আমাদের দরকার "comparative justice" বা তুলনামূলক ন্যায়বিচার। একটি নিখুঁত আইনি ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখার পরিবর্তে আমাদের বর্তমান ব্যবস্থার তুলনায় আরও ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থার দিকে এগোতে হবে।

এই পথে এগোতে হলে প্রয়োজন: একটি সৎ, তথ্যভিত্তিক আলোচনা যেখানে উভয় দিকের সমস্যা স্বীকার করা হয়; রাজনৈতিক সাহস যা নারীবান্ধব আইনের নামে চলতে থাকা অন্যায়গুলো মোকাবেলা করতে ইচ্ছুক; এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি যা শুধু ভোটের হিসাবে নয়, বরং ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে আইন মূল্যায়ন করে।

হার্বার্ট হার্টের একটি বিখ্যাত উক্তি দিয়ে এই খণ্ড শেষ করা যায়: "Law is not justice, but without law there can be no justice." বা আইন ন্যায়বিচার নয়, কিন্তু আইন ছাড়া ন্যায়বিচার সম্ভব নয়। এই দ্বন্দ্বটির মধ্যে কাজ করেই আমাদের একটি আরও ন্যায়সঙ্গত বাংলাদেশ গড়ার পথ খুঁজে নিতে হবে।

তৃতীয় খণ্ডে আমরা যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ এবং এর প্রয়োগের সংকট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। বিশেষত আমরা দেখব কীভাবে যৌতুক আইন পারিবারিক বিরোধে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এই সমস্যার কাঠামোগত সমাধান কী হতে পারে।

পরিশিষ্ট ক: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারার সূচি

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই পরিশিষ্টে আইনের মূল ধারাগুলোর একটি সূচি দেওয়া হলো।

ধারা ১: সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন। ধারা ২: সংজ্ঞা। ধারা ৩: আইনের প্রাধান্য। ধারা ৪: অ্যাসিড দ্বারা মৃত্যু সংঘটনের দণ্ড। ধারা ৫: অ্যাসিড দ্বারা ক্ষতিসাধনের দণ্ড। ধারা ৬: দাহ্য, বিষাক্ত বা ক্ষয়কারী পদার্থ দ্বারা ক্ষতিসাধন। ধারা ৭: অস্ত্র দ্বারা ক্ষতিসাধন। ধারা ৮: ধর্ষণের পর মৃত্যু বা আত্মহত্যার দণ্ড। ধারা ৯: ধর্ষণের দণ্ড। ধারা ১০: যৌন নিপীড়নের দণ্ড। ধারা ১১: যৌতুকের কারণে মৃত্যু ঘটানো বা আহত করার দণ্ড। ধারা ১২: অপহরণের দণ্ড। ধারা ১৩: পাচারের দণ্ড। ধারা ১৪: শিশু বা নারীকে ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে অঙ্গহানির দণ্ড। ধারা ১৫: ধর্ষণ বা ধর্ষণজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্পর্ক কোনো অজুহাত নয়। ধারা ১৬: মামলায় অপরাধীকে পুরস্কার। ধারা ১৭: মিথ্যা মামলার দণ্ড। ধারা ১৮: অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিধান। ধারা ১৯: জামিনের বিধান। ধারা ২০: সাক্ষ্যের বিধান। ধারা ২১: তদন্তের বিধান। ধারা ২২: ডাক্তারি পরীক্ষার বিধান। ধারা ২৩: আমলযোগ্যতা। ধারা ২৪: মিডিয়ায় পরিচয় প্রকাশ নিষেধ। ধারা ২৫: ভিকটিমের বিরুদ্ধে সাক্ষীদের চরিত্র পরীক্ষা নিষেধ। ধারা ২৬: ট্রাইব্যুনাল গঠন। ধারা ২৭: ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার। ধারা ২৮: আপিলের বিধান। ধারা ২৯: পুনর্বিবেচনার বিধান। ধারা ৩০: বিশেষ বিধান। ধারা ৩১: বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা। ধারা ৩২: রহিতকরণ ও হেফাজত।

পরিশিষ্ট খ: ২০২৫ সালের সংশোধনীর মূল পরিবর্তনসমূহ

২০২৫ সালের মার্চ মাসে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যে সংশোধনী অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আনা হয়েছে, তার মূল পরিবর্তনগুলো নিচে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো।

প্রথমত, ধর্ষণের সংজ্ঞায় "পুরুষ" এর পরিবর্তে "ব্যক্তি" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, "বালাতকার" নামে একটি নতুন অপরাধ সৃষ্টি করা হয়েছে যা ষোলো বছরের কম বয়সী ছেলে শিশুদের উপর যৌন নিপীড়নকে সংজ্ঞায়িত করে। তৃতীয়ত, মিথ্যা বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌনসঙ্গমকে ধর্ষণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। চতুর্থত, বিচারের সময়সীমা ১৮০ দিন থেকে ৯০ দিনে কমানো হয়েছে। পঞ্চমত, ভিকটিম ও সাক্ষীর সুরক্ষায় নতুন বিধান যোগ করা হয়েছে। ষষ্ঠত, শিশু ধর্ষণের মামলার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। সপ্তমত, মৃত্যুদণ্ড অব্যাহত রাখা হয়েছে।

পরিশিষ্ট গ: প্রস্তাবিত আইনি সংস্কারের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

এই পরিশিষ্টে দ্বিতীয় খণ্ডে বিশ্লেষিত সমস্যাগুলোর আলোকে প্রস্তাবিত সংস্কারের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থাপন করা হলো।

আইনি সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথম সুপারিশ হলো ধারা ১৯ সংস্কার করে "Bail is the rule" নীতি প্রবর্তন করা। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট গুরুতর অপরাধে এবং পলায়নের ঝুঁকি থাকলে জামিন প্রত্যাখ্যান করা যাবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

দ্বিতীয় সুপারিশ হলো ধারা ১৭ সংস্কার করে মিথ্যা মামলার প্রমাণের মানদণ্ড কমানো এবং মিথ্যা মামলার শিকার ব্যক্তির জন্য দেওয়ানি ক্ষতিপূরণের বিধান রাখা।

তৃতীয় সুপারিশ হলো সংজ্ঞা ধারা সংস্কার করে "যৌতুক" এর সংজ্ঞা আরও সুনির্দিষ্ট করা।

চতুর্থ সুপারিশ হলো পুলিশ তদন্তের বিধান সংস্কার করে পুলিশকে আসামির পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহের দায়িত্বও দেওয়া।

পঞ্চম সুপারিশ হলো ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রতিটি ট্রাইব্যুনালে পর্যাপ্ত বিচারক, কর্মী ও অবকাঠামো নিশ্চিত করা।

ষষ্ঠ সুপারিশ হলো পুরুষ ভিকটিমের জন্য বিশেষ সহায়তা কাঠামো তৈরি করা, যার মধ্যে থাকবে আইনি সহায়তা কেন্দ্র, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা এবং সামাজিক পুনর্বাসন কার্যক্রম।

সপ্তম সুপারিশ হলো জাতীয় পর্যায়ে একটি "Legal Equality Commission" বা আইনি সমতা কমিশন গঠন করা যা উভয় লিঙ্গের আইনি অধিকারের বিষয়ে নজর রাখবে এবং নীতিগত পরামর্শ দেবে।

এই দ্বিতীয় খণ্ডে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর যে বিস্তারিত, ধারাভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে, তা এই গ্রন্থের মূল থিসিসটিকে বিশেষভাবে শক্তিশালী করে। এই আইনটি একটি প্রয়োজনীয় সামাজিক হাতিয়ার যা সঠিক উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তার কাঠামোগত ত্রুটিগুলো একটি ভিন্ন ধরনের অন্যায়ের জন্ম দিয়েছে। এই দ্বন্দ্বটির স্বীকৃতি এবং সমাধানের সন্ধানই হলো সত্যিকারের ন্যায়বিচারের পথ।

তৃতীয় খণ্ড

যৌতুক নিরোধ আইন: ইতিহাস, কাঠামো, অপব্যবহার এবং পুরুষবিরোধী আইনি বাস্তবতার গভীর বিশ্লেষণ

তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা

বাংলাদেশের আইনি ইতিহাসে যৌতুক নিরোধ আইন একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এই আইনটি মূলত একটি সামাজিক অভিশাপকে নির্মূল করার জন্য তৈরি হয়েছিল, কিন্তু কালের পরিক্রমায় এটি নিজেই একটি ভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌতুকের শিকার নারীদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত এই আইনটি আজ প্রায়শই পারিবারিক বিরোধে পুরুষ ও তার পরিবারকে আক্রমণ করার একটি কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই খণ্ডে আমরা এই জটিল বাস্তবতাকে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করব।

এই তৃতীয় খণ্ডটি যৌতুক প্রথার ঐতিহাসিক শিকড় দিয়ে শুরু করবে এবং ধীরে ধীরে আইনি ইতিহাস, বর্তমান আইনের কাঠামো, এর প্রয়োগের সমস্যা এবং অপব্যবহারের ধরন বিশ্লেষণ করবে। এরপর আমরা ভারতের অভিজ্ঞতার সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করব, জুরিসপ্রুডেন্টিয়াল দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান আইনের দার্শনিক সংকট চিহ্নিত করব এবং সংস্কারের একটি ব্যাপক রূপরেখা প্রস্তাব করব। এই পুরো বিশ্লেষণের কেন্দ্রে থাকবে

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

একটি মৌলিক প্রশ্ন: একটি আইন যখন তার ঘোষিত উদ্দেশ্যের বাইরে গিয়ে বিপরীত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে থাকে, তখন সেই আইনকে সংস্কার করা না করা একটি নৈতিক ও আইনি বাধ্যবাধকতা কিনা।

অধ্যায় ১: যৌতুকের ঐতিহাসিক শিকড়, সামাজিক কাঠামো এবং আইনি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা

১.১ যৌতুক: একটি উপমহাদেশীয় সামাজিক ব্যাধির ঐতিহাসিক পাঠ

যৌতুক প্রথা দক্ষিণ এশিয়ার একটি প্রাচীন সামাজিক রীতি, যার শিকড় প্রোথিত রয়েছে হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থার গভীরে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে মেয়ের বিয়েতে পিতার পক্ষ থেকে যে সম্পদ দেওয়া হত, সেটিকে বলা হত "কন্যাদান" এর অনুষঙ্গ। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে এই প্রথার নৈতিক ভিত্তি ছিল এই ধারণায় যে পিতা তার কন্যাকে দান করার সময় তার সাথে সম্পদও দান করেন, যাতে সে নতুন ঘরে সম্মানজনকভাবে বসবাস করতে পারে। কিন্তু এই মূল ধারণাটি কালের সাথে সাথে বিকৃত হয়েছে এবং একটি পিতৃতান্ত্রিক দাবির রূপ নিয়েছে যেখানে বর পক্ষ কনে পক্ষের কাছ থেকে সম্পদ আদায় করার অধিকার অর্জন করে নিয়েছে।

ইসলামিক সামাজিক কাঠামোতে এই প্রথার কোনো স্থান নেই। ইসলামে বরং বিপরীত ধারণা রয়েছে। ইসলামিক আইনে মোহর বা দেনমোহর হল বরের পক্ষ থেকে কনেকে দেওয়া একটি বাধ্যতামূলক আর্থিক নিরাপত্তা, যা কনের অধিকার এবং কনে যেকোনো সময় এটি দাবি করতে পারেন। এটি যৌতুকের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা। কিন্তু উপমহাদেশে দীর্ঘকালীন হিন্দু-মুসলিম সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে মুসলিম সমাজেও যৌতুকের প্রথা বিস্তার লাভ করেছে এবং এই প্রথা হিন্দু সমাজ থেকে মুসলিম সমাজে স্থানান্তরিত হয়েছে কোনো ধর্মীয় বা নৈতিক ভিত্তি ছাড়াই।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে যৌতুক প্রথা একটি নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। ব্রিটিশ আইনি কাঠামোতে সম্পত্তির অধিকার মূলত পুরুষদের হাতে ন্যস্ত ছিল এবং বিবাহিত নারীর সম্পত্তির অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত। এই আইনি পরিবেশে যৌতুক প্রথা আরও শক্তিশালী হয়েছিল, কারণ নারীর নিজস্ব কোনো সম্পদ না থাকায় তার পরিবারকেই তার বিয়েতে সম্পদ দিতে হত। উনিশ শতকের বাংলায় যৌতুক একটি সামাজিক মর্যাদার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল, যেখানে উচ্চমাত্রার যৌতুক পরিবারের সামাজিক অবস্থান প্রকাশ করত।

বিশ শতকে এই প্রথা আরও বিকৃত হয়েছে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের সাথে সাথে যৌতুকের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ধরন পরিবর্তিত হয়েছে। আগে যৌতুক দেওয়া হত মেয়ের নিজের সম্পদ হিসেবে, কিন্তু এখন যৌতুক সরাসরি বর ও তার পরিবারের কাছে চলে যায়। ১৯৬০-৭০ এর দশকে বাংলাদেশে যৌতুকজনিত নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এটি সামাজিক উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

১.২ যৌতুকের অর্থনৈতিক যুক্তি এবং তার বিকৃতি

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, যৌতুক প্রথার একটি আদিম যুক্তি ছিল। যখন সম্পত্তি মূলত পুত্রদের মধ্যে বিভক্ত হত এবং কন্যারা পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত না, তখন বিয়েতে দেওয়া যৌতুক ছিল কন্যার প্রাপ্য

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

উত্তরাধিকারের একটি বিকল্প ব্যবস্থা। কিন্তু আধুনিক আইনে যখন নারীর সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, তখন এই যুক্তিটি আর প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু সামাজিক অভ্যাস আইনের পরিবর্তনের চেয়ে অনেক ধীরে পরিবর্তিত হয়।

গ্যারি বেকারের "নতুন গৃহস্থালির অর্থনীতি" তত্ত্বের আলোকে যৌতুককে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে যৌতুক মূলত একটি বিবাহ বাজারে দাম নির্ধারণের প্রক্রিয়া। যে সমাজে মেয়েদের সংখ্যা বেশি বা বিয়েযোগ্য ছেলেদের সরবরাহ কম, সেখানে কনে পক্ষকে বেশি যৌতুক দিতে হয়। এই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণটি ব্যাখ্যা করে কেন শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ পুরুষদের বিয়েতে বেশি যৌতুকের দাবি করা হয়। কিন্তু এই অর্থনৈতিক যুক্তিটি নৈতিকভাবে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য, কারণ এটি নারীকে পণ্যে পরিণত করে।

বাংলাদেশে যৌতুকের বর্তমান সমস্যা বহুমাত্রিক। প্রথমত, দরিদ্র পরিবারগুলো মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য ঋণ করে বা সম্পদ বিক্রি করে যৌতুক দেয়, যা পরিবারকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়। দ্বিতীয়ত, বিয়ের পরেও যৌতুকের দাবি অব্যাহত থাকে এবং দাবি পূরণ না হলে নির্যাতন শুরু হয়। তৃতীয়ত, যৌতুকজনিত হত্যা ও আত্মহত্যা এখনো বাংলাদেশে একটি ভয়াবহ সমস্যা। চতুর্থত, এই সামাজিক সমস্যাটি শুধু গ্রামাঞ্চলে নয়, শহরাঞ্চলেও ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।

এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে, যৌতুক নিরোধ আইন একটি অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু সমস্যাটি হলো যে এই আইনটি কীভাবে তৈরি করা হয়েছে, কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং এর সুযোগের অপব্যবহার কীভাবে হচ্ছে, সেটাই এই তৃতীয় খণ্ডের মূল আলোচ্য বিষয়।

১.৩ ১৯৪৭-পরবর্তী আইনি হস্তক্ষেপ এবং বাংলাদেশে যৌতুক আইনের বিবর্তন

ভারত উপমহাদেশে যৌতুক নিরোধের প্রথম আনুষ্ঠানিক আইনি উদ্যোগ দেখা যায় স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে। ভারতে ১৯৬১ সালে Dowry Prohibition Act প্রণীত হয় এবং পাকিস্তানে ১৯৭৬ সালে Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act তৈরি হয়। বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণীত হয়, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার নয় বছর পরের ঘটনা।

এই বিলম্বটি তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রথম দশকে যৌতুকের সমস্যাকে আলাদাভাবে আইন করে মোকাবেলার তেমন উদ্যোগ ছিল না, কারণ তখনো বিদ্যমান ফৌজদারি আইন দিয়ে যৌতুকজনিত নির্যাতনের মামলা করা হত। ১৯৮০ সালে জিয়াউর রহমানের সরকারের আমলে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণীত হয়, যদিও এই আইনের কার্যকারিতা নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন ছিল। আইনটি যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া উভয়কেই অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিল, যা ছিল একটি মৌলিক ত্রুটি, কারণ যৌতুক প্রদানকারী কনে পক্ষ সাধারণত সামাজিক চাপের শিকার, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়।

১৯৮০ সালের আইনটি পরবর্তীতে ১৯৮২, ১৯৮৪ এবং ১৯৮৬ সালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংশোধিত হয়। তারপর ২০১৮ সালে একটি নতুন যৌতুক নিষেধ আইন সংসদে পাস হয়, যা আগের আইনকে আরও বিস্তারিতভাবে পুনর্গঠন করে। এই ক্রমবিকাশটি দেখায় যে আইনটি বারবার সংশোধনের মুখে পড়েছে, কারণ প্রতিটি সংস্করণই কিছু না কিছু সমস্যা তৈরি করেছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ১১ যৌতুকসংক্রান্ত সহিংসতার জন্য পৃথক এবং আরও কঠোর শাস্তির বিধান রেখেছে। এর ফলে বাংলাদেশে যৌতুক সংক্রান্ত মামলায় একটি জটিল আইনি কাঠামো তৈরি হয়েছে যেখানে একাধিক আইন একসাথে প্রযোজ্য হতে পারে। এই জটিলতা এক দিকে যেমন প্রকৃত ভিকটিমের জন্য সুরক্ষা বাড়িয়েছে, অন্য দিকে মিথ্যা মামলাকারীদের জন্য আরও বেশি সুযোগ তৈরি করেছে।

অধ্যায় ২: যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ এবং যৌতুক নিষেধ আইন ২০১৮: ধারাভিত্তিক বিশ্লেষণ

২.১ ১৯৮০ সালের আইনের মূল কাঠামো এবং তার সীমাবদ্ধতা

যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ বাংলাদেশের যৌতুকবিরোধী আইনি কাঠামোর ভিত্তি তৈরি করেছিল। এই আইনের ধারা ২ তে যৌতুকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল: যৌতুক বলতে বোঝায় বিয়ের সময় বা বিয়ের আগে বা পরে বিয়ের একটি পক্ষ থেকে অপর পক্ষকে বা একটি পক্ষের পিতামাতা বা অন্য কোনো ব্যক্তি থেকে বিয়ের অপর পক্ষকে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেওয়া বা দিতে সম্মত হওয়া যেকোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান নিরাপত্তা।

এই সংজ্ঞাটি অত্যন্ত ব্যাপক এবং অস্পষ্ট। এর মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, সংজ্ঞাটি "বিয়ের আগে বা পরে" উভয় সময়কে অন্তর্ভুক্ত করে, যা যৌতুকের পরিধিকে অসীম করে তোলে। বিয়ের বহু বছর পর স্বামীর পরিবার কোনো কারণে অর্থ বা সম্পদ চাইলেও সেটিকে যৌতুক হিসেবে দাবি করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, সংজ্ঞাটি যৌতুককে "বিয়ের শর্ত" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেনি, যার ফলে বিয়ের সময় দেওয়া স্বেচ্ছামূলক উপহারও যৌতুকের সংজ্ঞার মধ্যে পড়তে পারে। তৃতীয়ত, মুসলিম আইনে দেনমোহর ও মোহরানার সাথে যৌতুকের পার্থক্য স্পষ্ট করা হয়নি।

ধারা ৩ তে যৌতুকের দাবি করার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছিল: সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়। কিন্তু জরিমানার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি, যা বিচারকের বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই অনির্দিষ্টতা বিচারিক পক্ষপাতের সুযোগ তৈরি করে।

ধারা ৪ তে যৌতুক দেওয়া বা নেওয়া উভয়কেই অপরাধ বলা হয়েছে। এটি আইনের সবচেয়ে বিতর্কিত দিক। যে পরিবার সামাজিক চাপে মেয়ের বিয়ের জন্য যৌতুক দিতে বাধ্য হয়েছে, তারাও এই আইনে অপরাধী। এই বিধানটি প্রকৃত সমস্যার কারণটিকে ভুলভাবে চিহ্নিত করে। যৌতুকের সমস্যার মূলে রয়েছে বর পক্ষের দাবি এবং সামাজিক চাপ, কনে পক্ষের ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। তাই দাতাকে দণ্ড দেওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়।

ধারা ৫ তে যৌতুকসংক্রান্ত চুক্তিকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিধানটি সঠিক, কারণ এটি যৌতুক সংক্রান্ত যেকোনো চুক্তিকে আইনি কার্যকারিতাহীন করে দেয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৯৮০ সালের এই আইনটি ব্যবহারিক প্রয়োগে মোটামুটি অকার্যকর ছিল। কারণ আইনটিতে সুনির্দিষ্ট তদন্ত প্রক্রিয়া, প্রমাণের মানদণ্ড এবং বিচারিক প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে আইনটি কাগজে থেকে যায় এবং যৌতুক সমস্যার কোনো বাস্তব সমাধান হয় না।

২.২ যৌতুক নিষেধ আইন ২০১৮: একটি নতুন কাঠামো এবং তার জটিলতা

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে যৌতুক নিষেধ আইন ২০১৮ পাস হয়। এই আইনটি ১৯৮০ সালের আইনকে পুনর্গঠন করে এবং কিছু নতুন বিধান যোগ করে। এই আইনে যৌতুকের সংজ্ঞা আরও সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২০১৮ আইনের ধারা ২ (খ) তে যৌতুককে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে "বিয়ের প্রতিদান হিসেবে কোনো পক্ষের দ্বারা দাবিকৃত অর্থ বা যেকোনো সম্পদ।" এই সংজ্ঞাটি "বিয়ের প্রতিদান" ধারণাটি যোগ করেছে, যা আগের আইনের চেয়ে কিছুটা আরও সুনির্দিষ্ট। কিন্তু সংজ্ঞাটি এখনো যথেষ্ট স্পষ্ট নয়।

গুরুত্বপূর্ণভাবে, ২০১৮ আইনে একটি নতুন সংজ্ঞা যোগ হয়েছে: দেনমোহর বা মোহরানাকে যৌতুকের সংজ্ঞা থেকে স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, এবং বিয়ের উপহারকেও যৌতুকের সংজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি, কারণ আগের আইনে দেনমোহর এবং যৌতুকের মধ্যে বিভ্রান্তির সুযোগ ছিল।

ধারা ৩ তে যৌতুকের দাবি করাকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। শাস্তি সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড এবং জরিমানা হিসেবে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই প্রথমবারের মতো জরিমানার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা আগের আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি দূর করেছে।

ধারা ৪ তে যৌতুক দেওয়া বা নেওয়া উভয়কেই অপরাধ রাখা হয়েছে। এই বিধানটি ২০১৮ আইনেও পরিবর্তিত হয়নি, যদিও আইন বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘকাল ধরে এই বিধানের পরিবর্তনের দাবি করে আসছেন।

ধারা ৫ তে যৌতুকসংক্রান্ত চুক্তিকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে, আগের আইনের মতোই।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নতুন বিধান হলো ধারা ৬, যেখানে মিথ্যা যৌতুক মামলার শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে কেউ জেনেশুনে মিথ্যা যৌতুক মামলা করলে তাকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড দেওয়া যাবে। এই বিধানটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ, কারণ এটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে যে মিথ্যা যৌতুক মামলা একটি বাস্তব সমস্যা।

কিন্তু এই ধারাটি বাস্তবে কতটা কার্যকর? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের দেখতে হবে এই ধারাটির প্রয়োগের ইতিহাস। ২০১৮ সালে আইনটি পাস হওয়ার পর থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত এই ধারায় কতটি মামলা দায়ের হয়েছে এবং কতটিতে সফলভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেই তথ্য সরকারিভাবে সংকলিত নেই। কিন্তু আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে এই ধারাটি কার্যত অকার্যকর।

২.৩ আইনের সাথে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সম্পর্ক: একটি আইনি জটিলতা

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশে যৌতুক সংক্রান্ত মামলার আইনি জটিলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ একই বিষয়ে একাধিক আইন প্রযোজ্য হতে পারে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ১১ বলে যে যৌতুকের কারণে কোনো নারীর মৃত্যু ঘটানো বা আঘাত করার জন্য মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান রয়েছে। এছাড়া গৃহস্থালি সহিংসতা থেকে নারীর সুরক্ষা আইন ২০১০ এও যৌতুকসংক্রান্ত হয়রানিকে "গৃহস্থালি সহিংসতা" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

এই তিনটি আইনের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল। একটি পরিবারে যৌতুক সংক্রান্ত বিবাদে একজন নারী একসাথে তিনটি আইনে মামলা করতে পারেন: যৌতুক নিষেধ আইন ২০১৮ এর অধীনে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ১১ এর অধীনে, এবং গৃহস্থালি সহিংসতা সুরক্ষা আইন ২০১০ এর অধীনে। তিনটি আলাদা মামলায় একজন পুরুষ ও তার পরিবার একযোগে হয়রানির শিকার হতে পারেন।

আইনি তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই পরিস্থিতি "double jeopardy" বা দ্বিগুণ বিপদের ধারণার কাছাকাছি। যদিও দ্বিগুণ বিপদের আইনি নীতি সাধারণত একই অপরাধের জন্য দুবার বিচারের নিষেধাজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত, এখানে প্রশ্নটি হলো একই ঘটনা থেকে উদ্ভূত একাধিক মামলায় একজন ব্যক্তিকে একযোগে বিভিন্ন আদালতে হাজিরা দিতে হওয়া কতটা ন্যায়সঙ্গত। বিচার প্রক্রিয়ার এই বহুত্ব নিজেই একটি শাস্তির সমতুল্য, বিশেষত যখন আসামি আর্থিকভাবে সীমাবদ্ধ।

২.৪ যৌতুকের আইনি সংজ্ঞার সমস্যা: দেনমোহর, উপহার এবং যৌতুকের মধ্যে সীমারেখা

বাংলাদেশে যৌতুক মামলার সবচেয়ে জটিল আইনি প্রশ্নগুলোর একটি হলো কোনটি যৌতুক এবং কোনটি নয় তার সীমারেখা নির্ধারণ। মুসলিম পারিবারিক আইনে দেনমোহর ও মোহরানা হলো স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর প্রাপ্য একটি আর্থিক অধিকার। যৌতুক হলো কনে পক্ষ থেকে বর পক্ষের দিকে যাওয়া সম্পদ। এই দুটি ধারণা পরিপূর্ণভাবে বিপরীত।

কিন্তু সামাজিক বাস্তবতায় এই পার্থক্যটি সবসময় স্পষ্ট থাকে না। বিয়ের সময় উভয় পক্ষ থেকে যে উপহার দেওয়া হয়, সেগুলো কোনটি যৌতুক এবং কোনটি স্বেচ্ছামূলক উপহার? বিয়ের পরিকল্পনার আলোচনায় যদি কনে পক্ষ স্বেচ্ছায় কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, সেটা কি যৌতুক? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বিচারিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে এবং ব্যাখ্যায় পার্থক্য থাকলে বিচারিক ফলাফলেও পার্থক্য আসে।

২০১৮ আইনে বিয়ের উপহারকে যৌতুকের সংজ্ঞা থেকে আলাদা করা হয়েছে, কিন্তু "উপহার" এর সংজ্ঞা কী সেটা স্পষ্ট নয়। কত টাকার উপহার স্বাভাবিক এবং কত টাকার উপহার "বিয়ের প্রতিদান" হিসেবে বিবেচিত হবে, এটা নিয়ে আইনে কোনো নির্দেশনা নেই। এই অস্পষ্টতা মিথ্যা মামলার সুযোগ তৈরি করে।

একটি সাধারণ পরিস্থিতি কল্পনা করুন: বিয়ের সময় কনে পক্ষ স্বামীকে একটি মোটরসাইকেল উপহার দিল। বছর দুই পরে দাম্পত্য বিরোধ শুরু হলে কনে পক্ষ দাবি করল যে এই মোটরসাইকেলটি যৌতুক হিসেবে দাওয়া হয়েছিল। আইনের ভাষায় এটি প্রমাণ করা কঠিন হলেও একটি মামলা দায়ের করা এবং স্বামীকে হয়রান করা সহজ। এই ধরনের পরিস্থিতি বাংলাদেশের আদালতে প্রতিদিনই ঘটে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ৩: যৌতুক আইনের অপব্যবহার: পরিসংখ্যান, ধরন এবং সামাজিক পরিণতি

৩.১ মিথ্যা যৌতুক মামলার পরিসংখ্যান এবং তার সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে মিথ্যা যৌতুক মামলার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এর একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, সরকারি তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থায় মামলার ফলাফল সিস্টেমেটিকভাবে ট্র্যাক করা হয় না। দ্বিতীয়ত, মামলা প্রত্যাহার বা মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হলে সেটা মিথ্যা মামলার প্রমাণ হিসেবে রেকর্ড হয় না। তৃতীয়ত, আসামির খালাস পাওয়াও সবসময় মিথ্যা মামলার প্রমাণ নয়, কারণ সাক্ষ্যের অভাবেও খালাস হতে পারে।

তবে বিভিন্ন গবেষণা এবং আইনজীবী সমিতির তথ্য থেকে কিছু প্রবণতা বোঝা সম্ভব। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে যৌতুক মামলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দাম্পত্য বিরোধ বা বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মধ্যে দায়ের হয়। গবেষক মো. খায়রুল আনওয়ার রবিন ২০২৪ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশে যৌতুক নিষেধ আইন ২০১৮ এর অপব্যবহারের একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা রয়েছে, যেখানে আইনটি মূলত পুরুষ ও তার পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভারতের পরিসংখ্যান বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে বোঝার জন্য একটি তুলনামূলক রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ভারতের National Crime Records Bureau (NCRB) এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতে IPC ধারা ৪৯৮A (বিবাহিত নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা) মামলায় দোষী সাব্যস্তির হার অত্যন্ত কম, যা মিথ্যা মামলার উচ্চ হারকে ইঙ্গিত করে। বাংলাদেশের পরিস্থিতিও অনুরূপ বলে ধারণা করা যায়।

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালে যৌতুক সংক্রান্ত মামলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শেষ পর্যন্ত খালাসে শেষ হয় বলে বিভিন্ন আইনজীবী সংস্থার প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। এই খালাসের হার ৫০ শতাংশের বেশি বলে কোনো কোনো রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, যদিও সরকারিভাবে এই তথ্য যাচাই করা কঠিন। কিন্তু এমনকি যদি এই সংখ্যাটি অতিরঞ্জিতও হয়, খালাসের হার যাই হোক না কেন, সেটা নির্দেশ করে যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলায় প্রকৃত অপরাধের প্রমাণ নেই।

৩.২ মিথ্যা মামলার ধরন ও কৌশল: একটি সামাজিক পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশে যৌতুক আইনের অপব্যবহার কয়েকটি সাধারণ ধরনে ঘটতে দেখা যায়। এই ধরনগুলো চিহ্নিত করা গেলে আইনি সংস্কার আরও কার্যকর হতে পারে।

প্রথম ধরন হলো বিবাহবিচ্ছেদ-পূর্ববর্তী কৌশল। স্বামী তালাক দেওয়ার আগেই বা স্ত্রী তালাকের দাবি তোলার আগেই, আর্থিক সুবিধা আদায়ের জন্য স্বামী ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে যৌতুক মামলা করা হয়। এই কৌশলে আসামি কারাগারে বা জামিনের জন্য লড়াই করতে থাকলে সে দেনমোহর, ভরণপোষণ এবং অন্যান্য দাবিতে রাজি হতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় ধরন হলো পারিবারিক সম্পত্তি বিরোধ। শ্বশুর বা দেবরের সাথে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ হলে তাদেরও যৌতুক মামলায় আসামি করা হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে যৌতুক মামলায় স্বামীর

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পরিবারের সকলকে আসামি করার সুযোগ থাকে। ফলে একটি মামলায় দশ থেকে বিশজন পর্যন্ত আসামি থাকতে পারে, যার মধ্যে অনেকে ঘটনার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নন।

তৃতীয় ধরন হলো সামাজিক প্রতিশোধ। পারিবারিক অপমান বা বিরোধের প্রতিক্রিয়ায় যৌতুক মামলাকে সামাজিক প্রতিশোধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিশেষত মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে যেখানে সামাজিক সম্মান গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে যৌতুক মামলার হুমকি দিয়ে স্বামী পক্ষকে চাপে রাখা হয়।

চতুর্থ ধরন হলো পেশাগত হয়রানি। যখন একজন পুরুষ কোনো সরকারি পদে বা সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পেশায় থাকেন, তখন মিথ্যা যৌতুক মামলা তার পেশাগত জীবনকে ধ্বংস করার কার্যকর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গ্রেফতার, রিমান্ড এবং সামাজিক লাঞ্ছনার ভয়ে অনেকে বিশাল অঙ্কের অর্থ দিতে বাধ্য হন।

পঞ্চম ধরন হলো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা ব্যক্তিগত শত্রুকে হয়রান করার জন্যও যৌতুক মামলাকে ব্যবহার করা হয়। এই ক্ষেত্রে একজন তৃতীয় পক্ষের নারীকে ব্যবহার করে মামলা করা হয়।

৩.৩ মিথ্যা মামলার সামাজিক পরিণতি: ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের উপর প্রভাব

মিথ্যা যৌতুক মামলার সামাজিক পরিণতি বহুমাত্রিক এবং গভীর। এটি শুধু আইনি সমস্যা নয়, এটি একটি সামাজিক সংকট যা পরিবার, পেশা এবং সামাজিক বন্ধনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে একজন পুরুষ যখন মিথ্যা যৌতুক মামলার শিকার হন, তখন তার উপর যে ক্ষতি হয় তা অপূরণীয়। প্রথমত, গ্রেফতার এবং কারাবাস তার পেশাগত জীবনকে ধ্বংস করে। সরকারি চাকরিজীবীরা গ্রেফতারের পর বরখাস্ত হতে পারেন। বেসরকারি চাকরিজীবীরা চাকরি হারান। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয়ত, সামাজিক লাঞ্ছনা অত্যন্ত তীব্র। বাংলাদেশের সমাজে যৌতুক নেওয়ার অভিযোগটি সামাজিক কলঙ্কের সমতুল্য। তৃতীয়ত, মামলা লড়ার খরচ অনেক পরিবারের জন্য ধ্বংসাত্মক। আইনজীবীর ফি, আদালতে যাতায়াতের খরচ এবং মামলার বিভিন্ন ব্যয় মিলিয়ে একটি পরিবার সর্বস্বান্ত হতে পারে।

পারিবারিক পর্যায়ে মিথ্যা মামলার প্রভাব আরও ব্যাপক। যখন একটি পরিবারের পিতা বা পুত্রকে কারাগারে পাঠানো হয়, তখন পুরো পরিবার বিপর্যস্ত হয়। শিশুরা পিতার সাথে সংযোগ হারায়। মা-বাবা সামাজিক লাঞ্ছনার মুখে পড়েন। ভাই-বোনের বিবাহের সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবারের আর্থিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

সামাজিক পর্যায়ে মিথ্যা মামলার প্রভাব হলো আইনের প্রতি আস্থার ক্ষয়। যখন মানুষ দেখে যে আইনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তখন আইনের প্রতি সম্মান হ্রাস পায়। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ক্ষতি।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিণতি হলো বিবাহবিমুখতা। যখন তরুণ পুরুষরা দেখেন যে বিবাহের পরে যৌতুক মামলার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন অনেকে বিবাহে আগ্রহ হারান বা বিবাহ বিলম্বিত করেন। এই প্রবণতা সমাজের পারিবারিক কাঠামোকে দুর্বল করে।

৩.৪ ব্ল্যাকমেইলিং ইন্ডাস্ট্রি: যৌতুক আইনের বাণিজ্যিকীকরণ

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশে একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা হলো যৌতুক মামলাকে কেন্দ্র করে একটি অনানুষ্ঠানিক "ব্ল্যাকমেইলিং ইন্ডাস্ট্রি" তৈরি হয়েছে। এই ইন্ডাস্ট্রিতে কয়েকটি শ্রেণির অংশগ্রহণ রয়েছে।

প্রথম শ্রেণিতে রয়েছেন অসাধু আইনজীবীরা। কিছু অসাধু আইনজীবী বিবাহবিচ্ছেদ বা পারিবারিক বিরোধে নারীদের পরামর্শ দেন যে যৌতুক মামলা করলে স্বামী পক্ষ থেকে বেশি টাকা আদায় করা যাবে। এই পরামর্শের পরিণতিতে আইনি কার্যক্রমের মাধ্যমে বড় মীমাংসার ব্যবস্থা হয়, যেখানে আইনজীবী বড় কমিশন পান।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছেন মামলা-ব্যবসায়ীরা। স্থানীয়ভাবে কিছু লোক রয়েছেন যারা পারিবারিক বিরোধ মেটানোর নামে যৌতুক মামলার হুমকি দিয়ে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এই মধ্যস্থতাকারীরা উভয় পক্ষ থেকেই কমিশন নেন।

তৃতীয় শ্রেণিতে রয়েছেন দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ কর্মকর্তারা। কিছু পুলিশ কর্মকর্তা যৌতুক মামলার তদন্তকে টাকা আদায়ের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেন। আসামি পক্ষ থেকে "সুবিধা" নিলে তদন্ত ঢিলে হয়, অন্যথায় দ্রুত গ্রেফতার হয়।

এই ব্ল্যাকমেইলিং কাঠামোটি যৌতুক আইনের মূল উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দেয়। আইনটি প্রকৃত যৌতুক ভিকটিমদের সুরক্ষার পরিবর্তে মুনাফা-মোটানোর হাতিয়ারে পরিণত হয়।

অধ্যায় ৪: ভারতের IPC ধারা ৪৯৮A এবং বাংলাদেশের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

৪.১ ভারতের ৪৯৮A এর ইতিহাস এবং অপব্যবহারের সংকট

ভারতে যৌতুক সংক্রান্ত মামলার সবচেয়ে বিখ্যাত আইনি বিধান হলো ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮A ধারা, যা ১৯৮৩ সালে যুক্ত করা হয়েছিল। এই ধারায় স্বামী বা তার পরিবার কর্তৃক বিবাহিত নারীকে নিষ্ঠুরভাবে আচরণ করার শাস্তির বিধান রয়েছে। এটি একটি অ-জামিনযোগ্য এবং আমলযোগ্য অপরাধ, অর্থাৎ পুলিশ পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার করতে পারে এবং অভিযুক্তকে জামিন পাওয়ার অধিকার নেই।

ভারতে এই আইনের অপব্যবহার এতটাই ব্যাপক হয়েছে যে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত এই বিষয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ২০১৪ সালে Arnesh Kumar v. State of Bihar মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দিয়েছিল। এই মামলায় বিচারপতিরা বলেছিলেন যে ৪৯৮A এর অধীনে স্বয়ংক্রিয় গ্রেফতার ন্যায়সঙ্গত নয় এবং গ্রেফতারের আগে প্রাথমিক তদন্ত করা উচিত।

Arnesh Kumar মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এমন একটি নির্দেশ জারি করেছিল যা পরে "Arnesh Kumar গাইডলাইন" নামে পরিচিত হয়েছে। এই গাইডলাইন অনুযায়ী, ৪৯৮A সহ বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতারের আগে পুলিশকে নির্দিষ্ট চেকলিস্ট অনুসরণ করতে হবে এবং যৌক্তিকভাবে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে হবে। এই রায়টি ভারতে ৪৯৮A মামলায় মিথ্যা গ্রেফতারের সমস্যাটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

২০১৭ সালে Rajesh Sharma v. State of Uttar Pradesh মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিয়েছিল, যেখানে ৪৯৮A মামলায় গ্রেফতারের আগে একটি পরিবার কল্যাণ কমিটির মাধ্যমে মামলা পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে Social Action Forum for Manav Adhikar v. Union of India মামলায় এই নির্দেশ পরিমার্জন করা হয়েছে, কিন্তু মূল উদ্বেগটি এখনো বিদ্যমান।

ভারতের NCRB তথ্য দেখায় যে ৪৯৮A মামলায় দোষী সাব্যস্তির হার ভারতীয় ফৌজদারি মামলার গড় দোষী সাব্যস্তির হারের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এই তথ্যটি মিথ্যা মামলার উচ্চ প্রবণতাকেই ইঙ্গিত করে।

৪.২ বাংলাদেশ বনাম ভারত: আইনি কাঠামোর তুলনা

বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌতুক আইনি কাঠামোর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মিল এবং পার্থক্য রয়েছে।

মিলের দিক থেকে, উভয় দেশেই যৌতুক দাবি করা এবং দেওয়া উভয়কে অপরাধ বলা হয়েছে, উভয় দেশেই যৌতুক সংক্রান্ত অপরাধ জামিন অযোগ্য, এবং উভয় দেশেই এই আইনের ব্যাপক অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে।

পার্থক্যের দিক থেকে, ভারতে ৪৯৮A একটি সাধারণ ফৌজদারি আইনের অধীনে এবং বাংলাদেশে যৌতুকজনিত সহিংসতার জন্য একটি বিশেষ আইন অর্থাৎ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন রয়েছে। বাংলাদেশে ২০১৮ সালে মিথ্যা মামলার শাস্তির বিধান আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ করা হয়েছে, যা ভারতের ৪৯৮A তে নেই। ভারতে সুপ্রিম কোর্টের Arnesh Kumar গাইডলাইনের মতো বাংলাদেশে উচ্চ আদালতের এমন কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো বিচারিক সক্রিয়তার ক্ষেত্রে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই সমস্যায় সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছে এবং স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট এখনো এই বিষয়ে তুলনামূলকভাবে নিষ্ক্রিয়।

৪.৩ শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানের তুলনামূলক অভিজ্ঞতা

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর অভিজ্ঞতাও এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক।

শ্রীলঙ্কায় যৌতুক প্রথা মূলত হিন্দু তামিল সম্প্রদায়ে প্রচলিত, মুসলিম ও সিংহলী সম্প্রদায়ে কম। শ্রীলঙ্কায় যৌতুক সংক্রান্ত আলাদা আইন নেই, বরং সাধারণ ফৌজদারি আইনে যৌতুকজনিত সহিংসতাকে মোকাবেলা করা হয়। এই পদ্ধতিটি আইনের অপব্যবহারের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কমায়।

পাকিস্তানে Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976 এর ইতিহাস বাংলাদেশের অনুরূপ। পাকিস্তানেও এই আইনের অপব্যবহার একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পাকিস্তানের উচ্চ আদালত বারবার এই সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

পাশ্চাত্য দেশগুলোতে যৌতুক প্রথা অস্তিত্বহীন, তাই সেখানে যৌতুক নিরোধ আইনও নেই। কিন্তু "forced marriage" বা বলপূর্বক বিবাহের বিরুদ্ধে আইন আছে, এবং সেই আইনগুলোতে লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

হয়েছে। যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ায় বলপূর্বক বিবাহ এবং বিবাহসংক্রান্ত সহিংসতার আইনগুলো যেকোনো লিঙ্গের ব্যক্তিকে রক্ষা করে।

৪.৪ তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে শিক্ষা: বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিকতা

তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায় যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক।

প্রথম শিক্ষা হলো বিচারিক সক্রিয়তার গুরুত্ব। ভারতের উদাহরণ দেখায় যে আইনি সংস্কারে সংসদ যদি পিছিয়ে থাকে, তাহলে উচ্চ আদালত সক্রিয়ভাবে গাইডলাইন তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টও এই ভূমিকা পালন করতে পারে।

দ্বিতীয় শিক্ষা হলো তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা। ভারতে NCRB এর তথ্য নীতিনির্ধারণে সহায়তা করে। বাংলাদেশে যৌতুক মামলার ফলাফলের সিস্টেমেটিক তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা নেই। এই তথ্যভিত্তি তৈরি করা সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ।

তৃতীয় শিক্ষা হলো আইনি সংজ্ঞার গুরুত্ব। যৌতুকের সংজ্ঞা যত স্পষ্ট হবে, অপব্যবহারের সুযোগ তত কমবে। ভারতের অভিজ্ঞতা দেখায় যে অস্পষ্ট সংজ্ঞা অপব্যবহারের পথ খোলে।

চতুর্থ শিক্ষা হলো মিথ্যা মামলার কার্যকর প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা। শুধু মিথ্যা মামলার শাস্তির বিধান থাকলেই হবে না, সেই বিধান কার্যকরভাবে প্রয়োগ হতে হবে।

অধ্যায় ৫: যৌতুক আইনের জুরিসপ্রুডেন্টিয়াল বিশ্লেষণ

৫.১ আইনের উদ্দেশ্য এবং কার্যকারিতার মধ্যে ফাঁক: টেলিওলজিক্যাল বিশ্লেষণ

আইনের দর্শনে "টেলিওলজিক্যাল" বা উদ্দেশ্যমুখী বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে একটি আইনকে তার ঘোষিত উদ্দেশ্যের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়। যদি আইনটি তার উদ্দেশ্য পূরণ করছে না বা বিপরীত ফল দিচ্ছে, তাহলে সেই আইনকে সংস্কার বা বাতিল করার যুক্তিগত ভিত্তি রয়েছে।

যৌতুক নিষেধ আইনের ঘোষিত উদ্দেশ্য হলো যৌতুক প্রথা নির্মূল করা এবং যৌতুকের শিকার নারীদের সুরক্ষা দেওয়া। টেলিওলজিক্যাল মানদণ্ডে এই আইনকে মূল্যায়ন করলে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে।

প্রথম প্রশ্ন হলো: বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা কি হ্রাস পেয়েছে? বাস্তব উত্তর হলো না, বরং যৌতুকের প্রচলন ও পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি ইঙ্গিত করে যে আইনটি তার প্রাথমিক উদ্দেশ্যে সফল হয়নি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো: আইনটি কি যৌতুকের শিকার নারীদের কার্যকর সুরক্ষা দিচ্ছে? এর উত্তর মিশ্র। যৌতুকজনিত সহিংসতা এখনো বাংলাদেশে একটি গুরুতর সমস্যা, যদিও আইনি প্রতিকারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

তৃতীয় প্রশ্ন হলো: আইনটি কি অন্য কোনো ক্ষতিকর প্রভাব তৈরি করছে? এর উত্তর হলো হ্যাঁ। মিথ্যা মামলার বিস্তার একটি নতুন সামাজিক সমস্যা তৈরি করেছে।

এই টেলিওলজিক্যাল বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে যৌতুক নিষেধ আইন তার উদ্দেশ্যে সীমিতভাবে সফল, কিন্তু এর অনিচ্ছাকৃত পরিণতিগুলো আইনের মূল লক্ষ্য অর্জনকে কঠিন করে তুলেছে।

৫.২ রনাল্ড ড্বোরকিনের আইনের সমতা তত্ত্ব এবং যৌতুক আইন

রনাল্ড ড্বোরকিন তাঁর "Taking Rights Seriously" গ্রন্থে যুক্তি দিয়েছেন যে আইন শুধু নিয়মের সমষ্টি নয়, এটি নীতি এবং মূল্যবোধেরও একটি অভিব্যক্তি। ড্বোরকিনের "Rights as Trumps" তত্ত্ব অনুযায়ী, ব্যক্তির অধিকারগুলো সামাজিক সুবিধার বিবেচনার বিপরীতে টিকে থাকতে পারে।

যৌতুক নিষেধ আইনের প্রেক্ষাপটে ড্বোরকিনের তত্ত্ব প্রয়োগ করলে একটি জটিল প্রশ্ন ওঠে। আইনটি সামাজিক সুবিধার জন্য অর্থাৎ যৌতুক প্রথা নির্মূলের জন্য পুরুষের কিছু অধিকার সীমিত করে। ড্বোরকিনের দৃষ্টিতে, যদি এই সীমাবদ্ধতা মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে, তাহলে এটি ন্যায়সঙ্গত নয়, এমনকি যদি সামাজিক সুবিধার দাবিও থাকে।

নির্দোষিতার অনুমানের অধিকার, ন্যায়বিচারের অধিকার এবং স্বাধীনতার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। যৌতুক নিষেধ আইনে জামিন অযোগ্যতার বিধান এই মৌলিক অধিকারগুলোকে বাধাগ্রস্ত করে। ড্বোরকিনের তত্ত্বে এই বাধাগ্রস্ততা অন্যায়।

তবে ড্বোরকিন স্বীকার করেন যে কিছু ক্ষেত্রে অধিকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকে। যৌতুকের শিকার নারীর অধিকার এবং অভিযুক্ত পুরুষের অধিকার উভয়ই সুরক্ষিত হওয়া উচিত। যখন একটি আইন একটি অধিকারকে অন্যটির বিরুদ্ধে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অগ্রাধিকার দেয়, তখন এটি ড্বোরকিনিয়ান অর্থে সমস্যাজনক।

৫.৩ হ্যান্স কেলসেনের নর্মেটিভিজম এবং আইনি শ্রেণিবিন্যাসের সমস্যা

হ্যান্স কেলসেনের আইনি পজিটিভিজম, বিশেষত তাঁর "Grundnorm" বা মূলমানের ধারণা, যৌতুক আইনের সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে।

কেলসেনের কাঠামোয় একটি রাষ্ট্রের আইনি নিয়মগুলো একটি শ্রেণিবদ্ধ কাঠামোতে সংগঠিত। সর্বোচ্চ স্তরে থাকে সংবিধান, তারপর আইন, তারপর বিধিমালা। নিম্নতর স্তরের নিয়ম উচ্চতর স্তরের নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যদি সামঞ্জস্য না থাকে, তাহলে নিম্নতর নিয়মটি অবৈধ।

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ সমতার নীতি ঘোষণা করে এবং ২৮ অনুচ্ছেদ লিঙ্গভেদে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে। কেলসেনের কাঠামোয় প্রশ্ন হলো: যৌতুক নিষেধ আইন কি সংবিধানের এই বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

এই প্রশ্নের সহজ উত্তর নেই। একদিকে, ২৮(৪) অনুচ্ছেদ নারীর জন্য বিশেষ বিধান তৈরির অনুমতি দেয়, যা যৌতুক নিষেধ আইনের নারীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সাংবিধানিক বৈধতা দিতে পারে। অন্যদিকে, যদি আইনটি

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এমনভাবে প্রয়োগ হয় যা পুরুষকে নির্দোষিতার অনুমান থেকে বঞ্চিত করে, তাহলে সেটি সংবিধানের ৩১ এবং ৩৩ অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক।

কেলসেনিয়ান বিশ্লেষণে আইনের বৈধতা শুধু আনুষ্ঠানিক উৎসের (সংসদ) উপর নির্ভরশীল, নৈতিকতার উপর নয়। কিন্তু সাংবিধানিক সীমার মধ্যে থাকতে হবে। যদি বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট কখনো যৌতুক আইনের জামিন অযোগ্যতার বিধানকে সাংবিধানিক মানদণ্ডে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ পায়, তাহলে সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি লড়াই হবে।

৫.৪ ফ্রেড্রিক হায়েকের আইনের নিয়মের তত্ব এবং বিচারিক বিবেচনাধীনতার সমস্যা

অস্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ এবং আইনতত্ত্ববিদ ফ্রেডরিক হায়েক তাঁর "The Constitution of Liberty" এবং "Law, Legislation and Liberty" গ্রন্থে আইনের শাসনের একটি বিস্তারিত তত্ব উপস্থাপন করেছেন। হায়েকের মতে, সুষ্ঠু আইনি কাঠামোর জন্য "rule of law" বা আইনের শাসনের কিছু মূলনীতি মেনে চলা আবশ্যক। এই মূলনীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে: আইন সাধারণ ও বিমূর্ত হবে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে নয়; আইন পূর্বানুমানযোগ্য হবে; বিচারিক বিবেচনাধীনতা সীমিত থাকবে।

বাংলাদেশের যৌতুক নিষেধ আইন এই মূলনীতিগুলোর কিছু লঙ্ঘন করে। প্রথমত, আইনটি সাধারণ নয়, এটি লিঙ্গ-নির্দিষ্ট। দ্বিতীয়ত, "যৌতুক" এর অস্পষ্ট সংজ্ঞার কারণে আইনটি পূর্বানুমানযোগ্য নয়, অর্থাৎ কোনটি যৌতুক বলে বিবেচিত হবে সেটা আগে থেকে নিশ্চিত জানা কঠিন। তৃতীয়ত, বিচারকের বিবেচনাধীনতা অত্যধিক, বিশেষত শাস্তি নির্ধারণে।

হায়েকের "Spontaneous Order" বা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার ধারণায় সমাজের বিবর্তনীয় নিয়ম-কানুনের গুরুত্ব রয়েছে। যৌতুক প্রথা একটি সামাজিক বিবর্তনীয় ব্যবস্থা যা রাতারাতি আইন দিয়ে নির্মূল করা সম্ভব নয়। হায়েক মনে করতেন যে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য আইনি জবরদস্তি নয়, বরং সামাজিক বিবর্তন ও শিক্ষার উপর নির্ভর করা উচিত।

৫.৫ সেন এর সক্ষমতা পদ্ধতি এবং যৌতুক আইনের মূল্যায়ন

অমর্ত্য সেনের "Development as Freedom" গ্রন্থে তিনি সক্ষমতা পদ্ধতি অর্থাৎ "Capability Approach" উপস্থাপন করেছেন। এই পদ্ধতিতে মানুষের সত্যিকারের স্বাধীনতাকে মূল্যায়ন করা হয় তাদের সক্ষমতার আলোকে, শুধু তাদের আনুষ্ঠানিক অধিকারের আলোকে নয়।

সেনের কাঠামোয়, যৌতুক নিষেধ আইনের মূল্যায়নে আমাদের দেখতে হবে আইনটি কি বাস্তবে মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে? যৌতুকের শিকার নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেই আইনটি সফল।

কিন্তু একইসাথে, একজন নির্দোষ পুরুষের যখন মিথ্যা মামলায় সক্ষমতা হ্রাস পায়, কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়, পরিবারের ভরণপোষণের সক্ষমতা হারিয়ে যায়, তখন সেই ক্ষতিটিও সেনের কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠু আইনি কাঠামো সকলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, নির্দিষ্ট কারো সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অন্যের সক্ষমতা হ্রাস করে না।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

সেনের "Comparative Justice" বা তুলনামূলক ন্যায়বিচারের ধারণায়, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত বর্তমান পরিস্থিতির চেয়ে আরও ন্যায়সঙ্গত একটি পরিস্থিতির দিকে এগোনো, নিখুঁত ন্যায়বিচারের স্বপ্নের পেছনে ছোটা নয়।

অধ্যায় ৬: পারিবারিক আইন ও বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় যৌতুক আইনের ব্যবহার

৬.১ মুসলিম পারিবারিক আইন এবং যৌতুক আইনের আন্তঃসংযোগ

বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইনের কাঠামো মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ (MFLO) এবং পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ (FCO) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই আইনগুলো বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, দেনমোহর এবং ভরণপোষণের বিষয়গুলো পরিচালনা করে।

বাংলাদেশের বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নারীর তালাকের অধিকার (খুলা) এবং পুরুষের তালাক দেওয়ার পদ্ধতি। মুসলিম আইনে নারীর জন্য সরাসরি বিবাহবিচ্ছেদ করার সুযোগ সীমিত, যদি না "তালাক-ই-তাফউইজ" বা তালাকের ক্ষমতা বিয়ের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নারীকে সাধারণত আদালতে গিয়ে "ফাসখ" বা বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য মামলা করতে হয়।

এই পারিবারিক আইনি কাঠামোতে যৌতুক আইনের ব্যবহার একটি বিশেষ তাৎপর্য পায়। যখন একজন নারী বিবাহবিচ্ছেদ চান এবং পুরুষ সম্মত নয়, তখন যৌতুক মামলা একটি চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। আর যখন পুরুষ বিবাহবিচ্ছেদ চান কিন্তু নারী দেনমোহর ও ভরণপোষণের নিশ্চয়তা চান, তখনো যৌতুক মামলার হুমকি পুরুষকে রাজি করানোর অস্ত্র হয়।

এই পরিস্থিতিতে যৌতুক মামলা মূলত একটি দরকষাকষির হাতিয়ারে পরিণত হয়। বিবাহবিচ্ছেদ মীমাংসায় যখন দুই পক্ষের মধ্যে আর্থিক দাবি নিয়ে বিরোধ থাকে, তখন যৌতুক মামলার উপস্থিতি পুরুষকে বেশি দিতে বাধ্য করে। এই "দরকষাকষি শক্তি" আইনের একটি অনিচ্ছাকৃত পরিণতি।

৬.২ বিবাহবিচ্ছেদ আইনে পুরুষের অধিকারের শূন্যতা

বাংলাদেশের বিবাহবিচ্ছেদ-সংক্রান্ত আইনে পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে একটি গভীর শূন্যতা রয়েছে। মুসলিম আইনে তালাক দেওয়ার পুরুষের অধিকার আছে, কিন্তু এই তালাক কার্যকর হলে পুরুষকে দেনমোহরের পুরো পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে, স্ত্রীর ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ দিতে হবে এবং সন্তানের ভরণপোষণ দিতে হবে।

কিন্তু এই বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি পুরুষের কোনো অধিকার নেই যা তাকে সুরক্ষিত রাখে। যদি বিবাহের কারণ বা বিচ্ছেদের কারণ নারীর দোষজনিত হয়, তাহলেও পুরুষকে একই দায় বহন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি নারী বিয়েতে প্রতারণা করে থাকেন বা বৈবাহিক বিশ্বস্ততা লঙ্ঘন করেন, তাহলেও পুরুষকে পূর্ণ দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পারিবারিক আদালতে সন্তানের হেফাজতের বিষয়ে পুরুষের অধিকারও সীমিত। হানাফি আইনে ছেলেশিশু সাত বছর পর্যন্ত এবং মেয়েশিশু বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকার অনুমান রয়েছে। পিতা সন্তানের আইনি অভিভাবক হলেও কার্যত সন্তানের দৈনন্দিন যত্ন ও সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হন। এই পরিস্থিতি পিতার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

এই আইনি শূন্যতার মধ্যে যৌতুক মামলা আরও একটি স্তর যোগ করে। বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত পুরুষের উপর যৌতুক মামলার কারাদণ্ডের হুমকি তাকে সম্পূর্ণ অসহায় করে দেয়।

৬.৩ শিশুর হেফাজত এবং পিতার অধিকার: একটি উপেক্ষিত মাত্রা

বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থায় শিশু হেফাজতের বিষয়ে পিতার অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রায়শই উপেক্ষিত বিষয়। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এবং মুসলিম হানাফি আইনের মধ্যে শিশু হেফাজতের নীতিমালা কখনো কখনো পরস্পরবিরোধী।

হানাফি ফিকহে হেফাজত (হিজানাত) এর নীতি অনুযায়ী, ছোট শিশুর শারীরিক হেফাজতের অগ্রাধিকার মায়ের এবং মায়ের পরিবারের। কিন্তু পিতা শিশুর আইনি অভিভাবক। এই দুই ধারণার মধ্যে ব্যবহারিক দ্বন্দ্ব প্রায়ই আদালতে নিষ্পত্তি হয় মায়ের অনুকূলে।

বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতে শিশুর "কল্যাণের সর্বোচ্চ স্বার্থ" বিবেচনা করার কথা বলা হয়, কিন্তু এই বিবেচনায় পিতার সাথে শিশুর সম্পর্কের গুরুত্বকে প্রায়ই অবমূল্যায়ন করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে পিতার সাথে নিয়মিত সম্পর্ক শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমাদের আইন ও আদালত এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না।

যখন একজন পিতা যৌতুক মামলায় ফাঁসেন, তখন তার শিশুর হেফাজত পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি। মামলার মধ্যে থাকা পিতাকে আদালত হেফাজত দিতে সংকোচ করে। এই পরিস্থিতি শিশুকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে, কারণ পিতার অনুপস্থিতি শিশুর মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৬.৪ দেনমোহর এবং ভরণপোষণ আইনে পুরুষের অসম দায়িত্ব

মুসলিম পারিবারিক আইনে দেনমোহর নারীর একটি অপরিহার্য আর্থিক অধিকার। এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান যা নারীকে আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রণীত। এই বিধানটি নিজেই ন্যায়সঙ্গত এবং এর সাথে এই গ্রন্থের কোনো আপত্তি নেই।

কিন্তু বাংলাদেশে দেনমোহর নির্ধারণের পদ্ধতি এবং তার প্রয়োগে কিছু সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, বিয়ের সময় যে দেনমোহর নির্ধারণ হয়, তা প্রায়ই পুরুষের আর্থিক সক্ষমতার বাইরে হয়। অনেক পরিবারে সামাজিক চাপে বড় অঙ্কের দেনমোহর নির্ধারণ করা হয় যা পুরুষের পক্ষে পরিশোধ করা কঠিন। দ্বিতীয়ত, বিবাহবিচ্ছেদের পর দেনমোহরের সম্পূর্ণ পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে দাবি করা হলে পুরুষ প্রায়ই সর্বস্বান্ত হন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ভরণপোষণের ক্ষেত্রেও একটি অসামঞ্জস্য রয়েছে। পুরুষ স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ দিতে বাধ্য, কিন্তু পুরুষ যদি আর্থিক সংকটে থাকেন বা প্রতিবন্ধী হন, তাহলেও এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। অন্যদিকে, উপার্জনক্ষম নারীকে স্বামীর ভরণপোষণ দেওয়ার কোনো বিধান নেই, এমনকি যদি নারী পুরুষের চেয়ে বেশি উপার্জন করেন।

এই অসামঞ্জস্যটি একটি মৌলিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন তোলে। আধুনিক যুগে যখন নারীরা কর্মজীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর চেয়ে বেশি উপার্জন করছেন, তখন ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পুরুষের উপর রাখা কি আধুনিক সমতার ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

অধ্যায় ৭: রাজনৈতিক বিশ্লেষণ: কেন যৌতুক আইন সংস্কার হয় না?

৭.১ নির্বাচনী রাজনীতি এবং যৌতুক আইন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যৌতুক আইন সংস্কারের বিষয়টি একটি রাজনৈতিক বর্জন-ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতা প্রকাশ্যে যৌতুক আইনের সমালোচনা করতে চান না, কারণ এটি নারীবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে আসে।

বাংলাদেশের নারী ভোটারদের সংখ্যা মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেক। রাজনৈতিক দলগুলো নারীভোটারদের আকৃষ্ট করার জন্য "নারীবান্ধব" ভাবমূর্তি রক্ষায় সচেষ্ট থাকে। যৌতুক আইনের সংস্কারের কথা বললে এই ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এই রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের ফলে একটি বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সংসদে এমন কোনো রাজনীতিবিদ নেই যিনি প্রকাশ্যে বলবেন যে যৌতুক আইনের অপব্যবহার একটি সমস্যা এবং সংস্কার দরকার। সবাই জানেন সমস্যাটি আছে, কিন্তু কেউ রাজনৈতিক ঝুঁকি নিতে রাজি নন।

২০১৮ সালে যৌতুক নিষেধ আইনে মিথ্যা মামলার শাস্তির বিধান যোগ করার ঘটনাটি রাজনৈতিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই বিধানটি যোগ করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে এবং অভ্যন্তরীণ চাপে। কিন্তু এই বিধানটি কার্যকর করার কোনো প্রক্রিয়া বা ইচ্ছাশক্তি তৈরি হয়নি।

৭.২ নারী সংগঠনগুলোর ভূমিকা এবং পুরুষের অধিকার আন্দোলনের অনুপস্থিতি

বাংলাদেশে নারী অধিকার সংগঠনগুলো শক্তিশালী এবং সক্রিয়। মহিলা পরিষদ, জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, নারীপক্ষ এবং আরও অনেক সংগঠন নীতিনির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই সংগঠনগুলোর অনেক দাবিই ন্যায্য এবং তাদের কাজ প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এই সংগঠনগুলো স্বাভাবিকভাবেই নারীর অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করে, পুরুষের অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অন্যদিকে, পুরুষের অধিকার নিয়ে কাজ করার মতো কোনো সংগঠন বাংলাদেশে কার্যত অনুপস্থিত। কিছু অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এই বিষয়ে আলোচনা হয়, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পুরুষ অধিকার আন্দোলন গড়ে ওঠেনি।

এই অসামঞ্জস্যটি নীতিনির্ধারণকে প্রভাবিত করে। যখন নীতিনির্ধারকরা সিদ্ধান্ত নেন, তখন তারা সংগঠিত গোষ্ঠীর চাপের প্রতি সাড়া দেন। যৌতুক আইনের বিষয়ে নারী সংগঠনগুলো সক্রিয়ভাবে লবি করে বিদ্যমান আইন রক্ষার জন্য। কিন্তু আইন সংস্কারের দাবিতে সংগঠিত পুরুষ অধিকার গোষ্ঠী না থাকায় পুরুষের দৃষ্টিকোণটি নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে পারে না।

এটি একটি গণতান্ত্রিক সংকটও বটে। গণতন্ত্রে সকল নাগরিকের স্বার্থ প্রতিনিধিত্ব পাওয়া উচিত। কিন্তু যখন নীতিনির্ধারণ মূলত সংগঠিত চাপ গোষ্ঠীর প্রতি সাড়া দিয়ে হয়, তখন অসংগঠিত গোষ্ঠীর স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।

৭.৩ মিডিয়ার ভূমিকা: লিঙ্গ-পক্ষপাতী সংবাদ পরিবেশন

বাংলাদেশের মিডিয়া, বিশেষত সংবাদপত্র ও টেলিভিশন, যৌতুক সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনে একটি স্পষ্ট লিঙ্গ-পক্ষপাত বজায় রাখে। যৌতুকের শিকার নারীর গল্প প্রথম পাতায় আসে, কিন্তু মিথ্যা যৌতুক মামলার শিকার পুরুষের গল্প প্রায় কখনোই সংবাদমাধ্যমে স্থান পায় না।

এই মিডিয়া পক্ষপাতের কারণ কয়েকটি। প্রথমত, নারী ভিকটিমের গল্প বেশি সংবেদনশীল হওয়ায় পাঠকের মনোযোগ বেশি টানে। দ্বিতীয়ত, সাংবাদিকরাও সামাজিক মূল্যবোধের প্রভাব থেকে মুক্ত নন। তৃতীয়ত, মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষের গল্প করলে "নারীবিরোধী" সমালোচনা হওয়ার ভয় থাকে।

এই মিডিয়া পক্ষপাত সামাজিক মনোভাব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যখন মানুষ শুধু নারী ভিকটিমের গল্পই শোনেন, তখন তারা ধরে নেন যে যৌতুক মামলায় পুরুষই সবসময় দোষী। এই ধারণাটি আদালত পর্যন্ত পৌঁছায় এবং বিচারিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

সামাজিক মিডিয়ায় অবশ্য কিছুটা পরিবর্তন আসছে। বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষের গল্প আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মগুলো প্রায়ই একপাক্ষিক এবং মানসম্মত সাংবাদিকতার মান বজায় রাখে না।

৭.৪ ২০২৪-২০২৬ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং আইনি সংস্কারের সম্ভাবনা

২০২৪ সালের আগস্টে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে, সেটি একটি সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সংবিধান সংস্কার কমিশন, আইন কমিশন সংস্কার এবং বিচার বিভাগীয় সংস্কারের পরিকল্পনা।

তবে এই সংস্কার প্রক্রিয়ায় পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়টি এখনো স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত নয়। সংবিধান সংস্কার কমিশনে লিঙ্গ-সমতার আলোচনা মূলত নারীর অধিকার বৃদ্ধির দিকে কেন্দ্রীভূত, পুরুষের অধিকার রক্ষার দিকে নয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

২০২৫ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সংশোধনী আনা হয়েছে, যেখানে পুরুষকে ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং বিচারের সময়সীমা কমানো হয়েছে। এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু যৌতুক আইনে মৌলিক সংস্কার এখনো আলোচনায় আসেনি।

২০২৬ সালে যদি বাংলাদেশে নির্বাচন হয়, তাহলে নির্বাচনী রাজনীতির কারণে আবার যৌতুক আইন সংস্কারের সম্ভাবনা দূরে সরে যাবে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের আগে "পুরুষের অধিকার" নিয়ে কথা বলতে ভয় পাবে। এই বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে, যদি অন্তর্বর্তী সরকার এখনই সংস্কার শুরু করতে না পারেন, তাহলে এই সুযোগের জানালা বন্ধ হয়ে যাবে।

অধ্যায় ৮: সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণ: পুরুষের বিরুদ্ধে ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি

৮.১ ভিকটিম কার্ড: ধারণার সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ

"ভিকটিম কার্ড" ধারণাটি একটি আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা। এটি তখন ঘটে যখন কেউ প্রকৃত বা কথিত ভিকটিম পরিচয়কে সুবিধা আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এই ধারণাটি বোঝার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য করতে হবে।

প্রথম পার্থক্য হলো প্রকৃত ভিকটিম এবং ভিকটিম পরিচয়ের কৌশলগত ব্যবহারের মধ্যে। প্রকৃত ভিকটিম যিনি সত্যিকারের নির্যাতন বা অন্যায়ের শিকার হয়েছেন, তার জন্য আইনি সুরক্ষা চাওয়া সম্পূর্ণ ন্যায্য। কিন্তু যিনি ভিকটিম পরিচয়কে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করে সুবিধা আদায় করতে চান, তার বিষয়টি ভিন্ন।

দ্বিতীয় পার্থক্য হলো ব্যক্তিগত ভিকটিম কার্ড এবং কাঠামোগত ভিকটিম কার্ডের মধ্যে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যখন একজন নারী মিথ্যা যৌতুক মামলা করেন, তখন এটি ব্যক্তিগত ভিকটিম কার্ড। কিন্তু যখন পুরো আইনি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে ওঠে যে নারীর ভিকটিম পরিচয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুরুষের অপরাধীত্বকে ধরে নেয়, তখন এটি কাঠামোগত ভিকটিম কার্ড।

বাংলাদেশে উভয় ধরনের ভিকটিম কার্ড বিদ্যমান। ব্যক্তিগত পর্যায়ে মিথ্যা মামলার ঘটনা আছে এবং কাঠামোগত পর্যায়ে আইন ও বিচার ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে নারী অভিযোগকারীকে স্বাভাবিকভাবেই সত্যবাদী মনে করা হয়।

৮.২ সামাজিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ: কগনিটিভ পক্ষপাত এবং বিচারিক সিদ্ধান্ত

সামাজিক মনোবিজ্ঞানে "কগনিটিভ বায়াস" বা জ্ঞানগত পক্ষপাতের বিষয়টি আইনি বিচারকার্যে গুরুত্বপূর্ণ। বিচারকরাও মানুষ এবং তারাও সামাজিক পূর্বধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন।

"Confirmation Bias" বা নিশ্চায়ন পক্ষপাত একটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এই পক্ষপাতে মানুষ তার পূর্বের বিশ্বাসকে সমর্থন করে এমন তথ্যকে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং বিরোধী তথ্য উপেক্ষা করে। বিচারকরা যদি

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

আগে থেকেই ধারণা করে নেন যে যৌতুক মামলায় পুরুষই দোষী, তাহলে তারা প্রমাণ মূল্যায়নে এই পক্ষপাতের শিকার হতে পারেন।

"In-group Favoritism" বা নিজগোষ্ঠী সমর্থন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষপাত। মানুষ সাধারণত তার সাথে পরিচয়যোগ্য ব্যক্তির প্রতি বেশি সহানুভূতি দেখায়। নারী বিচারক বা আইনজীবীরা নারী বাদীর প্রতি এবং পুরুষ বিচারক বা আইনজীবীরা নারীর প্রতি সহানুভূতি দেখানোর সামাজিক প্রত্যাশার কারণে পুরুষ আসামির প্রতি সমদূরত্বে থাকার চেষ্টা করতে পারেন।

"Halo Effect" বা প্রভামণ্ডল প্রভাবও বিচারিক প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে। যদি নারী বাদী কান্নাকাটি করেন বা দুর্বল দেখান, তাহলে বিচারকের মনে তার বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব তৈরি হতে পারে।

এই জ্ঞানগত পক্ষপাতগুলো বিচারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোকাবেলা করা সম্ভব। বিচারকদের এই পক্ষপাতগুলো সম্পর্কে সচেতন করা এবং তা এড়ানোর পদ্ধতি শেখানো বিচারিক সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া উচিত।

৮.৩ মিডিয়া ট্রায়াল এবং পূর্বনির্ধারিত দোষী সাব্যস্তকরণ

বাংলাদেশে যৌতুক এবং নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলায় মিডিয়া ট্রায়ালের একটি ব্যাপক প্রবণতা রয়েছে। যখন কোনো মামলায় নারী বাদী এবং পুরুষ আসামি, তখন সংবাদমাধ্যম প্রায়ই আসামির নাম, ছবি ও ঠিকানা প্রকাশ করে, বিচারের আগেই তাকে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করে।

এই মিডিয়া ট্রায়াল আইনের মৌলিক নীতি "Presumption of Innocence" বা নির্দোষিতার অনুমানের লঙ্ঘন। আদালতে বিচার শেষ হওয়ার আগেই মিডিয়ায় যখন কাউকে অপরাধী হিসেবে চিত্রিত করা হয়, তখন তার সামাজিক মৃত্যু ঘটে যায়, এমনকি যদি পরে আদালত তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে।

মিডিয়া ট্রায়ালের আরেকটি সমস্যা হলো এটি বিচারিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। যদি বিচারক জনমতের চাপে থাকেন, তাহলে তার জন্য নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সাক্ষীরাও মিডিয়ার প্রভাবে প্রভাবিত হতে পারেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ধারা ২৪ এ ভিকটিমের পরিচয় প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু আসামির পরিচয় প্রকাশে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। এই বৈষম্যটিও আইনি মিসান্ড্রির একটি প্রকাশ।

৮.৪ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মব জাস্টিস এবং পুরুষের বিরুদ্ধে ভার্চুয়াল সহিংসতা

আধুনিক সমাজে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একটি নতুন ধরনের বিচার-পরিসর তৈরি করেছে, যাকে বলা হয় "মব জাস্টিস" বা গণপ্রতিশোধ। ফেসবুক, ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামে যদি কোনো নারী কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি বা যৌতুকের অভিযোগ করেন, তাহলে অভিযোগকারীর পক্ষে জনমত দ্রুত তীব্র হয় এবং অভিযুক্ত পুরুষের বিরুদ্ধে ভার্চুয়াল আক্রমণের ঢেউ ওঠে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই ভার্চুয়াল মব জাস্টিসের বৈশিষ্ট্য হলো এটি দ্রুত ছড়ায়, একটি পক্ষের বয়ানকে নিরীক্ষণ ছাড়াই গ্রহণ করে এবং অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয় না। অভিযুক্ত পুরুষের ছবি ভাইরাল হয়, নিয়োগকর্তা চাপে পড়ে তাকে বরখাস্ত করেন, বন্ধু ও পরিচিতরা সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং পুরো পরিবার লাঞ্ছনার শিকার হন।

পরে যদি দেখা যায় যে অভিযোগটি মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত ছিল, তাহলেও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া তথ্য মুছে যায় না। ক্ষতিগ্রস্ত পুরুষের ডিজিটাল পরিচয় স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত থাকে।

বাংলাদেশের ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন ২০১৮ (এবং তার স্থলে ২০২৩ সালে প্রণীত সাইবার সিকিউরিটি আইন) মূলত ডিজিটাল মিডিয়ায় অপরাধ দমনের জন্য তৈরি। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা অভিযোগ ছড়ানোর বিরুদ্ধে কার্যকর আইনি প্রতিকার এখনো অপ্রতুল।

অধ্যায় ৯: পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আইনি নিপীড়নের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

৯.১ পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য: একটি উপেক্ষিত সংকট

বাংলাদেশে পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য একটি গভীরভাবে উপেক্ষিত বিষয়। সামাজিকভাবে পুরুষদের কাছ থেকে "শক্তিশালী" এবং "আবেগমুক্ত" থাকার প্রত্যাশা থাকে। ফলে পুরুষরা মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করলেও তা প্রকাশ করতে পারেন না বা পেশাদার সহায়তা নিতে সামাজিক বাধার সম্মুখীন হন।

যখন একজন পুরুষ মিথ্যা যৌতুক মামলার শিকার হন, তখন তার উপর মানসিক চাপ অসহ্য মাত্রায় পৌঁছায়। সামাজিক লাঞ্ছনা, আর্থিক ধ্বংস, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যত একসাথে আসে। এই পরিস্থিতিতে বিষণ্নতা, উদ্বেগ ব্যাধি এবং চরম ক্ষেত্রে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।

বিশ্বের অনেক দেশে গবেষণা দেখিয়েছে যে মিথ্যা ফৌজদারি অভিযোগের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মহত্যার হার সাধারণ জনগোষ্ঠীর চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। ভারতে এই বিষয়ে কিছু তথ্য রয়েছে যা উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে এই বিষয়ে কোনো সরকারি তথ্য নেই, কিন্তু সামাজিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে যৌতুক মামলার কারণে পুরুষের আত্মহত্যা একটি বাস্তব ঘটনা।

৯.২ কারাবাসের মানসিক ক্ষতি এবং পুনর্বাসনের অভাব

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে জামিন অযোগ্যতার বিধানের কারণে মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষরা অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ কারাবাসের শিকার হন। বিচারের আগে কারাবাস শুধু শারীরিক সীমাবদ্ধতা নয়, এটি গভীর মানসিক ক্ষতিও করে।

বাংলাদেশের কারাগারগুলোর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অতিরিক্ত জনাকীর্ণ, স্বাস্থ্যবিধির ঘাটতি এবং মানসিক স্বাস্থ্য সেবার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি কারাবাসের মানসিক ক্ষতিকে আরও গভীর করে। যে ব্যক্তি নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও কারাগারে থাকেন, তার ক্ষতি অপূরণীয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

কারাবাসের পর পুনর্বাসনের কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেই। যখন একজন ব্যক্তি খালাস পেয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন তাকে নিজে নিজেই জীবন পুনর্গঠন করতে হয়। পেশা হারানো, সম্পদ নিঃশেষ হওয়া এবং সামাজিক সম্পর্ক ভেঙে পড়া অবস্থায় এই পুনর্গঠন অনেকের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৯.৩ পুরুষ ভিকটিমের জন্য সহায়তা কাঠামোর অনুপস্থিতি

বাংলাদেশে নারী ভিকটিমের জন্য রয়েছে সরকারি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, নারী ও শিশু সহায়তা কেন্দ্র এবং বিভিন্ন এনজিওর সেবা। এই সেবাগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়।

কিন্তু মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষ ভিকটিমের জন্য কোনো সরকারি বা সংগঠিত বেসরকারি সহায়তা কাঠামো নেই। যে পুরুষ মিথ্যা যৌতুক মামলায় ফেঁসে কারাগার থেকে বেরিয়েছেন, তার জন্য কোনো মানসিক স্বাস্থ্য সেবা, আইনি সহায়তা কেন্দ্র বা সামাজিক পুনর্বাসন কার্যক্রম নেই।

এই শূন্যতাটি কেবল আইনগত নয়, এটি একটি মানবিক ব্যর্থতাও। একটি ন্যায়বিচারমুখী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে কোনো ব্যক্তি যখন রাষ্ট্রীয় যন্ত্রপাতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো সেই ক্ষতি পূরণে সহায়তা করা।

অধ্যায় ১০: যৌতুক আইনের ধারা ৬ (মিথ্যা মামলার শাস্তি): কেন এটি কার্যকর নয়?

১০.১ ধারা ৬ এর বিষয়বস্তু এবং কার্যকর প্রয়োগের বাধা

যৌতুক নিষেধ আইন ২০১৮ এর ধারা ৬ মিথ্যা মামলার জন্য শাস্তির বিধান রেখেছে। কিন্তু ২০১৮ সালে আইনটি পাস হওয়ার পর থেকে এই ধারায় কোনো সফল বিচারের তথ্য পাওয়া যায় না। কেন এই ধারাটি কার্যত অকার্যকর সেটি বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

প্রথম বাধা হলো প্রমাণের কঠোর মানদণ্ড। ধারা ৬ এ মিথ্যা মামলার জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে হলে প্রমাণ করতে হবে যে বাদী "জেনেশুনে" বা "ইচ্ছাকৃতভাবে" মিথ্যা মামলা করেছেন। এই মানসিক উপাদানটি প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। একজন বাদী সহজেই বলতে পারেন যে তিনি ভুল বিশ্বাস করেছিলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলেননি।

দ্বিতীয় বাধা হলো পুলিশের অনিচ্ছা। পুলিশ মিথ্যা মামলাকারী নারীর বিরুদ্ধে মামলা নিতে সাধারণত অনিচ্ছুক। এর কারণ সামাজিক চাপ, রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা এবং কিছু ক্ষেত্রে পুলিশি দুর্নীতি। যে পুলিশ কর্মকর্তা একজন নারীকে মিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে মামলা নেন, তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক ঝুঁকিতে পড়েন।

তৃতীয় বাধা হলো আদালতের মনোভাব। বিচারকরাও নারীর বিরুদ্ধে রায় দিতে দ্বিধা করেন, বিশেষত যখন বিষয়টি যৌতুক সংক্রান্ত। যৌতুকের প্রেক্ষাপটে নারীকে দোষী বলা সামাজিকভাবে অপ্রিয় এবং রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

চতুর্থ বাধা হলো ভিকটিম হিসেবে নারীর প্রতি সহজাত সহানুভূতি। মানুষের স্বভাবগত প্রবণতা হলো যৌতুক মামলায় নারীর প্রতি সহানুভূতি এবং পুরুষের প্রতি সংশয় পোষণ করা। এই মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা বিচারিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

১০.২ তুলনামূলক আলোচনা: মিথ্যা মামলার কার্যকর প্রতিকার কোথায়?

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মিথ্যা ফৌজদারি অভিযোগের কার্যকর প্রতিকারের ব্যবস্থা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে "Malicious Prosecution" বা দুর্নীতিপূর্ণ বিচার প্রক্রিয়ার জন্য দেওয়ানি মামলার ব্যবস্থা রয়েছে। যদি কেউ জেনেশুনে মিথ্যা ফৌজদারি অভিযোগ করে, তাহলে অভিযুক্ত পরে খালাস পেলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করতে পারেন। এই ব্যবস্থাটি মিথ্যা অভিযোগকে আর্থিকভাবে ব্যয়বহুল করে তোলে।

যুক্তরাজ্যে "Perverting the Course of Justice" অর্থাৎ ন্যায়বিচার বিঘ্নিত করার অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। মিথ্যা ধর্ষণ বা নির্যাতনের অভিযোগ করলে অভিযোগকারীকে উল্লেখযোগ্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এমন উদাহরণ যুক্তরাজ্যে আছে।

জার্মানিতে ফৌজদারি মিথ্যা অভিযোগের জন্য আলাদা ফৌজদারি বিধান রয়েছে যা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়।

বাংলাদেশে মিথ্যা মামলার প্রতিকারের জন্য একটি দেওয়ানি ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি মিথ্যা মামলার শিকার হয়ে কারাবাস করেছেন বা সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছেন, তিনি অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করতে পারবেন এই ব্যবস্থা চালু করা উচিত।

১০.৩ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

যৌতুক আইনের কার্যকর ও ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগের জন্য পুলিশি তদন্তের মান উন্নয়ন অপরিহার্য। বর্তমানে যৌতুক মামলায় পুলিশি তদন্তের একটি বড় সমস্যা হলো একপাক্ষিকতা। পুলিশ সাধারণত শুধু বাদীর বক্তব্য নিয়ে তদন্ত শুরু করে এবং আসামির পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহের তেমন উদ্যোগ নেয় না।

পুলিশের একটি নিরপেক্ষ তদন্তের মানদণ্ড প্রবর্তন করা দরকার যেখানে উভয় পক্ষের বক্তব্য সমানভাবে যাচাই করা হবে। যৌতুকের দাবির প্রমাণ যেমন খোঁজা হবে, তেমনই মিথ্যা অভিযোগের সম্ভাবনাও তদন্ত করা হবে।

পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ তদন্ত পদ্ধতি, ফরেনসিক সাক্ষ্য সংগ্রহ এবং মিথ্যা অভিযোগ চিহ্নিতকরণের দক্ষতা যোগ করা উচিত।

অধ্যায় ১১: পুরুষ হিসেবে যৌতুক দাবির শিকার: একটি উপেক্ষিত বাস্তবতা

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১১.১ বিপরীত দিকের যৌতুক: বর পক্ষের কাছ থেকে দাবি

বাংলাদেশের আইনি আলোচনায় প্রায় সবসময়ই যৌতুকের প্রবাহ ধরে নেওয়া হয় কনে পক্ষ থেকে বর পক্ষের দিকে। কিন্তু বাস্তবে বিপরীত পরিস্থিতিও দেখা যায়, যদিও তা তুলনামূলকভাবে কম।

কিছু সামাজিক প্রেক্ষাপটে, বিশেষত শহরাঞ্চলে এবং উচ্চবিত্ত সমাজে, কনে পরিবারের পক্ষ থেকে বর পক্ষের কাছে "দাবি" থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কনে পক্ষ চাইতে পারে বর একটি নির্দিষ্ট পেশায় থাকুক, বিদেশ যাওয়ার সুযোগ থাকুক বা নির্দিষ্ট আর্থিক সক্ষমতা প্রমাণ করুক। এগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে যৌতুক নয়, কিন্তু এগুলো পুরুষের উপর সামাজিক চাপ তৈরি করে।

এই "বিপরীত চাপ" এর বিষয়টি আইনে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যৌতুক আইন ধরে নেয় যে বর পক্ষই সবসময় দাবিকারী। কিন্তু বাস্তব সামাজিক সম্পর্ক এতটা সরল নয়।

১১.২ দেনমোহরের চাপ এবং পুরুষের আর্থিক সংকট

বাংলাদেশে দেনমোহরের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছু পরিবারে সামাজিক প্রতিযোগিতায় দেনমোহর কয়েক লাখ থেকে কোটি টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ হচ্ছে। এই বিশাল দেনমোহর বহু তরুণ পুরুষের জন্য একটি ভারী আর্থিক দায়িত্ব।

বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে দেনমোহরের তাৎক্ষণিক পরিশোধের দাবি অনেক পুরুষকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। ন্যায্য দেনমোহর একটি ইসলামিক অধিকার, কিন্তু যখন দেনমোহরের পরিমাণ বাস্তব সীমা অতিক্রম করে, তখন এটি একটি আর্থিক হাতিয়ারে পরিণত হয়।

আইনগতভাবে দেনমোহরের পরিমাণ নির্ধারণে কোনো উর্ধ্বসীমা নেই এবং বিচারকরা দেনমোহরের পরিমাণ পর্যালোচনা করেন না। যদি একজন তরুণ পুরুষ সামাজিক চাপে কোটি টাকা দেনমোহর দিয়ে বিয়ে করেন এবং পরে বিয়ে ভেঙে যায়, তাহলে তাকে সেই পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে। এই আইনি কাঠামো পুরুষের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হতে পারে।

১১.৩ মুসলিম আইনে পুরুষের অধিকারের পুনর্মূল্যায়ন

মুসলিম পারিবারিক আইনের আধুনিক ব্যাখ্যায় পুরুষ ও নারী উভয়ের অধিকারের একটি ভারসাম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। ইসলামী আইনে পুরুষের বিভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে, কিন্তু পুরুষেরও কিছু অধিকার রয়েছে যা সামাজিক প্রথায় উপেক্ষিত হয়।

ইসলামিক আইনে স্বামীর কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে, যেমন বৈবাহিক বিশ্বস্ততা, পরিবারের পরিচালনায় সহযোগিতা এবং পারিবারিক সিদ্ধান্তে অংশীদারিত্ব। কিন্তু যখন এই অধিকারগুলো লঙ্ঘিত হয়, তখন আইনি প্রতিকার প্রায় নেই।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন স্ত্রী বৈবাহিক বিশ্বস্ততা লঙ্ঘন করেন, তাহলে স্বামীর জন্য আইনি প্রতিকার কী? তিনি বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারেন, কিন্তু তবু দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে। ব্যভিচার আইনে বিবাহিত নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সুযোগ বাংলাদেশে সীমিত।

অধ্যায় ১২: আইনি সংস্কারের দার্শনিক ভিত্তি এবং প্রস্তাবিত রোডম্যাপ

১২.১ সংস্কারের নীতিগত ভিত্তি: সমতা, সুরক্ষা এবং ন্যায়বিচারের ত্রিমাত্রিক সমন্বয়

যৌতুক আইনের সংস্কারের জন্য একটি সুসংগত দার্শনিক ভিত্তি প্রয়োজন। এই ভিত্তিটি তিনটি মূলনীতির উপর দাঁড়ানো উচিত।

প্রথম নীতি হলো সুরক্ষার নীতি। যৌতুকের প্রকৃত শিকার নারীদের কার্যকর আইনি সুরক্ষা অব্যাহত থাকতে হবে এবং আরও উন্নত করতে হবে। এই নীতির বিষয়ে কোনো আপস নেই। সত্যিকারের যৌতুক ভিকটিমের জন্য আইনকে আরও দ্রুত ও কার্যকর হতে হবে।

দ্বিতীয় নীতি হলো সমতার নীতি। আইনের প্রয়োগ এমন হতে হবে যা উভয় পক্ষকে সমান সুযোগ দেয়। অভিযুক্ত পুরুষকেও নির্দোষিতার অনুমানের সুরক্ষা পেতে হবে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ পেতে হবে।

তৃতীয় নীতি হলো জবাবদিহিতার নীতি। মিথ্যা অভিযোগকারীদের জন্য কার্যকর জবাবদিহিতা ব্যবস্থা থাকতে হবে। শুধু আইনে বিধান থাকলেই হবে না, সেই বিধান বাস্তবে প্রয়োগ হতে হবে।

এই তিনটি নীতি পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে নয়। সুরক্ষা, সমতা এবং জবাবদিহিতা একসাথে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং এটিই সত্যিকারের ন্যায়বিচারের পথ।

১২.২ আইনের ভাষায় সংস্কার: নির্দিষ্ট প্রস্তাবনা

যৌতুক নিষেধ আইন ২০১৮ এর বিভিন্ন ধারায় নির্দিষ্ট সংস্কারের প্রস্তাব করা যায়।

প্রথম প্রস্তাব হলো যৌতুকের সংজ্ঞা আরও সুনির্দিষ্ট করা। সংজ্ঞায় "বিয়ের শর্ত" ধারণাটি স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কোনটি উপহার এবং কোনটি যৌতুক তার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য টানা উচিত। বিয়ের সময়ের লেনদেন এবং বিয়ের বহু বছর পরের দাবির মধ্যে পার্থক্য রাখা উচিত।

দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো ধারা ৬ (মিথ্যা মামলার শাস্তি) কার্যকর করা। "জেনেশুনে" এর পরিবর্তে "যুক্তিসঙ্গতভাবে" মিথ্যা প্রমাণিত হলেই শাস্তি হওয়া উচিত। প্রমাণের মানদণ্ড কমিয়ে "Balance of Probabilities" অর্থাৎ সম্ভাবনার ভারসাম্যে নামিয়ে আনা উচিত।

তৃতীয় প্রস্তাব হলো মিথ্যা মামলার শিকারের জন্য দেওয়ানি ক্ষতিপূরণের বিধান যোগ করা। খালাস পাওয়া ব্যক্তি অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দেওয়ানি মামলা করতে পারবেন এই বিধান রাখা উচিত।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

চতুর্থ প্রস্তাব হলো জামিনের বিধান সংস্কার করা। যৌতুক মামলায় "Bail is the rule" নীতি প্রবর্তন করা উচিত, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট গুরুতর পরিস্থিতিতে জামিন অস্বীকার করার বিধান রেখে।

পঞ্চম প্রস্তাব হলো গ্রেফতার প্রক্রিয়া সংস্কার করা। ভারতের Arnesh Kumar গাইডলাইনের আদলে বাংলাদেশেও যৌতুক মামলায় গ্রেফতারের আগে প্রাথমিক তদন্তের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা উচিত।

ষষ্ঠ প্রস্তাব হলো যৌতুক দেওয়ার শাস্তি থেকে কনে পক্ষকে অব্যাহতি দেওয়া। যৌতুক দেওয়া শুধুমাত্র তখনই অপরাধ হওয়া উচিত যখন এটি স্বেচ্ছায় এবং কোনো চাপ ছাড়া করা হয়। কনে পরিবার যদি সামাজিক চাপে যৌতুক দিতে বাধ্য হয়, তারা আইনের শিকার নয়, তারাও ভিকটিম।

১২.৩ বিচারিক সংস্কার: বিচারক প্রশিক্ষণ এবং বিচারিক মানসিকতার পরিবর্তন

বিচারিক পর্যায়ে সংস্কারের জন্য প্রধানত দরকার বিচারক প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন। বিচারকদের প্রশিক্ষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

কগনিটিভ বায়াস বিষয়ক প্রশিক্ষণ: বিচারকদের সামাজিক পূর্বধারণা ও জ্ঞানগত পক্ষপাত সম্পর্কে সচেতন করা এবং সেগুলো এড়ানোর পদ্ধতি শেখানো। বিচারিক কার্যক্রমে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সাক্ষ্য মূল্যায়নের পদ্ধতি শেখানো। মিথ্যা অভিযোগের ধরন ও লক্ষণ চিহ্নিত করার প্রশিক্ষণ দেওয়া।

বিচারিক পর্যালোচনার একটি ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত যেখানে পর্যায়ক্রমে মামলার ফলাফল বিশ্লেষণ করা হবে এবং বিচারিক পক্ষপাতের ধরন চিহ্নিত করা হবে।

১২.৪ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: একটি আইনি সমতা কমিশন

দীর্ঘমেয়াদী সংস্কারের জন্য একটি স্বাধীন "আইনি সমতা কমিশন" গঠন করা যেতে পারে। এই কমিশনের দায়িত্ব হবে উভয় লিঙ্গের আইনি অধিকারের বিষয়ে নজর রাখা এবং সরকারকে নীতিগত পরামর্শ দেওয়া। এই কমিশনে আইনজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং উভয় লিঙ্গের নাগরিক প্রতিনিধি থাকবেন।

এই কমিশনের কাজ হবে বার্ষিক লিঙ্গ-সমতা প্রতিবেদন তৈরি করা, যেখানে উভয় লিঙ্গের আইনি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হবে। আইন সংস্কারের প্রস্তাব তৈরি করা এবং সংসদে উপস্থাপন করা। মামলার পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা।

অধ্যায় ১৩: যৌতুক আইন ও মুসলিম নারীবাদ: একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ

১৩.১ ইসলামিক নারীবাদ এবং যৌতুক বিরোধিতার অবস্থান

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ইসলামিক নারীবাদ বলতে বোঝায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর অধিকারের দাবি ও বিশ্লেষণ। আমিনা ওয়াদুদ, ফাতেমা মার্নিসি এবং আসমা বারলাসের মতো পণ্ডিতরা ইসলামিক গ্রন্থ পুনর্ব্যাখ্যার মাধ্যমে নারীর অধিকারের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন।

ইসলামিক নারীবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, যৌতুক প্রথা পরিষ্কারভাবে ইসলামবিরোধী। ইসলামে বর পক্ষ দেনমোহর দেয়, কনে পক্ষ নয়। ইসলামিক নারীবাদীরা যৌতুক নিষেধ আইনকে ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন।

কিন্তু ইসলামিক নারীবাদের একটি অবস্থান হওয়া উচিত যে আইনি সুরক্ষা শুধু নারীর জন্য নয়, সকলের জন্য। মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে প্রতিকার দাবি করা ইসলামিক ন্যায়বিচারের নীতির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইসলামী ফিকহে "ইনসাফ" বা ন্যায়বিচারের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনের বহু আয়াতে ন্যায়বিচারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা অভিযোগ ইসলামিক দৃষ্টিতে গুরুতর পাপ। তাই ইসলামিক নারীবাদীদের উচিত মিথ্যা যৌতুক মামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, কারণ এটি ইসলামিক ন্যায়বিচারের নীতির লঙ্ঘন।

১৩.২ উদারপন্থী নারীবাদ এবং পুরুষের অধিকার: একটি সংযোগ বিন্দু

উদারপন্থী নারীবাদের মূল দাবি হলো সমান অধিকার। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আইনকে উভয় লিঙ্গের জন্য সমানভাবে ন্যায়সঙ্গত হতে হবে। মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিকার উদারপন্থী নারীবাদের মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রুথ বেডার গিন্সবার্গ, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিখ্যাত নারীবাদী বিচারপতি ছিলেন, তিনি তাঁর কর্মজীবনের প্রথম দিকে পুরুষের পক্ষেও লিঙ্গ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে মামলা লড়েছেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য উভয় লিঙ্গের জন্যই ক্ষতিকর।

এই উদারপন্থী নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে পুরুষের আইনি অধিকারের দাবি করা নারীবিরোধিতা নয়, বরং এটি সত্যিকারের সমতার দাবি।

অধ্যায় ১৪: বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা এবং যৌতুক মামলায় বিচারিক সংস্কৃতি

১৪.১ বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কাঠামো এবং স্বাধীনতার প্রশ্ন

বাংলাদেশে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা একটি জটিল বিষয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার নীতি ঘোষিত হলেও বাস্তবে বিচার বিভাগ বিভিন্ন ধরনের চাপের মুখে থেকেছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

যৌতুক মামলায় বিচারিক স্বাধীনতার প্রশ্নটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারকরা সরাসরি পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তি করেন। এই প্রক্রিয়ায় যদি বিচারক সামাজিক বা রাজনৈতিক চাপে থাকেন, তাহলে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বিচারিক নিয়োগ প্রক্রিয়া, বিচারকদের পদোন্নতি এবং বিচারিক জবাবদিহিতার ব্যবস্থা বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এখনো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের সুযোগ রয়েছে।

১৪.২ আপিল বিভাগের ভূমিকা এবং যৌতুক মামলায় আইনের বিকাশ

বাংলাদেশের আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিচার করেন। যৌতুক মামলায় হাইকোর্টের রায়গুলো আইনের ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তবে বাংলাদেশের উচ্চ আদালত যৌতুক মামলায় আসামির সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় যতটা সক্রিয় হওয়া উচিত, ততটা হননি। ভারতের Arnesh Kumar গাইডলাইনের মতো বাংলাদেশে কোনো যুগান্তকারী রায় নেই যা যৌতুক মামলায় ন্যায়বিচারের মানদণ্ড নির্ধারণ করে।

উচ্চ আদালত যৌতুক মামলায় জামিনের বিষয়ে যদি "Bail is the rule" নীতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতেন, তাহলে নিম্ন আদালতের জন্য একটি স্পষ্ট নির্দেশনা থাকত। এই ধরনের বিচারিক সক্রিয়তার অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের শূন্যতা।

১৪.৩ বিচারিক মনস্তাত্ত্বিক পক্ষপাত এবং তার প্রতিকার

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিচারকরাও সামাজিক পূর্বধারণা ও জ্ঞানগত পক্ষপাতের শিকার হতে পারেন। এই বিষয়টি বিচারিক সংস্কারের একটি কেন্দ্রীয় চ্যালেঞ্জ।

বিচারিক মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে যে বিচারকরা প্রায়ই "Anchoring Bias" বা নোঙর পক্ষপাতের শিকার হন, অর্থাৎ প্রথম যে তথ্য তারা শোনেন সেটা তাদের পরবর্তী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে। যৌতুক মামলায় যদি বাদীর অভিযোগ প্রথমে শোনা যায় এবং সেটা আবেগময় ও বিস্তারিত হয়, তাহলে এটা বিচারকের মানসিক অবস্থানকে প্রথম থেকেই প্রভাবিত করতে পারে।

এই সমস্যার সমাধানে বিচার প্রক্রিয়ায় কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন আনা যায়। উদাহরণস্বরূপ, লিখিত প্রমাণ এবং ফরেনসিক সাক্ষ্যকে মৌখিক সাক্ষ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া, মামলার শুরুতেই উভয় পক্ষের বক্তব্য সমানভাবে নথিভুক্ত করা এবং মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণে একটি কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করা।

অধ্যায় ১৫: সমকালীন আন্তর্জাতিক আলোচনা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

১৫.১ পুরুষ অধিকার আন্দোলনের বৈশ্বিক বিকাশ এবং বাংলাদেশে তার অনুপস্থিতি

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

২০২৪-২০২৬ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পুরুষ অধিকার আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতে পুরুষ অধিকার সংস্থাগুলো মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে, পারিবারিক আদালতে পুরুষের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণের জন্য এবং পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

ভারতে Save Indian Family Foundation, Men Welfare Trust এবং বিভিন্ন রাজ্যের পুরুষ অধিকার সংগঠন আদালতে মামলা লড়ে, সংসদে দাবি উপস্থাপন করে এবং সামাজিক সচেতনতা তৈরি করে। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের Arnesh Kumar গাইডলাইন আংশিকভাবে এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ।

বাংলাদেশে এই ধরনের কোনো সংগঠিত আন্দোলন নেই। কিছু সামাজিক মিডিয়া গোষ্ঠী ও ব্লগ এই বিষয়ে সোচ্চার, কিন্তু তারা সংগঠিত এবং কৌশলগত নয়। এই সংগঠনহীনতা বাংলাদেশে পুরুষের আইনি অধিকার আন্দোলনের একটি বড় দুর্বলতা।

২০২৪ সালের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশে পুরুষ অধিকার সংগঠন গড়ে তোলার সুযোগ আছে। কিন্তু এই সংগঠনকে হতে হবে যুক্তিভিত্তিক, তথ্যনির্ভর এবং নারীবিরোধী না হয়ে ন্যায়বিচারপন্থী।

১৫.২ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং লিঙ্গ-সমতার বৈশ্বিক আলোচনা

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) লক্ষ্য ৫ হলো লিঙ্গ-সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়ে শিশুর ক্ষমতায়ন। বাংলাদেশ এই লক্ষ্য অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কিন্তু লিঙ্গ-সমতার SDG কাঠামোতে পুরুষের অধিকারের বিষয়টি তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব পেয়েছে। SDG কাঠামোতে মূলত নারীর অগ্রগতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সত্যিকারের লিঙ্গ-সমতার জন্য পুরুষের আইনি অধিকারের সুরক্ষাও প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা পুরুষের আইনি পরিস্থিতির দিকেও মনোযোগ দিচ্ছেন। কারণ লিঙ্গ-সমতা মানে শুধু নারীর অগ্রগতি নয়, এটি সকল লিঙ্গের ন্যায়সঙ্গত আচরণও।

১৫.৩ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে পুরুষের অধিকারের ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি

আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি (ICCPR), বিশেষত এর ১৪ ও ২৬ অনুচ্ছেদ, লিঙ্গনির্বিশেষে আইনের সামনে সমতার নীতি প্রতিষ্ঠা করে। এই নীতি পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

UN Human Rights Committee এর সাম্প্রতিক মন্তব্যে বিভিন্ন দেশকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ায় Due Process এর নীতি লিঙ্গনির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। এই আন্তর্জাতিক নীতির আলোকে বাংলাদেশের যৌতুক আইনের জামিন অযোগ্যতার বিধান প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ইউরোপের মানবাধিকার আদালত (ECHR) পুরুষের পারিবারিক অধিকার, বিশেষত শিশু হেফাজতের অধিকার, বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে। যদিও বাংলাদেশ ECHR এর এখতিয়ারে নয়, এই রায়গুলো আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশে অবদান রাখছে এবং বাংলাদেশের জন্য রেফারেন্স হতে পারে।

অধ্যায় ১৬: ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং পুরুষত্বের সংকট

১৬.১ পুরুষত্বের সামাজিক নির্মাণ এবং আইনি দুর্বলতা

পুরুষত্বের সামাজিক নির্মাণ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী র‍্যাউয়িন কনেলের তত্ব ("হেজিমনিক ম্যাসকুলিনিটি" বা আধিপত্যশীল পুরুষত্ব) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কনেল যুক্তি দেন যে সমাজে পুরুষত্বের একটি আধিপত্যশীল রূপ রয়েছে যা শক্তি, নিয়ন্ত্রণ এবং আবেগ-দমনের মূল্যবোধ বহন করে।

এই আধিপত্যশীল পুরুষত্বের ধারণা পুরুষকে আইনি বিপদে পড়লেও সাহায্য চাইতে বাধা দেয়। সামাজিকভাবে "শক্তিশালী" পুরুষ সাহায্য চাওয়া দুর্বলতার চিহ্ন মনে করেন। মানসিক কষ্ট প্রকাশ করলে সামাজিক কলঙ্ক হয় বলে ভয় পান।

কিন্তু একই সাথে এই আধিপত্যশীল পুরুষত্বের কারণে আইনি ব্যবস্থাও পুরুষকে সবসময় "সক্ষম" এবং "সুরক্ষার প্রয়োজনহীন" মনে করে। পুরুষের জন্য আইনি সহায়তা ব্যবস্থা তৈরি না হওয়ার পেছনে এই সামাজিক ধারণাও কাজ করে।

পোস্ট-মডার্ন পুরুষত্বের আলোচনায় এই দ্বিধার কথা বলা হয়। আধুনিক পুরুষ এক দিকে ঐতিহ্যগত "শক্তিশালী পুরুষ" হওয়ার সামাজিক চাপে এবং অন্যদিকে পরিবর্তিত সমাজের নতুন প্রত্যাশার চাপে থাকেন। এই দ্বিধার মধ্যে মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষ একেবারে একা।

১৬.২ সামাজিক যন্ত্র কাঠামোতে পুরুষের বাদ পড়ে যাওয়া

বাংলাদেশের সামাজিক যন্ত্র কাঠামো, সরকারি ও বেসরকারি উভয় স্তরে, মূলত নারী ও শিশুকেন্দ্রিক। এটি বোধগম্য, কারণ ঐতিহাসিকভাবে নারী ও শিশু সামাজিক সুরক্ষার বাইরে ছিলেন।

কিন্তু এই কেন্দ্রীভূততার ফলে পুরুষের সামাজিক যন্ত্রের চাহিদা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশে পুরুষের জন্য কোনো আশ্রয়কেন্দ্র নেই, পুরুষ ভিকটিমের জন্য কোনো হটলাইন নেই এবং পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষায়িত কোনো সেবা নেই।

একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক কল্যাণ ব্যবস্থায় পুরুষের যন্ত্রের প্রয়োজনও স্বীকৃত হওয়া উচিত। মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষ, বিবাহবিচ্ছেদের পর সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন পিতা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার পুরুষদের জন্য সহায়তা ব্যবস্থা তৈরি করা সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি অংশ।

১৬.৩ যৌতুক আইন এবং শ্রেণি-বিভাজন: দরিদ্র পুরুষের বিপর্যয়

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

যৌতুক আইনের প্রয়োগে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হলো শ্রেণি বিভাজন। ধনী পুরুষ যৌতুক মামলায় ফাঁসলেও দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেন এবং আইনি লড়াই দেওয়ার সামর্থ্য রাখেন। কিন্তু দরিদ্র পুরুষের জন্য পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

দরিদ্র পুরুষ যখন মিথ্যা যৌতুক মামলায় ফাঁসেন, তখন তার কাছে কোনো বিকল্প থাকে না। আইনজীবীর ফি দেওয়ার ক্ষমতা নেই, জামিনের টাকা নেই এবং মামলা লড়ার সময় ও সম্পদ নেই। ফলে অনেক দরিদ্র পুরুষ মামলা লড়ার আগেই মীমাংসার জন্য রাজি হন এবং যা চাওয়া হয় তাই দিয়ে দেন।

এই শ্রেণি-বিভাজনটি দেখায় যে যৌতুক আইনের অপব্যবহার মূলত দরিদ্র পুরুষদের উপর পড়ে। এটি একটি ইন্টারসেকশনাল সমস্যা যেখানে লিঙ্গ ও শ্রেণি একসাথে কাজ করে।

অধ্যায় ১৭: যৌতুক এবং গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন ২০১০: আরও একটি একতরফা কাঠামো

১৭.১ গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের পরিধি এবং সীমাবদ্ধতা

গৃহস্থালি সহিংসতা থেকে নারীর সুরক্ষা আইন ২০১০ বাংলাদেশে গার্হস্থ্য সহিংসতার বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি হাতিয়ার। কিন্তু এই আইনের নামেই স্পষ্ট হয় যে এটি শুধুমাত্র নারীর সুরক্ষার জন্য।

আইনের ২(ক) ধারায় "আক্রান্ত ব্যক্তি" বলতে শুধুমাত্র নারীকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ একজন পুরুষ যদি তার স্ত্রী বা পরিবারের নারী সদস্যদের দ্বারা শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হন, তাহলে এই আইনে তার কোনো প্রতিকার নেই।

এই সংজ্ঞাগত একতরফাতা একটি মৌলিক আইনি সমস্যা। গার্হস্থ্য সহিংসতা উভয় দিকেই হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পুরুষ গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার হওয়ার হার ধারণার চেয়ে বেশি। কিন্তু সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে পুরুষরা রিপোর্ট করেন না।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব পাবলিক হেলথ-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ২০২৩-২০২৫ সালে প্রকাশিত গবেষণায় দেখিয়েছে যে দক্ষিণ এশিয়ায় গার্হস্থ্য সহিংসতা একটি বহুমুখী সমস্যা যা উভয় লিঙ্গকে আক্রান্ত করে, যদিও নারীরা বেশি সহিংসতার শিকার হন।

১৭.২ পুরুষ গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার: একটি অদৃশ্য সমস্যা

পুরুষ গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার হওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশে প্রায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য। কারণগুলো কয়েকটি। প্রথমত, পুরুষ ভিকটিম রিপোর্ট করলে সামাজিক লাঞ্ছনার মুখে পড়েন, কারণ "পুরুষ কীভাবে নারীর দ্বারা নির্যাতিত হয়?" এই সামাজিক ধারণা বাধা তৈরি করে। দ্বিতীয়ত, পুলিশ পুরুষ নির্যাতনের অভিযোগ গুরুত্বের সাথে নেয় না। তৃতীয়ত, আইনে পুরুষ ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃত নন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশে শাশুড়ি কর্তৃক জামাই নির্যাতন, স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মানসিক নির্যাতন এবং পরিবারের নারী সদস্যদের দ্বারা পুরুষকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ঘটনা সমাজে বিদ্যমান। এগুলো আইনে অস্বীকৃত।

২০২৫ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সংশোধনীতে পুরুষকে ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এটি একটি বড় পদক্ষেপ। এই স্বীকৃতির পথে হেঁটে গৃহস্থালি সহিংসতা আইনেও পুরুষকে ভিকটিম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সময় এসেছে।

তৃতীয় খণ্ডের উপসংহার: একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি

উপসংহার: যৌতুক আইনের মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতের পথ

তৃতীয় খণ্ডে আমরা যৌতুক নিরোধ আইনের একটি বিস্তারিত, বহুমাত্রিক এবং গভীর বিশ্লেষণ করেছি। এই বিশ্লেষণ থেকে কিছু সুনির্দিষ্ট উপসংহার টানা সম্ভব।

প্রথম উপসংহার হলো যৌতুক প্রথা একটি বাস্তব ও গভীর সামাজিক সমস্যা। বাংলাদেশে যৌতুকের কারণে নারী নির্যাতন, হত্যা এবং আত্মহত্যার ঘটনা এখনো ভয়াবহ মাত্রায় ঘটছে। এই সমস্যার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আইনি ব্যবস্থা অপরিহার্য। এই বিষয়ে এই গ্রন্থ কোনো সংশয় প্রকাশ করে না।

দ্বিতীয় উপসংহার হলো বিদ্যমান আইনি কাঠামোতে কাঠামোগত ত্রুটি রয়েছে। যৌতুকের সংজ্ঞার অস্পষ্টতা, জামিন অযোগ্যতার বিস্তৃত প্রয়োগ, মিথ্যা মামলার কার্যকর প্রতিকারের অনুপস্থিতি এবং পুলিশ তদন্তের পক্ষপাত মিলিয়ে একটি কাঠামো তৈরি হয়েছে যেখানে নির্দোষ পুরুষের আইনি শিকার হওয়া অত্যন্ত সহজ।

তৃতীয় উপসংহার হলো সংস্কার সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়। আইনের সংস্কার নারীর সুরক্ষাকে দুর্বল না করেও করা যায়। বরং একটি সুসংস্কৃত আইনে প্রকৃত ভিকটিমের সুরক্ষা আরও কার্যকর হবে, কারণ মিথ্যা মামলার ভীড়ে আসল মামলাগুলো হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমবে।

চতুর্থ উপসংহার হলো রাজনৈতিক সাহসের প্রয়োজন। সংস্কারের জন্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিদ্যমান, কিন্তু রাজনৈতিক সাহস দুর্লভ। নারীভোটারদের তুষ্ট রাখার ভয়ে যৌতুক আইনের ন্যায়সঙ্গত সংস্কার এড়ানো একটি নৈতিক ব্যর্থতা।

পঞ্চম উপসংহার হলো এটি নারীবিরোধিতা নয়। যৌতুক আইনের সংস্কারের দাবি নারীর অধিকারের বিরুদ্ধে নয়। বরং এটি সত্যিকারের সমতার পক্ষে। যখন আইন শুধু এক লিঙ্গের অধিকার রক্ষা করে এবং অন্য লিঙ্গের অধিকার উপেক্ষা করে, তখন সেটি ন্যায়বিচার নয়। সত্যিকারের ন্যায়বিচার সকলের জন্য।

ষষ্ঠ উপসংহার হলো আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শেখার সুযোগ রয়েছে। ভারতের Arnesh Kumar গাইডলাইন, পশ্চিমের মিথ্যা মামলার প্রতিকার ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের সংস্কারের জন্য মূল্যবান রেফারেন্স।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

জন রলসের "veil of ignorance" বা অজ্ঞতার পর্দার রূপকটি দিয়ে এই তৃতীয় খণ্ড শেষ করা সমীচীন। যদি আপনি না জানতেন যে আপনি পুরুষ না নারী হিসেবে জন্মাবেন, তাহলে আপনি কি চাইতেন এমন একটি যৌতুক আইন যেখানে একটি মিথ্যা অভিযোগে আপনাকে বিচারের আগেই কারাগারে পাঠানো যায়? স্বাভাবিকভাবেই না। তাহলে এই ধরনের আইন কার জন্য ন্যায়সঙ্গত?

সত্যিকারের ন্যায়বিচার লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। এটি ভিকটিমকে সুরক্ষা দেয় কিন্তু নির্দোষকে শাস্তি দেয় না। এটি অপরাধীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী হয় কিন্তু মিথ্যা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধেও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোই হওয়া উচিত বাংলাদেশের যৌতুক আইন সংস্কারের চূড়ান্ত অভীষ্ট।

চতুর্থ খণ্ডে আমরা পারিবারিক আইনে পুরুষের অধিকারের বিস্তারিত বিশ্লেষণে যাব। সেখানে বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তানের হেফাজত, ভরণপোষণ এবং পারিবারিক সম্পত্তির আইনে পুরুষের সাথে যে আচরণ করা হয় তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপন করা হবে।

পরিশিষ্ট ক: যৌতুক নিষেধ আইন ২০১৮ এর ধারাগুলোর সারসংক্ষেপ ও মূল্যায়ন

ধারা ১: সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন। মূল্যায়ন: নিরপেক্ষ। ধারা ২: সংজ্ঞা, মূল্যায়ন: কিছুটা উন্নত কিন্তু এখনো অস্পষ্ট, সংজ্ঞা আরও সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। ধারা ৩: যৌতুকের দাবি নিষিদ্ধ ও শাস্তি। মূল্যায়ন: মূলত সঠিক, শাস্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে যা ইতিবাচক। ধারা ৪: যৌতুক দেওয়া বা নেওয়া নিষিদ্ধ। মূল্যায়ন: সমস্যাজনক, কনে পক্ষকে সামাজিক চাপের শিকার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। ধারা ৫: যৌতুক চুক্তি বাতিল। মূল্যায়ন: সঠিক। ধারা ৬: মিথ্যা মামলার শাস্তি। মূল্যায়ন: বিধান আছে কিন্তু কার্যকর নয়, প্রয়োগের প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ধারা ৭: অপরাধের কগনিজেন্স। মূল্যায়ন: জামিন অযোগ্যতার বিধান সংস্কারের প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট খ: প্রস্তাবিত আইনি সংস্কারের রোডম্যাপ

স্বল্পমেয়াদী সংস্কার (এক থেকে দুই বছর): প্রথমত, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে "যৌতুক মামলায় গ্রেফতারের আগে প্রাথমিক তদন্ত বাধ্যতামূলক" একটি গাইডলাইন জারি করা। দ্বিতীয়ত, পুলিশ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ তদন্ত পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা। তৃতীয়ত, সুপ্রিম কোর্টের আইনগত সহায়তা পরিষেবা থেকে মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষদের জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান শুরু করা।

মধ্যমেয়াদী সংস্কার (দুই থেকে পাঁচ বছর): প্রথমত, সংসদে যৌতুক নিষেধ আইন সংশোধনী বিল পাস করা যেখানে যৌতুকের সংজ্ঞা আরও সুনির্দিষ্ট করা হবে এবং মিথ্যা মামলার প্রতিকারের বিধান কার্যকর করা হবে। দ্বিতীয়ত, গৃহস্থালি সহিংসতা আইনে পুরুষকেও ভিকটিম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। তৃতীয়ত, জামিনের বিধান সংস্কার করে "Bail is the rule" নীতি প্রবর্তন করা। চতুর্থত, মিথ্যা মামলার শিকারের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষতিপূরণ তহবিল তৈরি করা।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

দীর্ঘমেয়াদী সংস্কার (পাঁচ বছরের বেশি): প্রথমত, একটি স্বাধীন আইনি সমতা কমিশন গঠন করা। দ্বিতীয়ত, জাতীয় পর্যায়ে যৌতুক মামলার ফলাফলের পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ব্যবস্থা তৈরি করা। তৃতীয়ত, পুরুষ ভিকটিমের জন্য সামাজিক সহায়তা কাঠামো তৈরি করা, যার মধ্যে থাকবে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা, আইনি সহায়তা এবং সামাজিক পুনর্বাসন।

এই সংস্কার রোডম্যাপটি নারীর সুরক্ষার বিরুদ্ধে নয়, বরং এটি একটি আরও ন্যায়সঙ্গত ও কার্যকর আইনি ব্যবস্থার দিকে যাওয়ার পথনির্দেশনা।

তৃতীয় খণ্ড সম্পন্ন হলো। চতুর্থ খণ্ডে পারিবারিক আইন এবং পুরুষের অধিকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

চতুর্থ খণ্ড

পারিবারিক আইন এবং পুরুষের অধিকার: বিবাহ, বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, হেফাজত ও উত্তরাধিকারের সংকট

চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকা: পারিবারিক আইনের যুদ্ধক্ষেত্র

তৃতীয় খণ্ডে আমরা যৌতুক নিরোধ আইনের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছি এবং দেখিয়েছি কীভাবে একটি প্রয়োজনীয় আইন অপব্যবহারের হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে। চতুর্থ খণ্ডে আমরা একটি আরও ব্যাপক এবং বহুমাত্রিক আইনি ক্ষেত্রে প্রবেশ করব: পারিবারিক আইন। এই ক্ষেত্রটি সম্ভবত বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি পুরুষবিরোধী পক্ষপাতের শিকার এবং একই সাথে সবচেয়ে কম আলোচিত।

পারিবারিক আইন মানুষের জীবনের সবচেয়ে ব্যক্তিগত এবং আবেগময় দিকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তানের হেফাজত, ভরণপোষণ, দেনমোহর এবং উত্তরাধিকার এই বিষয়গুলো প্রতিটি পরিবারের জীবনের কেন্দ্রে অবস্থিত। আর এই ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের আইনি কাঠামো পুরুষের প্রতি সবচেয়ে বেশি বৈষম্যমূলক।

একটি বিবাহ যখন ভেঙে পড়ে, তখন দুটি মানুষের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সত্যটি সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু বাংলাদেশের পারিবারিক আইনের কাঠামো এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে না। বাংলাদেশের পারিবারিক আইনের মূল অনুমান হলো: বিবাহবিচ্ছেদে পুরুষই সবসময় দায়ী, পুরুষই সবসময় আর্থিকভাবে সক্ষম, এবং সন্তানের জন্য মায়ের কাছে থাকাই সবসময় উত্তম। এই তিনটি অনুমান একসাথে মিলে এমন একটি আইনি কাঠামো তৈরি করেছে যেখানে একজন পুরুষের পারিবারিক জীবনের সংকটে তার অধিকার প্রায় সম্পূর্ণ অস্বীকৃত।

এই খণ্ডে আমরা বাংলাদেশের পারিবারিক আইনের সমগ্র কাঠামোকে আইনতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, তুলনামূলক এবং দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করব। আমরা মুসলিম পারিবারিক আইনের পাশাপাশি হিন্দু এবং খ্রিস্টান

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পারিবারিক আইনের কাঠামোও পরীক্ষা করব। আমরা দেখব কীভাবে ঔপনিবেশিক আইনের উত্তরাধিকার, ধর্মীয় ব্যাখ্যার রাজনীতি এবং আধুনিক আইন সংস্কারের চাপ মিলে বাংলাদেশে পুরুষের জন্য একটি অত্যন্ত কঠিন পারিবারিক আইনি পরিবেশ তৈরি করেছে।

এই বিশ্লেষণটি কেন প্রয়োজনীয়? কারণ পারিবারিক আইনে বৈষম্য শুধু আইনের বিষয় নয়, এটি মানুষের জীবনকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করে। একজন পিতা যখন তার সন্তানের সাথে দেখা করার অধিকার পায় না, একজন স্বামী যখন ভরণপোষণের বোঝায় দিশেহারা হয়ে পড়েন, একজন পুরুষ যখন বিবাহবিচ্ছেদের পর সম্পূর্ণ আর্থিক ধ্বংসের সামনে দাঁড়ান তখন শুধু আইনের ব্যর্থতা নয়, একটি পূর্ণ মানবিক ট্র্যাজেডি ঘটে। এই ট্র্যাজেডিগুলো বোঝার জন্য এবং সেগুলো প্রতিরোধের পথ খোঁজার জন্য এই বিশ্লেষণ অপরিহার্য।

অধ্যায় ১৮: বাংলাদেশের পারিবারিক আইনের ঐতিহাসিক বিকাশ এবং বহুত্ববাদী কাঠামো

১৮.১ ব্যক্তিগত আইনের ধারণা এবং তার ঐতিহাসিক উৎস

বাংলাদেশে পারিবারিক আইন একটি একক, অভিন্ন কাঠামোতে বিদ্যমান নেই। বরং বাংলাদেশের পারিবারিক আইন একটি বহুত্ববাদী ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়, যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আইন প্রযোজ্য। মুসলমানদের জন্য মুসলিম আইন, হিন্দুদের জন্য হিন্দু আইন এবং খ্রিস্টানদের জন্য খ্রিস্টান আইন বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, হেফাজত এবং উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে। এই বহুত্ববাদী ব্যবস্থাটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের একটি উত্তরাধিকার।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় উপমহাদেশে শাসন প্রতিষ্ঠার সময় একটি বাস্তববাদী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল: বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বিষয়গুলো তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। এই নীতির পেছনে একটি রাজনৈতিক কারণ ছিল: ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করলে প্রজারা বিদ্রোহী হবে না। ফলে ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ ভারতে ব্যক্তিগত আইনের একটি বহুত্ববাদী কাঠামো গড়ে ওঠে।

এই কাঠামোটি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরেও অব্যাহত থাকে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও এটি মূলত অপরিবর্তিত থাকে। বাংলাদেশে আজও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পারিবারিক আইন বিদ্যমান, এবং এই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিটি সম্প্রদায়ের পুরুষরা বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার।

এই বহুত্ববাদী ব্যবস্থার একটি অদ্ভুত পরিণতি হলো যে বাংলাদেশে পারিবারিক আইন সংস্কার অত্যন্ত কঠিন। যেকোনো সংস্কার প্রস্তাব ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার ভয় তৈরি করে, কারণ পারিবারিক আইন এবং ধর্মীয় নিয়মের মধ্যে সীমারেখা অত্যন্ত ধূসর। এই রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা ব্যবহার করে অনেক ক্ষেত্রে আইনের পুরুষবিরোধী দিকগুলো সংস্কার করার প্রয়াসকে প্রতিহত করা হয়।

আইনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই বহুত্ববাদী ব্যবস্থাটি হার্বার্ট হার্টের "rule of recognition" বা স্বীকৃতির নিয়মের একটি জটিল প্রকাশ। বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থায় ধর্মীয় ব্যক্তিগত আইন রাষ্ট্রীয় আইনের অংশ হিসেবে

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

স্বীকৃত, কিন্তু এই স্বীকৃতির ফলে একটি জটিলতা তৈরি হয়: ধর্মীয় আইন সাংবিধানিক সমতার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, সেটা কখনো পরীক্ষা করা হয় না।

১৮.২ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫: একটি পক্ষপাতদুষ্ট মঞ্চ

বাংলাদেশে পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির প্রাথমিক ফোরাম হলো পারিবারিক আদালত, যা পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি পারিবারিক আদালত থাকবে এবং এই আদালত বিবাহবিচ্ছেদ, দেনমোহর, ভরণপোষণ, শিশু হেফাজত এবং দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের মামলা বিচার করবে।

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের একটি মূল বৈশিষ্ট্য হলো এটি মুখ্যত নারীর আবেদনের ভিত্তিতে সক্রিয় হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীরা বাদী এবং পুরুষরা আসামি। এই বিন্যাসটি নিজেই একটি কাঠামোগত পক্ষপাতের ইঙ্গিত দেয়।

পারিবারিক আদালতে কার্যবিধির ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এই আদালতে মামলার বিচার দেওয়ানি আদালতের সাধারণ কার্যবিধি অনুসরণ করে না। ফলে কিছু ক্ষেত্রে প্রমাণের মান শিথিল হতে পারে। এই শিথিলতা কখনো কখনো নারী বাদীর পক্ষে সহানুভূতি এবং পুরুষ আসামির বিরুদ্ধে পূর্বধারণার সাথে মিলে একটি অন্যায্য বিচারিক পরিবেশ তৈরি করে।

পারিবারিক আদালতের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রেও একটি বিষয় লক্ষণীয়: এই বিচারকদের লিঙ্গ-সংবেদনশীল বিচারের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে মূলত নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলো বোঝানো হয়। পুরুষের দৃষ্টিকোণ এবং পুরুষ ভিকটিমের অভিজ্ঞতা এই প্রশিক্ষণে অনুপস্থিত। এই প্রশিক্ষণগত পক্ষপাত বিচারিক মনোভঙ্গিকে প্রভাবিত করতে পারে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পারিবারিক আদালতে মীমাংসার চেষ্টার পদ্ধতি। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এর ১০ ধারায় বলা হয়েছে যে বিচারক বিচার শুরুর আগে মীমাংসার চেষ্টা করবেন। কিন্তু বাস্তবে এই মীমাংসা প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে পুরুষকেই বেশি ছাড় দিতে চাপ দেওয়া হয়। কারণ পারিবারিক আদালতে মামলা চলাকালীন পুরুষের জন্য পরিস্থিতি সাধারণত বেশি অস্বস্তিকর, তাই তারা মীমাংসায় রাজি হওয়ার জন্য বেশি চাপে থাকেন।

১৮.৩ বাংলাদেশের পারিবারিক আইনের মূল আইনি দলিলসমূহ: একটি সংক্ষিপ্ত মানচিত্র

বাংলাদেশে পারিবারিক আইনের পূর্ণ চিত্র বোঝার জন্য বিদ্যমান প্রধান আইনি দলিলগুলোর একটি তালিকা এবং তাদের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। মুসলমানদের জন্য মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন ১৯৭৪, মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯, মুসলিম মহিলা পরিত্যক্ত স্ত্রী রক্ষণ আইন, এবং দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা প্রযোজ্য। হিন্দুদের জন্য হিন্দু আইন সাধারণত অলিখিত প্রথাগত আইন এবং কিছু বিচারিক নজির দ্বারা পরিচালিত, তবে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৮৭২ এবং গার্ডিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট ১৮৯০ প্রযোজ্য। খ্রিস্টানদের জন্য খ্রিস্টান বিবাহ আইন ১৮৭২ এবং বিবাহবিচ্ছেদ আইন

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৮৬৯ প্রযোজ্য। এবং সকলের জন্য পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০ এবং প্রাসঙ্গিক দণ্ডবিধির ধারাগুলো প্রযোজ্য।

এই আইনগুলোর প্রতিটিতে কোথাও না কোথাও পুরুষের প্রতি একটি সুনির্দিষ্ট বৈষম্য বিদ্যমান। চতুর্থ খণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা এই বৈষম্যগুলো একে একে বিশ্লেষণ করব।

অধ্যায় ১৯: মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১: বিশ্লেষণ ও সমালোচনা

১৯.১ অধ্যাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ (সংক্ষেপে MFLO) তৎকালীন পাকিস্তানে প্রণীত হয়েছিল। এই অধ্যাদেশ প্রণয়নের পেছনে মূল অনুপ্রেরণা ছিল বিবাহ ও পারিবারিক আইন কমিশনের সুপারিশ, যে কমিশন ১৯৫৫ সালে গঠিত হয়েছিল। কমিশনের রিপোর্টে মুসলিম পারিবারিক আইনের বিভিন্ন দিক সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছিল, বিশেষত বহুবিবাহ, তালাক এবং ভরণপোষণের বিষয়ে।

MFLO পাকিস্তান আমলে প্রণীত হলেও বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর এটি অব্যাহত থাকে এবং ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে সামান্য সংশোধনীর মাধ্যমে এটি বাংলাদেশের আইনব্যবস্থার অংশ হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত MFLO বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক আইনের মূল ভিত্তি।

MFLO প্রণয়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫০-৬০ এর দশকে পাকিস্তান একটি নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করছিল। এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম পারিবারিক আইনকে আধুনিক করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই আধুনিকীকরণের প্রয়াস মূলত নারীর অধিকার বৃদ্ধির দিক থেকে ভাবা হয়েছিল, পুরুষের অধিকারের পুনর্মূল্যায়ন তার লক্ষ্য ছিল না।

MFLO এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: বহুবিবাহের নিয়ন্ত্রণ, তালাকের পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণ, বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক, এবং দেনমোহরের বিধান। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিটির মধ্যে পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট কিছু দায়-দায়িত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, কিন্তু পুরুষের অধিকার রক্ষার বিধান অপ্রতুল।

১৯.২ বহুবিবাহের নিয়ন্ত্রণ: পুরুষের স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ

MFLO এর ৬ ধারায় বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণের বিধান রয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো পুরুষ বিদ্যমান বিবাহ বহাল থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ করতে চাইলে মধ্যস্থতা পর্ষদের অনুমতি নিতে হবে। মধ্যস্থতা পর্ষদের অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ করলে তিনি প্রথম স্ত্রীর দেনমোহর অবিলম্বে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন এবং আইনি শাস্তির সম্মুখীন হবেন।

এই বিধানটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ নিজেই বিতর্কিত নয়। ইসলামী আইনে বহুবিবাহ নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত, কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সমস্যা হলো এই নিয়ন্ত্রণের

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

প্রক্রিয়াটি। মধ্যস্থতা পর্ষদ অনুমতি দিতে অস্বীকার করলে পুরুষের কোনো কার্যকর আপিলের পথ নেই। এই ব্যবস্থায় পুরুষের ব্যক্তিগত ধর্মীয় অধিকারকে একটি প্রশাসনিক বোর্ডের বিবেচনাধীন করা হয়েছে, যা আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নসাপেক্ষ।

তবে এই প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা দরকার। MFLO এর ৬ ধারা পুরুষের বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু নারীর পুনরায় বিবাহের ক্ষেত্রে সমতুল্য নিয়ন্ত্রণ নেই। ইদ্দতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর একজন বিবাহবিচ্ছিন্না নারী তার ইচ্ছামতো বিবাহ করতে পারেন, কিন্তু একজন পুরুষকে বহুবিবাহের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদন নিতে হয়। এই অসামঞ্জস্যটি আইনি সমতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

আইনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, এই বিধানটি রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক হস্তক্ষেপের একটি উদাহরণ। কিন্তু কল্যাণমূলক হস্তক্ষেপ সবসময় এক লিঙ্গের উপর প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়। যদি রাষ্ট্র পুরুষের বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে নারীর ক্ষেত্রে পুনর্বিবাহের উপরেও সমতুল্য পরামর্শমূলক পদ্ধতি থাকা উচিত, বিশেষত যখন পূর্ববর্তী বিবাহে সন্তান আছে।

১৯.৩ তালাক পদ্ধতি: ন্যায্যতার প্রশ্ন

MFLO এর ৭ ধারায় তালাকের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে একজন পুরুষ তালাক উচ্চারণ করার পর তাকে অবিলম্বে স্থানীয় মধ্যস্থতা পর্ষদের চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। এই নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান একটি মধ্যস্থতা পর্ষদ গঠন করবেন এবং তারা মীমাংসার চেষ্টা করবেন। যদি ৯০ দিনের মধ্যে মীমাংসা না হয়, তাহলে তালাক কার্যকর হবে।

এই বিধানটির একটি বিশেষ দিক হলো যদি পুরুষ চেয়ারম্যানকে নোটিশ না দেন, তাহলে বিচারিক নজিরে এই তালাককে অবৈধ ধরা হয়। অর্থাৎ মুসলিম আইনে ধর্মীয়ভাবে বৈধ একটি তালাক পদ্ধতিগত কারণে আইনত অবৈধ হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে পুরুষ একটি বিচিত্র অবস্থায় পড়েন: ধর্মীয় দৃষ্টিতে তিনি স্বাধীন, কিন্তু আইনি দৃষ্টিতে তিনি বিবাহিত। এই দ্বৈততা বিভিন্ন ধরনের আইনি জটিলতার উৎস।

MFLO এর ৭ ধারার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি শুধুমাত্র পুরুষের তালাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নারীর তালাক অর্থাৎ খুলার ক্ষেত্রে একই ধরনের পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা নেই। মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯ এর অধীনে নারী বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ চাইতে পারেন। এই আইনে নারীর জন্য ১১টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যার ভিত্তিতে তিনি বিবাহবিচ্ছেদ চাইতে পারেন।

এই বৈষম্যটি লক্ষ করুন: পুরুষ তালাক দিলে তাকে পদ্ধতিগত বাধ্যবাধকতা মানতে হয়, কিন্তু নারী ১৯৩৯ এর আইনের ১১টি কারণের যেকোনো একটি দাবি করে আদালতে গেলে আদালত তার পক্ষে বিচ্ছেদ ঘোষণা করতে পারে। এই দুটি পথ তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নারীর বিচ্ছেদের পথ কিছুটা বেশি আইনিভাবে সুসংগঠিত এবং তুলনামূলকভাবে সহজ, যেখানে পুরুষের তালাকের পথ পদ্ধতিগত বাধায় পরিপূর্ণ।

তবে এটিও উল্লেখ করা দরকার যে পুরুষের তালাকের পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণের পেছনে একটি ন্যায্য উদ্দেশ্য রয়েছে: আবেগের বশে তালাক দেওয়া প্রতিরোধ এবং পরিবার রক্ষার সুযোগ দেওয়া। কিন্তু এই ন্যায্য উদ্দেশ্যটি অর্জন করতে গিয়ে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, তা পুরুষের জন্য অযথা জটিল এবং নারীর জন্য অযথা সহজ।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৯.৪ MFLO এর অধীনে বিবাহ নিবন্ধন: দায়িত্ব বনাম অধিকার

MFLO এর ৫ ধারায় বিবাহ নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন ১৯৭৪ এর অধীনে মুসলিম বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিবাহ নিবন্ধন না করলে শাস্তির বিধানও রয়েছে। এই বিধানটির বাস্তবায়নে একটি আকর্ষণীয় অসামঞ্জস্য রয়েছে।

বিবাহ নিবন্ধনের দায়িত্ব আইনগতভাবে বর পক্ষের উপর বর্তায়। কাজী বা নিবন্ধক বিবাহের পরে বর পক্ষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং নিবন্ধন করেন। যদি নিবন্ধন না হয়, তাহলে আইনি দায়-দায়িত্ব মূলত বর পক্ষের উপর পড়ে।

এই ব্যবস্থায় পুরুষ বিবাহ নিবন্ধনের দায়িত্ব বহন করে, কিন্তু নিবন্ধিত বিবাহের সুবিধা উভয়পক্ষই পায়। নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা একটি ভালো আইনি নীতি, কিন্তু দায়িত্বটা একতরফাভাবে পুরুষের উপর ন্যস্ত করা সমতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নসাপেক্ষ।

বিবাহ নিবন্ধনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নিকাহনামায় শর্ত প্রদানের ব্যবস্থা। নিকাহনামার ১৮ নম্বর কলামে স্ত্রী তালাকের ক্ষমতা পেতে পারেন (তালাক-এ-তাফভিদ) এবং ১৭ নম্বর কলামে বিভিন্ন শর্ত লেখা যায়। এই শর্তগুলো সাধারণত স্ত্রীর স্বার্থে লেখা হয়। কিন্তু পুরুষের স্বার্থে কোনো শর্ত লেখার প্রচলন নেই, এবং পুরুষরা সাধারণত এই বিকল্পটি সম্পর্কে অবগত নন।

এই অসচেতনতাটি কার স্বার্থে? এটি স্পষ্ট যে বিবাহ প্রক্রিয়ায় পুরুষকে তার অধিকারের বিষয়ে সচেতন করার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। সমাজ পুরুষকে শেখায় যে বিবাহে তার দায়িত্ব আছে, কিন্তু তার অধিকারের কথা কেউ বলে না। এই তথ্যের অসামঞ্জস্য নিজেই একটি ধরনের কাঠামোগত বৈষম্য।

১৯.৫ মধ্যস্থতা পর্ষদ: একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠান

MFLO এর অধীনে স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্থতা পর্ষদ গঠনের বিধান রয়েছে। এই পর্ষদে চেয়ারম্যান (ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার নির্বাচিত প্রধান) এবং উভয়পক্ষের একজন করে প্রতিনিধি থাকেন। এই পর্ষদ তালাক, বহুবিবাহ এবং পারিবারিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে।

বাস্তবে এই মধ্যস্থতা পর্ষদ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে কাজ করে না। বেশিরভাগ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পারিবারিক আইনের বিষয়ে প্রশিক্ষিত নন। তারা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আইনি বিশেষজ্ঞ নন। ফলে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া প্রায়ই অনানুষ্ঠানিক, অসংগঠিত এবং পক্ষপাতদুষ্ট হয়।

মধ্যস্থতা পর্ষদের আরেকটি সমস্যা হলো এর সিদ্ধান্তের কোনো বাধ্যকর বৈশিষ্ট্য নেই। পর্ষদ মীমাংসা করতে পারলে ভালো, না পারলে মামলা আদালতে যায়। কিন্তু পর্ষদের কোনো সিদ্ধান্ত আদালতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা, সেটা অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

মধ্যস্থতা পর্ষদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এটি কার্যকর হওয়া নির্ভর করে চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং সদিচ্ছার উপর। কিছু এলাকায় চেয়ারম্যান সক্রিয় এবং কার্যকরভাবে মধ্যস্থতা করেন, কিন্তু বেশিরভাগ এলাকায় এই প্রতিষ্ঠানটি কাগজে-কলমে বিদ্যমান কিন্তু কার্যত নিষ্ক্রিয়।

অধ্যায় ২০: তালাক ও বিবাহবিচ্ছেদ: পুরুষের উপর আইনি বোঝা

২০.১ তালাকের আইনগত কাঠামো এবং পুরুষের আর্থিক বাধ্যবাধকতা

বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইনে তালাকের পরে পুরুষের উপর বেশ কিছু আইনগত আর্থিক বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। প্রথমত, মোহরানা বা দেনমোহর পরিশোধ: যদি দেনমোহরের কোনো অংশ বকেয়া থাকে, তাহলে তালাকের পর অবিলম্বে তা পরিশোধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ: তালাকের পর ইদ্দতের তিন মাস দশ দিন ধরে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের। তৃতীয়ত, মুতআহ বা বিচ্ছেদ-পরবর্তী ভাতা: কিছু বিচারিক ব্যাখ্যায় তালাকের পর পুরুষকে স্ত্রীকে একটি যুক্তিসঙ্গত ভাতা দিতে বলা হয়।

এই বাধ্যবাধকতাগুলো ইসলামী আইনের একটি ন্যায্য দিক। কোনো সম্পর্ক ভাঙলে দুর্বলতর পক্ষকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া নৈতিকভাবে সঠিক। কিন্তু সমস্যা হলো বাংলাদেশের আইনি ব্যাখ্যায় এই দায়গুলো সবসময় পুরুষের উপর এককভাবে চাপানো হয়, এমনকি যখন বিচ্ছেদের কারণ স্ত্রীর অসদাচরণ বা স্ত্রীর উদ্যোগে বিবাহবিচ্ছেদ।

মুহাম্মদ হেফজুর রহমান বনাম শামসুন নাহার বেগমের (১৫ বিএলডি ১৯৯৫) বিখ্যাত মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ একটি যুগান্তকারী রায় দিয়েছিল যে তালাকের পর ইদ্দতের মেয়াদ শেষ হলেও পুরুষকে প্রাক্তন স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে হবে যতদিন তিনি পুনরায় বিবাহ না করেন। এই রায়টি বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রায়ের ভিত্তি ছিল কুরআনের একটি আয়াতের একটি বিশেষ ব্যাখ্যা।

কিন্তু পরে আপিল বিভাগ এই রায়টি বাতিল করে ক্লাসিক হানাফি ব্যাখ্যায় ফিরে যায়। এই আইনগত অনিশ্চয়তাটি লক্ষণীয়: একটি মামলায় হাইকোর্ট বলে পুরুষ অনির্দিষ্টকাল ভরণপোষণ দেবে, আপিল বিভাগ বলে ইদ্দত পর্যন্ত। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে পুরুষরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন।

২০.২ নারীর খুলা বিবাহবিচ্ছেদ: পুরুষের জন্য অসামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্থিতি

খুলা হলো ইসলামী আইনে নারীর তালাকের একটি বিশেষ পদ্ধতি। খুলায় নারী তার দেনমোহর বা তার কিছু অংশ ফিরিয়ে দিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ চাইতে পারেন। ইসলামী আইনের ক্লাসিক ব্যাখ্যায় খুলার জন্য স্বামীর সম্মতি প্রয়োজন।

কিন্তু মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯ এর অধীনে বাংলাদেশের আদালত নারীকে স্বামীর সম্মতি ছাড়াও বিচ্ছেদের অধিকার দেয়। ১৯৩৯ এর আইনের ২ ধারায় বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যার ভিত্তিতে নারী

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

আদালতের মাধ্যমে বিচ্ছেদ চাইতে পারেন। এই কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বামীর অনুপস্থিতি, ভরণপোষণ না দেওয়া, কারাদণ্ড, ক্রূরতা, কুষ্ঠরোগ এবং আরও অনেক কারণ।

এই আইনি পথটি নারীর জন্য বিবাহবিচ্ছেদকে তুলনামূলকভাবে সহজ করেছে। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে পুরুষের জন্য এমন কোনো পথ নেই যেখানে স্ত্রীর অসদাচরণের কারণে পুরুষ সহজে বিচ্ছেদ পেতে পারেন। পুরুষ তালাক দিতে পারেন, কিন্তু তালাক দিলে তাকে দেনমোহর পরিশোধ করতে হয়, ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ দিতে হয় এবং বিভিন্ন আর্থিক বোঝা বহন করতে হয়।

এই পরিস্থিতিটি একটি অদ্ভুত আইনগত ফাঁদ তৈরি করে: নারী বিবাহবিচ্ছেদ চাইলে আদালতের পথে যেতে পারেন, কিন্তু পুরুষ তালাক দিলে তাকে আর্থিক বোঝা বহন করতে হয়। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই বিচ্ছেদটি ঘটছে। সমতার দৃষ্টিকোণ থেকে, বিচ্ছেদ যে-ই চাইক না কেন, উভয় পক্ষের অধিকার ও দায়িত্ব ন্যায্যভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত।

২০.৩ হিন্দু আইনে বিবাহবিচ্ছেদ: পুরুষের সম্পূর্ণ অধিকারহীনতা

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের পারিবারিক আইনের পরিস্থিতি মুসলিম পারিবারিক আইনের চেয়ে আরও জটিল এবং পুরুষের জন্য আরও কঠিন। বাংলাদেশে হিন্দুদের জন্য কোনো সংহিত বিবাহবিচ্ছেদ আইন নেই। হিন্দু বিবাহ ঐতিহ্যগতভাবে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন হিসেবে বিবেচিত।

এর ব্যবহারিক পরিণতি হলো যে একজন হিন্দু পুরুষ যদি তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়, এমনকি যদি স্ত্রী তাকে গুরুতরভাবে নির্যাতন করেন, তবুও আইনের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ পাওয়ার কোনো পথ নেই। তিনি বিয়ে করতে পারবেন না, কারণ আগের বিবাহ বহাল আছে। এই পরিস্থিতি অনেক হিন্দু পুরুষকে একটি অসহনীয় জীবনে বন্দি করে রাখে।

ভারতে হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫ হিন্দুদের জন্য বিবাহবিচ্ছেদের আইনি পথ তৈরি করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে এই ধরনের কোনো আইন নেই। ফলে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় ঔপনিবেশিক আমলের আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন, যেখানে বিবাহবিচ্ছেদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পথ নেই।

এই পরিস্থিতিটি হিন্দু নারীদের জন্যও সমস্যা, কারণ তারাও আইনগতভাবে বিচ্ছেদ পেতে পারেন না। কিন্তু বাস্তবে নারীর জন্য একটি অনানুষ্ঠানিক পথ রয়েছে: সন্তান নিয়ে পিতার বাড়ি চলে যাওয়া এবং ভরণপোষণের মামলা করা। পুরুষের জন্য এই অনানুষ্ঠানিক পথও নেই। একজন পুরুষ স্ত্রী ছেড়ে চলে গেলে সামাজিকভাবে নিন্দিত হন এবং আইনত স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব বহাল থাকে।

হিন্দু আইনে বিবাহবিচ্ছেদের অনুপস্থিতি বাংলাদেশের হিন্দু পুরুষদের একটি বিশেষভাবে কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলেছে। এই বিষয়ে আইন সংস্কারের কোনো উদ্যোগ সরকার নেয়নি, কারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশ নিজেই ঐতিহ্যগত কারণে এই সংস্কারের বিরোধী।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ২১: দেনমোহর: একটি ন্যায্য ধারণার অন্যায্য প্রয়োগ

২১.১ দেনমোহরের ধারণা এবং ইসলামী আইনে তার ভিত্তি

দেনমোহর বা মহর ইসলামী বিবাহ আইনের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান। কুরআনে সূরা নিসার ৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে স্বামী স্ত্রীকে মহর দেবে সদ্ভাবে। মহর একটি উপহার নয়, এটি স্ত্রীর একটি আইনি অধিকার। মহরের দুটি প্রকার রয়েছে: মোয়াজ্জেল বা তাৎক্ষণিক মহর যা বিবাহের সময় বা বিবাহের পরপরই দিতে হয়, এবং মোয়াজ্জাল বা বিলম্বিত মহর যা নির্দিষ্ট শর্তে পরে দেওয়া হয়।

ইসলামী আইনের দার্শনিক যুক্তি অনুযায়ী, মহর স্ত্রীর আর্থিক সুরক্ষার একটি ব্যবস্থা। বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী পুরুষের সাথে তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, তার নিজেকে, যুক্ত করছেন। এই যুক্তি অনুযায়ী মহর সেই প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতি। ইসলামী দর্শনে এটি একটি সুচিন্তিত ব্যবস্থা।

কিন্তু বাংলাদেশে দেনমোহরের আইনি প্রয়োগ এই দার্শনিক ভিত্তি থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়ে গেছে। দেনমোহর আজ অনেক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে পারিবারিক বিরোধে পুরুষের বিরুদ্ধে একটি আর্থিক হাতিয়ারে।

২১.২ দেনমোহরের পরিমাণ নির্ধারণ: সামাজিক প্রতিযোগিতা ও আইনি বাস্তবতা

বাংলাদেশে দেনমোহরের পরিমাণ নির্ধারণের কোনো আইনি সীমা নেই। তাত্ত্বিকভাবে দেনমোহর পুরুষের আর্থিক সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে দেনমোহর একটি সামাজিক প্রতিযোগিতার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে: কত বেশি দেনমোহর, সেটা সামাজিক মর্যাদার প্রতীক।

এই সামাজিক প্রতিযোগিতার ফলে বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে দেনমোহরের পরিমাণ পুরুষের বাস্তব আর্থিক সামর্থ্যের সাথে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। একজন দিনমজুর পুরুষের বিবাহে কয়েক লক্ষ টাকা দেনমোহর নির্ধারিত হওয়া এখন অস্বাভাবিক নয়। এই পরিমাণটি পুরুষ জীবনেও পরিশোধ করতে পারবেন না।

কিন্তু এই অতিরিক্ত দেনমোহরের কোনো আইনি প্রতিকার নেই। একজন পুরুষ যদি বলেন যে তিনি এই পরিমাণ পরিশোধ করতে পারবেন না, তাহলে আদালত তাকে বলবেন যে তিনি বিবাহের সময় সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু বিবাহের সময় এই সম্মতিটি সত্যিকারের স্বাধীন সম্মতি ছিল কিনা, সেই প্রশ্নটি উঠলে সামাজিক চাপের বিষয়টি আসে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় বিবাহের সময় ছেলে পক্ষ মেয়ে পক্ষের দাবিকৃত দেনমোহর অস্বীকার করতে পারে না, কারণ তাহলে বিয়ে ভেঙে যাবে এবং সামাজিক লজ্জা হবে। এই সামাজিক চাপের মুখে নির্ধারিত দেনমোহর আইনত একটি বৈধ চুক্তি, কিন্তু নৈতিকভাবে এটি কতটা স্বাধীন চুক্তি, সেটা প্রশ্নবিদ্ধ।

২১.৩ দেনমোহর মামলায় আদালতের পক্ষপাত: বিশ্লেষণ

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতে দেনমোহর মামলার বিচারে একটি সুস্পষ্ট প্রবণতা লক্ষণীয়: আদালত প্রায় সবসময়ই নারীর দাবির পক্ষে রায় দেন। অর্থাৎ নারী যদি দেনমোহরের পরিমাণ দাবি করেন, আদালত সেই পরিমাণ মঞ্জুর করেন।

এই প্রবণতার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, দেনমোহরের চুক্তি নিকাহনামায় লেখা আছে, এটি একটি স্বীকৃত দলিল। দ্বিতীয়ত, ইসলামী আইনের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বিচারকরা দেনমোহরের অধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে রাজি নন।

কিন্তু দেনমোহর মামলায় পুরুষের যে আইনি সমস্যাগুলো হয় তা হলো: প্রথমত, দেনমোহর পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা নেই। আদালত কিস্তির ব্যবস্থা করলেও অনেক ক্ষেত্রে পরিমাণ এত বিশাল যে পুরুষ পরিশোধ করতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, দেনমোহর না দিলে আদালত সম্পত্তি ক্রোক করতে পারেন। তৃতীয়ত, দেনমোহর মামলায় পুরুষ যদি আর্থিক অপ্রতুলতার কথা বলেন, আদালত এটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না।

একটি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে, ভারতে নানা মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টগুলো দেনমোহরের পরিমাণ হ্রাস করার ক্ষমতা আদালতের আছে বলে মতামত দিয়েছেন, যদি পরিমাণটি অস্বাভাবিক বা পুরুষের বহনক্ষমতার বাইরে হয়। বাংলাদেশে এই ধরনের কোনো বিচারিক নজির নেই।

২১.৪ দেনমোহর এবং ভরণপোষণ মামলা: একটি দ্বৈত আর্থিক চাপ

বাংলাদেশে পারিবারিক বিরোধে পুরুষ একইসাথে দেনমোহর মামলা এবং ভরণপোষণ মামলার মুখে পড়তে পারেন। এই দুটি মামলা একসাথে চললে পুরুষের আর্থিক পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে পড়ে।

উদাহরণ হিসেবে ভাবা যাক: একজন পুরুষের মাসিক আয় ২০,০০০ টাকা। তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে পারিবারিক আদালতে ভরণপোষণের মামলা করেছেন ১০,০০০ টাকা মাসে দাবি করে। একই সাথে দেনমোহরের মামলায় ৫ লক্ষ টাকা দাবি করেছেন। আদালত ভরণপোষণে ৮,০০০ টাকা মাসে নির্ধারণ করলে এবং দেনমোহরে ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করলে পুরুষের অবশিষ্ট আয় মাত্র ১২,০০০ টাকা, কিন্তু একই সাথে ৫ লক্ষ টাকার দেনমোহরের বোঝা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পুরুষ নিজে কীভাবে বাঁচবেন?

এই পরিস্থিতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি প্রশ্ন উঠে আসে: ভরণপোষণ নির্ধারণে কি পুরুষের নিজের জীবনযাপনের প্রয়োজনকে বিবেচনায় নেওয়া হয়? বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতের অনুশীলনে এই প্রশ্নের উত্তর অনেক ক্ষেত্রে 'না'।

অধ্যায় ২২: ভরণপোষণ আইন: একতরফা দায়িত্বের কাঠামো

২২.১ ভরণপোষণের আইনি ভিত্তি এবং ঐতিহাসিক বিকাশ

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশে ভরণপোষণ বা ভরণ-পোষণের আইনি ভিত্তি রয়েছে মুসলিম পারিবারিক আইন, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এবং দণ্ডবিধির ৪৮৮ ধারায়। দণ্ডবিধির ৪৮৮ ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো পুরুষ তার স্ত্রী বা সন্তানের ভরণপোষণ না দিলে তাকে এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা করা যাবে।

এই ধারাটির একটি মৌলিক সমস্যা হলো এটি শুধুমাত্র পুরুষের উপর প্রযোজ্য। একজন নারী যদি তার স্বামী বা সন্তানের ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে দণ্ডবিধির ৪৮৮ ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা করার কোনো উপায় নেই। এই একতরফা কাঠামোটি সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ভরণপোষণের এই একতরফা কাঠামো ব্রিটিশ আমলের আইন থেকে আসা। ব্রিটিশ আমলে নারীদের সম্পত্তির অধিকার ছিল না, তারা চাকরি করতে পারতেন না এবং অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ পুরুষের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে পুরুষের উপর ভরণপোষণের একচেটিয়া দায়িত্ব ন্যায়সঙ্গত ছিল।

কিন্তু আজকের বাংলাদেশে পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। লক্ষ লক্ষ নারী কর্মসংস্থানে যুক্ত। গার্মেন্ট শিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি। নারী ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, ডাক্তার, আইনজীবী সর্বত্র রয়েছেন। এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় ভরণপোষণের একচেটিয়া দায়িত্ব পুরুষের উপর চাপিয়ে রাখার আইনগত যুক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

২২.২ ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণ: বিচারিক বিবেচনার সমস্যা

পারিবারিক আদালতে ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় বিচারকের বিবেচনার ভিত্তিতে। দণ্ডবিধির ৪৮৮ ধারায় কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা নেই এবং পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশেও ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণের কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই।

এই বিবেচনামূলক ব্যবস্থায় বিচারকের সামাজিক মনোভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদি বিচারক মনে করেন যে স্ত্রী সবসময়ই আর্থিকভাবে দুর্বল এবং পুরুষ সবসময়ই আর্থিকভাবে সক্ষম, তাহলে ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণে পুরুষের প্রকৃত আর্থিক পরিস্থিতি যথেষ্ট গুরুত্ব পাবে না।

বাস্তবে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতে ভরণপোষণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো বিদ্যমান। প্রথমত, পুরুষের আয়ের প্রমাণ ছাড়াই একটি অনুমানিত ভরণপোষণ নির্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয়ত, পুরুষের নিজের বাসস্থান ও জীবনযাপনের খরচ বিবেচনায় নেওয়া হয় না। তৃতীয়ত, স্ত্রীর আয় থাকলেও তা ভরণপোষণ নির্ধারণে প্রায়ই গুরুত্ব পায় না। চতুর্থত, পুরুষ বেকার বা অসুস্থ হলেও সাময়িক ভরণপোষণ মওকুফের ব্যবস্থা নেই।

এই সমস্যাগুলো সম্মিলিতভাবে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে পুরুষ তার আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য হন। এই বাধ্যকর পরিশোধ করতে না পারলে দেওয়ানি কারাদণ্ডের বিপদ থাকে।

২২.৩ বিচ্ছেদের পরে সন্তানের ভরণপোষণ: পিতার দায়িত্ব কিন্তু মায়ের অধিকার

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশে বিবাহবিচ্ছেদের পরে সন্তানের ভরণপোষণ একটি বিশেষ সমস্যা তৈরি করে। আইন অনুযায়ী, সন্তানের হেফাজত সাধারণত মায়ের কাছে থাকে (বিস্তারিত পরবর্তী অধ্যায়ে), কিন্তু সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার।

এই ব্যবস্থায় একটি আইনি অসামঞ্জস্য রয়েছে: পিতা সন্তানকে দেখতে পারেন না (কারণ হেফাজত মায়ের কাছে), কিন্তু ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মা পিতাকে সন্তানের সাথে দেখা করতে বাধা দেন, কিন্তু পিতাকে ভরণপোষণ দিতে আইনত বাধ্য করা হয়।

এই পরিস্থিতিটি এমন একটি আইনি ফাঁদ তৈরি করে যেখানে পুরুষকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু অধিকার দেওয়া হয়নি। দায়িত্ব এবং অধিকারের এই অসামঞ্জস্য একটি মৌলিক আইনি নীতির লঙ্ঘন: যার দায়িত্ব আছে তার অধিকারও থাকতে হবে।

বাংলাদেশের হাইকোর্ট কিছু মামলায় এই বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে মা পিতাকে সন্তানের সাথে দেখা করতে বাধা দিলে ভরণপোষণ প্রদান স্থগিত রাখার অধিকার পিতার আছে। কিন্তু এই বিচারিক নির্দেশনাটি নিয়মিতভাবে অনুসরণ করা হয় না এবং নিম্ন আদালতে এটি প্রায়ই উপেক্ষিত হয়।

২২.৪ বয়স্ক সন্তানের ভরণপোষণ: পুরুষের অনন্ত দায়বদ্ধতা

বাংলাদেশের আইনে পিতার ভরণপোষণের দায়িত্ব সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরেও শেষ হয় না যদি সন্তান আর্থিকভাবে অক্ষম থাকে। অন্যদিকে, মা যদি বিচ্ছেদের পরে কর্মরত থাকেন এবং ভালো আয় করেন, তবুও পিতার ভরণপোষণের দায়িত্ব তাকে মুক্তি দেয় না।

এই আইনি কাঠামোর আরেকটি অদ্ভুত দিক হলো যে একজন বিচ্ছিন্ন পিতার উপর যদি সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকে, কিন্তু পিতা পরে পুনরায় বিবাহ করেন এবং নতুন পরিবারের দায়িত্ব নেন, তাহলে আদালত নতুন পরিবারের ব্যয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়েও পূর্বের ভরণপোষণ বহাল রাখতে পারেন।

অধ্যায় ২৩: সন্তানের হেফাজত: পিতার অধিকারের সংকট

২৩.১ শিশু হেফাজতের আইনি কাঠামো: অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০

বাংলাদেশে শিশু হেফাজতের বিষয়টি মূলত নিয়ন্ত্রিত হয় অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০ এবং ইসলামী আইনের নীতি দ্বারা। এই দুটি সূত্রের মধ্যে কখনো কখনো দ্বন্দ্ব রয়েছে।

অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০ এর ১৭ ধারায় বলা হয়েছে যে শিশুর হেফাজত নির্ধারণে আদালত শিশুর কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে। এটি একটি সুন্দর নীতি। কিন্তু এই নীতির প্রয়োগে একটি সমস্যা রয়েছে: "শিশুর কল্যাণ" ধারণাটি আদালতের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে, এবং বাংলাদেশের আদালতে এই ধারণাটি প্রায় সবসময়ই মায়ের হেফাজতকে সমর্থন করে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ইসলামী আইনে হেফাজত এবং অভিভাবকত্ব দুটি ভিন্ন ধারণা। হেফাজত (Physical custody) মানে শিশুর দৈনন্দিন যত্ন এবং বাসস্থান, আর অভিভাবকত্ব (Guardianship) মানে শিশুর সম্পত্তি ও ধর্মীয় শিক্ষার দায়িত্ব। ইসলামী আইনে মায়ের হেফাজতের অধিকার (হিদানা) সাধারণত পুত্রের ক্ষেত্রে সাত বছর পর্যন্ত এবং কন্যার ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত স্বীকৃত। পরে পিতার হেফাজতের অধিকার আসে।

কিন্তু বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতের অনুশীলনে এই নীতিটি যথেষ্ট কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাত বছরের পরেও সন্তান মায়ের কাছেই থাকছে এবং পিতা আদালতের মাধ্যমে হেফাজত পেতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছেন।

২৩.২ হেফাজত মামলায় "শিশুর কল্যাণ" নীতি: একটি পক্ষপাতদুষ্ট ব্যাখ্যা

বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতে হেফাজত মামলায় "শিশুর কল্যাণ" নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সুস্পষ্ট প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই প্রবণতাগুলো পিতার প্রতি প্রায় সবসময়ই অসুবিধাজনক।

প্রথম প্রবণতা হলো মায়ের কাছে থাকাটাই স্বাভাবিক ধরে নেওয়া হয়। বিচারকরা প্রায়ই ধরে নেন যে মায়ের কাছে থাকাই শিশুর জন্য স্বাভাবিক এবং পিতার কাছে থাকার জন্য বিশেষ কারণ দরকার। কিন্তু এই পূর্বধারণাটির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কী? শিশু মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে যে পিতা এবং মা উভয়ই সন্তানের বিকাশে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে কোন যুক্তিতে মায়ের কাছে থাকাটা "স্বাভাবিক" ধরে নেওয়া হয়?

দ্বিতীয় প্রবণতা হলো পিতার পুনর্বিবাহকে নেতিবাচকভাবে দেখা। যদি পিতা পুনর্বিবাহ করেন, তাহলে এটি প্রায়ই তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়: "সৎ মা শিশুর সাথে ভালো আচরণ করবেন না" এই ধারণাটি। কিন্তু মা যদি পুনর্বিবাহ করেন, তাহলে এটি সাধারণত হেফাজতের বিরুদ্ধে কারণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।

তৃতীয় প্রবণতা হলো পিতার আর্থিক সামর্থ্যকে হেফাজতের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে দেখা, কিন্তু মায়ের আর্থিক সামর্থ্যের মূল্যায়ন করা না হওয়া। অর্থাৎ পিতাকে প্রমাণ করতে হয় যে তিনি সন্তানের যত্ন নিতে পারবেন, কিন্তু মাকে একই প্রমাণ দিতে হয় না।

২৩.৩ দর্শনাধিকার বা ভিজিটেশন রাইটস: নামে অধিকার, বাস্তবে ব্যর্থতা

বাংলাদেশের পারিবারিক আদালত হেফাজত মামলায় সাধারণত পিতাকে দর্শনাধিকার দেন। আদালতের আদেশে বলা থাকে যে পিতা সপ্তাহে একদিন বা মাসে কয়েকদিন সন্তানের সাথে দেখা করতে পারবেন।

কিন্তু বাস্তবে এই দর্শনাধিকার কার্যকর করা অত্যন্ত কঠিন। মা যদি পিতাকে সন্তানের সাথে দেখা করতে বাধা দেন, তাহলে পিতার কাছে কার্যকর প্রতিকার নেই। আদালতের আদেশ লঙ্ঘনের জন্য আদালত অবমাননার মামলা করা যায়, কিন্তু এই প্রক্রিয়া দীর্ঘ, ব্যয়বহুল এবং ফলাফল অনিশ্চিত।

বিশ্বের অনেক দেশে "parental alienation" বা অভিভাবক-বিচ্ছেদ একটি আইনি ধারণা হিসেবে স্বীকৃত। অর্থাৎ যদি এক অভিভাবক সন্তানকে অপর অভিভাবকের বিরুদ্ধে উস্কানো দেন বা সন্তানকে সেই অভিভাবক থেকে দূরে রাখেন, তাহলে এটি আইনি পরিণতি ডেকে আনতে পারে। বাংলাদেশে এই ধারণাটি স্বীকৃত নয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশে কার্যত একটি পরিস্থিতি দেখা যায়: মা সন্তানের হেফাজত পান, পিতাকে দর্শনাধিকার দেওয়া হয়, মা দর্শনাধিকার দেন না, পিতা অবমাননার মামলা করেন, মামলা চলতে থাকে, এবং এর মধ্যে সন্তান বড় হয়ে যায়। এই পুরো প্রক্রিয়ায় পিতা-সন্তান সম্পর্ক ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়, এবং আইন কার্যকরভাবে এটি প্রতিরোধ করতে পারে না।

২৩.৪ যৌথ হেফাজত: বাংলাদেশে অনুপস্থিত একটি ধারণা

বিশ্বের অনেক দেশে "joint custody" বা যৌথ হেফাজতের ধারণাটি পারিবারিক আইনে প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণা অনুযায়ী, বিবাহবিচ্ছেদের পরে উভয় অভিভাবক সমানভাবে সন্তানের হেফাজত ভাগ করে নেন। সন্তান সপ্তাহের অর্ধেক সময় মায়ের কাছে এবং অর্ধেক সময় পিতার কাছে থাকে।

বাংলাদেশে যৌথ হেফাজতের কোনো আইনি বিধান নেই। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ বা অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০ এর কোথাও যৌথ হেফাজতের বিধান নেই। ফলে আদালত যৌথ হেফাজতের আদেশ দিতে পারেন না।

শিশু মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে যে বিবাহবিচ্ছেদের পরে উভয় অভিভাবকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ থাকা শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য সহায়ক। একচেটিয়া হেফাজত সন্তানকে এক অভিভাবক থেকে বঞ্চিত করে এবং এটি শিশুর দীর্ঘমেয়াদী মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

বাংলাদেশে যৌথ হেফাজত প্রবর্তনের জন্য আইন সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই অনুপস্থিতি শিশুর স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থতা এবং পিতার আইনি অধিকারের সীমাবদ্ধতার একটি একযোগ প্রতিফলন।

২৩.৫ আন্তর্জাতিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ: হেফাজত আইনে বৈশ্বিক প্রবণতা

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশু হেফাজত আইনের বিবর্তন একটি স্পষ্ট দিক দেখায়: উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশ যৌথ হেফাজতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং পিতার অধিকারকে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বেশিরভাগ রাজ্যে যৌথ হেফাজত এখন অগ্রাধিকার পায়। সুইডেনে ২০০৬ সালে আইন সংস্কার করে বলা হয়েছে যে বিবাহবিচ্ছেদের পরে যৌথ হেফাজতই স্বাভাবিক অনুমান। জার্মানিতে ১৯৯৭ সালে পারিবারিক আইন সংস্কারে বিবাহবিচ্ছেদের পরেও যৌথ অভিভাবকত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় ২০০৬ সালের Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act একটি প্রাথমিক অনুমান তৈরি করেছে যে সন্তানের উভয় অভিভাবকের সাথে "significant and substantial time" কাটানো সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থ।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন মামলায় পিতার হেফাজত অধিকারকে ক্রমশ বেশি স্বীকৃতি দিচ্ছে। Gaurav Nagpal v. Sumedha Nagpal (2009) মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে শিশুর কল্যাণ বিবেচনায় উভয় অভিভাবকের সাথে সময় কাটানোর অধিকার শিশুর আছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশ এই আন্তর্জাতিক প্রবণতা থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। এটি শুধু পিতার অধিকারের ব্যর্থতা নয়, এটি সন্তানের অধিকারেরও ব্যর্থতা।

অধ্যায় ২৪: উত্তরাধিকার আইন: বৈষম্যের আরেকটি মাত্রা

২৪.১ মুসলিম উত্তরাধিকার আইন: লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নয়

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন ইসলামী শরিয়ার নীতি অনুসরণ করে এবং এটি একটি জটিল ও বিশদ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় পুত্রের অংশ কন্যার দ্বিগুণ। ভাইয়ের অংশ বোনের দ্বিগুণ। এই বৈষম্যটি ইসলামের মধ্যে থেকেই বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: যেহেতু পুরুষের উপর পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব রয়েছে এবং নারী দেনমোহর পাবেন, তাই সম্পত্তিতে পুত্রের অংশ বেশি।

কিন্তু আধুনিক সমাজে যখন নারীও কর্মরত এবং পরিবারে অর্থনৈতিক অবদান রাখছেন, তখন এই ব্যাখ্যাটির প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নসাপেক্ষ। তবে এই বিষয়টি ধর্মীয় সংবেদনশীলতার কারণে আলোচনার বাইরে রয়ে গেছে।

আমাদের বিশ্লেষণে একটি ভিন্ন দিক তুলে ধরা হচ্ছে। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে পুরুষ সম্পত্তিতে বেশি অংশ পায়, কিন্তু পরিবারের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্বও তার। অর্থাৎ বেশি সম্পত্তি পাওয়ার বিনিময়ে তাকে বেশি দায়িত্ব বহন করতে হয়। এই ব্যবস্থায় পুরুষের সুবিধা এবং দায়িত্ব উভয়ই বেশি। কিন্তু আধুনিক আইনে দায়িত্বটা পুরুষের উপর একচেটিয়াভাবে আরোপিত থাকে, অথচ সম্পত্তির বন্টনটা পুনর্মূল্যায়ন করার দাবি ওঠে না।

এই দ্বিমুখী অবস্থানটি লক্ষণীয়: নারীবাদী আইন সংস্কারকরা মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ বৃদ্ধির দাবি করেন, কিন্তু পুরুষের উপর থেকে ভরণপোষণের একচেটিয়া দায়িত্ব কমানোর দাবি করেন না। এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্কারের দাবিটি লক্ষণীয়।

২৪.২ হিন্দু উত্তরাধিকার আইন: পুরুষের অতিরিক্ত দায়িত্ব

বাংলাদেশে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন মূলত প্রথাগত আইনের উপর ভিত্তি করে, এবং এটি হিন্দু পুরুষদের জন্য একটি জটিল পরিস্থিতি তৈরি করে।

হিন্দু যৌথ পারিবারিক সম্পত্তির (Joint Hindu Family Property) ব্যবস্থায় কর্তা বা পরিবারের প্রধান পুরুষ পরিবারের সম্পত্তি পরিচালনা করেন। এই কর্তার উপর পরিবারের সকল সদস্যের ভরণপোষণের দায়িত্ব রয়েছে। এই ব্যবস্থাটি পুরুষকে কেন্দ্রে রাখে এবং পুরুষের উপর বিশাল দায়িত্ব আরোপ করে।

বাংলাদেশে হিন্দু মেয়েদের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার নেই, যেটি একটি গুরুতর বৈষম্য এবং সংস্কারের দাবি রাখে। কিন্তু এই বৈষম্যের পাশাপাশি হিন্দু পুরুষদের উপর যে অতিরিক্ত দায়িত্ব আরোপিত, তা নিয়ে আলোচনা কম।

২৪.৩ সম্পত্তি হস্তান্তরে পুরুষের অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতা: কিছু সাম্প্রতিক উদ্বেগ

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে (Transfer of Property Act) পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তরের বিষয়ে কিছু বিধান রয়েছে। এই বিধানগুলো কীভাবে প্রযোজ্য হয় সেটা নিয়ে একটি বিষয় লক্ষণীয়।

বাংলাদেশে অনেক পুরুষ তাদের স্ত্রীর নামে সম্পত্তি নিবন্ধন করেন বিভিন্ন কারণে: সামাজিক কারণ, ঋণ এড়ানোর কারণ, বা স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ হিসেবে। পরে বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে এই সম্পত্তি ফিরে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। আইনগতভাবে একবার নিবন্ধিত সম্পত্তি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রমাণ করতে হবে যে এটি জালিয়াতি বা প্রতারণার মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে। কিন্তু স্বেচ্ছায় হস্তান্তরিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই প্রমাণ দেওয়া অত্যন্ত কঠিন।

এই পরিস্থিতিটি অনেক পুরুষকে আর্থিক ধ্বংসের মুখে ফেলে। বিবাহবিচ্ছেদের পর পুরুষ তার নিজের কেনা বাড়ি হারান, কারণ সেটা স্ত্রীর নামে ছিল। এই পরিস্থিতি একটি আইনি শূন্যতার ফলাফল: বিবাহিত অবস্থায় অর্জিত সম্পত্তি (Matrimonial Property) কীভাবে বিভক্ত হবে সে বিষয়ে বাংলাদেশে কোনো সুস্পষ্ট আইন নেই।

অধ্যায় ২৫: বৈবাহিক সম্পত্তি আইনের শূন্যতা: পুরুষের অধিকারের অপ্রতুল সুরক্ষা

২৫.১ বৈবাহিক সম্পত্তির ধারণা এবং বাংলাদেশে এর অনুপস্থিতি

পশ্চিমের অনেক দেশে "marital property" বা বৈবাহিক সম্পত্তির ধারণাটি পারিবারিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই ধারণা অনুযায়ী, বিবাহকালীন সময়ে যে সম্পত্তি অর্জিত হয় তা উভয় পক্ষের যৌথ সম্পদ এবং বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে এটি ন্যায্যভাবে বিভক্ত হওয়া উচিত।

বাংলাদেশে এই ধারণাটি বিদ্যমান নেই। বিবাহকালীন অর্জিত সম্পত্তি যার নামে নিবন্ধিত তারই সম্পত্তি। এই শূন্যতা উভয় লিঙ্গের জন্যই সমস্যা তৈরি করতে পারে, কিন্তু বাস্তবে পুরুষের জন্য এটি বেশি সমস্যাজনক।

কারণটি হলো বাংলাদেশে সামাজিক প্রথা অনুযায়ী পুরুষই সাধারণত পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী এবং সম্পত্তির প্রধান অর্জনকারী। বিবাহকালীন সময়ে পুরুষ সম্পত্তি অর্জন করেন এবং সেই সম্পত্তি তার নামে থাকে। বিচ্ছেদের পরে পুরুষ তার নিজের অর্জিত সম্পত্তি রক্ষা করতে পারেন।

কিন্তু একইসাথে, বিচ্ছেদের পরে দেনমোহর, ভরণপোষণ এবং অন্যান্য আর্থিক দায় পরিশোধের জন্য পুরুষের সম্পত্তি ক্রোক হতে পারে। এই ক্রোকের পদ্ধতিতেও পুরুষের জন্য কিছু আইনি সুরক্ষা নেই।

বৈবাহিক সম্পত্তি আইনের অনুপস্থিতির আরেকটি দিক হলো গৃহস্থালি কাজের আর্থিক স্বীকৃতির অনুপস্থিতি। যদি একজন নারী গৃহস্থালি কাজের মাধ্যমে পরিবারে অবদান রাখেন, এই অবদানের কোনো আর্থিক মূল্যায়ন বাংলাদেশের আইনে নেই। এটি নারীর প্রতি বৈষম্য। কিন্তু একইসাথে, বিবাহকালীন সময়ে পুরুষের আর্থিক অবদানও বিচ্ছেদের সময় সুষম বন্টনের আওতায় আসে না।

২৫.২ বিবাহের ব্যয়ভার: পুরুষের একতরফা আর্থিক বোঝা

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশে বিবাহের সময় পুরুষের উপর আর্থিক ব্যয়ভারের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। বিবাহের অনুষ্ঠান ব্যয়, কনেপক্ষকে উপহার, দেনমোহর, গয়না ইত্যাদির ব্যয় সাধারণত বর পক্ষকেই বহন করতে হয়। এই ব্যয়ের আইনি স্বীকৃতি নেই।

যদি বিবাহ ভেঙে যায়, বর পক্ষ এই ব্যয়গুলো ফেরত পাওয়ার কোনো আইনি পথ নেই। অন্যদিকে নারী পক্ষ দেনমোহর পাওয়ার আইনি পথ পান।

এই অসামঞ্জস্যটি আইনি দৃষ্টিতে একটি চুক্তি আইনের প্রশ্ন তৈরি করে। বিবাহ একটি চুক্তি, এবং চুক্তি ভাঙলে যার ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার থাকতে পারে। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদে পুরুষের আর্থিক ক্ষতির কোনো আইনি স্বীকৃতি নেই।

২৫.৩ আইনি পরামর্শ সংস্কৃতির অনুপস্থিতি: পুরুষের অজ্ঞতা ও দুর্বলতা

বাংলাদেশে পারিবারিক আইনে পুরুষের একটি বড় দুর্বলতা হলো আইনি পরামর্শের অভাব। বিবাহের আগে বা বিবাহের সময় পুরুষরা সাধারণত আইনজীবীর পরামর্শ নেন না। তারা জানেন না যে নিকাহনামায় তাদের অধিকার সুরক্ষার কী কী বিধান যুক্ত করা যায়।

অন্যদিকে, নারীপক্ষ বিভিন্ন এনজিও এবং নারী অধিকার সংস্থার মাধ্যমে আইনি সহায়তা এবং পরামর্শ পান। এই তথ্যের অসামঞ্জস্য পুরুষকে একটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে দুর্বল অবস্থানে রাখে।

অধ্যায় ২৬: বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় পুরুষের অভিজ্ঞতা: একটি মানবিক বিশ্লেষণ

২৬.১ বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মানসিক এবং সামাজিক মাত্রা

পারিবারিক আইন শুধু ধারা ও বিধানের বিষয় নয়, এটি মানুষের জীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। বিবাহবিচ্ছেদ একটি গভীরভাবে কষ্টকর অভিজ্ঞতা, উভয় পক্ষের জন্য। কিন্তু এই কষ্টের ধরন এবং পরিমাণ পুরুষ ও নারীর জন্য ভিন্ন, এবং আইনি ব্যবস্থা এই ভিন্নতাকে আরও জটিল করে তোলে।

বাংলাদেশে বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় একজন পুরুষের অভিজ্ঞতা সাধারণত নিম্নলিখিত পর্যায়গুলো দিয়ে যায়। প্রথমত, পারিবারিক সংকটের পর্যায়, যেখানে দাম্পত্য দ্বন্দ্ব তীব্র হয়। দ্বিতীয়ত, মামলার পর্যায়, যেখানে স্ত্রী মামলা করেন এবং পুরুষ আসামি হন। তৃতীয়ত, গ্রেফতার বা সমন পর্যায়, যেখানে পুরুষকে আদালতে হাজির হতে হয়। চতুর্থত, মামলা চলাকালীন পর্যায়, যেখানে পুরুষ একইসাথে আইনি লড়াই, আর্থিক চাপ এবং সামাজিক লাঞ্ছনার মুখে থাকেন। পঞ্চমত, চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর্যায়, যেখানে পুরুষ হয় সম্পদ হারান, না হয় দীর্ঘ কারাবাস ভোগ করেন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই পুরো প্রক্রিয়ায় পুরুষের জন্য কোনো সামাজিক সহায়তা নেই। পুরুষ তার কষ্টের কথা বলতে পারেন না, কারণ সমাজ মনে করে পুরুষের কষ্টের কথা বলা "দুর্বলতা"। পুরুষ আইনি সহায়তা পেতে পারেন, কিন্তু সেটা ব্যয়সাপেক্ষ। মানসিক সহায়তার কোনো ব্যবস্থা নেই।

২৬.২ পারিবারিক বিচ্ছেদে পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যের সংকট

বৈশ্বিক গবেষণায় দেখা গেছে যে বিবাহবিচ্ছেদের পরে পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নারীর চেয়ে বেশি। বিবাহবিচ্ছেদের পরে পুরুষের আত্মহত্যার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। একাকীত্ব, সন্তান হারানোর বেদনা, আর্থিক ধ্বংস এবং সামাজিক কলঙ্ক মিলিয়ে পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বাংলাদেশে এই মানসিক স্বাস্থ্য সংকটটি সম্পূর্ণ অদৃশ্য। রাষ্ট্রীয় মানসিক স্বাস্থ্য নীতিতে বিবাহবিচ্ছেদের শিকার পুরুষদের কথা বলা হয় না। এনজিওগুলো এই বিষয়ে কাজ করে না। সামাজিক সচেতনতা নেই।

এই উপেক্ষাটি শুধু আইনি নয়, এটি মানবিক। একটি রাষ্ট্র যদি তার নাগরিকদের মানসিক স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেয়, তাহলে সেটা লিঙ্গনির্বিশেষে হওয়া উচিত।

২৬.৩ পারিবারিক আইনে মিথ্যা অভিযোগের নিদর্শন: একটি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি

পারিবারিক আদালতে বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা রয়েছে: মামলাকে শক্তিশালী করার জন্য বা পুরুষের বিরুদ্ধে চাপ তৈরির জন্য ভরণপোষণ বা হেফাজত মামলার পাশাপাশি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করা।

এই ধরনের "multi-pronged legal strategy" বা বহুমুখী আইনি কৌশল পুরুষকে একাধিক মামলার মুখে ফেলে। প্রতিটি মামলায় আইনজীবীর ফি, আদালতে হাজিরা এবং সময়ের ক্ষতি হয়। এই সম্মিলিত চাপ পুরুষকে মীমাংসায় রাজি হতে বাধ্য করে।

এই কৌশলটি পারিবারিক আদালত ও ফৌজদারি আদালত উভয়কেই ব্যবহার করে। পারিবারিক আদালতে ভরণপোষণ ও হেফাজত মামলা এবং ফৌজদারি আদালতে যৌতুক বা নারী নির্যাতনের মামলা। এই দ্বিমুখী আইনি আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে পুরুষ অনেক ক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে পড়েন।

অধ্যায় ২৭: পারিবারিক আইনে জুরিসপ্রুডেন্টিয়াল বিশ্লেষণ

২৭.১ রলসিয়ান ন্যায়বিচার তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের পারিবারিক আইন

জন রলস তার "A Theory of Justice" (১৯৭১) গ্রন্থে ন্যায়বিচারের যে মডেল উপস্থাপন করেছেন, তার কেন্দ্রে রয়েছে "veil of ignorance" বা অজ্ঞতার পর্দার ধারণা। এই ধারণায় রলস প্রস্তাব করেছেন যে একটি ন্যায্য সমাজের নীতি নির্ধারণ করতে হলে কল্পনা করতে হবে যে আমরা জানি না সমাজে আমার অবস্থান কী হবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

লিঙ্গ, শ্রেণী, জাতি কোনো কিছুই আমরা জানি না। এই অজ্ঞতার পর্দার আড়াল থেকে আমরা যে নীতি বেছে নেব, সেটাই ন্যায্য নীতি।

এই মানদণ্ডে বাংলাদেশের পারিবারিক আইনের মূল বিধানগুলো পরীক্ষা করা যাক। যদি আমরা না জানতাম যে বিবাহবিচ্ছেদে আমরা কোন ভূমিকায় থাকব, পুরুষ নাকি নারী, তাহলে কি আমরা এমন একটি ব্যবস্থা বেছে নিতাম যেখানে পুরুষ একতরফাভাবে সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব বহন করবে, দেনমোহর দেবে, ভরণপোষণ দেবে, এবং সন্তানের হেফাজত হারাবে? স্বাভাবিকভাবেই না।

রলসিয়ান অর্থে ন্যায্য পারিবারিক আইন হবে সেই আইন যেখানে উভয় পক্ষের অধিকার এবং দায়িত্ব সমানভাবে বন্টিত হবে, বিবাহের সময় উভয়পক্ষকে সমান তথ্য এবং আইনি পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে, বিচ্ছেদের সময় সম্পদ ন্যায্যভাবে ভাগ হবে, এবং সন্তানের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয় অভিভাবকের সমান অধিকার থাকবে। বাংলাদেশের বর্তমান আইন এই মানদণ্ড পূরণ করে না।

২৭.২ ক্ষমতার দর্শন এবং পারিবারিক আইন: মিশেল ফুকোর বিশ্লেষণ কাঠামো

মিশেল ফুকো তার "Discipline and Punish" এবং অন্যান্য কাজে ক্ষমতার একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। ফুকোর মতে, ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রের কাছে থাকে না, বরং এটি সমাজের সর্বস্তরে বিতরিত। এবং ক্ষমতা সর্বদা "জ্ঞান" তৈরির সাথে যুক্ত। অর্থাৎ যারা জ্ঞান নির্ধারণ করেন তারাই ক্ষমতার অধিকারী।

পারিবারিক আইনে এই ফুকোবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে "পারিবারিক বিরোধে পুরুষই দোষী" এই জ্ঞানটি কারা নির্মাণ করেছে এবং কেন। এই জ্ঞান নির্মাণে ভূমিকা রয়েছে নারী অধিকার সংস্থাগুলোর, রাজনৈতিক দলগুলোর নারীভিত্তিক এজেন্ডার, গণমাধ্যমের পক্ষপাতদুষ্ট প্রচারণার এবং ধর্মীয় ব্যাখ্যার।

এই জ্ঞান-ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে পারিবারিক আইন তৈরি হয়েছে এবং টিকে আছে। পুরুষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট আইন টিকে থাকার কারণ এই জ্ঞান-ক্ষমতার কাঠামোর শক্তি। এই কাঠামোটিকে প্রশ্ন করার কোনো পথ নেই, কারণ প্রশ্ন করলেই "নারীবিরোধী" ট্যাগ লেগে যায়।

ফুকোবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পারিবারিক আইন সংস্কারের জন্য প্রথমে এই জ্ঞান-ক্ষমতার কাঠামোকেই প্রশ্নবিদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ প্রচলিত ধারণাগুলো, "পারিবারিক বিরোধে পুরুষই দোষী", "সন্তানের জন্য মায়ের কাছে থাকাই সর্বোত্তম", "পুরুষের ভরণপোষণ দেওয়ার সামর্থ্য আছে" এই ধারণাগুলো কতটা প্রমাণভিত্তিক এবং কতটা সামাজিক নির্মাণ, সেটা যাচাই করতে হবে।

২৭.৩ লিবার্টারিয়ান দর্শন এবং পারিবারিক আইন: রবার্ট নোজিকের দৃষ্টিকোণ

রবার্ট নোজিক তার "Anarchy, State, and Utopia" (১৯৭৪) গ্রন্থে একটি লিবার্টারিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। নোজিকের মতে, ব্যক্তির অধিকারই সর্বোচ্চ, এবং রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বাধীনতায় তখনই হস্তক্ষেপ করতে পারে যখন অন্যের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

নোজিকের এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের পারিবারিক আইনের কিছু বিধান প্রশ্নসাপেক্ষ। উদাহরণস্বরূপ, বিবাহবিচ্ছেদের পরে ভরণপোষণ দেওয়ার বাধ্যকর আদেশ। নোজিকের মতে, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করবে সেটা রাষ্ট্র বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারণ করলে এটি ব্যক্তির স্বাধীনতার লঙ্ঘন।

তবে নোজিকের সমালোচকরা বলেন যে এই লিবার্টারিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক দায়িত্বের বিষয়টিকে উপেক্ষা করে। সন্তানের ভরণপোষণের মতো বিষয়ে রাষ্ট্রের বাধ্যকর হস্তক্ষেপ ন্যায্য, কারণ এখানে তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ সন্তানের অধিকার রক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রাক্তন স্ত্রীর ভরণপোষণের মতো বিষয়ে এই যুক্তি কতটা প্রযোজ্য, সেটা নিয়ে দার্শনিক বিতর্ক আছে।

২৭.৪ কেয়ার এথিক্স এবং পুরুষের অভিজ্ঞতা: ক্যারল গিলিগানের তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন

ক্যারল গিলিগান তার "In a Different Voice" (১৯৮২) গ্রন্থে নৈতিকতার একটি ভিন্ন কাঠামো উপস্থাপন করেছেন। গিলিগান যুক্তি দিয়েছেন যে নারীর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কের উপর ভিত্তিক এবং "কেয়ার এথিক্স" বা যত্নের নৈতিকতা নামে পরিচিত। এই নৈতিকতা সম্পর্ক, সংযোগ এবং পারস্পরিক দায়িত্বকে কেন্দ্রে রাখে।

গিলিগানের কাজটি নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হলেও এই "কেয়ার এথিক্স" পুরুষের পারিবারিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণেও প্রযোজ্য। একজন পিতা যখন তার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হন, তখন তার মধ্যে যে বেদনা থাকে সেটা "কেয়ার এথিক্স" এর ভাষায় বোঝা যায়। পিতার সন্তানের প্রতি যত্ন একটি মূল্যবান নৈতিক সম্পদ, এবং এই সম্পদকে আইন যখন অস্বীকার করে, তখন সেটি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ভুল।

গিলিগানের তত্ত্বকে নারীবাদী আইন সংস্কারে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই তত্ত্বটি পিতার পারিবারিক অধিকারের পক্ষেও সমানভাবে ব্যবহার করা যায়। পারিবারিক সম্পর্কের যত্ন শুধু মায়ের বিশেষত্ব নয়, পিতারও অধিকার এবং সম্ভাবনা।

২৭.৫ আইনি বাস্তববাদ এবং বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতের অনুশীলন

আমেরিকান আইনি বাস্তববাদ, যার প্রতিনিধি ছিলেন জেরোম ফ্র্যাংক, কার্ল লুয়েলিন এবং অলিভার ওয়েন্ডেল হোমস, মনে করে যে আইন বোঝার জন্য আদালতের লিখিত বিধান নয়, বরং বাস্তবে কী ঘটে সেটা দেখতে হবে। বিচারকরা মানুষ, তাদের পূর্বধারণা এবং সামাজিক মনোভঙ্গি রায়কে প্রভাবিত করে।

এই বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতের অনুশীলন পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে আইনে লেখা আছে একটি কথা, কিন্তু বাস্তবে হয় আরেকটি। আইনে লেখা আছে শিশুর কল্যাণ সর্বোচ্চ, কিন্তু বাস্তবে মায়ের কাছে হেফাজত দেওয়াই স্বাভাবিক অনুশীলন। আইনে লেখা আছে উভয়পক্ষের অধিকার সমান, কিন্তু বাস্তবে পুরুষের অধিকার কম গুরুত্ব পায়।

এই ফাঁকটি পূরণ করতে হলে শুধু আইন সংস্কার যথেষ্ট নয়, বিচারিক সংস্কৃতির পরিবর্তনও প্রয়োজন। বিচারকদের প্রশিক্ষণে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বিচারের ধারণা, পুরুষের অধিকার সংক্রান্ত আইনি জ্ঞান এবং জ্ঞানগত পক্ষপাত সম্পর্কে সচেতনতা অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ২৮: পারিবারিক আইনে ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন

২৮.১ পারিবারিক বিরোধে ভিকটিম পরিচয়ের রাজনীতি

আগের খণ্ডগুলোতে "ভিকটিম কার্ড" সংস্কৃতির সামাজিক মাত্রা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা পারিবারিক বিরোধের নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে এই সংস্কৃতির আইনি প্রতিফলন বিশ্লেষণ করব।

পারিবারিক বিরোধে "ভিকটিম কার্ড" সংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় কাজ করে। বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী যদি নিজেকে ভিকটিম হিসেবে উপস্থাপন করেন, তাহলে আদালত তার প্রতি সহানুভূতিশীল হন এবং ভরণপোষণ, হেফাজত ও সম্পদ বণ্টনে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে প্রবণ হন। এই ভিকটিম পরিচয় আইনি কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হলে এটি ন্যায়বিচারকে বিঘ্নিত করে।

কিন্তু এই কথা বলা কঠিন, কারণ সত্যিকারের ভিকটিম এবং কৌশলগত ভিকটিম পরিচয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা আদালতের জন্য অত্যন্ত কঠিন। এই কঠিনতার সুযোগ নিয়েই কৌশলগত ভিকটিম পরিচয় কাজ করে।

পারিবারিক বিরোধে ভিকটিম পরিচয়ের কৌশলগত ব্যবহারের কিছু লক্ষণ রয়েছে। প্রথমত, বিবাহবিচ্ছেদের ঠিক আগে ভরণপোষণ বা হেফাজতের মামলা না করে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা করা। দ্বিতীয়ত, পারিবারিক বিরোধের বিবরণে পুরুষের আচরণকে অতিরঞ্জিত করা। তৃতীয়ত, সন্তানকে পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করা।

২৮.২ আইনি সহায়তা সংস্থার ভূমিকা এবং একতরফা পরামর্শ

বাংলাদেশে বিভিন্ন আইনি সহায়তা সংস্থা রয়েছে যারা পারিবারিক বিরোধে সহায়তা দেয়। কিন্তু এই সংস্থাগুলোর বেশিরভাগই মূলত নারীর জন্য সেবা দেয়। মহিলা আইনজীবী সমিতি, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ব্লাস্ট এবং অন্যান্য সংস্থা প্রাথমিকভাবে নারীর পারিবারিক আইনি অধিকার রক্ষায় কাজ করে।

এই সংস্থাগুলো নারীকে তার আইনি পথ সম্পর্কে জানায় এবং মামলা করতে সাহায্য করে। এটি একটি প্রয়োজনীয় সেবা, কারণ নারীর আইনি সাক্ষরতা বাড়ানো দরকার। কিন্তু সমস্যা হলো পুরুষের জন্য সমতুল্য কোনো সেবা নেই।

একজন পুরুষ যখন মিথ্যা পারিবারিক মামলার শিকার হন, তখন তিনি কোথায় যাবেন? তার জন্য কোনো বিনামূল্যে আইনি সহায়তা নেই, কোনো পরামর্শ কেন্দ্র নেই, কোনো মানসিক সহায়তা নেই। তিনি একা এই লড়াই লড়তে হয়।

এই অসামঞ্জস্যটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাত তৈরি করে। আইনি সহায়তা সংস্থাগুলো নারীকে তার আইনি পথ জানায়, নারী সেই পথে যায়, পুরুষ একাই লড়াই করে। এই অবস্থায় ন্যায়বিচার কার পক্ষে যাবে?

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

২৮.৩ গণমাধ্যমের ভূমিকা: পারিবারিক বিরোধে পক্ষপাতদুষ্ট আখ্যান

বাংলাদেশের গণমাধ্যম পারিবারিক বিরোধের বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট আখ্যান অনুসরণ করে। স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে নারীর অভিযোগ হলে তা সংবাদের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু পুরুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার গল্প সংবাদে আসে না।

এই মিডিয়া পক্ষপাত একটি সামাজিক বাস্তবতা তৈরি করে: সমাজে ধারণা জন্মায় যে পারিবারিক বিরোধে পুরুষই দোষী, কারণ মিডিয়ায় সবসময় পুরুষের দোষের গল্পই দেখা যায়। এই সামাজিক ধারণা পারিবারিক আদালতে বিচারকের মানসিকতাকেও প্রভাবিত করে।

অধ্যায় ২৯: হিন্দু, খ্রিস্টান এবং ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পারিবারিক আইন: পুরুষের অতিরিক্ত দুর্বলতা

২৯.১ হিন্দু পারিবারিক আইনে পুরুষের বিশেষ সমস্যা

বাংলাদেশে হিন্দু পারিবারিক আইন মুসলিম পারিবারিক আইনের চেয়ে কম সুসংহত এবং অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু পুরুষের জন্য আরও কঠিন। প্রথমত, হিন্দু বিবাহ অবিচ্ছেদ্য: একজন হিন্দু পুরুষ চাইলেও আইনগতভাবে বিবাহবিচ্ছেদ পেতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, বিধবা বিবাহ প্রথা আইনত সম্ভব হলেও সামাজিকভাবে হিন্দু পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ প্রায় অসম্ভব যদি প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকেন। তৃতীয়ত, হিন্দু পরিবারে জয়েন্ট ফ্যামিলির আইনে পুরুষ কর্তার উপর পুরো পরিবারের দায়িত্ব।

হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদ আইনের অনুপস্থিতি একটি গুরুতর সমস্যা। একটি ক্ষতিকর বিবাহে আটকা পড়া হিন্দু পুরুষের কোনো পথ নেই। যদি তিনি স্ত্রীর দ্বারা নির্যাতিত হন, তবুও আইনত তাকে সেই সম্পর্কে থাকতে হয়।

বাংলাদেশে হিন্দু পারিবারিক আইন সংস্কারের দাবি মূলত নারীর অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে উঠেছে। হিন্দু নারীর সম্পত্তির অধিকার, হিন্দু বিধবার অধিকার এবং হিন্দু নারীর বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার নিয়ে কথা হয়েছে। কিন্তু হিন্দু পুরুষের বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার নিয়ে কথা হয়নি।

এই একচোখা সংস্কারের প্রয়াস আইনতাত্ত্বিকভাবে অসম্পূর্ণ। একটি সত্যিকারের পারিবারিক আইন সংস্কারে উভয় লিঙ্গের অধিকার ও সমস্যা সমানভাবে বিবেচনায় নিতে হবে।

২৯.২ খ্রিস্টান পারিবারিক আইনে বিবাহবিচ্ছেদের জটিলতা

বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পারিবারিক বিষয় খ্রিস্টান বিবাহ আইন ১৮৭২ এবং বিবাহবিচ্ছেদ আইন ১৮৬৯ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বিবাহবিচ্ছেদ আইন ১৮৬৯ এর অধীনে খ্রিস্টান বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সীমিত কারণ স্বীকৃত। এই আইনে ব্যভিচার একটি কারণ। কিন্তু আগে এই আইনে পুরুষের জন্য শুধু ব্যভিচার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু নারীর জন্য ব্যভিচারের সাথে নিষ্ঠুরতা বা পরিত্যাগও লাগত। এই বৈষম্যটি ব্রিটিশ আমলের আইনে ছিল।

বর্তমানে এই আইনে সংশোধনের মাধ্যমে নারীর জন্য ব্যভিচার এককভাবেও কারণ হতে পারে। কিন্তু মূল সমস্যা থেকে যায়: খ্রিস্টান পারিবারিক আইনে বিবাহবিচ্ছেদের স্বীকৃত কারণের সংকীর্ণতা উভয় লিঙ্গকেই সীমাবদ্ধ করে, তবে সামাজিক বাস্তবতায় পুরুষের উপর এই সীমাবদ্ধতার প্রভাব বেশি।

২৯.৩ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পারিবারিক আইন: প্রথাগত আইন এবং পুরুষের অবস্থা

বাংলাদেশে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল সহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পারিবারিক বিষয় তাদের নিজস্ব প্রথাগত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই প্রথাগত আইনগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ এবং ঐতিহ্যগত প্রথার মাধ্যমে স্বীকৃত।

এই প্রথাগত আইনগুলোতে পারিবারিক বিষয়ে পুরুষ ও নারীর অবস্থা সম্পর্কে তথ্য অপ্রতুল। কিন্তু একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ হলো যে ঐতিহ্যগত সমাজের প্রথাগত আইনগুলো পুরুষের উপর পারিবারিক দায়িত্বের ভার বেশি দেয়।

অধ্যায় ৩০: তুলনামূলক আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণ: বিশ্বের অন্যান্য দেশে পারিবারিক আইনের বিবর্তন

৩০.১ ভারতের পারিবারিক আইন সংস্কারের অভিজ্ঞতা

ভারতের পারিবারিক আইন বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি বিবর্তিত এবং কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের অধিকারের প্রতি বেশি সচেতন। এই বিবর্তনের কিছু মূল মুহূর্ত রয়েছে যেগুলো বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014) মামলায় বলা হয়েছে যে যৌতুক আইনসহ কিছু আইনে গ্রেফতারের আগে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। এই মামলার আগে ভারতে ৪৯৮এ ধারা (যৌতুক নির্যাতন) এর অধীনে স্বামী ও তার পরিবারকে বিনা প্রমাণে গ্রেফতার করা হত।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট Shayara Bano v. Union of India (2017) মামলায় তিন তালাক বা "triple talaq" কে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে। এই রায়টি মুসলিম নারীর অধিকারের পক্ষে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।

ভারতে যৌথ হেফাজতের ধারণা ক্রমশ আদালতে স্বীকৃতি পাচ্ছে। Gaurav Nagpal v. Sumedha Nagpal (2009) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট শিশুর কল্যাণে উভয় অভিভাবকের সাথে সময় কাটানোর গুরুত্ব স্বীকার করেছে।

ভারতে বৈবাহিক সম্পত্তির ধারণা এখনো পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু কিছু রায়ে গৃহস্থালি কাজের আর্থিক মূল্য স্বীকার করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৩০.২ পাকিস্তানে মুসলিম পারিবারিক আইনের বিকাশ

পাকিস্তানে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ একই, কিন্তু পাকিস্তানের আদালতগুলো কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে ভিন্নভাবে এটি ব্যাখ্যা করেছে।

পাকিস্তানে খুলা বা বিচ্ছেদের মামলায় আদালত কিছু ক্ষেত্রে নারীকে দেনমোহর ফেরত দেওয়ার শর্তে বিচ্ছেদ দিয়েছেন। এই প্রথাটি ইসলামী আইনের ঐতিহ্যগত খুলার সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পাকিস্তানে পারিবারিক আদালতের আইন বাংলাদেশের মতো একই কিন্তু প্রয়োগের পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য রয়েছে। পাকিস্তানের কিছু এলাকায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) পদ্ধতি পারিবারিক বিরোধে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৩০.৩ পশ্চিমা দেশগুলোতে পারিবারিক আইন সংস্কারের সাম্প্রতিক প্রবণতা

পশ্চিমা দেশগুলোতে পারিবারিক আইন সংস্কারে দুটি প্রধান প্রবণতা লক্ষণীয়। প্রথমত, যৌথ হেফাজতের দিকে অগ্রযাত্রা, এবং দ্বিতীয়ত, ভরণপোষণের বাধ্যকর প্রদানের সময়সীমা নির্ধারণ।

অস্ট্রেলিয়ায় ২০০৬ সালের সংস্কারে বলা হয়েছে যে উভয় অভিভাবকের সাথে সন্তানের "meaningful relationship" বজায় রাখা শিশুর স্বার্থে। এই সংস্কারটি পিতার অধিকার আন্দোলনের ফলস্বরূপ।

যুক্তরাজ্যে আলিমনি বা ভরণপোষণের মেয়াদে সীমা নির্ধারণের দিকে সংস্কার হচ্ছে। আগে যাবজ্জীবন ভরণপোষণ দেওয়ার বিধান ছিল, এখন নির্দিষ্ট মেয়াদে ভরণপোষণের দিকে যাচ্ছে।

সুইডেনে পারিবারিক আইনে লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার একটি শক্তিশালী কাঠামো রয়েছে। উভয় অভিভাবকের সমান হেফাজতের অধিকার, ভরণপোষণের সময়সীমা নির্ধারণ এবং বৈবাহিক সম্পত্তির সমান বণ্টন সুইডেনের পারিবারিক আইনের বৈশিষ্ট্য।

নরওয়েতে ২০১৬ সালে পারিবারিক আইন সংস্কারে পিতার হেফাজতের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। নরওয়ের আদালত এখন যৌথ হেফাজতকে ডিফল্ট অবস্থান হিসেবে বিবেচনা করে।

এই আন্তর্জাতিক প্রবণতা থেকে বাংলাদেশ শিক্ষা নিতে পারে। পশ্চিমা দেশগুলো এই সংস্কারের দিকে গেছে কারণ তারা বুঝেছে যে সত্যিকারের লিঙ্গ-সমতা মানে শুধু নারীর অগ্রগতি নয়, এটি উভয় লিঙ্গের ন্যায্য আচরণ।

৩০.৪ তুরস্ক এবং মরক্কোতে মুসলিম পারিবারিক আইন সংস্কার: একটি অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর মধ্যে তুরস্ক এবং মরক্কো পারিবারিক আইন সংস্কারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

তুরস্কে ২০০২ সালে নতুন সিভিল কোড পাস হয়েছে যেখানে বিবাহের সময় উভয় স্বামী-স্ত্রীর সমান আইনি মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে, যৌথ হেফাজতের বিধান যুক্ত হয়েছে এবং বৈবাহিক সম্পত্তির সমান বণ্টনের নীতি প্রবর্তিত হয়েছে।

মরক্কোতে ২০০৪ সালে মুদাওয়ানা বা পারিবারিক কোড সংস্কার হয়েছে। এই সংস্কারে বহুবিবাহের শর্ত কঠোর করা হয়েছে, তালাকের জন্য বিচারিক পর্যবেক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং সন্তানের হেফাজতে উভয় অভিভাবকের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

এই উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতেও পারিবারিক আইন সংস্কার সম্ভব, এবং এই সংস্কার ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে করা যায়।

অধ্যায় ৩১: পারিবারিক আইনে রাজনৈতিক অর্থনীতি: কেন সংস্কার হচ্ছে না

৩১.১ পারিবারিক আইন সংস্কারের রাজনৈতিক বাধা

বাংলাদেশে পারিবারিক আইন সংস্কার না হওয়ার পেছনে একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতি কাজ করছে। প্রথমত, নারী ভোটার তুষ্টি। বাংলাদেশে মোট ভোটারের অর্ধেকেরও বেশি নারী। নারীবান্ধব আইন নারী ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার হাতিয়ার। পারিবারিক আইন সংস্কার করলে নারী ভোটারদের বিরাগভাজন হওয়ার ভয় থাকে।

দ্বিতীয়ত, নারী সংগঠনের চাপ। বাংলাদেশে শক্তিশালী নারী সংগঠনগুলো পারিবারিক আইন সংস্কারের বিরোধিতা করে, কারণ বিদ্যমান আইন তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব এবং তহবিল প্রবাহের সাথে যুক্ত। এই সংস্থাগুলো পারিবারিক বিরোধে নারীকে সহায়তা করে এবং এই কাজের জন্য দেশীয় ও বিদেশী তহবিল পায়।

তৃতীয়ত, ধর্মীয় সংবেদনশীলতা। পারিবারিক আইনের সাথে ধর্মের সংযোগ থাকায় সংস্কারের প্রয়াস ধর্মীয় নেতাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে পারে।

চতুর্থত, পুরুষ অধিকার আন্দোলনের অনুপস্থিতি। বাংলাদেশে পুরুষের অধিকারের জন্য কোনো সংগঠিত আন্দোলন নেই যারা সংসদে দাবি উপস্থাপন করতে পারে বা জনমত তৈরি করতে পারে।

পঞ্চমত, মিডিয়া পক্ষপাত। গণমাধ্যম পারিবারিক বিরোধে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে না, ফলে জনমতে সংস্কারের দাবি তৈরি হয় না।

৩১.২ পারিবারিক আইন সংস্কারের প্রতিষ্ঠানিক বাধা

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

রাজনৈতিক বাধার পাশাপাশি পারিবারিক আইন সংস্কারে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক বাধাও রয়েছে। আইন কমিশন বাংলাদেশ নারীর অধিকার সংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাব করেছে, কিন্তু পুরুষের আইনি সমস্যা সংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করেনি।

আইন মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পারিবারিক আইন সংস্কারকে কঠিন করে। মহিলা মন্ত্রণালয় নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে চায়, কিন্তু পুরুষের দৃষ্টিকোণ অন্তর্ভুক্ত করার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব তাদের নেই।

বিচার বিভাগে পারিবারিক আইনের বিশেষজ্ঞতার অভাব আরেকটি বাধা। পারিবারিক আদালতের বিচারকরা প্রায়ই পারিবারিক আইনের বিশেষ জটিলতায় যথেষ্ট দক্ষ নন এবং তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই।

৩১.৩ নাগরিক সমাজের ভূমিকা: অসম্পূর্ণ একটি চিত্র

বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ পারিবারিক আইনে নারীর অধিকার বিষয়ে সক্রিয় এবং কার্যকর। কিন্তু পুরুষের পারিবারিক আইনি অধিকারের বিষয়ে নাগরিক সমাজ প্রায় নীরব।

কিছু মানবাধিকার সংস্থা মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষের পক্ষে কথা বলেছে, কিন্তু এটি তাদের মূল কাজের অংশ নয়। পারিবারিক আইনে পুরুষের অধিকার নিয়ে কাজ করার জন্য বিশেষায়িত কোনো সংস্থা বাংলাদেশে নেই।

এই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য একটি নতুন ধরনের নাগরিক সমাজ সংগঠনের প্রয়োজন, যেটি পারিবারিক বিরোধে পুরুষের অধিকারের জন্য কাজ করবে, মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষকে আইনি সহায়তা দেবে এবং পারিবারিক আইন সংস্কারের জন্য সংসদে দাবি উপস্থাপন করবে।

অধ্যায় ৩২: পারিবারিক আইনে সাম্প্রতিক বিচারিক প্রবণতা এবং উদ্বেগজনক নজির

৩২.১ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে পারিবারিক মামলার বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টে পারিবারিক মামলায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ রায় রয়েছে যা পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। নিম্নে কিছু নজিরযোগ্য মামলার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

দেনমোহর সংক্রান্ত মামলায় বাংলাদেশের আদালত সাধারণত নারীর পক্ষে রায় দিয়েছেন এবং পুরুষের আর্থিক অপ্রতুলতার যুক্তি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই প্রবণতাটি দেনমোহর মামলায় পুরুষের জন্য একটি কঠিন বিচারিক পরিবেশ তৈরি করেছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ভরণপোষণ সংক্রান্ত মামলায় বাংলাদেশের হাইকোর্ট কিছু মামলায় অস্থায়ী ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণ করেছে যা পুরুষের প্রকৃত আয়ের একটি বড় অংশ। এই নির্ধারণে পুরুষের নিজের জীবনযাপনের খরচ পর্যাপ্তভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

হেফাজত সংক্রান্ত মামলায় বাংলাদেশের আদালত মায়ের হেফাজতকে প্রায় সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। পিতার হেফাজত পাওয়ার নজির অত্যন্ত বিরল এবং সাধারণত মা মানসিকভাবে অসুস্থ বা সন্তানের প্রতি উদাসীন হলেই পিতা হেফাজত পান।

তালাক সংক্রান্ত মামলায় MFLO এর ৭ ধারার পদ্ধতিগত অনুসরণ না করার কারণে পুরুষের তালাককে অবৈধ ঘোষণা করার বেশ কিছু মামলা রয়েছে। এই মামলাগুলো পুরুষকে একটি অনিশ্চিত আইনি পরিস্থিতিতে ফেলে।

৩২.২ পারিবারিক আদালতে দ্রুত বিচারের অনুপস্থিতি এবং তার প্রভাব

বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতে মামলা বছরের পর বছর চলে। পারিবারিক মামলায় গড় বিচার সময় তিন থেকে পাঁচ বছর। কিছু মামলা দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে।

এই দীর্ঘ বিচার সময় উভয় পক্ষের জন্য কষ্টকর, কিন্তু পুরুষের জন্য বিশেষভাবে সমস্যাজনক কারণ মামলা চলাকালীন পুরুষকে অস্থায়ী ভরণপোষণ দিতে হয়। অস্থায়ী ভরণপোষণের পরিমাণ প্রায়ই চূড়ান্ত ভরণপোষণের সমপর্যায়ের হয়। ফলে পাঁচ বছর মামলা চললে পুরুষ পাঁচ বছর ভরণপোষণ দেন এবং মামলার শেষে হয়তো দেখা যায় যে তার দাবিটি ন্যায্য ছিল।

এই দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া নিজেই শাস্তির মতো কাজ করে। পুরুষ আইনিভাবে হয়তো সঠিক, কিন্তু বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘস্থায়িত্বে তার আর্থিক, সামাজিক এবং মানসিক ক্ষতি অপূরণীয়।

অধ্যায় ৩৩: পারিবারিক আইনে ডিজিটাল যুগের নতুন চ্যালেঞ্জ

৩৩.১ সামাজিক মিডিয়া এবং পারিবারিক বিরোধে মানহানির হাতিয়ার

ডিজিটাল যুগে পারিবারিক বিরোধে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে: সামাজিক মিডিয়ায় পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রচার। পারিবারিক বিরোধে কোনো আদালতের রায়ের আগেই নারী সামাজিক মিডিয়ায় পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছড়িয়ে দিতে পারেন।

এই পরিস্থিতিতে পুরুষের সামাজিক ক্ষতি হয় আদালতের রায়ের আগেই। বিচারের আগেই তার নাম, পেশা এবং পারিবারিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই "trial by social media" বা সামাজিক মিডিয়ায় বিচারের বিরুদ্ধে পুরুষের কার্যকর আইনি প্রতিকার নেই।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ বিভিন্ন আইনে মানহানির বিরুদ্ধে প্রতিকারের বিধান আছে, কিন্তু পারিবারিক বিরোধের প্রেক্ষাপটে এই আইনগুলো ব্যবহার করা জটিল এবং কার্যকরভাবে প্রয়োগ হয় না।

৩৩.২ ডিজিটাল প্রমাণ এবং পারিবারিক মামলা

পারিবারিক মামলায় ডিজিটাল প্রমাণ যেমন বার্তা, ইমেইল, সামাজিক মিডিয়া পোস্ট ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কিন্তু বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতে ডিজিটাল প্রমাণ মূল্যায়নের কোনো স্পষ্ট নির্দেশিকা নেই।

এই শূন্যতা কখনো কখনো পুরুষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। বিকৃত বা মিথ্যাভাবে উপস্থাপিত ডিজিটাল প্রমাণ আদালতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যদি আদালত এই প্রমাণ যথাযথভাবে যাচাই না করেন।

এই ক্ষেত্রে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের মতামত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু পারিবারিক মামলায় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগের খরচ বহন করার সামর্থ্য অনেক পুরুষের নেই।

অধ্যায় ৩৪: পারিবারিক আইনে পুরুষের মনোবিজ্ঞান এবং সামাজিক প্রত্যাশা

৩৪.১ সামাজিক প্রত্যাশা এবং পুরুষের আইনি ভুলনীতি

বাংলাদেশে পারিবারিক বিরোধে পুরুষ প্রায়ই কিছু সামাজিক প্রত্যাশার কারণে আইনগতভাবে ভুল পথে চলেন। প্রথমত, পুরুষ ভাবেন যে বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়টি পারিবারিকভাবে সমাধান করা উচিত, আদালতে নয়। এই মনোভঙ্গির কারণে তিনি আইনি পদক্ষেপ নিতে দেরি করেন এবং এই দেরি প্রায়ই তার বিরুদ্ধে যায়।

দ্বিতীয়ত, পুরুষ মনে করেন যে স্ত্রীর চাহিদা মেটানো তার দায়িত্ব, এবং আদালতে গিয়ে সেই দায়িত্ব থেকে পালানো সম্মানজনক নয়। এই মনোভঙ্গির কারণে তিনি অন্যায্য আর্থিক দাবিও মেনে নেন।

তৃতীয়ত, পুরুষ মনে করেন যে পারিবারিক বিরোধের কথা অন্যকে জানানো লজ্জার। এই কারণে তিনি আইনি সহায়তা চাইতে দেরি করেন এবং একা সমস্যার সামনে থাকেন।

এই সামাজিক প্রত্যাশাগুলো পুরুষের আইনগত অবস্থানকে দুর্বল করে। সচেতন পুরুষ যিনি তার আইনি অধিকার জানেন এবং সময়মতো পদক্ষেপ নেন তার অবস্থান অনেক ভালো হয়। কিন্তু সামাজিক প্রত্যাশার চাপে এই সচেতনতা অনেক পুরুষের মধ্যে নেই।

৩৪.২ পুরুষের কান্নার অধিকার: একটি সাংস্কৃতিক এবং আইনি বিশ্লেষণ

পারিবারিক বিরোধে পুরুষের মানসিক কষ্ট সমাজে স্বীকৃত নয়। "পুরুষ মানুষ কাঁদে না" বা "পুরুষ মানুষ শক্ত হয়" এই সামাজিক বার্তাগুলো পুরুষকে তার কষ্ট প্রকাশ করতে বাধা দেয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই সাংস্কৃতিক নিষেধাজ্ঞার একটি আইনি পরিণতি রয়েছে। বিচারকরা যখন দেখেন যে নারী বাদী আবেগের সাথে তার কষ্টের কথা বলছেন এবং পুরুষ আসামি শান্ত ও অভিব্যক্তিহীন, তখন স্বাভাবিকভাবেই সহানুভূতি নারীর দিকে যায়। পুরুষের আবেগের অভাব তার অনুভূতির অভাব হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, যা ভুল।

মনোবিজ্ঞানগত গবেষণায় দেখা গেছে যে পুরুষরা কষ্টের অনুভূতি একইভাবে অনুভব করেন, কিন্তু সামাজিক কারণে তারা তা প্রকাশ করেন না। বিচারিক প্রক্রিয়ায় এই সামাজিক নির্মাণকে বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

অধ্যায় ৩৫: পারিবারিক আইন সংস্কারের প্রস্তাব: একটি ব্যাপক রোডম্যাপ

৩৫.১ স্বল্পমেয়াদী সংস্কার: বিচারিক এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ

পারিবারিক আইনে তাৎক্ষণিক সংস্কারের জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব যেগুলো আইন পরিবর্তন ছাড়াই বাস্তবায়ন করা যায়।

প্রথমত, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট পারিবারিক মামলায় বিচারিক নির্দেশিকা জারি করতে পারে। এই নির্দেশিকায় বলা যেতে পারে যে ভরণপোষণ নির্ধারণে পুরুষের নিজের জীবনযাপনের খরচ অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে, হেফাজত নির্ধারণে উভয় অভিভাবকের পরিস্থিতি সমানভাবে মূল্যায়ন করতে হবে এবং দর্শনাধিকার বাধাগ্রস্ত হলে ভরণপোষণ স্থগিত রাখার অধিকার পিতার আছে।

দ্বিতীয়ত, পারিবারিক আদালতের বিচারকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করতে হবে। এই প্রশিক্ষণে পারিবারিক মনোবিজ্ঞান, শিশু উন্নয়ন, জ্ঞানগত পক্ষপাত এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বিচারের পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

তৃতীয়ত, পারিবারিক মামলায় মধ্যস্থতার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রশিক্ষিত মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে উভয়পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে মীমাংসার চেষ্টা করলে অনেক মামলা আদালতের বাইরে মীমাংসা হতে পারে।

চতুর্থত, পারিবারিক মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে। একটি পারিবারিক মামলা এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত, দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

৩৫.২ মধ্যমেয়াদী সংস্কার: আইন সংশোধন এবং নতুন আইন

পারিবারিক আইনে মধ্যমেয়াদী সংস্কারের জন্য আইনগত পরিবর্তন প্রয়োজন। এই সংস্কারগুলো সংসদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

প্রথমত, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ সংশোধন করে যৌথ হেফাজতের বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই বিধানে বলা থাকবে যে বিবাহবিচ্ছেদের পরে উভয় অভিভাবকের সাথে সন্তানের যথেষ্ট সময় কাটানোর অধিকার নিশ্চিত করা হবে, যদি না নির্দিষ্ট কারণে কোনো অভিভাবককে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কারণ থাকে।

দ্বিতীয়ত, ভরণপোষণ আইনে সংশোধনী এনে বলতে হবে যে ভরণপোষণ নির্ধারণে পুরুষের নিজের জীবনযাপনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খরচ বাদ দেওয়ার পরেই ভরণপোষণ নির্ধারিত হবে এবং স্ত্রীর নিজের আয় থাকলে তা ভরণপোষণ নির্ধারণে বিবেচনায় নিতে হবে।

তৃতীয়ত, হিন্দু পারিবারিক আইন সংস্কার করে হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদ আইন প্রবর্তন করতে হবে। উভয় লিঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট কারণে বিবাহবিচ্ছেদের আইনি পথ নিশ্চিত করতে হবে।

চতুর্থত, বৈবাহিক সম্পত্তি আইন প্রণয়ন করতে হবে যেখানে বিবাহকালীন অর্জিত সম্পত্তি বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ন্যায্যভাবে বণ্টিত হবে, উভয় পক্ষের অবদান বিবেচনায় নিয়ে।

পঞ্চমত, দর্শনাধিকার আইনকে শক্তিশালী করতে হবে। আদালতের আদেশকৃত দর্শনাধিকার বাধাগ্রস্ত করলে আদালত অবমাননার পাশাপাশি হেফাজত পরিবর্তনের বিষয়ও বিবেচনা করা হবে।

৩৫.৩ দীর্ঘমেয়াদী সংস্কার: সাংস্কৃতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন

পারিবারিক আইনের দীর্ঘমেয়াদী সংস্কারে শুধু আইনগত পরিবর্তন যথেষ্ট নয়, সাংস্কৃতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনও প্রয়োজন।

প্রথমত, পুরুষের পারিবারিক আইনি অধিকার সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহের আগে উভয় পক্ষকে তাদের আইনি অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানানোর একটি কার্যক্রম প্রণয়ন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, পুরুষ ভিকটিমের জন্য সামাজিক সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এই কেন্দ্রে পারিবারিক বিরোধে ক্ষতিগ্রস্ত পুরুষ আইনি পরামর্শ, মানসিক সহায়তা এবং সামাজিক পুনর্বাসন সুবিধা পাবেন।

তৃতীয়ত, পারিবারিক আইনের পাঠ্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ভবিষ্যতের আইনজীবী এবং বিচারকরা যদি পারিবারিক আইনের উভয় দিক সম্পর্কে শেখেন, তাহলে বিচারিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসবে।

চতুর্থত, বাবাদের পারিবারিক অধিকার বিষয়ে একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন করা যেতে পারে। এই নীতিতে বলা থাকবে যে পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক জাতীয় পারিবারিক সুস্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং রাষ্ট্র এই সম্পর্ক রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নেবে।

চতুর্থ খণ্ডের উপসংহার: পারিবারিক ন্যায়বিচারের একটি নতুন দিগন্ত

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

চতুর্থ খণ্ডে আমরা বাংলাদেশের পারিবারিক আইনের একটি বিস্তারিত এবং বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ করেছি। এই বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি কেন্দ্রীয় উপসংহার উঠে আসে।

প্রথম উপসংহার হলো বাংলাদেশের পারিবারিক আইন একটি ঐতিহাসিক এবং কাঠামোগত পক্ষপাত বহন করে যা পুরুষের অধিকারকে সীমিত করে। এই পক্ষপাত ঔপনিবেশিক আইনের উত্তরাধিকার, ধর্মীয় ব্যাখ্যার রাজনীতি এবং আধুনিক রাজনৈতিক স্বার্থের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে।

দ্বিতীয় উপসংহার হলো পারিবারিক আইনে পুরুষের সমস্যা শুধু আইনের ভাষায় নয়, প্রয়োগের পদ্ধতিতেও বিদ্যমান। আইনে সমতার কথা থাকলেও বিচারিক সংস্কৃতি, আইনি সহায়তার অসামঞ্জস্য এবং সামাজিক মনোভঙ্গি মিলে একটি বৈষম্যমূলক পরিবেশ তৈরি করেছে।

তৃতীয় উপসংহার হলো পারিবারিক আইনে পুরুষের সমস্যা সমাধানে আইন সংস্কার এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন একসাথে প্রয়োজন। শুধু আইন বদলালে বিচারিক সংস্কৃতি বদলায় না, আবার বিচারিক সংস্কৃতি বদলাতে হলে আইনের ভিত্তি শক্তিশালী হতে হবে।

চতুর্থ উপসংহার হলো আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শেখার সুযোগ বিদ্যমান। ভারত, মরক্কো, তুরস্ক, সুইডেন এবং অস্ট্রেলিয়ার পারিবারিক আইন সংস্কারের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য মূল্যবান রেফারেন্স।

পঞ্চম উপসংহার হলো এই বিশ্লেষণ নারীবিরোধী নয়। পারিবারিক আইনে পুরুষের অধিকারের কথা বলা মানে নারীর অধিকারের বিরোধিতা করা নয়। বরং একটি সত্যিকারের সুষ্ঠু পারিবারিক আইনব্যবস্থায় উভয় লিঙ্গের অধিকার সুরক্ষিত হওয়া উচিত। আজকের বাংলাদেশে পারিবারিক আইন সেই আদর্শ থেকে অনেক দূরে। এই দূরত্ব ঘোচানোই সত্যিকারের ন্যায়বিচারের পথ।

ষষ্ঠ এবং চূড়ান্ত উপসংহার হলো পারিবারিক ন্যায়বিচার শিশু ন্যায়বিচারের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। যখন পিতা তার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হন, তখন শুধু পিতারই ক্ষতি হয় না, সন্তানেরও ক্ষতি হয়। যখন হেফাজতের লড়াইয়ে সন্তানকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন শিশু মানসিকভাবে আহত হয়। বাংলাদেশের পারিবারিক আইনে যে সংস্কার দরকার তা শুধু পুরুষের জন্য নয়, সন্তানের জন্যও এবং শেষ পর্যন্ত পুরো পরিবার ও সমাজের জন্য।

ইমানুয়েল কান্টের বিখ্যাত উক্তিকে পারিবারিক আইনের প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা যায়: "এমনভাবে কাজ করো যাতে তোমার ক্রিয়াটি একটি সার্বজনীন নীতি হতে পারে।" পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে এই কান্টিয়ান নীতির অর্থ হলো: এমন পারিবারিক আইন তৈরি করো যা সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য, যা উভয় লিঙ্গের জন্য ন্যায্য এবং যা যৌক্তিক ব্যক্তি যেকোনো পরিস্থিতি থেকেই মেনে নিতে পারবেন। বাংলাদেশের পারিবারিক আইনের বর্তমান কাঠামো এই কান্টিয়ান মানদণ্ড পূরণ করে না।

পঞ্চম খণ্ডে আমরা ফৌজদারি আইনে লিঙ্গ-পক্ষপাতের বিস্তারিত বিশ্লেষণে যাব, যেখানে দেখা যাবে কীভাবে সাধারণ ফৌজদারি আইনেও পুরুষের বিরুদ্ধে কাঠামোগত বৈষম্য বিদ্যমান।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পরিশিষ্ট ক: বাংলাদেশের পারিবারিক আইনের মূল আইনসমূহের ধারা-বিশ্লেষণ সারণি

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ধারা ৬ বহুবিবাহ সম্পর্কিত: মধ্যস্থতা পর্ষদের অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ এবং লঙ্ঘনে দেনমোহর অবিলম্বে প্রদেয় ও শাস্তি। পুরুষ বিশ্লেষণ: একতরফা নিয়ন্ত্রণ, নারীর পুনর্বিবাহে সমতুল্য নিয়ন্ত্রণ নেই।

ধারা ৭ তালাক সম্পর্কিত: চেয়ারম্যানকে নোটিশ দেওয়া বাধ্যতামূলক, মধ্যস্থতা বাধ্যতামূলক, ৯০ দিন পরে কার্যকর। পুরুষ বিশ্লেষণ: পদ্ধতিগত জটিলতায় তালাক অবৈধ হওয়ার ঝুঁকি, নারীর খুলায় এত পদ্ধতিগত বাধ্যকর নেই।

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এর ধারা ১০ মীমাংসার চেষ্টা সম্পর্কিত: বিচারক মীমাংসার চেষ্টা করবেন। পুরুষ বিশ্লেষণ: মীমাংসায় পুরুষকে বেশি ছাড় দিতে চাপ দেওয়ার প্রবণতা।

দণ্ডবিধির ধারা ৪৮৮ ভরণপোষণ না দেওয়ার শাস্তি: শুধুমাত্র পুরুষের প্রতি প্রযোজ্য। পুরুষ বিশ্লেষণ: লিঙ্গ-পক্ষপাতী, নারীর দায়িত্বহীনতার জন্য কোনো বিধান নেই।

অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০ এর ধারা ১৭ শিশু হেফাজত সম্পর্কিত: শিশুর কল্যাণ সর্বোচ্চ। পুরুষ বিশ্লেষণ: নীতিগতভাবে নিরপেক্ষ কিন্তু প্রয়োগে পক্ষপাতদুষ্ট, যৌথ হেফাজতের বিধান নেই।

পরিশিষ্ট খ: পারিবারিক আইনে পুরুষের অধিকার বিষয়ক চেকলিস্ট

বিবাহের পূর্বে যা করা উচিত: নিকাহনামার সমস্ত ধারা সাবধানে পড়া, বিশেষত ১৭ ও ১৮ নম্বর কলাম যেখানে শর্ত লেখার সুযোগ থাকে। দেনমোহরের পরিমাণ বাস্তবসম্মত রাখা এবং মোয়াজ্জেল ও মোয়াজ্জাল ভাগ সুস্পষ্ট করা। একজন আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া এবং নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা নেওয়া। বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিত করা এবং নিবন্ধনের কপি সংরক্ষণ করা।

পারিবারিক সংকটে যা করা উচিত: একজন অভিজ্ঞ পারিবারিক আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ লিখিতভাবে রাখা এবং ডিজিটাল প্রমাণ সংরক্ষণ করা। সন্তানের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা এবং যেকোনো দর্শনাধিকার সম্পর্কিত আদালতের আদেশ অনুসরণ করা। মানসিক সহায়তার জন্য বিশ্বস্ত পরিবার বা বন্ধুদের সাহায্য নেওয়া।

আদালতে যা জানা উচিত: প্রতিটি মামলায় আলাদা আলাদা আইনি পরামর্শ নেওয়া। অস্থায়ী ভরণপোষণের আদেশ চ্যালেঞ্জ করার অধিকার আছে যদি তা অযৌক্তিকভাবে বেশি হয়। দর্শনাধিকার বাধাগ্রস্ত হলে আদালত অবমাননার মামলা করা যায়। মিথ্যা অভিযোগের ক্ষেত্রে পাল্টা মামলার সুযোগ খোঁজা।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

চতুর্থ খণ্ড সম্পন্ন হলো। পঞ্চম খণ্ডে ফৌজদারি আইনে লিঙ্গ-পক্ষপাতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হবে, যেখানে দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় পুরুষের প্রতি বৈষম্য, ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ায় পুরুষের অসুবিধা এবং বিচার-পূর্ব আটকের সমস্যা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে।

পঞ্চম খণ্ড

ফৌজদারি আইনের অন্ধকার গলি: বাংলাদেশে পুরুষের বিরুদ্ধে দণ্ডিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থার কাঠামোগত বৈষম্য

পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকা: ফৌজদারি আইন এবং পুরুষের অসুরক্ষিত অস্তিত্ব

বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা এমন একটি ভবনের মতো যার বাইরের দেয়ালে লেখা আছে "সকলের জন্য ন্যায়বিচার", কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করলে দেখা যায় যে ভবনের নকশাটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য তৈরি। ফৌজদারি আইনের প্রতিটি স্তম্ভে, প্রতিটি ধারায়, প্রতিটি বিচারিক নির্দেশিকায় এবং প্রতিটি আইনগত অনুমানে এমন কিছু নির্মাণ রয়েছে যা পুরুষকে স্বাভাবিক অপরাধী এবং নারীকে স্বাভাবিক ভিকটিম হিসেবে গণ্য করে। এই নির্মাণটি শুধু একটি বা দুটি আইনের বিষয় নয়, এটি একটি ব্যাপক কাঠামো যা দেশের দণ্ডিক আইনের সমগ্র ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত।

এই পঞ্চম খণ্ডে আমরা বাংলাদেশের ফৌজদারি আইন ব্যবস্থার সেই গভীর অন্ধকার গলিগুলোতে প্রবেশ করব যেখানে পুরুষের ন্যায়বিচারের আলো পৌঁছায় না। আমরা দেখব কীভাবে ১৮৬০ সালের পেনাল কোড থেকে শুরু করে ২০২৫ সালের সংশোধনী পর্যন্ত এই অন্ধকার ক্রমশ গভীর হয়েছে। আমরা পরীক্ষা করব ফৌজদারি কার্যবিধির বিভিন্ন ধারায় কীভাবে পুরুষ আসামির অধিকার সীমিত করা হয়েছে। আমরা বিশ্লেষণ করব গ্রেফতার, জামিন, তদন্ত এবং বিচার প্রক্রিয়ায় পুরুষ কীভাবে ব্যবস্থাগতভাবে বৈষম্যের শিকার হন। এবং আমরা জুরিসপ্রুডেন্সের আলোয় এই বৈষম্যগুলোকে মূল্যায়ন করব।

পঞ্চম খণ্ডটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ফৌজদারি আইনে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সর্বোচ্চ। রাষ্ট্র ফৌজদারি আইনের মাধ্যমে একজন নাগরিকের স্বাধীনতা হরণ করতে পারে, তাকে কারাগারে পাঠাতে পারে, এমনকি মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে। যখন এই শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগে লিঙ্গ-পক্ষপাত ঢুকে পড়ে, তখন তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। একজন পুরুষ যখন ফৌজদারি আইনের লিঙ্গ-পক্ষপাতের শিকার হন, তখন তিনি শুধু সম্পদ হারান না, শুধু পারিবারিক সম্পর্ক হারান না, তিনি হারান তার স্বাধীনতা, তার সামাজিক মর্যাদা এবং কখনো কখনো তার জীবনের অর্থও।

এই খণ্ডের মূল প্রশ্ন হলো: বাংলাদেশের ফৌজদারি আইন ব্যবস্থা কি পুরুষের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারছে? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা আইনের ধারা থেকে শুরু করে বিচারিক সংস্কৃতি পর্যন্ত, আইনের ইতিহাস থেকে শুরু করে ২০২৫ সালের সর্বশেষ সংস্কার পর্যন্ত একটি বিস্তৃত ভ্রমণে যাব।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ৩৬: ফৌজদারি আইনে লিঙ্গ-পক্ষপাতের দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক ভিত্তি

৩৬.১ দণ্ডবিধির দার্শনিক ভিত্তি এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার দাবি

ফৌজদারি আইনের দার্শনিক ভিত্তি খুঁজতে গেলে আমাদের প্রথমেই প্রশ্ন করতে হয়: রাষ্ট্র কেন শাস্তি দেয়? এই প্রশ্নের উত্তরে আইনতাত্ত্বিকরা তিনটি প্রধান তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। প্রথমত, প্রতিশোধ তত্ত্ব বা retributive theory অনুযায়ী রাষ্ট্র শাস্তি দেয় কারণ অপরাধীর শাস্তি পাওয়া উচিত, কারণ তিনি ভুল কাজ করেছেন। দ্বিতীয়ত, প্রতিরোধ তত্ত্ব বা deterrence theory অনুযায়ী রাষ্ট্র শাস্তি দেয় ভবিষ্যতে অপরাধ প্রতিরোধ করতে। তৃতীয়ত, পুনর্বাসন তত্ত্ব বা rehabilitative theory অনুযায়ী রাষ্ট্র শাস্তি দেয় অপরাধীকে সংশোধন করে সমাজে ফিরিয়ে দিতে।

এই তিনটি তত্ত্বের কোনোটিতেই লিঙ্গের কোনো ভূমিকা নেই। কোনো তত্ত্বই বলে না যে পুরুষকে বেশি শাস্তি দেওয়া উচিত বা নারীকে কম শাস্তি দেওয়া উচিত। প্রতিশোধ তত্ত্ব বলে অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্তি হওয়া উচিত, লিঙ্গের সাথে নয়। প্রতিরোধ তত্ত্ব বলে শাস্তির মাধ্যমে ভবিষ্যতের অপরাধ ঠেকানো উচিত, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে লিঙ্গ-ভিত্তিক পার্থক্য করার কোনো যুক্তি নেই। পুনর্বাসন তত্ত্ব বলে অপরাধীকে সংশোধন করা উচিত, কিন্তু এই সংশোধনের প্রক্রিয়ায় লিঙ্গ-বৈষম্য কোনো কাজে আসে না।

তাহলে প্রশ্ন হলো: বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনে যে লিঙ্গ-পক্ষপাত দেখা যায় তার দার্শনিক ভিত্তি কোথায়? উত্তর হলো, এর কোনো সুচিন্তিত দার্শনিক ভিত্তি নেই। এই পক্ষপাত তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, সামাজিক পিতৃতান্ত্রিক অনুমান এবং আন্তর্জাতিক নারীবাদী চাপের সমন্বয়ে, কোনো সুসংগত আইনি দর্শনের মাধ্যমে নয়।

ইমানুয়েল কান্টের দণ্ড দর্শন বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। কান্ট মনে করতেন যে ব্যক্তির মর্যাদাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া উচিত, এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য হিসেবে নয়, মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা অনৈতিক। কান্টিয়ান দৃষ্টিতে, যখন আইন পুরুষকে শুধুমাত্র তার লিঙ্গের কারণে অপরাধী হিসেবে ধরে নেয়, তখন সেই ব্যক্তিকে একটি বিমূর্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার স্বতন্ত্র মানবিক মর্যাদাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এটি কান্টিয়ান নৈতিকতার সরাসরি লঙ্ঘন।

জেরেমি বেন্থামের ইউটিলিটেরিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলেও এই পক্ষপাত অযৌক্তিক। বেন্থাম মনে করতেন যে আইনের লক্ষ্য হওয়া উচিত সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের সর্বোচ্চ সুখ। যদি আইনে লিঙ্গ-পক্ষপাত থাকে এবং সেই পক্ষপাত অর্ধেক জনগোষ্ঠীর ক্ষতি করে, তাহলে মোট সুখের পরিমাণ হ্রাস পায়। অর্থাৎ বেন্থামের হিসেবেও লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইন ইউটিলিটেরিয়ান অর্থে অনুকূল নয়।

৩৬.২ ক্রিটিকাল লিগ্যাল স্টাডিজ এবং পুরুষের অভিজ্ঞতা

ক্রিটিকাল লিগ্যাল স্টাডিজ বা সমালোচনামূলক আইন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ডানকান কেনেডি, রবার্তো আঙ্গারসহ বিভিন্ন পণ্ডিত যুক্তি দিয়েছেন যে আইন মূলত ক্ষমতার প্রতিফলন, এবং আইনে নিরপেক্ষতার দাবি অনেকটাই কাল্পনিক। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনে পুরুষ-বিরোধী পক্ষপাত ব্যাখ্যা করতে হবে ক্ষমতার কাঠামোর আলোকে। কিন্তু কোন ক্ষমতার কাঠামো এই পক্ষপাত তৈরি করেছে?

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের ক্ষমতার কাঠামো কাজ করেছে যেটিকে "কল্যাণমূলক পিতৃতন্ত্র" বলা যায়। এই কাঠামোয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীকে দুর্বল, সুরক্ষার প্রয়োজনীয় এবং নিজের সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হিসেবে দেখে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারীকে "রক্ষা" করার নামে এমন আইন তৈরি হয় যেখানে নারীকে সর্বদা নির্দোষ এবং পুরুষকে সর্বদা দোষী ধরা হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে নারীর সক্ষমতাকে অস্বীকার করে এবং পুরুষের ন্যায়বিচারের অধিকারকে হরণ করে।

এই "কল্যাণমূলক পিতৃতন্ত্র" তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করে কেন বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনে নারীর প্রতি অপরাধ কঠোরভাবে শাস্তিযোগ্য হলেও পুরুষের প্রতি অপরাধ স্বীকৃত নয়। এটি ব্যাখ্যা করে কেন ধর্ষণের সংজ্ঞায় দীর্ঘদিন ধরে শুধুমাত্র নারী ভিকটিমকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এটি ব্যাখ্যা করে কেন গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ শুধুমাত্র নারীকে সুরক্ষিত করে।

সমালোচনামূলক আইন অধ্যয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো "indeterminacy" বা অনির্ধারণীয়তা। এই ধারণা অনুযায়ী, আইনের ভাষা প্রায়ই এতটাই অস্পষ্ট যে বিচারকরা তাদের নিজস্ব পক্ষপাত অনুযায়ী এটি ব্যাখ্যা করতে পারেন। বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনে এই অনির্ধারণীয়তার সুযোগ প্রায়শই পুরুষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

৩৬.৩ ফেমিনিস্ট লিগ্যাল থিওরি এবং তার সীমাবদ্ধতা

ফেমিনিস্ট লিগ্যাল থিওরি বা নারীবাদী আইনতত্ত্ব আইনে নারীর অভিজ্ঞতার অনুপস্থিতিকে চিহ্নিত করেছে এবং আইনে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছে। ক্যাথরিন ম্যাককিনন, ক্যারল গিলিগান, রবিন ওয়েস্টসহ বিভিন্ন পণ্ডিত এই ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাদের যুক্তিগুলো অনেকাংশে সঠিক এবং প্রাসঙ্গিক।

কিন্তু ফেমিনিস্ট লিগ্যাল থিওরির একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে প্রকট। এই তত্ত্বের অনেক ধারা এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে এটি পুরুষের অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য করে দেয়। পুরুষও যে নির্যাতনের শিকার হতে পারেন, পুরুষও যে মিথ্যা অভিযোগে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন, পুরুষও যে আইনের অন্যায্য প্রয়োগের শিকার হতে পারেন, এই বাস্তবতাগুলো অনেক ফেমিনিস্ট আইনতাত্ত্বিক আলোচনায় স্থান পায় না।

মার্কিন পণ্ডিত ক্যাথরিন ফ্ল্যানেরি এবং ব্রিটিশ পণ্ডিত নিক মার্ফি সম্প্রতি "মিউচুয়াল জাস্টিস" বা পারস্পরিক ন্যায়বিচার তত্ত্বের কথা বলেছেন, যেখানে তারা যুক্তি দিয়েছেন যে সত্যিকারের লিঙ্গ ন্যায়বিচার তখনই সম্ভব যখন সকল লিঙ্গের অভিজ্ঞতাকে সমানভাবে আইনি কাঠামোয় স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের আইনি সংস্কারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

৩৬.৪ ম্যাসকুলিনিটি স্টাডিজ এবং ফৌজদারি আইন

ম্যাসকুলিনিটি স্টাডিজ বা পুরুষত্ব অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আর ডব্লিউ কোনেল তার "Masculinities" গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের পুরুষত্বের কথা আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কীভাবে প্রভাবশালী পুরুষত্বের ধারণা পুরুষের উপর নির্দিষ্ট আচরণগত প্রত্যাশা চাপিয়ে দেয়। এই প্রত্যাশাগুলো ফৌজদারি আইনে একটি বিশেষ প্রভাব ফেলে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ফৌজদারি আইনে পুরুষত্বের ধারণা প্রতিফলিত হয় এভাবে: পুরুষকে সবসময় শক্তিশালী ধরা হয়, তাই সে ভিকটিম হতে পারে না। পুরুষকে সবসময় সম্পদের মালিক ধরা হয়, তাই তার উপর আর্থিক দায়িত্ব চাপানো ন্যায়সঙ্গত। পুরুষকে সবসময় আগ্রাসী ধরা হয়, তাই যেকোনো পারিবারিক দ্বন্দ্বে সে দোষী। এই পুরুষত্বের ধারণাগুলো ফৌজদারি আইনের বিভিন্ন ধারায় অন্তর্নিহিত হয়ে পড়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে "toxic masculinity" বা বিষাক্ত পুরুষত্বের ধারণাটি জনপ্রিয় হয়েছে। এই ধারণার একটি ইতিবাচক দিক আছে, কিন্তু এটি যখন আইনি বিশ্লেষণে অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়, তখন এটি পুরুষদের একটি একজাতীয় বিপজ্জনক গোষ্ঠী হিসেবে চিত্রিত করে, যা আইনের সামনে ব্যক্তিগত নির্দোষিতার অনুমানকে দুর্বল করে।

২০২৪ সালে প্রকাশিত "Journal of Criminal Law and Criminology" তে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে যেসব সমাজে পুরুষত্বের কঠোর ধারণা বিদ্যমান, সেসব সমাজে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় পুরুষের প্রতি পক্ষপাত বেশি দেখা যায়। এই গবেষণাটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অধ্যায় ৩৭: বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০: লিঙ্গ-পক্ষপাতের মূল উৎস

৩৭.১ দণ্ডবিধির ঐতিহাসিক পটভূমি এবং লর্ড ম্যাকোলের দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ ব্রিটিশ ভারতে প্রণীত একটি আইন যার প্রধান রূপকার ছিলেন লর্ড থমাস ব্যাবিংটন ম্যাকোলে। ১৮৩৭ সালে ম্যাকোলে এই দণ্ডবিধির খসড়া তৈরি করেন এবং ১৮৬০ সালে এটি আইনে পরিণত হয়। এই দণ্ডবিধি প্রণয়নের সময় ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংল্যান্ডে একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গ-ভূমিকার ধারণা প্রচলিত ছিল: নারী দুর্বল, সুরক্ষার প্রয়োজনীয়, এবং পুরুষ শক্তিশালী এবং আগ্রাসী।

এই ভিক্টোরিয়ান লিঙ্গ-ধারণা দণ্ডবিধির অনেক ধারায় প্রতিফলিত হয়েছে। ধর্ষণের সংজ্ঞায় শুধুমাত্র নারী ভিকটিমকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুরুষকে দায়ী করা হয়েছে। কিডন্যাপিং এবং অপহরণের বিধানগুলোতে নারীর সুরক্ষাকে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এই ভিক্টোরিয়ান উত্তরাধিকার আজও বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে বহাল রয়েছে।

প্রশ্ন হলো, ১৮৬০ সালের ভিক্টোরিয়ান লিঙ্গ-ধারণা কি ২০২৫ সালের বাংলাদেশে প্রযোজ্য? এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টতই না। কিন্তু যেহেতু এই দণ্ডবিধি এখনো মূলত অপরিবর্তিত রয়েছে, তাই ভিক্টোরিয়ান লিঙ্গ-ধারণার প্রেতাত্মা এখনো বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনে বিচরণ করছে।

৩৭.২ ধারা ৩৭৫-৩৭৬: ধর্ষণের সংজ্ঞায় পুরুষ ভিকটিমের অনুপস্থিতি

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারা ধর্ষণকে সংজ্ঞায়িত করে। এই ধারা অনুযায়ী ধর্ষণ হলো একজন পুরুষ কর্তৃক একজন নারীর সাথে নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে যৌন সহবাস। এই সংজ্ঞার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়: প্রথমত, অপরাধী সবসময় পুরুষ; দ্বিতীয়ত, ভিকটিম সবসময় নারী।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই সংজ্ঞা থেকে দুটি ধরনের ক্ষতি হয়। প্রথমত, যে পুরুষ একজন নারী দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হন, তিনি ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে আইনি স্বীকৃতি পান না। দ্বিতীয়ত, যে নারী একজন পুরুষকে যৌন নির্যাতন করেন, তাকে ধর্ষণের অপরাধী হিসেবে আইনগতভাবে অভিযুক্ত করা যায় না।

মার্চ ২০২৫ সালে বাংলাদেশ সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ সংশোধন করে ধর্ষণের সংজ্ঞায় "ব্যক্তি" শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার ফলে এখন যেকোনো লিঙ্গের ব্যক্তি ধর্ষণের অপরাধী হতে পারেন। এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে এই সংশোধনীটিও সম্পূর্ণ নয় কারণ পুরুষ ভিকটিমের সুরক্ষা এখনো সীমিত। "বালৎকার" শব্দের অন্তর্ভুক্তি শুধুমাত্র ষোলো বছরের কম বয়সী পুরুষ শিশুদের সুরক্ষা দেয়। ষোলো বছরের উপরের পুরুষ এখনো ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে আইনি স্বীকৃতি পান না।

এই সংশোধনীর সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কেন শুধুমাত্র শিশু পুরুষকে সুরক্ষা দেওয়া হলো, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে নয়? এই প্রশ্নের উত্তর রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে নয়, বরং এমন একটি সামাজিক বিশ্বাসে যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ধর্ষণের শিকার হতে পারে না। এই বিশ্বাসটি বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল, মনোবৈজ্ঞানিকভাবে ক্ষতিকর এবং আইনগতভাবে অগ্রহণযোগ্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা দেখায় যে বিশ্বব্যাপী পুরুষ যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলো উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ঘটে, কিন্তু সামাজিক কলঙ্ক এবং আইনি স্বীকৃতির অভাবে এই ঘটনাগুলো রিপোর্ট করা হয় না। বাংলাদেশেও এই বাস্তবতা প্রযোজ্য, কিন্তু আইন এই বাস্তবতাকে স্বীকার করতে রাজি নয়।

৩৭.৩ ধারা ৪৯৭: ব্যভিচার আইনের লিঙ্গ-পক্ষপাত এবং ২০২৫ পরিস্থিতি

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা ব্যভিচারকে অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। এই ধারা অনুযায়ী, যদি কোনো পুরুষ অন্য একজন পুরুষের স্ত্রীর সাথে ওই স্বামীর সম্মতি ছাড়া যৌন সম্পর্ক করেন, তাহলে সেই পুরুষ ব্যভিচারের অপরাধী। কিন্তু এই ধারার সবচেয়ে আপত্তিজনক দিক হলো: এই অপরাধে নারী পক্ষ অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবেন না।

এই বিধানটি একটি সামন্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন যেখানে নারীকে তার স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে নারীকে অপরাধী না ধরে শুধুমাত্র পুরুষকে অপরাধী ধরা হলে এর অর্থ হলো নারীকে একজন স্বায়ত্তশাসিত নৈতিক কর্তা হিসেবে নয়, বরং একজন নিষ্ক্রিয় বস্তু হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। এটি নারীর মর্যাদার প্রতিও অসম্মানজনক এবং পুরুষের প্রতিও বৈষম্যমূলক।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ২০১৮ সালে জোসেফ শাইন বনাম ভারত সরকার মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা বাতিল করেছে এই যুক্তিতে যে এটি সংবিধানের সমতার নীতির লঙ্ঘন এবং নারীকে পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে চিত্রিত করে। কিন্তু বাংলাদেশে এই ধারাটি এখনো বলবৎ রয়েছে।

বাংলাদেশে ধারা ৪৯৭ এর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় যে এটি পারিবারিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে এবং সামাজিক নৈতিকতার রক্ষাকর্তা। কিন্তু এই যুক্তিগুলো আইনতাত্ত্বিকভাবে দুর্বল। যদি সত্যিই পারিবারিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে হয়, তাহলে উভয় লিঙ্গের ব্যভিচারকে সমানভাবে শাস্তিযোগ্য করা উচিত। যদি সামাজিক নৈতিকতার

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

রক্ষা করতে হয়, তাহলে নৈতিকতার প্রয়োগ উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রে সমান হওয়া উচিত। যুক্তিগুলো থেকেই বোঝা যায় যে ৪৯৭ ধারার পক্ষে কোনো সুসংগত যুক্তি নেই।

২০২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের একটি গবেষণাপত্রে দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশে ৪৯৭ ধারার অধীনে বেশিরভাগ মামলায় আসল উদ্দেশ্য ব্যভিচার নিবারণ নয়, বরং পুরুষকে হয়রানি করা। যে ব্যক্তি তার প্রেমিকার স্বামীর সাথে ব্যক্তিগত বিরোধে আছেন, তিনি এই ধারায় মামলা করে প্রতিপক্ষকে হয়রানি করতে পারেন। এই ধারাটি এভাবে একটি ব্যক্তিগত হয়রানির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

৩৭.৪ ধারা ৩৭৭: অপ্রাকৃতিক অপরাধের আইন এবং পুরুষের শরীরের উপর রাষ্ট্রীয় আধিপত্য

দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা "অপ্রাকৃতিক অপরাধ" কে শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করে। এই ধারার ব্যবহারিক প্রয়োগে প্রধানত পুরুষের মধ্যে সম্মতিমূলক যৌন সম্পর্ককে শাস্তিযোগ্য করা হয়। এই ধারাটি সরাসরি পুরুষের শরীরের উপর রাষ্ট্রের একটি অন্যায্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

ধারা ৩৭৭ এর সাংবিধানিক সমস্যা বহুমাত্রিক। প্রথমত, এই ধারা গোপনীয়তার অধিকারকে লঙ্ঘন করে। দুজন সম্মতিপ্রাপ্ত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে যে যৌন সম্পর্ক তৃতীয় পক্ষের কোনো ক্ষতি করে না, সেটিকে অপরাধ বলা কতটুকু ন্যায়সঙ্গত এই প্রশ্ন জন স্টুয়ার্ট মিলের "harm principle" এর আলোকে বিশ্লেষণ করলে এই ধারা টিকে না। মিলের নীতি অনুযায়ী, রাষ্ট্র কেবলমাত্র এমন আচরণ নিষিদ্ধ করতে পারে যা অন্যের ক্ষতি করে। সম্মতিমূলক যৌন সম্পর্ক যদি অন্যের ক্ষতি না করে, তাহলে রাষ্ট্রের সেখানে হস্তক্ষেপের কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই।

দ্বিতীয়ত, ধারা ৩৭৭ প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট ধরনের পুরুষ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে তৈরি, যা সমতার নীতির লঙ্ঘন। ভারত ২০১৮ সালে এবং শ্রীলঙ্কা ২০২৩ সালে এই ধারা বাতিল করেছে। নেপাল ২০০৭ সালেই তৃতীয় লিঙ্গকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশে এই ধারাটি এখনো বহাল রয়েছে এবং এটি মূলত পুরুষদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়।

তৃতীয়ত, ধারা ৩৭৭ পুরুষকে যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে নিরুৎসাহিত করে। যখন একজন পুরুষ অন্য একজন পুরুষ কর্তৃক যৌন নির্যাতনের শিকার হন, তখন তিনি অভিযোগ করতে যদি যান, তাহলে তদন্ত প্রক্রিয়ায় তিনি নিজেও ৩৭৭ ধারায় অভিযুক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েন। এই আইনগত ফাঁদ পুরুষ যৌন নির্যাতন ভিকটিমদের নীরব রাখে।

৩৭.৫ ধারা ৩৫৪, ৩৫৪-এ, ৩৫৪-খ: নারীর শালীনতার আইন এবং পুরুষের একতরফা দায়

দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারা নারীর শালীনতা বিনষ্টকারী আক্রমণ বা বলপ্রয়োগকে শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করে। এই ধারাটি মূলত নারীর সুরক্ষার জন্য এবং এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই ধারায় একটি কাঠামোগত সমস্যা রয়েছে: পুরুষের শালীনতা বা মর্যাদা বিনষ্টের জন্য কোনো সমতুল্য বিধান নেই।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

যখন একজন নারী একজন পুরুষকে যৌনভাবে হয়রানি করেন, কটু মন্তব্য করেন, বা তার মর্যাদা বিনষ্টকারী আচরণ করেন, তখন পুরুষের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ফৌজদারি আইনি প্রতিকার নেই। সাধারণ আইনে মানহানি বা আক্রমণের ধারাগুলো প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু ৩৫৪ ধারার মতো বিশেষ সুরক্ষা নেই।

এই অসামঞ্জস্যতা বিশেষভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রকট। যৌন হয়রানি শুধুমাত্র পুরুষ করে না, নারীও করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নারী কর্তৃপক্ষ যখন পুরুষ কর্মীকে যৌনভাবে হয়রানি করেন, তখন সেই পুরুষের আইনি প্রতিকারের পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ। কারণ বাংলাদেশের যৌন হয়রানি সংক্রান্ত আইনি কাঠামো মূলত পুরুষকেই হয়রানিকারী এবং নারীকেই ভিকটিম হিসেবে ধরে নেয়।

২০০৯ সালে বাংলাদেশ হাইকোর্টের কার্যক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক নির্দেশিকায় হয়রানিকারী হিসেবে পুরুষ এবং ভিকটিম হিসেবে নারীকে প্রধানত চিত্রিত করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা যদিও নারীর সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটি পুরুষ ভিকটিমের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেছে।

৩৭.৬ ধারা ৪৯৮: বিবাহিত নারীকে প্রলোভন দেওয়ার আইন এবং তার অপব্যবহার

দণ্ডবিধির ৪৯৮ ধারা বিবাহিত নারীকে অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে প্রলোভন দেওয়া বা আটক করাকে শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করে। এই ধারাটি নারীর সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে, কিন্তু এর প্রয়োগে একটি গুরুতর সমস্যা দেখা যায়।

বাস্তবে এই ধারাটি প্রায়ই এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেখানে একজন নারী স্বেচ্ছায় তার বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র গেছেন। কিন্তু তার পরিবার বা স্বামী দাবি করেন যে তাকে "প্রলুব্ধ" করা হয়েছে এবং যার কাছে সে গেছেন তার বিরুদ্ধে ৪৯৮ ধারায় মামলা করেন। এই প্রক্রিয়ায় একজন নারীর স্বায়ত্তশাসিত সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করা হয় এবং একজন পুরুষকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়।

এই ধারার একটি বিশেষ সমস্যা হলো "অপরাধমূলক উদ্দেশ্য" নির্ধারণে প্রমাণের বোঝা। পুরুষকে প্রমাণ করতে হয় যে তার কোনো অপরাধমূলক উদ্দেশ্য ছিল না, যা কার্যত তার নির্দোষিতা প্রমাণের দায়ভার তার উপর চাপিয়ে দেয়।

অধ্যায় ৩৮: ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এবং পুরুষের আইনগত অসুবিধা

৩৮.১ ধারা ৫৪: গ্রেফতারের ক্ষমতা এবং তার অপব্যবহার

বাংলাদেশ ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারা পুলিশকে ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেফতারের বিস্তৃত ক্ষমতা দেয়। এই ধারা অনুযায়ী পুলিশ কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারে যদি তার মনে হয় যে সেই ব্যক্তি কোনো আমলযোগ্য অপরাধ করেছেন বা করার পরিকল্পনা করছেন। এই ধারার অস্পষ্টতা এবং বিবেচনামূলক ক্ষমতা বহু বিশ্লেষক লক্ষ্য করেছেন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ব্যবহারিক পর্যায়ে দেখা যায় যে পারিবারিক বিরোধে নারী পক্ষ যখন পুলিশকে অবহিত করেন, তখন পুলিশ প্রায়ই পুরুষ পক্ষকে যাচাই-বাছাই ছাড়াই গ্রেফতার করে। এই প্রক্রিয়ায় ৫৪ ধারার অস্পষ্টতাকে পুরুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।

২০২৫ সালে ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধনের মাধ্যমে গ্রেফতার প্রক্রিয়ায় কিছু নতুন সুরক্ষামূলক বিধান যুক্ত করা হয়েছে। বিশেষত ধারা ৪৬এ থেকে ৪৬ই পর্যন্ত নতুন বিধানগুলো গ্রেফতারের সময় পুলিশের পরিচয় প্রকাশ, গ্রেফতারের স্মারকপত্র তৈরি, আইনজীবীর সাথে যোগাযোগের সুযোগ এবং ডিজিটাল রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। এই পরিবর্তনগুলো ইতিবাচক, কিন্তু পুরুষ ভিকটিমের বিশেষ সমস্যাগুলোর সমাধান করেনি।

৩৮.২ জামিনের রাজনীতি: কীভাবে পুরুষ জামিন পেতে অসুবিধায় পড়েন

বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় জামিনের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জামিন না পেলে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারের আগেই কারাগারে থাকেন, যা মূলত শাস্তির মতোই, কারণ তার স্বাধীনতা হরণ হয় বিচার সম্পন্ন হওয়ার আগেই।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর অধীনে মামলায় অভিযুক্ত পুরুষ অনেক ক্ষেত্রে জামিন পেতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হন। এই আইনের ৩(৩) ধারায় বলা আছে যে এই আইনের অধীনে গ্রেফতারকৃত আসামির জামিনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিচারককে বাদীপক্ষের মতামত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। এই বিধানটি নারী বাদীকে জামিন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়, যা ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিতর্কিত।

যৌতুক মামলায় জামিনের পরিস্থিতি আরও জটিল। ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে যৌতুক-সংক্রান্ত মামলায় অভিযুক্ত পুরুষের জামিন পাওয়া কঠিন এবং ব্যয়বহুল। এই মামলাগুলো অনেক সময় দ্রুত নিষ্পত্তি হয় না, ফলে বিচারাধীন বন্দিত্ব দীর্ঘায়িত হয়।

তুলনামূলকভাবে দেখা গেলে, যখন একজন নারী একজন পুরুষের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন, তখন পুলিশ এবং আদালত সাধারণত পুরুষ আসামির জামিনের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নেন। কিন্তু যখন একজন পুরুষ একজন নারীর বিরুদ্ধে মামলা করেন, তখন নারী আসামির জামিনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি উদারতা দেখা যায়।

৩৮.৩ তদন্ত প্রক্রিয়ায় পক্ষপাত: পুরুষের বিরুদ্ধে তদন্তের একতরফা ধরন

বাংলাদেশ পুলিশের তদন্ত প্রক্রিয়ায় পুরুষের বিরুদ্ধে একটি কাঠামোগত পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায়। পারিবারিক বিরোধ বা নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলায় পুলিশ অনেক সময় একমাত্র নারী অভিযোগকারীর বক্তব্যকেই যথেষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য করে এবং পুরুষ আসামির বক্তব্য যাচাই করার প্রয়োজন মনে করে না।

এই তদন্তগত পক্ষপাতের কারণগুলো বহুমাত্রিক। প্রথমত, পুলিশ বাহিনীতে লিঙ্গ-সংবেদনশীলতার প্রশিক্ষণ অপর্যাপ্ত এবং একতরফা। পুলিশকে নারী ভিকটিমের প্রতি সংবেদনশীল হতে শেখানো হয়, কিন্তু পুরুষ আসামির অধিকারের বিষয়ে কার্যত কোনো প্রশিক্ষণ নেই। দ্বিতীয়ত, সামাজিক চাপ এবং মিডিয়ার প্রভাব পুলিশ কর্মকর্তাদের পুরুষ আসামির প্রতি কঠোর অবস্থান নিতে প্রণোদিত করে। তৃতীয়ত, থানায় এবং পুলিশ অফিসে

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

নারী অভিযোগকারীদের জন্য বিশেষ ডেস্ক এবং সহায়তা ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু পুরুষ অভিযোগকারীদের জন্য এমন কোনো বিশেষ সুবিধা নেই।

ফরেনসিক তদন্তের ক্ষেত্রেও পুরুষের প্রতি বৈষম্য লক্ষ্যণীয়। যখন একজন নারী পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তখন পুলিশ সাধারণত ফরেনসিক প্রমাণ সংগ্রহে সক্রিয় থাকে। কিন্তু যখন একজন পুরুষ নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তখন ফরেনসিক তদন্তে অনেক কম উৎসাহ দেখা যায়।

৩৮.৪ নারী পুলিশ ডেস্ক এবং পুরুষ অভিযোগকারীর সমস্যা

১৯৯০-এর দশক থেকে বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় নারী পুলিশ ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। এই ডেস্কের উদ্দেশ্য হলো নারী অভিযোগকারীরা যেন পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তার সামনে তাদের অভিযোগ উপস্থাপন করতে না হয়, বিশেষত যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে। এই উদ্যোগটি প্রশংসনীয় এবং প্রয়োজনীয়।

কিন্তু এই ডেস্কের অস্তিত্ব একটি অনুপস্থিতিকে স্পষ্ট করে দেয়: পুরুষ অভিযোগকারীদের জন্য কোনো বিশেষ সুবিধা নেই। যখন একজন পুরুষ নারী কর্তৃক নির্যাতনের অভিযোগ করতে আসেন, তখন তিনি কোনো বিশেষ সহায়তা পান না। পুলিশ অফিসার প্রায়ই সেই অভিযোগকে হাল্কাভাবে নেন বা এমনকি উপহাস করেন।

ব্যবহারিক পর্যায়ে দেখা গেছে যে একজন পুরুষ যখন স্ত্রীর দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ করতে থানায় যান, তখন পুলিশ অনেক সময় পারিবারিক বিষয়ে মামলা না করে সমঝোতার পরামর্শ দেন। কিন্তু যখন একজন নারী স্বামীর দ্বারা নির্যাতনের অভিযোগ করেন, তখন একই পুলিশ অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে পড়ে। এই দ্বৈত মানদণ্ড আইনের সামনে সমতার নীতির লঙ্ঘন।

অধ্যায় ৩৯: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এবং ২০২৫ সংশোধনী: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

৩৯.১ আইনের উদ্দেশ্য এবং বাস্তবতার মধ্যে ফাটল

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা এবং নির্যাতন দমন করা। এই উদ্দেশ্য সংশয়াতীতভাবে মহৎ এবং প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা, এসিড আক্রমণ, যৌতুক হত্যা এবং যৌন নির্যাতন সত্যিকারের এবং ব্যাপক সমস্যা।

কিন্তু এই আইনের বাস্তব প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে এর মহৎ উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এই বিচ্যুতির কারণগুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, আইনের ভাষা এমনভাবে লেখা হয়েছে যে অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আইনের প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় পুরুষ আসামির অধিকার রক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা নেই। তৃতীয়ত, মিথ্যা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তির ব্যবস্থা দুর্বল।

এই আইনের অধীনে মামলার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে উদ্বেগজনক চিত্র দেখা যায়। একটি জাতীয় পর্যায়ের গবেষণায় দেখা গেছে যে এই আইনে দায়ের করা মামলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হয় মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অথবা প্রমাণের অভাবে খালাস হয়। কিন্তু মামলা চলাকালীন সময়ে পুরুষ আসামিকে যে হয়রানি, বিচারপূর্ব কারাগার এবং সামাজিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তার কোনো প্রতিকার নেই।

৩৯.২ ধারা ৯: ধর্ষণের সংজ্ঞা, শাস্তি এবং প্রমাণের বোঝা

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯ ধারায় ধর্ষণকে একটি গুরুতর অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান রয়েছে। ধর্ষণ অবশ্যই একটি গুরুতর অপরাধ এবং কঠোর শাস্তির দাবিদার। কিন্তু এই ধারার কিছু দিক আইনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাজনক।

প্রথম সমস্যা হলো আইনে এমন বিধান রয়েছে যে ধর্ষণের মামলায় সহবাসের তথ্য সাক্ষী সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে, পুরুষ আসামিকে প্রমাণ করতে হবে যে মহিলার সম্মতি ছিল। এটি প্রমাণের বোঝা উল্টে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা, যা "Presumption of Innocence" বা নির্দোষিতার অনুমানের নীতির বিপরীত।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো পূর্ববর্তী যৌন ইতিহাসের প্রমাণের ব্যবহার। বাংলাদেশে ঐতিহ্যগতভাবে ধর্ষণ মামলায় নারীর যৌন ইতিহাস প্রতিরক্ষা হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি ছিল, যা অগ্রহণযোগ্য এবং সংশোধন করা প্রয়োজন। কিন্তু একই সাথে, পুরুষ আসামির ক্ষেত্রে তার পূর্ববর্তী ইতিহাস যেন অযথা ব্যবহার না করা হয় সে বিষয়েও সুরক্ষা প্রয়োজন।

তৃতীয় সমস্যা হলো "২০২০ সংশোধনী" যেখানে ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এই সংশোধনী রাজনৈতিক চাপের মুখে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে করা হয়েছিল। এটি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হলেও, আইন বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বাস্তবে ধর্ষণের ঘটনা কমায় না বরং মামলার রিপোর্টিং কমিয়ে দিতে পারে। কারণ নারীরা ভয় পেতে পারেন যে তাদের অভিযোগের ফলে একজন পুরুষের মৃত্যুদণ্ড হবে, ফলে তারা অভিযোগ করতে সংকোচ বোধ করতে পারেন। একই সাথে, মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকলে মিথ্যা মামলার মাধ্যমে একজন নির্দোষ পুরুষকে অপূরণীয় ক্ষতির দিকে ঠেলে দেওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে।

৩৯.৩ মার্চ ২০২৫ সংশোধনী: একটি অসম্পূর্ণ পদক্ষেপ

মার্চ ২০২৫ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর সংশোধনী বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্ষণের সংজ্ঞায় "মানুষ" বা "ব্যক্তি" শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ফলে এখন যেকোনো লিঙ্গের ব্যক্তি ধর্ষণের অপরাধী হতে পারেন।

এই সংশোধনীর ইতিবাচক দিকগুলো অস্বীকার করা যায় না। প্রথমত, এটি স্বীকার করে যে ধর্ষণ শুধুমাত্র পুরুষ করে না। দ্বিতীয়ত, এটি "বালৎকার" শব্দের মাধ্যমে শিশু পুরুষের যৌন সুরক্ষাকে স্বীকৃতি দেয়। তৃতীয়ত, তদন্তের সময়সীমা এবং বিচারের সময়সীমা সংকুচিত করা বিচারের গতি বাড়ানোর একটি ভালো উদ্যোগ।

কিন্তু এই সংশোধনীর সীমাবদ্ধতাও প্রকট। প্রথমত, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এখনো ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃত নয়। ষোলো বছরের বেশি বয়সী পুরুষের যৌন নির্যাতন এই আইনে "ধর্ষণ" নয়। দ্বিতীয়ত, সংশোধনীতে মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেই। তৃতীয়ত, বিচারপূর্ব তদন্তে পুরুষ আসামির অধিকার সুরক্ষার কোনো নতুন বিধান নেই।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বিশ্লেষকরা মনে করেন যে এই সংশোধনী প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক চাপ এবং কিছু নারী অধিকার সংগঠনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীকী পদক্ষেপ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। মূল কাঠামোগত সমস্যাগুলো অপরিবর্তিত রয়েছে।

৩৯.৪ নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল: বিচারিক কাঠামোয় পক্ষপাত

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে মামলা পরিচালনার জন্য দেশের প্রতিটি জেলায় বিশেষ ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হয়েছে। এই ট্রাইব্যুনালগুলো বিশেষভাবে এই আইনের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য তৈরি। কিন্তু এই ট্রাইব্যুনালগুলোর গঠন, কার্যপদ্ধতি এবং বিচারিক সংস্কৃতিতে কিছু সমস্যা রয়েছে।

প্রথম সমস্যা হলো ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের প্রশিক্ষণ। এই বিচারকরা সাধারণত নারী নির্যাতন মামলার বিষয়ে সংবেদনশীলতার প্রশিক্ষণ পান, যা প্রয়োজনীয়। কিন্তু তারা পুরুষ আসামির অধিকার রক্ষার বিষয়ে সমান গুরুত্ব সহকারে প্রশিক্ষিত নন।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো ট্রাইব্যুনালের সামাজিক পরিবেশ। এই ট্রাইব্যুনালে নারী অধিকার সংগঠনগুলোর উপস্থিতি এবং প্রভাব লক্ষণীয়। এই সংগঠনগুলো অনেক সময় বিচার প্রক্রিয়ায় এমনভাবে হস্তক্ষেপ করে যা নিরপেক্ষ বিচারের পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

তৃতীয় সমস্যা হলো মামলার চাপ। ট্রাইব্যুনালে মামলার পরিমাণ অত্যন্ত বেশি এবং বিচারকরা বিপুল চাপে থাকেন। এই চাপের মধ্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হলে বিচারকরা অনেক সময় সংক্ষিপ্ত রাস্তা অনুসরণ করেন এবং প্রচলিত সামাজিক ধারণার উপর নির্ভর করেন, যা পুরুষ আসামির জন্য ক্ষতিকর।

অধ্যায় ৪০: গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০: একটি লিঙ্গ-নির্দিষ্ট আইনের সমস্যা

৪০.১ আইনের কাঠামো এবং লিঙ্গ-পক্ষপাতী সংজ্ঞা

গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি পদক্ষেপ। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা প্রদান করা। কিন্তু এই আইনের সংজ্ঞায়নে একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে: এই আইন শুধুমাত্র নারীকে সুরক্ষা দেয়।

আইনের ২(খ) ধারায় "নির্যাতিত ব্যক্তি" সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এমনভাবে যে শুধুমাত্র নারী এই বিভাগে পড়েন। পুরুষ যদি তার স্ত্রীর দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন, তাহলে তিনি এই আইনের অধীনে কোনো সুরক্ষা পাবেন না।

এই সীমাবদ্ধতার একটি বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক। যদি একজন স্বামী তার স্ত্রীকে মারধর করেন, তাহলে স্ত্রী এই আইনে সুরক্ষামূলক আদেশ পেতে পারেন। কিন্তু যদি একজন স্ত্রী তার স্বামীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন, তাহলে স্বামী এই আইনের কোনো সুরক্ষা পাবেন না। তিনি সাধারণ দণ্ডবিধির আশ্রয় নিতে পারেন, কিন্তু গার্হস্থ্য সহিংসতার বিশেষ সুরক্ষা তার জন্য নেই।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই বৈষম্য কি সাংবিধানিক? বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ এবং ২৮ ধারা সমতার নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে। গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন যদি শুধুমাত্র একটি লিঙ্গকে সুরক্ষা দেয়, তাহলে এটি সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সে প্রশ্ন তোলা সংগত।

সংবিধানের ২৮(৪) ধারার যুক্তি দিয়ে বলা যেতে পারে যে নারীর জন্য বিশেষ সুরক্ষা সাংবিধানিকভাবে অনুমোদিত। কিন্তু ২৮(৪) ধারা নারীর জন্য বিশেষ সুরক্ষার অনুমতি দেয়, পুরুষের সুরক্ষা বঞ্চিত করার অনুমতি দেয় না। এই পার্থক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪০.২ পুরুষ গার্হস্থ্য নির্যাতন: একটি অদৃশ্য বাস্তবতা

পুরুষ গার্হস্থ্য নির্যাতনের বিষয়টি বাংলাদেশে প্রায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য। সামাজিক কলঙ্কের কারণে পুরুষরা এই নির্যাতনের কথা স্বীকার করেন না। আইনি সুরক্ষার অভাবে তারা আইনের আশ্রয় নিতে পারেন না। এবং গণমাধ্যম এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না।

বিশ্বব্যাপী গবেষণা দেখায় যে গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার হওয়া পুরুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রের Centers for Disease Control and Prevention এর গবেষণায় দেখা গেছে যে গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার পুরুষের সংখ্যা নারীর শিকার সংখ্যার তুলনায় অনেক কম হলেও মোটেই নগণ্য নয়। যুক্তরাজ্যে প্রতি তিনজন গার্হস্থ্য নির্যাতন ভিকটিমের মধ্যে একজন পুরুষ।

বাংলাদেশে এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক গবেষণা নেই, কারণ আইন পুরুষ ভিকটিমকে স্বীকৃতি দেয় না, তাই ডেটাও সংগ্রহ করা হয় না। এটি একটি দুষ্টচক্র: আইন না থাকলে ডেটা নেই, ডেটা না থাকলে সমস্যার মাত্রা বোঝা যায় না, এবং সমস্যার মাত্রা না জানলে আইন পরিবর্তনের চাপ তৈরি হয় না।

৪০.৩ আন্তর্জাতিক তুলনা: অন্য দেশে কীভাবে পুরুষ গার্হস্থ্য সহিংসতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে

আন্তর্জাতিকভাবে পুরুষ গার্হস্থ্য নির্যাতনের স্বীকৃতি এবং আইনি সুরক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈচিত্র্য রয়েছে।

যুক্তরাজ্যে ২০০৪ সাল থেকে গার্হস্থ্য সহিংসতার সংজ্ঞা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ করা হয়েছে। পুরুষ ভিকটিমরা একই আইনি সুরক্ষা পান যা নারী ভিকটিমরা পান। যুক্তরাষ্ট্রে Violence Against Women Act এর পরিধি বিস্তৃত করে পুরুষ এবং অ-বাইনারি ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডায়ও গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন লিঙ্গ-নিরপেক্ষ।

এশিয়ার মধ্যে ফিলিপাইন তার Anti-Violence Against Women and Their Children Act এর পাশাপাশি পুরুষ ভিকটিমদের জন্যও কিছু সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা রেখেছে। থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়ায় গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন লিঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করার প্রয়াস রয়েছে।

বাংলাদেশ এই আন্তর্জাতিক প্রবণতা থেকে পিছিয়ে আছে। ২০২৫ সালে নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে, কিন্তু পুরুষের গার্হস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি তাদের এজেন্ডায় নেই।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ৪১: বিচারপূর্ব আটক এবং পুরুষের মর্যাদাহানি: একটি বিশেষ সমস্যা

৪১.১ বিচারপূর্ব আটকের হার এবং লিঙ্গ-বৈষম্য

বাংলাদেশের কারাগারে বিচারাধীন বন্দিদের সংখ্যা মোট কারাবন্দির সংখ্যার সত্তর থেকে আশি ভাগ। এই বিচারাধীন বন্দিদের বিশাল অংশই পুরুষ। এই পরিসংখ্যান শুধুমাত্র সামাজিক কারণে নয়, বরং আইনি কাঠামোর কারণেও।

ফৌজদারি কার্যবিধির অনেক ধারায় নারীকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার নির্দেশ রয়েছে। ধারা ৪৬(৪) বলে যে মহিলাকে পুরুষ পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার করা যাবে না বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া। এই বিধানটি নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু এর ফলাফল হলো পুরুষকে নারীর চেয়ে অনেক বেশি গ্রেফতার করা হয় একই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে।

বিচারপূর্ব আটক একটি মারাত্মক সমস্যা কারণ এটি একজন নির্দোষ ব্যক্তির জীবনে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। চাকরি হারানো, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক কলঙ্ক এবং মানসিক আঘাত বিচারপূর্ব আটকের সাধারণ পরিণতি। পরবর্তীতে বিচারে খালাস পেলেও এই ক্ষতি পূরণ হয় না এবং ক্ষতিপূরণের কোনো কার্যকর আইনি ব্যবস্থা নেই।

৪১.২ গ্রেফতারের পরে সামাজিক মৃত্যু: পুরুষের জন্য একটি বিশেষ পরিস্থিতি

বাংলাদেশে যখন একজন পুরুষকে নারী নির্যাতন বা যৌতুক সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতার করা হয়, তখন তার সামাজিক জীবনে একটি বিপর্যয় ঘটে। এই বিপর্যয়টি বিচারের রায়ের আগেই শুরু হয়।

প্রথমত, গ্রেফতারের সংবাদ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরুষটি সমাজে "অপরাধী" হিসেবে চিহ্নিত হয়। দ্বিতীয়ত, তার পরিবার সামাজিক বয়কটের শিকার হয়। তৃতীয়ত, তার চাকরি বা ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চতুর্থত, তার সন্তানরা বিদ্যালয়ে বৈষম্যের শিকার হয়।

এই সামাজিক ক্ষতি বিচারে খালাস পেলেও সম্পূর্ণ মোচন হয় না। বাংলাদেশের সমাজে একবার "অভিযুক্ত" হলে সেই দাগ বহু বছর বা সারাজীবন থেকে যায়। এই বাস্তবতায় একটি মিথ্যা অভিযোগ একজন নির্দোষ পুরুষের জীবন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারে।

এই বিষয়টিকে জুরিসপ্রুডেন্সের ভাষায় বলা যায় "collateral consequences" বা অনুষঙ্গিক পরিণতির সমস্যা। আইনি শাস্তির বাইরে সামাজিক, পেশাগত এবং পারিবারিক পরিণতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচারিক বিবেচনা হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলাদেশের ফৌজদারি আইন এই অনুষঙ্গিক পরিণতিগুলো বিবেচনায় নেয় না এবং মিথ্যা মামলার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই।

৪১.৩ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং বিচারপূর্ব আটকের সীমাবদ্ধতা

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে বিচারপূর্ব আটক সম্পর্কে কঠোর নির্দেশিকা রয়েছে। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির ৯ অনুচ্ছেদ বলে যে কাউকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া আটক রাখা যাবে না এবং বিচার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা যাবে না। এই আন্তর্জাতিক মান বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে মেনে চলা হয় না।

বাংলাদেশ এই চুক্তিতে অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। ফলে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বাংলাদেশের দায়বদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু বিচারপূর্ব আটকের ক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করার অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া দুর্বল।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটির ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বিচারপূর্ব আটক "exceptional measure" বা ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা হওয়া উচিত। প্রতিটি ক্ষেত্রে আটকের প্রয়োজনীয়তা পৃথকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের মামলায় পুরুষ আসামিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আটক রাখার প্রবণতা এই আন্তর্জাতিক মানের লঙ্ঘন।

অধ্যায় ৪২: দণ্ড বিধান এবং শাস্তি নির্ধারণে লিঙ্গ-পক্ষপাত

৪২.১ শাস্তি নির্ধারণে বিচারিক বিবেচনা এবং লিঙ্গ-প্রভাব

ফৌজদারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে শাস্তি নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় বিচারকরা বিস্তৃত বিবেচনামূলক ক্ষমতা রাখেন। এই বিবেচনামূলক ক্ষমতার প্রয়োগে লিঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে।

গবেষণা দেখায় যে একই ধরনের অপরাধের জন্য নারীরা গড়ে পুরুষের চেয়ে কম কঠোর শাস্তি পান। এই প্রবণতাটি আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত এবং বিভিন্ন দেশে গবেষণায় প্রমাণিত। বাংলাদেশে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক গবেষণা সীমিত, কিন্তু আইন অনুশীলনকারীদের অভিজ্ঞতা এই প্রবণতার সাক্ষ্য দেয়।

এই বৈষম্যের কারণগুলো বিভিন্ন। প্রথমত, "chivalry hypothesis" বা নাইটলি আচরণের অনুকল্প অনুযায়ী বিচারকরা অনেক সময় নারীর প্রতি "সদয়" আচরণ করেন এবং কম কঠোর শাস্তি দেন। দ্বিতীয়ত, "maternal mitigation" বা মাতৃত্বের লাঘব কারণ হিসেবে নারীর সন্তান রয়েছে এই বিষয়টি শাস্তি লাঘবের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়, কিন্তু পুরুষের সন্তান থাকলেও একই সুবিধা পান না। তৃতীয়ত, পুরুষকে সামাজিকভাবে বেশি দায়িত্বশীল ধরা হয় এবং তাই একই অপরাধের জন্য তার শাস্তি বেশি হওয়া "স্বাভাবিক" বলে মনে করা হয়।

৪২.২ মৃত্যুদণ্ড এবং লিঙ্গ-পক্ষপাত

বাংলাদেশের মৃত্যুদণ্ড নীতিতে লিঙ্গ-পক্ষপাতের একটি বিশেষ মাত্রা রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া ব্যক্তিদের প্রায় সকলেই পুরুষ। এই পরিসংখ্যানটি শুধুমাত্র সামাজিক কারণে নয়, বরং আইনগত কারণেও।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশে কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড বিধান রয়েছে এবং এই অপরাধগুলোর সংজ্ঞায় পুরুষকেই প্রধান অপরাধী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। যেমন ধর্ষণের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড বিধান রয়েছে, কিন্তু ধর্ষণের সংজ্ঞায় দীর্ঘদিন ধরে শুধুমাত্র পুরুষ অপরাধী হতে পারত, ফলে নারী ধর্ষণকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না।

জুরিসপ্রুডেন্সের দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে যে লিঙ্গ-পক্ষপাত রয়েছে তা অত্যন্ত গুরুতর। কারণ মৃত্যুদণ্ড অপরিবর্তনীয়। যদি একজন নির্দোষ পুরুষকে মিথ্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তাহলে পরবর্তীতে তার নির্দোষিতা প্রমাণিত হলেও তাকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

৪২.৩ পুরুষের বিরুদ্ধে শাস্তি নির্ধারণে সামাজিক ধারণার প্রভাব

শাস্তি নির্ধারণে সামাজিক ধারণার প্রভাব একটি সূক্ষ্ম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের বিচারকরা মানুষ, এবং তারা সমাজের বাইরে নন। সমাজে প্রচলিত ধারণা যে পুরুষ স্বভাবতই বেশি আগ্রাসী, পুরুষ নারীকে নির্যাতন করে, পুরুষ পরিবারকে কষ্ট দেয়, এই ধারণাগুলো বিচারকের অচেতন মনোজগতেও প্রভাব ফেলে।

সামাজিক মনোবিজ্ঞানে "cognitive bias" বা জ্ঞানীয় পক্ষপাতের ধারণাটি এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক। গবেষণায় দেখা গেছে যে মানুষ যখন কারো সম্পর্কে পূর্বধারণা রাখেন, তখন নতুন তথ্যও সেই পূর্বধারণাকে নিশ্চিত করার দিকে ব্যাখ্যা করা হয়। বিচারিক ক্ষেত্রে এই "confirmation bias" পুরুষ আসামির বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে।

২০২৩-২৪ সালে প্রকাশিত কয়েকটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে বিচারকরা যখন একই মামলার তথ্য পান এবং শুধুমাত্র আসামির লিঙ্গ পরিবর্তন করা হয়, তখন পুরুষ আসামির ক্ষেত্রে গড়ে বেশি কঠোর রায় দেওয়া হয়। এই গবেষণার ফলাফল বিচারিক প্রশিক্ষণে লিঙ্গ-পক্ষপাত সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে সামনে আনে।

অধ্যায় ৪৩: মিথ্যা মামলা এবং ফৌজদারি ন্যায়বিচার ব্যবস্থার বিকৃতি

৪৩.১ মিথ্যা মামলার সংজ্ঞা, ধরন এবং ব্যাপ্তি

মিথ্যা মামলা বা false accusation ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সবচেয়ে বিপজ্জনক সমস্যাগুলোর একটি। যখন একটি মিথ্যা অভিযোগ একজন নির্দোষ মানুষকে ফৌজদারি আদালতের সামনে দাঁড় করায়, তখন সেই ব্যক্তির জীবনে অপরিমাপযোগ্য ক্ষতি হয়।

বাংলাদেশে মিথ্যা মামলার সংজ্ঞা নিয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে। কঠোর অর্থে মিথ্যা মামলা হলো এমন মামলা যেখানে অভিযোগকারী জেনেশুনে মিথ্যা তথ্য দিয়ে অভিযোগ করেছেন। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে মিথ্যা মামলা হলো এমন মামলা যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ। এই দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে কারণ অভিযোগকারী সত্যিকারের ভুল বিশ্বাস নিয়ে অভিযোগ করতে পারেন।

বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে মামলায় মিথ্যা অভিযোগের একটি নির্দিষ্ট ধরন লক্ষ্যণীয়। এই ধরনের মামলায় মূলত বৈবাহিক বা পারিবারিক বিরোধকে ফৌজদারি মামলায় রূপান্তরিত করা

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

হয়। একজন নারী যখন তার স্বামীর সাথে বিবাহবিচ্ছেদ চান কিন্তু সুবিধাজনক শর্তে সেটা পাচ্ছেন না, তখন তিনি নারী নির্যাতন বা যৌতুক মামলা করেন শুধুমাত্র স্বামীকে চাপ দিতে। এটি আইনের উদ্দেশ্যের সরাসরি অপব্যবহার।

৪৩.২ যৌতুক মামলায় মিথ্যা অভিযোগের কাঠামো

যৌতুক নিরোধ আইনের অধীনে মিথ্যা মামলার একটি বিশেষ কাঠামো রয়েছে। এই কাঠামোটি বোঝার জন্য আমাদের প্রথমে যৌতুক মামলার প্রমাণের কাঠামো বুঝতে হবে।

যৌতুক নির্যাতনের অভিযোগে প্রমাণের বোঝা সাধারণত খুবই সরল। অভিযোগকারী যদি বলেন যে তার কাছে যৌতুক চাওয়া হয়েছে এবং না দেওয়ায় নির্যাতন করা হয়েছে, তাহলে এই অভিযোগটি প্রায় স্বতঃপ্রমাণিত বলে ধরে নেওয়া হয়। পুরুষ আসামিকে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব।

এই কাঠামোটি আইনের একটি সাধারণ ব্যবহার তৈরি করেছে: বৈবাহিক সংকটে যৌতুক মামলা একটি "কৌশলগত হাতিয়ার" হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আইনজীবীরা অনেক সময় তাদের মহিলা মক্কেলদের পরামর্শ দেন যে বিবাহবিচ্ছেদের আগে যৌতুক মামলা করলে স্বামীপক্ষ বেশি অনুকূল শর্তে সমঝোতা করবে। এই পরামর্শটি যদিও আইনগতভাবে সমস্যাজনক, কিন্তু বাস্তবে এটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ২০১৪ সালে Arnesh Kumar বনাম বিহার রাজ্য মামলায় এই সমস্যাটিকে সরাসরি চিহ্নিত করেছিল এবং ৪৯৮-এ ধারায় (ভারতে যৌতুক নির্যাতনের ধারা) স্বয়ংক্রিয় গ্রেফতারের বিরুদ্ধে নির্দেশিকা দিয়েছিল। বাংলাদেশে এই ধরনের কোনো বিচারিক নির্দেশিকা নেই।

৪৩.৩ এফআইআর অপব্যবহার এবং পুরুষের অধিকার

বাংলাদেশে মামলা দায়েরের প্রাথমিক পর্যায়ে FIR বা প্রথম তথ্য প্রতিবেদন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। একটি FIR দায়ের হলে পুলিশকে তদন্ত শুরু করতে হয় এবং আসামিকে গ্রেফতার করা যায়। এই FIR দায়েরের প্রক্রিয়াটি পুরুষের বিরুদ্ধে অপব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রথম সমস্যা হলো FIR দায়ের করার জন্য প্রাথমিক প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। শুধু অভিযোগকারীর কথা যথেষ্ট। এই সরল প্রক্রিয়া মিথ্যা অভিযোগের দরজা খুলে দেয়।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো FIR দায়ের হলে পুলিশকে "must investigate" বা বাধ্যতামূলকভাবে তদন্ত করতে হবে। এই বাধ্যবাধকতা মিথ্যা মামলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যা পুলিশের সম্পদ অপচয় করে এবং আসামির উপর বিচারপূর্ব হয়রানি সৃষ্টি করে।

তৃতীয় সমস্যা হলো FIR প্রত্যাহারের জটিল প্রক্রিয়া। একবার FIR দায়ের হলে অভিযোগকারী চাইলেই সহজে প্রত্যাহার করতে পারেন না কারণ রাষ্ট্রপক্ষ মামলা চালিয়ে যেতে পারে। এর মানে হলো যদি কোনো নারী বুঝতে পারেন যে তার অভিযোগ মিথ্যা ছিল বা বাড়াবাড়ি ছিল, তাহলেও মামলা চলতে থাকে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৪৩.৪ মিথ্যা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকারের অপর্যাপ্ততা

বাংলাদেশে মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার সীমিত এবং অকার্যকর। দণ্ডবিধির ২১১ ধারায় মিথ্যা মামলা করার বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রয়েছে। এই ধারায় বলা আছে যে কেউ জেনেশুনে মিথ্যা অভিযোগ করলে তাকে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা দেওয়া যাবে।

কিন্তু বাস্তবে এই ধারায় মামলা করা এবং সফলভাবে বিচার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। প্রথমত, মিথ্যা মামলার অভিযোগ প্রমাণ করতে হলে দেখাতে হবে যে মূল অভিযোগটি মিথ্যা ছিল এবং অভিযোগকারী সেটা জানতেন। দ্বিতীয়ত, মূল মামলায় খালাস পেলেও তা "মিথ্যা মামলা" প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। তৃতীয়ত, সামাজিক চাপের কারণে অনেক পুরুষ মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা করতে সংকোচ বোধ করেন।

বাস্তবে দেখা যায় যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মিথ্যা মামলার ক্ষেত্রে অভিযোগকারী নারী খুব কমই শাস্তির মুখোমুখি হন। এই দায়মুক্তি মিথ্যা মামলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে এবং এটি একটি বিপজ্জনক প্রণোদনা কাঠামো তৈরি করে।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ২০১৩ সালে Preeti Gupta বনাম ঝাড়খণ্ড রাজ্য মামলায় মন্তব্য করেছিল যে ৪৯৮-এ ধারার অধীনে মিথ্যা মামলা একটি সমাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে এবং এই বিষয়ে সংসদের মনোযোগ দরকার। বাংলাদেশে এই বিষয়ে বিচারিক মন্তব্যও বিরল এবং আইনি সংস্কারের আলোচনা প্রায় অনুপস্থিত।

অধ্যায় ৪৪: ফৌজদারি বিচারে পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মহত্যার সংকট

৪৪.১ মামলা এবং পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক

ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে পড়লে যে মানসিক চাপ তৈরি হয় তা অসহনীয় হতে পারে। বিশেষত যখন মামলাটি মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যমূলক, তখন এই চাপ আরও বেশি। বাংলাদেশে পুরুষ আসামির মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২১ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে পুরুষরা আত্মহত্যার ঝুঁকিতে নারীদের চেয়ে বেশি থাকেন এবং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো আইনি সমস্যা ও সামাজিক কলঙ্কের সম্মিলন। মামলায় জড়িয়ে পড়া, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক অপমান এবং আর্থিক সংকট একসাথে মিলে পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যে মারাত্মক আঘাত হানে।

বাংলাদেশে যৌতুক মামলা বা নারী নির্যাতন মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার পরে পুরুষ আত্মহত্যার কোনো সরকারি পরিসংখ্যান নেই। কিন্তু গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ এবং পরিবারগুলোর অভিজ্ঞতা বলে যে এই ঘটনা অনেক বেশি ঘটে। মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পরে লজ্জায় এবং মানসিক আঘাতে আত্মহত্যা করা পুরুষের গল্প বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে মাঝে মাঝে উঠে আসে, কিন্তু এটি সামাজিক আলোচনার কেন্দ্রে আসে না।

৪৪.২ কারাগারে পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা অত্যন্ত সীমিত। কারাবন্দিদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার হার সাধারণ জনগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু এই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার বিষয়ে কার্যকর হস্তক্ষেপ নেই।

বিচারপূর্ব আটকে থাকা পুরুষরা বিশেষ মানসিক চাপে থাকেন। তারা না জানেন বিচারের ফলাফল কী হবে, না জানেন কতদিন আটক থাকতে হবে। এই অনিশ্চয়তা এবং অসহায়ত্বের অনুভূতি মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

জাতিসংঘের বন্দিদের সাথে আচরণের সর্বনিম্ন মান নিয়ম, যা নেলসন ম্যান্ডেলা বিধি নামে পরিচিত, বন্দিদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করে। বাংলাদেশ এই মান পূরণ করছে কিনা সেটা প্রশ্নবিদ্ধ।

৪৪.৩ আইনি হয়রানি এবং পুরুষের মানসিক বিপর্যয়: একটি জনস্বাস্থ্য দৃষ্টিভঙ্গি

আইনি হয়রানিকে একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখার একটি শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে। যখন হাজার হাজার পুরুষ প্রতি বছর মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত মামলায় জড়িয়ে পড়েন, যখন তাদের পরিবার ভেঙে যায়, চাকরি যায়, সম্মান যায়, তখন এটি শুধু ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, এটি একটি জনস্বাস্থ্য সংকট।

মানসিক স্বাস্থ্যের পরিভাষায় এই অভিজ্ঞতাকে "legal abuse syndrome" বা আইনি অপব্যবহার সিন্ড্রোম বলা যায়। এই অভিজ্ঞতার শিকার ব্যক্তিরা Post-Traumatic Stress Disorder বা PTSD এর মতো লক্ষণ দেখান, সামাজিক সম্পর্কে সমস্যায় ভোগেন এবং দীর্ঘমেয়াদী মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকিতে থাকেন।

বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা এই জনস্বাস্থ্য মাত্রাটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। মামলা চলাকালীন মানসিক সহায়তার কোনো ব্যবস্থা নেই। মামলা শেষে মানসিক পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা নেই। এবং আইনি হয়রানির কারণে মানসিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের কোনো ব্যবস্থা নেই।

অধ্যায় ৪৫: সাইবার অপরাধ আইন এবং পুরুষের অধিকার

৪৫.১ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩: পুরুষের দৃষ্টিকোণ

বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এবং তার উত্তরসূরি সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ অনলাইন পরিবেশে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি। এই আইনগুলো সামগ্রিকভাবে বিতর্কিত কারণ এগুলো বাক স্বাধীনতাকে সীমিত করার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু এই আইনগুলোর একটি বিশেষ লিঙ্গ-সংক্রান্ত মাত্রা রয়েছে। এই আইনে "অনলাইনে যৌন হয়রানি" এবং "অনলাইনে মানহানি" সংক্রান্ত বিধানগুলো প্রায়শই পুরুষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় এবং নারীর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়।

এই বিষয়ে একটি ন্যায্য মন্তব্য হলো যে অনলাইন যৌন হয়রানির শিকার নারীরা সত্যিকারের ক্ষতির সম্মুখীন হন এবং তাদের সুরক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা হলো এই আইনগুলোতে "যৌন হয়রানি" এর সংজ্ঞা এতটাই বিস্তৃত

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

যে যেকোনো অপ্রীতিকর মন্তব্যকেও এর আওতায় আনা যায়। এই বিস্তৃত সংজ্ঞা পুরুষের বিরুদ্ধে অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করে।

একটি বাস্তব সমস্যা হলো যখন একজন নারী তার প্রাক্তন প্রেমিক বা বিবাহিত সঙ্গীর সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন, তখন তিনি সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা করে পুরুষকে হয়রানি করতে পারেন। এই মামলায় পুরুষকে গ্রেফতার করা যায় এবং সামাজিক মর্যাদা ধ্বংস হয়ে যায়।

৪৫.২ অনলাইন মানহানি আইন এবং পুরুষের অধিকার

সাইবার নিরাপত্তা আইনে অনলাইনে মানহানির বিধান রয়েছে। কিন্তু এই বিধানের প্রয়োগে একটি অদ্ভুত পার্থক্য দেখা যায়: নারী যখন কোনো পুরুষের সম্পর্কে অনলাইনে মিথ্যা তথ্য প্রচার করেন, তখন পুলিশ প্রায়ই সক্রিয় হয় না। কিন্তু পুরুষ যখন কোনো নারীর সম্পর্কে তথ্য প্রচার করেন, তখন পুলিশ দ্রুত সক্রিয় হয়।

এই অসামঞ্জস্যের কারণ আইনের ভাষায় নয়, বরং আইনের প্রয়োগ সংস্কৃতিতে। পুলিশ সামাজিক ধারণা দ্বারা প্রভাবিত যে নারীকে অনলাইনে হয়রানি করা বেশি গুরুতর এবং পুরুষকে হয়রানি করা কম গুরুতর। এই ধারণাটি আইনের সমান প্রয়োগের নীতির লঙ্ঘন।

আরেকটি সমস্যা হলো যখন একজন নারী কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারণা চালান, তখন সেই প্রচারণাকে "সচেতনতা বৃদ্ধি" বলে মনে করা হয়। কিন্তু পুরুষ যদি একই কাজ করেন, তাহলে তাকে "হয়রানিকারী" বলা হয়। এই দ্বৈত মানদণ্ড অনলাইন পরিবেশে পুরুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সীমিত করে।

৪৫.৩ পর্নোগ্রাফি আইন এবং পুরুষের বিরুদ্ধে একতরফা প্রয়োগ

বাংলাদেশে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ পর্নোগ্রাফিক বিষয়বস্তু উৎপাদন, বিতরণ এবং প্রদর্শনকে শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করে। এই আইনের প্রয়োগে একটি লিঙ্গ-পক্ষপাত লক্ষণীয়।

বাস্তবে এই আইনের অধীনে প্রায় সকল মামলাই পুরুষের বিরুদ্ধে। নারীরা যখন যৌন বিষয়বস্তু উৎপাদন বা বিতরণ করেন, তখন প্রায়ই তাদের "ভিকটিম" হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং মামলা সেই বিষয়বস্তু তৈরিতে সহায়তাকারী পুরুষের বিরুদ্ধে হয়।

এই প্রয়োগ কাঠামো অনেক ক্ষেত্রে অযৌক্তিক। যদি দুজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি পারস্পরিক সম্মতিতে যৌন বিষয়বস্তু উৎপাদন করেন, তাহলে শুধুমাত্র একজনকে (পুরুষকে) দায়ী ধরা এবং অন্যজনকে (নারীকে) ভিকটিম ধরা নৈতিকভাবে অসংগত।

অধ্যায় ৪৬: বিচারিক ব্যাখ্যায় পুরুষ-বিরোধী প্রবণতা: কেস ল বিশ্লেষণ

৪৬.১ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারিক দৃষ্টিভঙ্গি

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায় এবং পর্যবেক্ষণ থেকে ফৌজদারি মামলায় লিঙ্গ সংক্রান্ত বিচারিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি চিত্র তৈরি হয়। সাধারণত সুপ্রিম কোর্ট নারী সুরক্ষার প্রশ্নে প্রগতিশীল অবস্থান নিয়েছেন, যা প্রশংসনীয়।

কিন্তু একই সাথে, পুরুষ আসামির মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময় অপর্যাপ্ত। মিথ্যা মামলার বিষয়ে আদালত যদিও মাঝে মাঝে মন্তব্য করেছেন, কিন্তু এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিচারিক নির্দেশিকা প্রায় নেই।

প্রমাণের বোঝার প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের কিছু রায়ে যৌন অপরাধের মামলায় ভিকটিমের (নারীর) বক্তব্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি কতটুকু ন্যায়সঙ্গত? একদিকে, যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে ভিকটিমের কথার গুরুত্ব আছে কারণ এই ধরনের অপরাধ প্রায়ই প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া ঘটে। অন্যদিকে, শুধুমাত্র একজনের অভিযোগের ভিত্তিতে কারো স্বাধীনতা হরণ করা "presumption of innocence" এর বিরোধী।

এই দ্বন্দ্ব সমাধানের একটি পথ হলো ভিকটিমের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া এবং একই সাথে আসামিকে তার পক্ষের প্রমাণ উপস্থাপনের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক মামলায় এই ভারসাম্য বজায় রাখা হয় না।

৪৬.২ বিচারিক পক্ষপাতের ধরন: একটি বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের ফৌজদারি মামলায় বিচারিক পক্ষপাতের কিছু নির্দিষ্ট ধরন চিহ্নিত করা যায়।

প্রথম ধরন হলো "sympathy bias" বা সহানুভূতিমূলক পক্ষপাত। এই ধরনের পক্ষপাতে বিচারক অনেক সময় নারী বাদীর প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল হন এবং পুরুষ আসামির বক্তব্যকে কম গুরুত্ব দেন। আদালতে নারী যখন কান্নাকাটি করেন বা আবেগের সাথে তার কষ্টের কথা বলেন, তখন সেটি বিচারকের মনে প্রভাব ফেলতে পারে।

দ্বিতীয় ধরন হলো "stereotyping bias" বা ছাঁচবদ্ধ পক্ষপাত। এই পক্ষপাতে বিচারক পুরুষ আসামিকে স্বাভাবিক অপরাধী ভূমিকায় দেখেন এবং নারী বাদীকে স্বাভাবিক ভিকটিম ভূমিকায়। এই ছাঁচবদ্ধ ধারণা নতুন তথ্যের মুখেও সহজে পরিবর্তন হয় না।

তৃতীয় ধরন হলো "outcome bias" বা ফলাফল-কেন্দ্রিক পক্ষপাত। যদি একজন বিচারক মনে করেন যে নারীর বিচার পাওয়াটা সমাজের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে তিনি তার রায়ে সেই ফলাফলের দিকে ঝুঁকতে পারেন। এই প্রবণতা বিচারিক নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে।

৪৬.৩ উচ্চ আদালতের ভূমিকা এবং সংশোধনী বিচার

বাংলাদেশের হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগ অনেক ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের পক্ষপাতদুষ্ট রায় সংশোধন করেছেন। এই উচ্চ আদালতের ভূমিকা বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

কিন্তু উচ্চ আদালতে যাওয়া একটি ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। একজন পুরুষ যিনি নিম্ন আদালতে অন্যায্য রায়ের শিকার হয়েছেন, তার কাছে হাইকোর্টে আপিল করার সামর্থ্য সবসময় নেই। এই অর্থনৈতিক বাধা ন্যায়বিচারের প্রবেশাধিকারকে সীমিত করে।

আরও একটি সমস্যা হলো উচ্চ আদালতে মামলা নিষ্পত্তির দীর্ঘ সময়। নিম্ন আদালতের রায়ের পরে উচ্চ আদালতে সুবিচার পেতে কয়েক বছর লাগতে পারে। এই দীর্ঘ সময়ে পুরুষ আসামির জীবনে যে ক্ষতি হয়, তা কোনো আদালতের রায়ে পূরণ হয় না।

অধ্যায় ৪৭: মাদকবিরোধী আইন এবং পুরুষের উপর প্রভাব

৪৭.১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এবং পুরুষের অসামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রেফতার

বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এবং এর পরবর্তী সংশোধনী মাদক পাচার ও সেবনকে কঠোরভাবে শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করে। এই আইনে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান রয়েছে।

মাদক আইনের প্রয়োগে একটি স্পষ্ট লিঙ্গ-পার্থক্য দেখা যায়। বাংলাদেশে মাদক মামলায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই পুরুষ। এটি আংশিকভাবে সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন, কারণ মাদক পাচারে পুরুষের অংশগ্রহণ বেশি। কিন্তু আইনের প্রয়োগের ধরনেও একটি পক্ষপাত রয়েছে।

যখন একজন নারী মাদকের সাথে জড়িত হন, তখন পুলিশ প্রায়ই তাকে "ভিকটিম" বা "পুরুষ পাচারকারীর হাতিয়ার" হিসেবে দেখেন। ফলে তার বিরুদ্ধে মামলা না করে বা লঘু মামলা করে পুরুষ পাচারকারীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। এই বিবেচনা অনেক সময় ন্যায্য, কিন্তু অনেক সময় এটি একজন নারীর সক্রিয় ভূমিকাকে উপেক্ষা করে এবং একজন পুরুষকে অতিরিক্ত দায়ী করে।

৪৭.২ মাদক মামলায় প্রমাণ এবং পুলিশের বিবেচনামূলক ক্ষমতার অপব্যবহার

বাংলাদেশে মাদক মামলায় একটি বিশেষ সমস্যা রয়েছে যা পুরুষের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পুলিশ অনেক সময় মাদক "উদ্ধার" করেন এমনভাবে যা প্রশ্নবিদ্ধ। বিশেষত যদি পুলিশের কাছে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার মনোভাব থাকে বা কেউ মোটা অঙ্কের ঘুষ দিয়ে কাউকে ফাঁসাতে চান, তাহলে মাদক মামলা একটি কার্যকর হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

"প্লান্টেড এভিডেন্স" বা পুঁতে রাখা প্রমাণের সমস্যা বাংলাদেশের মাদক মামলায় একটি স্বীকৃত সমস্যা। এই সমস্যার শিকার মূলত পুরুষরা, কারণ সমাজে পুরুষই মাদক পাচারকারী হিসেবে সহজে বিশ্বাসযোগ্য।

মাদক মামলায় ফরেনসিক প্রমাণের মান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা দুর্বল। "চেইন অফ কাস্টডি" বা প্রমাণ সংরক্ষণের ধারাবাহিকতার নিয়ম মানা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। এই দুর্বলতা মিথ্যা মাদক মামলার সুযোগ তৈরি করে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ৪৮: জঙ্গিবাদ দমন আইন, সন্ত্রাসবিরোধী আইন এবং পুরুষের অধিকার

৪৮.১ সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ এবং পুরুষের প্রতি তার প্রভাব

বাংলাদেশের সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ রাষ্ট্রকে সন্দেহভাজন জঙ্গি বা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়। এই আইনের প্রয়োগে পুরুষরা অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন।

বাস্তবে দেখা যায় যে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে যারা গ্রেফতার হন তাদের প্রায় সকলেই পুরুষ। এটি আংশিকভাবে সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন। কিন্তু এই আইনে "সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্ততা" এর সংজ্ঞা এতটাই বিস্তৃত যে যেকোনো ব্যক্তিকে এই ধারায় গ্রেফতার করা সম্ভব।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো বাংলাদেশে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অপব্যবহারের বিষয়ে বারবার সতর্কতা উচ্চারণ করেছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তার ২০২৫ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে আগের সরকারের আমলে এই আইনটি রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনে ব্যবহৃত হয়েছে। রাজনৈতিক বিরোধীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা বেশি হওয়ায় এই আইনের ক্ষতিও পুরুষরাই বেশি ভোগ করেছেন।

৪৮.২ বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং পুরুষের বিনা বিচারে আটক

বাংলাদেশের বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ রাষ্ট্রকে যেকোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখার ক্ষমতা দেয়। এই আইনটি সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলোর সাথে স্পষ্ট সংঘাত তৈরি করে।

এই আইনের প্রয়োগে পুরুষরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কারণ যারা রাজনৈতিক কারণে আটক হন তাদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই পুরুষ। এই বিনা বিচারে আটক "presumption of innocence" এর সরাসরি লঙ্ঘন।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট পিটিশন করার সুযোগ থাকলেও কার্যত এই পথে সুবিচার পাওয়া কঠিন। আটককৃত ব্যক্তির পরিবার প্রায়ই আইনগত পদক্ষেপ নিতে সাহস পান না কারণ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করার পরিণতির ভয় থাকে।

অধ্যায় ৪৯: ফৌজদারি আইনে পুরুষের অধিকার: তুলনামূলক আইনি বিশ্লেষণ

৪৯.১ ভারতের অভিজ্ঞতা: সংস্কার এবং তার পাঠ

ভারতের ফৌজদারি আইন সংস্কারের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। ভারতেও বাংলাদেশের মতো পুরুষবিরোধী আইনি প্রবণতার বিরুদ্ধে দীর্ঘ বিতর্ক চলেছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ২০১৮ সালে ব্যভিচার আইন (ধারা ৪৯৭) বাতিল করেছে। ২০১৪ সালে যৌতুক নির্যাতন আইনে (ধারা ৪৯৮-এ) স্বয়ংক্রিয় গ্রেফতারের বিরুদ্ধে নির্দেশিকা দিয়েছে। ২০১৮ সালে সামরিক আইনে সমকামী সম্পর্ককে ডিক্রিমিনালাইজ করেছে। এই সংস্কারগুলো ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সক্রিয় ভূমিকার ফলে সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট এই ক্ষেত্রে ভারতের মতো সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন। বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ ধারা হাইকোর্টকে মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য রিট আবেদন বিচারের ক্ষমতা দেয়। এই ক্ষমতার সক্রিয় ব্যবহার ফৌজদারি আইনে পুরুষবিরোধী বিধানগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

ভারতের ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩ (পুরনো ভারতীয় দণ্ডবিধির স্থলাভিষিক্ত) কিছু ক্ষেত্রে আরও লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাষা ব্যবহার করেছে। এই সংস্কার বাংলাদেশের জন্যও একটি মডেল হতে পারে।

৪৯.২ পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা: পুরুষ অধিকার আন্দোলন এবং আইনি পরিবর্তন

পাকিস্তানেও বাংলাদেশের মতো যৌতুক এবং নারী নির্যাতন সংক্রান্ত আইনে পুরুষবিরোধী প্রবণতার বিতর্ক রয়েছে। পাকিস্তানে গত কয়েক বছরে পুরুষের আইনি অধিকার নিয়ে কিছু সংগঠিত আন্দোলন দেখা গেছে।

পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট কিছু মামলায় বলেছেন যে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত আইনে মিথ্যা মামলার সংখ্যা উদ্বেগজনক এবং এই বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কার্যকর সংস্কার এখনো সীমিত।

পাকিস্তানে মুসলিম পারিবারিক আইনে সংস্কার এবং পুরুষের অধিকার বিষয়ে ইসলামিক আইনশাস্ত্রের সাথে আধুনিক আইনি নীতির সমন্বয়ের একটি বিতর্ক চলছে। এই বিতর্ক বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও প্রাসঙ্গিক।

৪৯.৩ শ্রীলঙ্কার সংস্কার মডেল এবং বাংলাদেশের জন্য পাঠ

শ্রীলঙ্কা গত দশ বছরে তার ফৌজদারি আইনে কিছু উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেছে। ২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কা ধারা ৩৭৭ বাতিল করে সমকামী সম্পর্ককে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে। শ্রীলঙ্কার গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন সংশোধন করে পুরুষ ভিকটিমকেও কিছু সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা দেখায় যে একটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশও ধর্মীয় ও সামাজিক চাপ উপেক্ষা করে আইনি সংস্কার করতে পারে যদি রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি থাকে। বাংলাদেশের জন্য শ্রীলঙ্কার এই অভিজ্ঞতা অনুপ্রেরণামূলক।

৪৯.৪ স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মডেল: লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ফৌজদারি আইনের উদাহরণ

স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো, বিশেষত সুইডেন, নরওয়ে এবং ডেনমার্ক, লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রে বিশ্বে সর্বোচ্চ মানের উদাহরণ।

সুইডেনে ধর্ষণের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ: যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো ব্যক্তিকে ধর্ষণ করতে পারে। গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন পুরুষ এবং নারী উভয় ভিকটিমকে একই সুরক্ষা দেয়। মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা রয়েছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশ যখন তার ফৌজদারি আইন সংস্কার করবে, তখন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মডেল থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া যেতে পারে। যদিও সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ভিন্ন, তবু লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনের মূলনীতি সার্বজনীন।

অধ্যায় ৫০: ফৌজদারি আইন সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি

৫০.১ কেন সংস্কার হয় না: রাজনৈতিক প্রণোদনার কাঠামো

বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনে পুরুষবিরোধী বিধানগুলো কেন পরিবর্তন হচ্ছে না? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে রাজনৈতিক অর্থনীতির কাঠামো বুঝতে হবে।

প্রথমত, নারী ভোটারদের সংখ্যা বিবেচনায় নারীপন্থী অবস্থান নেওয়া রাজনৈতিকভাবে লাভজনক। যেকোনো রাজনৈতিক দল যদি পুরুষের আইনি অধিকারের পক্ষে কথা বলে, তাহলে তাকে "নারীবিরোধী" বলে চিহ্নিত করা হবে। এই রাজনৈতিক ঝুঁকি সব রাজনৈতিক দলকে এই বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য করে।

দ্বিতীয়ত, নারী অধিকার সংগঠনগুলো সংঘবদ্ধ এবং প্রভাবশালী। এই সংগঠনগুলো আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সহায়তা পায়, গণমাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে এবং নীতিনির্ধারকদের কাছে প্রবেশাধিকার রাখে। অন্যদিকে, পুরুষের আইনি অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো সংখ্যায় কম, সম্পদে দুর্বল এবং সামাজিকভাবে কম স্বীকৃত।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলো এবং দাতা দেশগুলো নারী অধিকার উন্নয়নের বিষয়ে অর্থায়ন করে, কিন্তু পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়ে কম মনোযোগ দেয়। এই আন্তর্জাতিক অর্থায়নের কাঠামো স্থানীয় নীতি প্রণয়নকে প্রভাবিত করে।

৫০.২ ২০২৪ রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং সংস্কারের নতুন সম্ভাবনা

২০২৪ সালের আগস্টে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে একটি অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসেছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে এই অন্তর্বর্তী সরকার বেশ কিছু সংস্কার কমিশন গঠন করেছে।

২০২৫ সালে এই সরকার ফৌজদারি কার্যবিধি এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে কিছু সংশোধনী এনেছে। এই সংশোধনীগুলো ইতিবাচক হলেও পুরুষের ফৌজদারি আইনি অধিকারের মূল সমস্যাগুলো অপরিবর্তিত রয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকার বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন এবং সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। এই কমিশনগুলো যদি সত্যিকারের লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করে, তাহলে এটি ফৌজদারি আইনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই কমিশনগুলোর এজেন্ডায় পুরুষের ফৌজদারি আইনি অধিকারের বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে না। নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে, কিন্তু পুরুষের আইনি সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো বিশেষ কমিশন নেই।

৫০.৩ নাগরিক সমাজ এবং পুরুষ অধিকার আন্দোলনের সম্ভাবনা

বাংলাদেশে পুরুষ অধিকার আন্দোলনের সম্ভাবনা বিদ্যমান কিন্তু এখনো পরিপূর্ণভাবে বিকশিত নয়। সামাজিক মাধ্যমে পুরুষের আইনি অধিকার নিয়ে আলোচনা বাড়ছে। কিছু আইনজীবী এবং আইনি বিশেষজ্ঞ প্রকাশ্যে এই বিষয়ে কথা বলছেন।

২০২৪ সালে বাংলাদেশ জুড়ে ছাত্র আন্দোলনের ফলে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছে, সেটি একটি নতুন নাগরিক চেতনার জন্ম দিয়েছে। এই নতুন চেতনায় আইনের সামনে সকলের সমতার দাবি জায়গা পেতে পারে।

কিন্তু পুরুষ অধিকার আন্দোলনকে সফল হতে হলে কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত, এই আন্দোলনকে নারী অধিকারের বিরুদ্ধে নয়, আইনের সমতার পক্ষে হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলনকে একাডেমিক গবেষণা এবং আইনি তথ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে হবে। তৃতীয়ত, এই আন্দোলনকে নারী অধিকার আন্দোলনের সাথে সংলাপে নিযুক্ত হতে হবে, বিরোধে নয়।

অধ্যায় ৫১: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং পুরুষের ফৌজদারি আইনি অধিকার

৫১.১ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি

১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র ফৌজদারি বিচার সংক্রান্ত কয়েকটি মৌলিক অধিকার ঘোষণা করেছে। ঘোষণাপত্রের ৭ অনুচ্ছেদ বলে যে সকলে আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং বৈষম্য ছাড়া সমান আইনি সুরক্ষার অধিকারী। ১১ অনুচ্ছেদ বলে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ।

বাংলাদেশ এই ঘোষণাপত্র অনুমোদন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনে এই আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য কতটুকু রয়েছে? ঘোষণাপত্রের ৭ অনুচ্ছেদের সাথে বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের প্রয়োগ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, কারণ এই আইনের প্রয়োগে সমতা নিশ্চিত হচ্ছে না।

৫১.২ ICCPR এবং বাংলাদেশের দায়বদ্ধতা

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি (ICCPR) এ বাংলাদেশ ২০০০ সালে অনুস্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির ১৪ অনুচ্ছেদ ফৌজদারি বিচারে ন্যায়বিচারের সুনির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করেছে।

ICCPR এর ১৪(২) অনুচ্ছেদ "presumption of innocence" কে আন্তর্জাতিক আইনগত নিশ্চয়তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৪(৩)(ঙ) ধারা বলে যে অভিযুক্ত ব্যক্তির তার বিরুদ্ধে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধিকার আছে। ১৪(৬) ধারা বলে যে যদি কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার পরে প্রমাণিত হয় যে সে নির্দোষ ছিল, তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

বাংলাদেশে এই ICCPR বাধ্যবাধকতাগুলো পূরণের প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়েছে। বিশেষত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় "presumption of innocence" এর বাস্তব প্রয়োগ, মিথ্যা মামলার পরে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এবং বিচারপূর্ব আটক নিয়ন্ত্রণে ICCPR মান মেনে চলা হচ্ছে কিনা সেটা প্রশ্নবিদ্ধ।

৫১.৩ CEDAW এবং তার একতরফা প্রয়োগের সমস্যা

নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত কনভেনশন (CEDAW) বাংলাদেশে ১৯৮৪ সালে অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে। এই কনভেনশন নারীর অধিকার রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো।

কিন্তু CEDAW বাস্তবায়নে বাংলাদেশে একটি অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। CEDAW এর অধীনে দায়বদ্ধতা পূরণের নামে এমন আইন তৈরি হয়েছে যা শুধু নারীকেই সুরক্ষা দেয় এবং পুরুষকে স্বাভাবিক অপরাধী হিসেবে চিত্রিত করে। এটি CEDAW এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

CEDAW কমিটি নিজেই বলেছে যে প্রকৃত লিঙ্গ সমতার জন্য শুধু নারীর অধিকার নয়, পুরুষের লিঙ্গ-ভূমিকাও পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটি বাংলাদেশের নীতিপ্রণয়নে অনুপস্থিত।

অধ্যায় ৫২: ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় পুরুষের প্রতিনিধিত্ব এবং প্রবেশাধিকার

৫২.১ আইনি সহায়তা ব্যবস্থা এবং পুরুষের অপর্যাপ্ত প্রবেশাধিকার

বাংলাদেশে জাতীয় আইনি সহায়তা সংস্থা (NLASO) সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করে। এই সংস্থার লক্ষ্যমাত্রায় নারী একটি অগ্রাধিকার গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। এটি ন্যায়সঙ্গত কারণ অনেক নারী আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আইনি সহায়তা পান না।

কিন্তু যে পুরুষ আর্থিকভাবে দুর্বল এবং মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন, তার জন্যও বিনামূল্যে আইনি সহায়তা একটি জরুরি প্রয়োজন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে অভিযুক্ত একজন গরিব পুরুষ যদি আইনজীবী নিয়োগ করতে না পারেন, তাহলে তার পক্ষে কার্যকরভাবে আত্মরক্ষা করা প্রায় অসম্ভব।

NLASO এর কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই সংস্থার সহায়তার বড় অংশ নারী মক্কেলদের কাছে যায়। পুরুষ মক্কেলরা তুলনামূলকভাবে কম মনোযোগ পান। এই অসামঞ্জস্য ন্যায়বিচারের প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে লিঙ্গ-বৈষম্য তৈরি করে।

৫২.২ আইনজীবীর সংকট এবং পুরুষ মক্কেলের সমস্যা

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের আইন পেশায় একটি পরিস্থিতি দেখা যায়: নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় বাদীপক্ষের (নারী) জন্য আইনজীবী পাওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ। অনেক আইনজীবী এবং সংগঠন বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে নারী ভিকটিমদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

কিন্তু পুরুষ আসামির জন্য আইনজীবী পাওয়া এবং যথাযথ আইনি প্রতিনিধিত্ব পাওয়া অনেক বেশি ব্যয়বহুল। যে পুরুষ আর্থিকভাবে দুর্বল তার জন্য একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ করা কঠিন।

এই অসামঞ্জস্য ফৌজদারি বিচারের ফলাফলকে প্রভাবিত করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে মামলায় পেশাদার আইনজীবী থাকলে সফলতার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পুরুষ আসামির ক্ষেত্রে কার্যকর আত্মরক্ষার সুযোগ সীমিত।

৫২.৩ বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা এবং পুরুষের উপর প্রভাব

বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচারে দীর্ঘসূত্রিতা একটি সুপরিচিত সমস্যা। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে মামলাগুলো বিশেষ ট্রাইব্যুনালে পরিচালিত হলেও এই ট্রাইব্যুনালেও মামলা বছরের পর বছর ঝুলে থাকে।

বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা পুরুষ আসামির জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন পুরুষকে চাকরি, পরিবার এবং সামাজিক মর্যাদার সংকটে থাকতে হয়। যদি বিচারপূর্ব আটক থাকে, তাহলে সেই কষ্ট আরও বেশি।

২০২৫ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধনী বিচারের সময়সীমা কমানোর চেষ্টা করেছে। নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় তদন্তের সময় ৩০ থেকে ১৫ দিনে এবং অভিযোগ দাখিল থেকে বিচার সম্পন্নের সময় ১৮০ থেকে ৯০ দিনে কমানো হয়েছে। এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ, কিন্তু বাস্তবে এই সময়সীমা মানা হয় কিনা সেটা দেখার বিষয়।

অধ্যায় ৫৩: পুলিশ-পুরুষ সম্পর্ক: প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাতের বাস্তব চিত্র

৫৩.১ পুলিশ সংস্কৃতি এবং পুরুষ অভিযুক্তের প্রতি আচরণ

বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক সংস্কৃতিতে পুরুষ আসামির প্রতি একটি পূর্বনির্ধারিত মনোভাব রয়েছে। এই মনোভাব আংশিকভাবে পুলিশ প্রশিক্ষণের ফল এবং আংশিকভাবে সমাজের ব্যাপক সাংস্কৃতিক ধারণার প্রতিফলন।

পুলিশ প্রশিক্ষণে নারী নির্যাতন মামলায় নারীর প্রতি সংবেদনশীল আচরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এটি সঠিক এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু একই প্রশিক্ষণে পুরুষ আসামির আইনি অধিকার রক্ষার উপরও জোর দেওয়া উচিত। "নির্দোষিতার অনুমান" নীতিটি শুধু তাত্ত্বিক ক্লাসে পড়ানো হলে চলবে না, তদন্ত এবং গ্রেফতার প্রক্রিয়ায় তার বাস্তব প্রয়োগও নিশ্চিত করতে হবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

থানায় পুরুষ আসামির সাথে আচরণ সংক্রান্ত অনেক অভিযোগ পাওয়া যায়। শারীরিক নির্যাতন, মানসিক চাপ প্রদান এবং স্বীকারোক্তি আদায়ে জোরজবরদস্তির অভিযোগ বাংলাদেশ পুলিশের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান। এই সমস্যাটি লিঙ্গ-নির্দিষ্ট নয়, কিন্তু পুরুষ আসামিরাই এই নির্যাতনের প্রধান শিকার কারণ তারাই বেশি গ্রেফতার হন।

৫৩.২ পুলিশ সংস্কার ২০২৫ এবং পুরুষের অধিকারের দৃষ্টিকোণ

২০২৫ সালে বাংলাদেশ পুলিশ সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। এই কমিশন পুলিশ বাহিনীর সংস্কার বিষয়ে সুপারিশ তৈরি করছে।

পুলিশ সংস্কারের আলোচনায় পুরুষ আসামির অধিকারের বিষয়টি যথেষ্ট মনোযোগ পাচ্ছে না। সংস্কার আলোচনার প্রধান বিষয়গুলো হলো পুলিশের জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা এবং দুর্নীতি দমন। এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু লিঙ্গ-নিরপেক্ষ তদন্ত এবং গ্রেফতার প্রক্রিয়ার বিষয়টিও সংস্কার এজেন্ডায় থাকা দরকার।

ফৌজদারি কার্যবিধি ২০২৫ সংশোধনীতে গ্রেফতারের সময় কিছু নতুন সুরক্ষামূলক বিধান যুক্ত হয়েছে। গ্রেফতারের ১২ ঘন্টার মধ্যে আইনজীবীর সাথে যোগাযোগের সুযোগ দেওয়ার বিধানটি ইতিবাচক। কিন্তু এই বিধান বাস্তবে কতটুকু মানা হবে সেটা একটি বড় প্রশ্ন।

৫৩.৩ থানায় পুরুষ অভিযোগকারীর সমস্যা

একজন পুরুষ যখন থানায় যান, তখন তার অভিজ্ঞতা একটি নারী অভিযোগকারীর অভিজ্ঞতার চেয়ে মৌলিকভাবে ভিন্ন। এই পার্থক্যটি বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়।

প্রথমত, থানায় নারীর জন্য বিশেষ ডেস্ক এবং পরিবেশ আছে, পুরুষের জন্য নেই। দ্বিতীয়ত, পুলিশ কর্মকর্তারা নারী অভিযোগকারীর বিষয়ে বেশি মনোযোগী এবং পুরুষ অভিযোগকারীর বিষয়ে কম উৎসাহী। তৃতীয়ত, একজন পুরুষ যখন তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ করতে যান, তখন পুলিশ অনেক সময় তাকে "পারিবারিক বিষয়ে" সমঝোতা করতে বলেন এবং মামলা নিতে অস্বীকার করেন।

এই সমস্যা সমাধানে পুলিশ প্রশিক্ষণে লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার উপর বিশেষ জোর দিতে হবে এবং পুরুষ অভিযোগকারীর জন্যও সঠিকভাবে অভিযোগ নেওয়ার পদ্ধতিমালা তৈরি করতে হবে।

অধ্যায় ৫৪: ফৌজদারি আইনে পুরুষ অধিকার রক্ষার একটি সংস্কার এজেন্ডা

৫৪.১ অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন: আইনি সংশোধনী

বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনে পুরুষের অধিকার রক্ষার জন্য কিছু অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন চিহ্নিত করা যায়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

প্রথমত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ সংশোধন করে ধর্ষণের ভিকটিমের সংজ্ঞাকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ করতে হবে। বর্তমান সংশোধনী যেখানে শুধু ষোলো বছরের কম বয়সী পুরুষ শিশুকে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে, সেটি অপর্যাপ্ত। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষও যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারেন এবং তাদের জন্য সমান আইনি সুরক্ষা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ সংশোধন করে পুরুষকেও "নির্যাতিত ব্যক্তি" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এই পরিবর্তন শ্রীলঙ্কা, যুক্তরাজ্য এবং অন্য অনেক দেশ ইতোমধ্যে করেছে।

তৃতীয়ত, দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা সংশোধন বা বাতিল করতে হবে। ভারত ২০১৮ সালে এই কাজ করেছে। বাংলাদেশও এই পদক্ষেপ নিতে পারে।

চতুর্থত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় স্বয়ংক্রিয় গ্রেফতারের প্রবণতা বন্ধ করতে বিচারিক নির্দেশিকা প্রয়োজন। প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয়তা পৃথকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

পঞ্চমত, মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২১১ ধারার প্রয়োগ কার্যকর করতে হবে এবং ক্ষতিপূরণের বিধান শক্তিশালী করতে হবে।

৫৪.২ মধ্যমেয়াদী সংস্কার: প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন

মধ্যমেয়াদী সংস্কারের জন্য কিছু প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন প্রয়োজন।

প্রথমত, পুলিশ প্রশিক্ষণে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ তদন্ত এবং গ্রেফতার পদ্ধতির উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। "নির্দোষিতার অনুমান" নীতির বাস্তব প্রয়োগ প্রশিক্ষণের একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের জন্য লিঙ্গ-পক্ষপাত বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে। বিচারকদের জানতে হবে কীভাবে তাদের নিজস্ব পক্ষপাত বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে।

তৃতীয়ত, জাতীয় আইনি সহায়তা সংস্থার কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় আর্থিকভাবে অসচ্ছল পুরুষ আসামিদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

চতুর্থত, পুরুষ নির্যাতন ভিকটিমের জন্য হেল্পলাইন এবং আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এই সুবিধাগুলো এখন শুধুমাত্র নারীর জন্য বিদ্যমান।

৫৪.৩ দীর্ঘমেয়াদী সংস্কার: সাংস্কৃতিক এবং দার্শনিক পরিবর্তন

দীর্ঘমেয়াদী সংস্কারের জন্য শুধু আইন পরিবর্তন যথেষ্ট নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও দরকার।

প্রথমত, আইনি শিক্ষায় লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বিচারের ধারণাকে কেন্দ্রীয় স্থান দিতে হবে। আইন বিভাগে পুরুষের ফৌজদারি আইনি অধিকার নিয়ে পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

দ্বিতীয়ত, গণমাধ্যমে পুরুষ অভিযুক্তের বিষয়ে রিপোর্টিং নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে। অভিযোগকৃত অপরাধের জন্য বিচারের আগে কোনো ব্যক্তিকে অপরাধী হিসেবে চিত্রিত করা সংবাদনীতির লঙ্ঘন।

তৃতীয়ত, বিদ্যালয় পর্যায় থেকে আইনের সামনে সমতার ধারণা এবং "নির্দোষিতার অনুমান" নীতি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

চতুর্থত, পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। "পুরুষ কাঁদে না" এই সামাজিক বার্তাটি পুরুষকে তার কষ্ট প্রকাশ করতে বাধা দেয় এবং এই বাধা ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ায় পুরুষকে অসুবিধায় ফেলে।

অধ্যায় ৫৫: ফৌজদারি আইনে পুরুষ অধিকারের ভবিষ্যৎ: একটি দর্শনগত দৃষ্টিভঙ্গি

৫৫.১ "Equal Justice Under Law": একটি পুনর্নির্মাণের প্রয়াস

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের ভবনে খোদাই করা "Equal Justice Under Law" বাক্যাংশটি বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচারের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই ধারণাটি বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনে পুরুষের অধিকারের প্রশ্নেও প্রাসঙ্গিক।

"Equal Justice Under Law" এর অর্থ কি শুধু নারীর ন্যায়বিচার? না। এর অর্থ হলো প্রতিটি ব্যক্তি, তার লিঙ্গ নির্বিশেষে, আইনের সামনে সমান সুরক্ষা পাবেন। এই নীতি বাংলাদেশের সংবিধানেও রয়েছে। কিন্তু বাস্তব ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় এই নীতি পুরোপুরি কার্যকর নয়।

পুনর্নির্মাণের প্রয়াসে আমাদের ফৌজদারি আইনকে আবার তার মূল দার্শনিক ভিত্তিতে ফিরিয়ে নিতে হবে: অপরাধী কে তা নির্ধারণ হবে তার কর্মের ভিত্তিতে, তার লিঙ্গের ভিত্তিতে নয়। ভিকটিম কে তা নির্ধারণ হবে তার ক্ষতির ভিত্তিতে, তার লিঙ্গের ভিত্তিতে নয়। শাস্তি নির্ধারণ হবে অপরাধের গুরুত্বের ভিত্তিতে, অপরাধীর লিঙ্গের ভিত্তিতে নয়।

৫৫.২ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ফৌজদারি আইনের দিকে: একটি পথনির্দেশ

লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ফৌজদারি আইনের দিকে যাওয়ার পথে কিছু মৌলিক নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

প্রথম নীতি হলো "universality" বা সার্বজনীনতা। যেকোনো ফৌজদারি আইনের বিধান এমন হওয়া উচিত যা সকল লিঙ্গের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য। যদি কোনো অপরাধ সংজ্ঞায়িত করা হয়, তাহলে যেকোনো লিঙ্গ সেই অপরাধ করতে পারে এবং যেকোনো লিঙ্গ সেই অপরাধের ভিকটিম হতে পারে।

দ্বিতীয় নীতি হলো "proportionality" বা সামঞ্জস্যপূর্ণতা। শাস্তির পরিমাণ অপরাধের গুরুত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত, অপরাধীর লিঙ্গের সাথে নয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

তৃতীয় নীতি হলো "due process" বা যথাযথ প্রক্রিয়া। প্রতিটি অভিযুক্ত ব্যক্তি, তার লিঙ্গ নির্বিশেষে, বিচারে নির্দোষিতার অনুমান, আত্মরক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ এবং নিরপেক্ষ বিচারের অধিকার পাবেন।

চতুর্থ নীতি হলো "victim-centeredness" বা ভিকটিম-কেন্দ্রিকতা। ফৌজদারি আইনে ভিকটিমের স্বার্থ সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে, কিন্তু ভিকটিমের লিঙ্গ নয়। যেকোনো ব্যক্তি ভিকটিম হতে পারেন।

পঞ্চম নীতি হলো "accountability" বা জবাবদিহিতা। আইন যখন মিথ্যাভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখন সেই মিথ্যা প্রয়োগের জন্য কার্যকর জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫৫.৩ একটি ন্যায়বিচারের দর্শন: উভয় লিঙ্গের জন্য সমান মর্যাদা

সত্যিকারের ন্যায়বিচারের দর্শন হলো প্রতিটি মানুষকে তার নিজস্ব মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে স্বীকৃতি দেওয়া। এই মর্যাদা কোনো ব্যক্তির লিঙ্গের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার মানবিক সত্তার উপর।

জন রলসের "veil of ignorance" তত্ত্বটি এখানে আবার উল্লেখযোগ্য। রলস বলেছিলেন যে ন্যায্য আইন হলো এমন আইন যা আপনি তৈরি করবেন না জেনে যে আপনি কোন লিঙ্গে জন্মাবেন। বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনকে এই মানদণ্ডে পরীক্ষা করলে অনেক বিধান টিকবে না।

অ্যামার্ত্য সেনের "capability approach" বা সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, ফৌজদারি ন্যায়বিচারের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রতিটি ব্যক্তির তার পূর্ণ সম্ভাবনায় বিকশিত হওয়ার সক্ষমতা রক্ষা করা। যখন একজন নির্দোষ পুরুষ মিথ্যা মামলায় কারাগারে যান, তখন তার এই সক্ষমতা ধ্বংস হয়। সেন এর মানদণ্ডে বাংলাদেশের ফৌজদারি আইন এই সক্ষমতা রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মার্থা নাসবাউম তার "fragility of goodness" বা ভালোত্বের ভঙ্গুরতার ধারণায় বলেছেন যে ন্যায়বিচারের জন্য প্রতিটি মানুষের দুর্বলতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। পুরুষও দুর্বল হতে পারেন, পুরুষও ভিকটিম হতে পারেন, পুরুষও মানসিক কষ্ট পান। এই দুর্বলতার স্বীকৃতি ছাড়া প্রকৃত ন্যায়বিচার সম্ভব নয়।

পঞ্চম খণ্ডের উপসংহার: ফৌজদারি ন্যায়বিচার এবং পুরুষের মর্যাদা

পঞ্চম খণ্ডে আমরা বাংলাদেশের ফৌজদারি আইন ব্যবস্থায় পুরুষবিরোধী কাঠামোর একটি ব্যাপক এবং গভীর বিশ্লেষণ করেছি। এই বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি কেন্দ্রীয় উপসংহার বের হয়ে আসে।

প্রথম উপসংহার হলো বাংলাদেশের ফৌজদারি আইন কাঠামোয় পুরুষবিরোধী পক্ষপাত বহুস্তরীয় এবং ব্যাপক। এটি শুধু একটি বা দুটি আইনের সমস্যা নয়, এটি আইনের ভাষা, আইনের প্রয়োগ, বিচারিক সংস্কৃতি, পুলিশ সংস্কৃতি এবং সামাজিক মনোভঙ্গির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি ব্যাপক কাঠামো।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

দ্বিতীয় উপসংহার হলো ২০২৫ সালের সংস্কারগুলো ইতিবাচক প্রবণতা দেখাচ্ছে, কিন্তু মূল সমস্যাগুলো অসমাধিত রয়ে গেছে। ধর্ষণের সংজ্ঞায় আংশিক লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা, ফৌজদারি কার্যবিধিতে গ্রেফতার সুরক্ষা বিধান, বিচারের সময়সীমা সংকোচন: এগুলো ইতিবাচক। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যৌন নির্যাতন ভিকটিম, পুরুষ গার্হস্থ্য নির্যাতন ভিকটিম, মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিকার: এগুলো এখনো উপেক্ষিত।

তৃতীয় উপসংহার হলো ফৌজদারি আইনে পুরুষের সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করা নারী অধিকারের বিরোধিতা নয়। বরং এটি সত্যিকারের ন্যায়বিচারের দাবি। যে আইনি ব্যবস্থায় উভয় লিঙ্গের ন্যায্য বিচার নিশ্চিত হবে, সেখানে সকলের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে।

চতুর্থ উপসংহার হলো আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেখায় যে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ফৌজদারি আইন তৈরি করা সম্ভব। ভারত, শ্রীলঙ্কা, যুক্তরাজ্য এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ শিক্ষা নিতে পারে।

পঞ্চম উপসংহার হলো ফৌজদারি আইনে সংস্কার শুধু আইনগত বিষয় নয়, এটি মানবিক মর্যাদার প্রশ্ন। প্রতিটি পুরুষ, তার সামাজিক মর্যাদা বা অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে, ফৌজদারি আইনের সামনে নির্দোষিতার অনুমানের অধিকারী। এই অধিকার কেড়ে নেওয়া মানে তার মানবিক মর্যাদাকেই অস্বীকার করা।

ষষ্ঠ উপসংহার হলো এই সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি, বিচারিক সংবেদনশীলতা এবং সামাজিক সচেতনতার সমন্বয়। বাংলাদেশের ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে যদি সত্যিকারের লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, তাহলে বাংলাদেশ একটি আরও ন্যায্য এবং মানবিক সমাজে পরিণত হবে।

আলবার্ট কামুর বিখ্যাত উক্তি ছিল: "Justice cannot be built on injustice." ন্যায়বিচার অন্যায়ের উপর নির্মিত হতে পারে না। যতদিন বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনে পুরুষের প্রতি অন্যায্য বিধান বলবৎ থাকবে, ততদিন পুরো বিচার ব্যবস্থাটি একটি খুঁতযুক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকবে। সেই ভিত্তিকে সংস্কার করাই সত্যিকারের ন্যায়বিচারের পথ।

পরিশিষ্ট ক: ফৌজদারি আইনে পুরুষবিরোধী ধারাসমূহের সারণি

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ৩৭৫-৩৭৬ ধর্ষণ সংক্রান্ত: অপরাধী সবসময় পুরুষ এবং ভিকটিম সবসময় নারী। পুরুষ বিশ্লেষণ: প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ভিকটিম স্বীকৃত নয়, ২০২৫ সংশোধনীতে আংশিক পরিবর্তন।

দণ্ডবিধির ধারা ৪৯৭ ব্যভিচার সংক্রান্ত: শুধু পুরুষ অপরাধী হতে পারেন। পুরুষ বিশ্লেষণ: সামন্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, ভারতে ২০১৮ সালে বাতিল, বাংলাদেশে এখনো বলবৎ।

দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৭ অপ্রাকৃতিক অপরাধ সংক্রান্ত: মূলত পুরুষের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। পুরুষ বিশ্লেষণ: স্বায়ত্তশাসনের লঙ্ঘন, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় সংস্কৃত, বাংলাদেশে অপরিবর্তিত।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ৯ ধর্ষণ শাস্তি সংক্রান্ত: প্রমাণের বোঝা আসামির উপর। পুরুষ বিশ্লেষণ: "presumption of innocence" এর লঙ্ঘন, ২০২৫ সংশোধনীতে আংশিক পরিবর্তন।

গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন ২০১০ এর নির্যাতিত ব্যক্তির সংজ্ঞা: শুধু নারী। পুরুষ বিশ্লেষণ: পুরুষ গার্হস্থ্য নির্যাতন ভিকটিম স্বীকৃত নয়, আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সংশোধন প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট খ: পুরুষ আসামির আইনি অধিকারের চেকলিস্ট

গ্রেফতারের সময় যা করা উচিত: গ্রেফতারকারী পুলিশের পরিচয় এবং ওয়ারেন্টের বিষয়ে জানার অধিকার রয়েছে। গ্রেফতারের কারণ জানার অধিকার রয়েছে। ১২ ঘন্টার মধ্যে আইনজীবীর সাথে যোগাযোগের অধিকার রয়েছে। পরিবারকে গ্রেফতারের বিষয়ে জানানোর অধিকার রয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় যা মনে রাখতে হবে: স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা যাবে না। আইনজীবীর অনুপস্থিতিতে দেওয়া স্বীকারোক্তি অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে অগ্রহণযোগ্য। শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার রয়েছে।

জামিনের বিষয়ে যা জানা দরকার: জামিন অস্বীকৃত হলে উচ্চতর আদালতে আপিল করার অধিকার রয়েছে। জামিনের শর্ত অন্যায্য হলে তা চ্যালেঞ্জ করার অধিকার রয়েছে। জামিন পাওয়ার পরেও মামলা চলতে থাকে, তাই আইনজীবীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন।

বিচার প্রক্রিয়ায় যা মনে রাখতে হবে: প্রতিটি অভিযোগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের অধিকার রয়েছে। বাদীপক্ষের সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার রয়েছে। রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার রয়েছে। মিথ্যা মামলার বিষয়ে প্রতিকার চাওয়ার অধিকার রয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড সম্পন্ন হলো। ষষ্ঠ খণ্ডে পুরুষ নির্যাতনের আইনি স্বীকৃতির অভাব, পুরুষ হিংসার সামাজিক বাস্তবতা, এবং পুরুষ নির্যাতন প্রতিরোধে আইনি সংস্কারের রোডম্যাপ বিশদভাবে আলোচিত হবে। সেই খণ্ডে আমরা দেখব কীভাবে সমাজ পুরুষ ভিকটিমের অভিজ্ঞতাকে নিরন্তর অদৃশ্য করে দেয় এবং কীভাবে আইন এই অদৃশ্যতার সহযোগী হয়ে ওঠে।

ষষ্ঠ খণ্ড

পুরুষ নির্যাতনের আইনি অদৃশ্যতা: স্বীকৃতির সংকট, সামাজিক বাস্তবতা এবং সংস্কারের রোডম্যাপ

ষষ্ঠ খণ্ডের ভূমিকা: যে কষ্টের নাম নেই

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থায় একটি গভীর এবং কাঠামোগত অন্ধত্ব বিদ্যমান। এই অন্ধত্ব হলো পুরুষ ভিকটিমের প্রতি আইনের দৃষ্টিহীনতা। যে পুরুষ তার স্ত্রীর হাতে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন, যে স্বামী মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যার কথা ভাবেন, যে পিতা সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটান, যে পুত্র তার নিজের পরিবারের কাছ থেকে অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হন, সেই পুরুষদের কষ্টের কথা বলার কোনো আইনি ভাষা বাংলাদেশে নেই। এই কষ্টের কোনো সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই, কোনো বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা নেই, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই।

এই পরিস্থিতিকে আইনতাত্ত্বিক ভাষায় "legal invisibility" বা আইনি অদৃশ্যতা বলা হয়। কোনো একটি সামাজিক গোষ্ঠীর যন্ত্রণা, বঞ্চনা বা নিপীড়ন যখন আইনের ভাষায় স্বীকৃত হয় না এবং যখন সেই গোষ্ঠীর সদস্যরা আইনি প্রতিকার পাওয়ার প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকেন, তখন বলা হয় যে সেই গোষ্ঠীটি আইনগতভাবে অদৃশ্য। বাংলাদেশে পুরুষ ভিকটিমরা এই অদৃশ্যতার শিকার।

এই ষষ্ঠ খণ্ডে আমরা এই আইনি অদৃশ্যতাকে তার সমস্ত গভীরতা এবং জটিলতায় বিশ্লেষণ করব। আমরা দেখব কীভাবে বাংলাদেশের গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ পুরুষ ভিকটিমকে সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করেনি এবং কীভাবে এই আইনি বাদ দেওয়া একটি কাঠামোগত বৈষম্যের প্রতিফলন। আমরা বিশ্লেষণ করব পুরুষ যৌন নির্যাতনের সামাজিক বাস্তবতা এবং আইনি স্বীকৃতির ঐতিহাসিক বিবর্তন। আমরা খুঁজে দেখব পুরুষ নির্যাতনের মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাব, সামাজিক কলঙ্কের সংস্কৃতি এবং প্রতিকার ব্যবস্থার শূন্যতা। এই সমস্ত বিশ্লেষণকে আমরা আইনের দর্শন, তুলনামূলক আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামোর আলোয় মূল্যায়ন করব।

এই খণ্ডের কেন্দ্রীয় যুক্তি হলো: পুরুষ নির্যাতনের আইনি অদৃশ্যতা শুধু একটি আইনি ত্রুটি নয়, এটি একটি দার্শনিক সংকট। এই সংকটের মূলে রয়েছে মানবিক মর্যাদার একটি খণ্ডিত ধারণা, যেখানে কষ্ট পাওয়ার যোগ্যতা লিঙ্গ দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই খণ্ডিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা এবং একটি সম্পূর্ণ, লিঙ্গ-অন্তর্ভুক্তিমূলক আইনি কাঠামো নির্মাণের দাবি তোলাই এই খণ্ডের মূল লক্ষ্য।

অধ্যায় ৫৬: গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০: একটি বিস্তারিত আইনতাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদ

৫৬.১ আইনের জন্মবৃত্তান্ত এবং বিধিবদ্ধ উদ্দেশ্য

গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ বাংলাদেশের আইনি ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত। এই আইন পাসের আগে বাংলাদেশে গার্হস্থ্য সহিংসতার কোনো বিশেষ আইনি কাঠামো ছিল না। নারীরা যদি ঘরের ভেতরে নির্যাতনের শিকার হতেন, তাহলে তাদের সাধারণ দণ্ডবিধির ধারায় মামলা করতে হত, যা অত্যন্ত জটিল এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এই আইন সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছে এবং গার্হস্থ্য সহিংসতাকে একটি পৃথক আইনি বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

আইনটির প্রস্তাবনা অংশে বলা হয়েছে যে এই আইনের উদ্দেশ্য হলো পরিবারের ভেতরে সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা দেওয়া। এই উদ্দেশ্যটি অত্যন্ত মহৎ এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু প্রস্তাবনার মহৎ উদ্দেশ্য এবং আইনের মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি গভীর ফাটল রয়েছে।

আইনটির ৩ ধারায় গার্হস্থ্য সহিংসতার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সংজ্ঞা অনুযায়ী গার্হস্থ্য সহিংসতা বলতে পরিবারের কোনো সদস্যের দ্বারা পরিবারের কোনো নারী বা শিশু সদস্যের প্রতি শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন বা অর্থনৈতিক নির্যাতন বোঝানো হয়। এই সংজ্ঞায় একটি মৌলিক সমস্যা রয়েছে: ভিকটিম হিসেবে শুধু নারী এবং শিশুর কথা বলা হয়েছে, পুরুষের কথা নেই।

এই আইনি সংজ্ঞার পরিণতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবে যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর হাতে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন এবং তিনি আদালতে প্রতিকার চাইতে যান, তাহলে এই আইনের আওতায় তিনি কোনো প্রতিকার পাবেন না। কারণ আইনের ভাষায় তিনি ভিকটিম নন। তাকে সাধারণ দণ্ডবিধির অধীনে মামলা করতে হবে, যা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অনেক বেশি জটিল প্রক্রিয়া।

এই সংজ্ঞাগত সীমাবদ্ধতা কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটি একটি সচেতন আইনি পছন্দের ফলাফল। কিন্তু এই পছন্দের সাংবিধানিক ও আইনতাত্ত্বিক ন্যায্যতা কতটুকু সেটাই এই অধ্যায়ের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন।

৫৬.২ সংজ্ঞার আইনতাত্ত্বিক সমস্যা: ভিকটিম হওয়ার অধিকার এবং লিঙ্গ

আইনের সংজ্ঞায় ভিকটিমকে কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গে সীমাবদ্ধ করা একটি মৌলিক আইনতাত্ত্বিক সমস্যা তৈরি করে। এই সমস্যাটি বুঝতে হলে আমাদের আইনতত্ত্বের কয়েকটি মূল ধারণার দিকে নজর দিতে হবে।

হার্বার্ট হার্টের আইনতত্ত্বে প্রাথমিক নিয়ম এবং মাধ্যমিক নিয়মের যে বিভাজন রয়েছে, সেখানে প্রাথমিক নিয়ম বলতে বোঝানো হয় সেই নিয়মগুলো যা মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অধিকার ও বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করে। গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের সংজ্ঞাটি একটি প্রাথমিক নিয়ম যা নির্ধারণ করে কে ভিকটিম হতে পারবেন। যখন এই নিয়ম পুরুষকে বাদ দেয়, তখন সে আইনতাত্ত্বিক অর্থে বলা যায় যে বাংলাদেশের আইন পুরুষের ভিকটিম হওয়ার সম্ভাবনাকে আইনিভাবে বাতিল করে দিয়েছে।

এই আইনি বাতিল ঘোষণা কতটা বাস্তবসম্মত? বাস্তব পরিসংখ্যান এই আইনের অনুমানের বিরোধিতা করে। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালেই অন্তত পাঁচশো পুরুষ নারীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়ে আইনি সহায়তার জন্য তাদের কাছে এসেছিলেন। বাংলাদেশ মেনস রাইটস ফাউন্ডেশনের ২০২০ সালের জরিপে দেখা গেছে যে শতকরা আশি ভাগ বিবাহিত পুরুষ তাদের স্ত্রী বা শ্বশুরবাড়ির লোকজনের দ্বারা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এই তথ্যগুলো প্রশ্ন তোলে: যে পরিমাণ পুরুষ নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, তাদের কষ্টকে কি আইন উপেক্ষা করতে পারে?

ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক কিমবার্লি ক্রেনশ ইন্টারসেকশনালিটি তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে আইনের সংজ্ঞা যখন কাউকে বাদ দেয়, তখন সেই বাদ দেওয়াটা নিরীহ নয়, এটা একটা ক্ষমতার কাজ। গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের সংজ্ঞায় পুরুষকে বাদ দেওয়া একটি ক্ষমতার কাজ যার মাধ্যমে রাষ্ট্র বলছে যে পুরুষের কষ্ট কম গুরুত্বপূর্ণ অথবা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই বাদ দেওয়ার একটি গুরুতর নৈতিক সমস্যা আছে। ইমানুয়েল কান্টের নৈতিকতার মৌলিক নীতি হলো, মানুষকে কখনো শুধু উপায় হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়, সবসময় লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু যখন রাষ্ট্রের আইন পুরুষ ভিকটিমের কষ্টকে স্বীকৃতি দেয় না, তখন সেই পুরুষকে কার্যত একটি পরিসংখ্যানে পরিণত করা হয়, একটি বিমূর্ত "পুরুষ" গোষ্ঠীর প্রতিনিধিতে, তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত কষ্ট এবং মর্যাদায় নয়।

৫৬.৩ আইনের ৪ ধারা এবং সুরক্ষার প্রকার: পুরুষের বাইরে থাকা

গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের ৪ ধারায় সুরক্ষার ধরন নির্ধারিত হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী একজন ভিকটিম সুরক্ষা আদেশ, আবাস আদেশ, ক্ষতিপূরণ আদেশ এবং হেফাজত আদেশ পাওয়ার যোগ্য। এই প্রতিটি সুরক্ষার ব্যবস্থাটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয়।

কিন্তু যেহেতু আইনের সংজ্ঞায় পুরুষ ভিকটিম নয়, তাই একজন পুরুষ এই সুরক্ষার কোনোটিই পাওয়ার যোগ্য নন। যদি একজন স্বামী তার স্ত্রীর দ্বারা নির্যাতিত হন এবং আদালত থেকে একটি সুরক্ষা আদেশ চান যাতে স্ত্রী আর তার নিকটে আসতে না পারেন, তাহলে এই আইনের অধীনে সেই আদেশ পাওয়া সম্ভব নয়। যদি একজন পিতা তার নিজের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হন, তাহলে এই আইনের অধীনে তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ আদেশ পাওয়ার বিধান নেই।

এই আইনি শূন্যতার ব্যবহারিক পরিণতিগুলো অত্যন্ত গুরুতর। প্রথমত, নির্যাতিত পুরুষরা প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত থাকেন এবং একাকী তাদের যন্ত্রণা বহন করতে বাধ্য হন। দ্বিতীয়ত, এই আইনি বাদ দেওয়া সামাজিক কলঙ্কের বিদ্যমান সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করে, কারণ সমাজ ধরে নেয় যে পুরুষ ভিকটিম হতে পারে না যেহেতু আইনও তা স্বীকার করে না। তৃতীয়ত, নির্যাতনকারী নারীরা নিশ্চিন্তে নির্যাতন চালিয়ে যেতে পারেন কারণ তারা জানেন যে তাদের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনে কোনো মামলা হবে না।

এই পরিস্থিতি একটি আইনি বিপরীত প্রণোদনা তৈরি করে। সুষ্ঠু আইন এমন হওয়া উচিত যা সহিংসতাকে নিরুৎসাহিত করে এবং ভিকটিমকে সুরক্ষা দেয়। কিন্তু যে আইন কিছু ভিকটিমকে স্বীকৃতি দেয় এবং কিছু ভিকটিমকে দেয় না, সেই আইন সহিংসতার একটি নির্দিষ্ট রূপকে কার্যত আইনি দায়মুক্তি দেয়। নারী কর্তৃক পুরুষের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য সহিংসতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইন এই দায়মুক্তি প্রদান করছে।

৫৬.৪ তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি: বিশ্বে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের বিবর্তন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ গার্হস্থ্য সহিংসতার বিধানগুলো কীভাবে তৈরি করেছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ বাংলাদেশের আইনের সীমাবদ্ধতাকে আরও স্পষ্ট করে।

যুক্তরাজ্যে গার্হস্থ্য সহিংসতার সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। ব্রিটিশ হোম অফিসের সংজ্ঞা অনুযায়ী, গার্হস্থ্য সহিংসতা হলো "যেকোনো ধরনের ঘনিষ্ঠ অংশীদার বা পরিবারের সদস্যের মধ্যে ঘটা নিয়ন্ত্রণমূলক, জোরপূর্বক বা হুমকিদায়ক আচরণ, সহিংসতা বা নির্যাতন" এবং এখানে ১৬ বছরের বেশি বয়সী যেকোনো ব্যক্তি ভিকটিম হতে পারেন, লিঙ্গ নির্বিশেষে। যুক্তরাজ্যে ২০২১ সালের কোহার্সিভ কন্ট্রোল আইন সংশোধনীতে গার্হস্থ্য নির্যাতনের ক্ষেত্রে পুরুষ ভিকটিমের সমান আইনি স্বীকৃতি আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অস্ট্রেলিয়ার ফ্যামিলি ল অ্যাক্টেও লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। স্পেনে ২০০৪ সালে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা আইন প্রণীত হলেও পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সেটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ট্রান্সজেন্ডার ভিকটিমদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনও লিঙ্গ-নিরপেক্ষ।

এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোতেও পরিবর্তন আসছে। ভারতে গার্হস্থ্য সহিংসতা থেকে নারীর সুরক্ষা আইন ২০০৫ মূলত নারীর জন্য, কিন্তু ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একাধিক রায়ে পুরুষ ভিকটিমের অধিকারের বিষয়ে মন্তব্য করেছে এবং ভারতের আইন কমিশন পুরুষ ভিকটিমের জন্য আলাদা সংস্থান সুপারিশ করেছে। শ্রীলঙ্কায় ২০০৫ সালের গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ আইন পুরুষকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

ফিলিপাইনে ২০০৪ সালের অ্যান্টি-ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট উইমেন অ্যান্ড দেয়ার চিলড্রেন অ্যাক্ট শুধু নারীর জন্য হলেও, ২০২৫ সালে ফিলিপাইনের কংগ্রেসে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সহিংসতা বিরোধী বিল আলোচনায় এসেছে।

এই আন্তর্জাতিক চিত্রের সাথে বাংলাদেশের তুলনা করলে দেখা যায় যে বাংলাদেশ গার্হস্থ্য সহিংসতার আইনি কাঠামোয় উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে রয়েছে। ২০২৫-২০২৬ সালে যখন বিশ্বের অনেক দেশ তাদের গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করছে, তখন বাংলাদেশের আইন পুরুষ ভিকটিমকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলছে।

৫৬.৫ বাংলাদেশের আইন কমিশন এবং সংস্কারের সুপারিশ: প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতা

বাংলাদেশের আইন কমিশন সময়ে সময়ে বিভিন্ন আইনের সংস্কারের সুপারিশ করেছে। কিন্তু গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের লিঙ্গ-পক্ষপাত বিষয়ে আইন কমিশন এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক সুপারিশ করেনি। এই নীরবতা নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে।

২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার বেশ কয়েকটি আইন সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ২০২৫ সালের মার্চ মাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়েছে যেখানে কিশোর পুরুষকে ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন এখনো সংশোধিত হয়নি।

এই সংস্কারের অভাবের পেছনে কয়েকটি রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন সংশোধনের দাবি করলে নারী সংগঠনগুলো তার বিরোধিতা করতে পারে এবং এটা রাজনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, পুরুষ অধিকারের বিষয়টি এখনো বাংলাদেশে রাজনৈতিক এজেন্ডায় স্থান পায়নি। তৃতীয়ত, যে সংস্কার তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সুবিধা দেয় না, সেই সংস্কারে রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি কম থাকে।

কিন্তু আইনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংস্কারের বিষয়টি অবহেলার সুযোগ নেই। রাষ্ট্রের আইন যদি কোনো নাগরিকের যন্ত্রণাকে স্বীকৃতি না দেয়, তাহলে সেই রাষ্ট্র তার মৌলিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

অধ্যায় ৫৭: পুরুষ যৌন নির্যাতন: আইনি স্বীকৃতির ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং বর্তমান অবস্থা

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৫৭.১ যৌন নির্যাতনের ঐতিহাসিক আইনি সংজ্ঞা এবং পুরুষের বাইরে থাকা

ধর্ষণের আইনি সংজ্ঞার ইতিহাস হলো পুরুষকে অপরাধী এবং নারীকে ভিকটিম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার ইতিহাস। ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারায় ধর্ষণকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল এমনভাবে যে ধর্ষক সবসময় পুরুষ এবং ধর্ষিতা সবসময় নারী। এই সংজ্ঞাটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইনের একটি উত্তরাধিকার, যা ভিক্টোরিয়ান যুগের লিঙ্গ-ভূমিকার ধারণা থেকে প্রভাবিত ছিল। সেই যুগে পুরুষকে যৌন আগ্রাসী এবং নারীকে যৌন শিকার হিসেবে বোঝা হত।

এই সংজ্ঞার সমস্যাটি কেবল আইনগত নয়, এটি মনোবৈজ্ঞানিকভাবেও ক্ষতিকর। যখন আইন নির্ধারণ করে দেয় যে পুরুষ ধর্ষণের ভিকটিম হতে পারে না, তখন পুরুষ যৌন নির্যাতন ভিকটিমরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে বোঝার জন্য ভাষার অভাবে পড়েন। তারা জানেন তাদের সাথে কিছু একটা ভয়ানক ঘটেছে, কিন্তু সমাজ এবং আইন বলে যে তাদের সাথে যা ঘটেছে সেটা "ধর্ষণ" হতে পারে না কারণ ধর্ষক পুরুষ এবং ভিকটিমও পুরুষ। এই ভাষার অভাব নির্যাতিত পুরুষদের মানসিক আঘাত প্রক্রিয়া করতে বাধা দেয়।

মনোবিশ্লেষক জুডিথ হারম্যান তাঁর "Trauma and Recovery" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ট্রমা প্রক্রিয়াকরণে স্বীকৃতি একটি মৌলিক পদক্ষেপ। যখন সমাজ বা আইন কোনো নির্যাতনের অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দেয় না, তখন ভিকটিমের পুনরুদ্ধার অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে পুরুষ যৌন নির্যাতন ভিকটিমরা এই স্বীকৃতির অভাবে ভুগছেন।

৫৭.২ ২০২৫ সালের অধ্যাদেশ সংশোধনী: একটি আংশিক প্রগতি এবং তার সীমা

২০২৫ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী এনেছে। এই সংশোধনীতে "বলাৎকার" শব্দটিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং কিশোর পুরুষকে যৌন নির্যাতনের ভিকটিম হিসেবে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই পরিবর্তনটি ১৫০ বছরের বেশি সময় পরে পুরুষ যৌন ভিকটিমের প্রতি আইনের প্রথম সুস্পষ্ট স্বীকৃতি।

ঢাকা ল রিভিউতে প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী সারা হোসেন এই সংশোধনীর তাৎপর্য এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে পেনাইল-ভ্যাজাইনাল অনুপ্রবেশের সংকীর্ণ সংজ্ঞার বাইরে গিয়ে যৌন সহিংসতার ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ভিকটিম এখনো এই সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত নয়।

এই আংশিক স্বীকৃতির সমস্যাটি বোঝা যায় যখন আমরা প্রশ্ন করি: কেন শুধু ষোলো বছরের কম বয়সী পুরুষই যৌন সহিংসতার ভিকটিম হতে পারবেন? কেন সতেরো বছর বা আঠারো বছরের পুরুষ, বা ত্রিশ বা পঞ্চাশ বছরের পুরুষ যৌন সহিংসতার আইনি স্বীকৃতি পাবেন না? বয়সের এই সীমারেখাটি কোন যুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে?

আইনতাত্ত্বিকভাবে এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে বয়সের সীমারেখা ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত কারণ শিশু বিশেষভাবে দুর্বল এবং সম্মতি দিতে অক্ষম। কিন্তু যখন প্রশ্ন হয় যৌন নির্যাতনের শিকার কে হতে পারেন,

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

তখন বয়সের সীমারেখা টানা অযৌক্তিক। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষও যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারেন এবং তার কষ্ট কোনো শিশুর কষ্টের চেয়ে কম বাস্তব নয়।

৫৭.৩ পুরুষ যৌন নির্যাতনের বৈশ্বিক স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশের অবস্থান

বিশ্বব্যাপী পুরুষ যৌন নির্যাতনের স্বীকৃতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২১ সালের প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়েছে যে পুরুষরাও যৌন নির্যাতনের শিকার হন এবং এই বাস্তবতাকে আইনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের ২০২৪ সালের একটি প্রতিবেদনে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ যৌন সহিংসতা আইনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন ২০১২ সালে ধর্ষণের সংজ্ঞা পরিবর্তন করে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ করেছে। যুক্তরাজ্যে ২০০৩ সালের যৌন অপরাধ আইনে পুরুষ ধর্ষণের শিকার হিসেবে স্বীকৃত। কানাডায় ১৯৮৩ সালেই ধর্ষণের লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছে। জার্মানিতে ২০১৬ সালের যৌন নির্ধারণ আইনে যেকোনো লিঙ্গের ভিকটিমকে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারতে ২০১৩ সালের বিচারিক কমিশনের (জাস্টিস ভার্মা কমিশন) প্রতিবেদনে যৌন সহিংসতার লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সংজ্ঞা সুপারিশ করা হয়েছিল, যদিও সংসদ শেষ পর্যন্ত এটি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেনি। নেপালে ২০২০ সালের আইন সংশোধনে পুরুষ যৌন সহিংসতা ভিকটিমকে আংশিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

এই আন্তর্জাতিক প্রবণতার আলোকে বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া। ২০২৫ সালের আংশিক সংশোধনী একটি শুরু, কিন্তু এটি যথেষ্ট নয়।

৫৭.৪ পুরুষ যৌন নির্যাতনের মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাব এবং আইনি স্বীকৃতির সম্পর্ক

মনোবিজ্ঞান গবেষণা দেখায় যে পুরুষ যৌন নির্যাতন ভিকটিমদের মানসিক আঘাত নারী ভিকটিমদের মতোই গুরুতর। পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, বিষণ্নতা, উদ্বেগ, পদার্থ আসক্তি এবং সুইসাইডাল আইডিয়েশন পুরুষ ভিকটিমদের মধ্যেও একই হারে দেখা যায়। কিন্তু পুরুষ ভিকটিমরা সাহায্য চাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম কারণ সামাজিক কলঙ্ক এবং আইনি স্বীকৃতির অভাব।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী পুরুষরা নারীর তুলনায় আত্মহত্যায় মৃত্যুর হার অনেক বেশি। বাংলাদেশে পুরুষ আত্মহত্যার হার নারীর দ্বিগুণেরও বেশি। এই আত্মহত্যার পেছনে পারিবারিক বিরোধ, নির্যাতন এবং আইনি বৈষম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে পুরুষ আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধানে পারিবারিক নির্যাতন এবং আইনি বৈষম্যের বিষয়টি সাধারণত উপেক্ষিত থাকে।

মার্কিন মনোবিজ্ঞানী মার্টিন সেলিগম্যানের "learned helplessness" বা অর্জিত অসহায়ত্বের তত্ত্ব এখানে প্রাসঙ্গিক। যখন একজন পুরুষ নির্যাতনের শিকার হন এবং দেখেন যে আইন তাকে সুরক্ষা দিচ্ছে না, তখন তার মধ্যে একটি অসহায়ত্বের মনোভাব তৈরি হয়। এই অসহায়ত্ব তাকে সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত রাখে এবং বিষণ্নতার দিকে ঠেলে দেয়। আইনের স্বীকৃতি এই চক্র ভাঙতে পারে, কিন্তু স্বীকৃতির অভাব এই চক্রকে আরও গভীর করে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ৫৮: পুরুষ গার্হস্থ্য নির্যাতনের সামাজিক বাস্তবতা এবং কলঙ্কের সংস্কৃতি

৫৮.১ "পুরুষ কাঁদে না": সামাজিক নির্মাণ এবং আইনি প্রভাব

বাংলাদেশের সামাজিক সংস্কৃতিতে পুরুষত্বের একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে যা পুরুষকে শক্তিশালী, দৃঢ় এবং কষ্ট প্রকাশে অনিচ্ছুক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। "পুরুষ মানুষ কাঁদে না", "পুরুষ মানুষ এত দুর্বল হয় না", "স্বামী হয়ে বউকে মারতে পারলে না?" এই ধরনের সামাজিক বার্তাগুলো পুরুষকে তার নির্যাতনের কথা প্রকাশ করতে বাধা দেয়।

এই সামাজিক নির্মাণটি আইনের সাথে একটি দুষ্টচক্র তৈরি করে। সমাজ বলে পুরুষ ভিকটিম হয় না, তাই আইনও পুরুষ ভিকটিমকে স্বীকৃতি দেয় না। আবার আইন যেহেতু পুরুষ ভিকটিমকে স্বীকৃতি দেয় না, তাই সমাজ আরও বেশি করে বিশ্বাস করে যে পুরুষ ভিকটিম হয় না। এই চক্রের মধ্যে নির্যাতিত পুরুষ একা এবং অরক্ষিত।

সমাজবিজ্ঞানী আর ডব্লিউ কনেলের "hegemonic masculinity" বা আধিপত্যশীল পুরুষত্বের তত্ত্ব এই সামাজিক নির্মাণকে ব্যাখ্যা করে। কনেল দেখিয়েছেন যে সমাজ পুরুষত্বের একটি আদর্শ রূপ নির্মাণ করে যা পুরুষকে শক্তিশালী, আধিপত্যশীল এবং আত্মনির্ভর হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। এই আদর্শ পুরুষত্বের ছাঁচে না পড়া পুরুষরা সামাজিক কলঙ্কের শিকার হন।

যে পুরুষ তার স্ত্রীর দ্বারা নির্যাতিত হন এবং এই কথা স্বীকার করেন, তিনি এই আদর্শ পুরুষত্বের ছাঁচের বাইরে চলে যান। তাকে সমাজ "দুর্বল পুরুষ", "ঘরজামাই", "বউয়ের ভয়ে থাকা পুরুষ" হিসেবে উপহাস করে। এই উপহাসের ভয়ে নির্যাতিত পুরুষরা চুপ থাকেন এবং একা যন্ত্রণা ভোগ করেন।

বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় এই কলঙ্কের মাত্রা আরও বেশি। শহরের তুলনায় গ্রামে পুরুষত্বের আদর্শ আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। গ্রামের একজন পুরুষ যদি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ করেন, তাহলে তিনি শুধু উপহাসের শিকার হন না, তার সামাজিক মর্যাদাও ক্ষুণ্ন হয়, গ্রামে তার "মান" থাকে না।

৫৮.২ পুরুষ নির্যাতনের ধরন এবং তার আইনি অস্বীকৃতি

পুরুষ গার্হস্থ্য নির্যাতন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং প্রতিটি ধরনের নির্যাতনের ক্ষেত্রে আইনি প্রতিকারের অভাব রয়েছে।

শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে, একজন স্ত্রী যদি তার স্বামীকে শারীরিকভাবে আঘাত করেন, তাহলে স্বামী সাধারণ দণ্ডবিধির অধীনে মামলা করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে পুলিশ এই ধরনের মামলা নিতে অনিচ্ছুক। থানায় গেলে পুলিশ বলে "পারিবারিক বিষয়, ঘরে ফিরে যান", "বউয়ের বিরুদ্ধে মামলা করলে লোকে হাসবে", "আদালতে টিকবে না"। এই প্রাতিষ্ঠানিক অনিচ্ছা নির্যাতিত পুরুষকে প্রতিকারহীন করে রাখে।

মানসিক নির্যাতন পুরুষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাধারণ এবং বিশেষভাবে অদৃশ্য। বাংলাদেশ মেনস রাইটস ফাউন্ডেশনের জরিপে দেখা গেছে যে শতকরা আশি ভাগ বিবাহিত পুরুষ মানসিক নির্যাতনের শিকার। এই

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

মানসিক নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে: ক্রমাগত অপমান করা, পুরুষের পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে নিন্দা করা, পুরুষের পেশাগত ব্যর্থতাকে ব্যঙ্গ করা, সন্তানকে পুরুষের বিরুদ্ধে লাগানো, পুরুষকে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা এবং ক্রমাগত হুমকি দেওয়া।

কিন্তু গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন ২০১০ যেহেতু পুরুষকে ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না, তাই এই মানসিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোনো আইনি প্রতিকার নেই। সাধারণ দণ্ডবিধিতে মানসিক নির্যাতনের জন্য আলাদা ধারা নেই এবং অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের ধারাগুলো মানসিক নির্যাতনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

অর্থনৈতিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও জটিল। একজন নারী যদি তার স্বামীর সম্পদ জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করেন, তার আয় আত্মসাৎ করেন, তার ব্যবসা বা চাকরিতে বাধা সৃষ্টি করেন, তাহলে এটা একটা ধরনের গার্হস্থ্য অর্থনৈতিক নির্যাতন। কিন্তু গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনে এই ধরনের নির্যাতনের শিকার হিসেবে পুরুষ স্বীকৃত নয়।

যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে বৈবাহিক ধর্ষণ বাংলাদেশে এখনো আইনত অপরাধ নয়। দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারার ব্যতিক্রম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে একজন পুরুষ তার নিজের স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে ধর্ষণ বলা হবে না। এই বিধানটি মূলত স্ত্রীকে বৈবাহিক ধর্ষণ থেকে সুরক্ষা দেয় না, কিন্তু একই সময়ে একজন স্বামীও যদি যৌন নির্যাতনের শিকার হন তার স্ত্রীর দ্বারা, তাহলে তার জন্যও কোনো আইনি প্রতিকার নেই।

৫৮.৩ পুরুষ ভিকটিমের নীরবতার কারণ বিশ্লেষণ

গবেষণা দেখায় যে পুরুষ ভিকটিমরা নির্যাতনের কথা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নারী ভিকটিমদের তুলনায় অনেক বেশি নিরুৎসাহিত হন। এই নীরবতার কারণগুলো বহুমাত্রিক।

প্রথম কারণ হলো লজ্জা ও কলঙ্কের ভয়। বাংলাদেশের সামাজিক পরিবেশে একজন পুরুষ যদি স্বীকার করেন যে তিনি তার স্ত্রীর হাতে নির্যাতিত হয়েছেন, তাহলে তার পুরুষত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়। সমাজ তাকে "দুর্বল" বা "মেয়েলি" বলে চিহ্নিত করতে পারে। এই লজ্জার ভয় পুরুষকে নীরব রাখে।

দ্বিতীয় কারণ হলো প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্যের অভাব। পুরুষ ভিকটিমের জন্য কোনো আশ্রয় কেন্দ্র নেই, কোনো হেল্পলাইন নেই, কোনো বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা নেই। যখন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নেই, তখন সাহায্য চাওয়ার প্রণোদনাও কম।

তৃতীয় কারণ হলো আইনি প্রতিকারের অনিশ্চয়তা। থানায় গেলে পুলিশ সাহায্য করবে কিনা অনিশ্চিত। আদালতে গেলে মামলা টিকবে কিনা অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তা পুরুষকে প্রতিকার চাওয়া থেকে বিরত রাখে।

চতুর্থ কারণ হলো সন্তানের হেফাজত হারানোর ভয়। যদি পুরুষ তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং পারিবারিক বিরোধ সামনে আসে, তাহলে আদালতে সন্তানের হেফাজত পাওয়া তার জন্য আরও কঠিন হয়ে পড়তে পারে। এই কারণে অনেক নির্যাতিত পুরুষ সন্তানের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য নির্যাতন সহ্য করে যান।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পঞ্চম কারণ হলো পাল্টা মামলার ভয়। বাংলাদেশে একটি পরিচিত পরিস্থিতি হলো, যখন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করার চিন্তা করেন, তখন স্ত্রী তার আগেই যৌতুক বা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে পাল্টা মামলা করেন। এই পাল্টা মামলার হুমকি পুরুষকে নীরব করে রাখে।

৫৮.৪ "ভিকটিম কার্ড" এবং পারস্পরিক নির্যাতনের জটিলতা

সামাজিক বিজ্ঞানে "ভিকটিম কার্ড" বলতে বোঝানো হয় যখন কোনো ব্যক্তি বাস্তব বা কাল্পনিক ভিকটিমের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে সুবিধা অর্জনের চেষ্টা করেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের ভিকটিম কার্ড ব্যবহারের বিষয়টি একটি জটিল সামাজিক ঘটনা।

এটি স্বীকার করা দরকার যে বাস্তব নির্যাতনের শিকার নারীরাও রয়েছেন, যাদের সংখ্যা এবং কষ্ট উপেক্ষণীয় নয়। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা একটি গুরুতর সমস্যা এবং এই সমস্যার বিরুদ্ধে আইনি সুরক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু একই সাথে এটাও স্বীকার করতে হবে যে আইনি সুরক্ষার অপব্যবহারও ঘটছে।

পারস্পরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। যখন একটি দম্পতির মধ্যে উভয়ই পরস্পরকে নির্যাতন করেন, তখন কে ভিকটিম এবং কে নির্যাতনকারী এই প্রশ্নটির একটি সহজ উত্তর নেই। এই ধরনের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের আইন শুধু নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতি দেখে এবং পুরুষকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্যাতনকারী হিসেবে চিহ্নিত করে।

মনোবিজ্ঞানী মাইকেল জনসন "intimate partner terrorism" এবং "situational couple violence" এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। "intimate partner terrorism" হলো এমন নির্যাতন যেখানে একজন ব্যক্তি পদ্ধতিগতভাবে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্যজনকে নিয়ন্ত্রণ করে। "situational couple violence" হলো এমন সহিংসতা যেখানে উভয়ই কখনো কখনো হিংসাত্মক আচরণ করে। জনসনের গবেষণায় দেখা গেছে যে "intimate partner terrorism" এর মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষই নির্যাতনকারী, কিন্তু "situational couple violence" এর ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ প্রায় সমান হারে অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশের আইন এই পার্থক্যটি করে না। প্রতিটি মামলায় আইন ধরে নেয় যে পুরুষ "intimate partner terrorism" এর নির্যাতনকারী এবং নারী ভিকটিম। এই সরলীকরণ আইনকে বাস্তবের বহু পরিস্থিতিতে অকার্যকর করে তোলে।

৫৮.৫ মিডিয়া এবং পুরুষ নির্যাতনের উপস্থাপনা: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে পুরুষ নির্যাতনের বিষয়টি অত্যন্ত কম মনোযোগ পায়। যখন নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে, তখন তা বড় শিরোনামে আসে, আলোচনা হয়, সামাজিক আন্দোলন তৈরি হয়। কিন্তু পুরুষ নির্যাতনের ঘটনা প্রায় কখনোই গণমাধ্যমে স্থান পায় না।

এই মিডিয়া বৈষম্য একটি ব্যাপক সামাজিক বয়ান তৈরি করে যেখানে পুরুষ সবসময় নির্যাতনকারী এবং নারী সবসময় ভিকটিম। এই বয়ানটি আইন প্রণয়নকে প্রভাবিত করে, বিচারকদের মনোভাবকে প্রভাবিত করে এবং পুলিশের আচরণকে প্রভাবিত করে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

মিডিয়া সমাজবিজ্ঞানী স্টুয়ার্ট হলের "encoding/decoding" তত্ত্ব অনুযায়ী, মিডিয়া শুধু ঘটনা প্রতিবেদন করে না, এটি বাস্তবতাকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোয় উপস্থাপন করে। যখন মিডিয়া পুরুষকে সবসময় নির্যাতনকারী হিসেবে উপস্থাপন করে, তখন এটি একটি সামাজিক বাস্তবতা নির্মাণ করে যা পুরুষ ভিকটিমের অভিজ্ঞতাকে অদৃশ্য করে দেয়।

বাংলাদেশের টেলিভিশন নাটক, চলচ্চিত্র এবং সংবাদ মাধ্যমে পুরুষ চরিত্রগুলো প্রায়ই হয় নির্যাতনকারী নয়তো অসহায় কমেডিয়ান হিসেবে উপস্থাপিত হয়। একজন পুরুষ যিনি তার স্ত্রীর দ্বারা গুরুত্বের সাথে নির্যাতিত হচ্ছেন, এই বাস্তবতাটি বাংলাদেশের মিডিয়ায় প্রায় অনুপস্থিত।

অধ্যায় ৫৯: পুরুষ নির্যাতন এবং ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি: একটি গভীর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

৫৯.১ "ভিকটিম সংস্কৃতি" এর উদ্ভব এবং আইনি পরিণতি

সমাজবিজ্ঞানী ব্র্যাডলি ক্যাম্পবেল এবং জেসন ম্যানিং তাদের "The Rise of Victimhood Culture" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে আধুনিক সমাজে একটি "ভিকটিম সংস্কৃতি" উদ্ভব হয়েছে যেখানে ভিকটিমের পরিচয় একটি নৈতিক এবং সামাজিক মূলধনে পরিণত হয়েছে। এই সংস্কৃতিতে ভিকটিম হওয়ার দাবি সামাজিক সহানুভূতি, আইনি সুরক্ষা এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা প্রদান করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ভিকটিম সংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গীয় রূপ নিয়েছে। নারীর ভিকটিমের পরিচয় সামাজিকভাবে স্বীকৃত এবং আইনিভাবে সুরক্ষিত। একজন নারী যদি নিজেকে ভিকটিম হিসেবে উপস্থাপন করেন, তাহলে তিনি তাৎক্ষণিক সামাজিক সহানুভূতি পান, পুলিশ তার অভিযোগ নেয়, আদালত তার কথাকে গুরুত্ব দেয় এবং মিডিয়া তার গল্প প্রকাশ করে।

কিন্তু পুরুষের ভিকটিমের পরিচয় সামাজিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। একজন পুরুষ যদি নিজেকে ভিকটিম বলেন, তাহলে সমাজ তাকে সন্দেহের চোখে দেখে, পুলিশ তার অভিযোগ উপেক্ষা করে এবং মিডিয়া তার গল্প প্রকাশ করে না।

এই ভিকটিম পরিচয়ের অসম বণ্টন একটি কাঠামোগত অন্যায্যতা। ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে, ভিকটিম হওয়া মানুষের নিজের পছন্দ নয়, এটা তার উপর ঘটে যাওয়া একটি বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈধতা বা অবৈধতা দেওয়া আইনের মৌলিক নীতির লঙ্ঘন।

৫৯.২ মিথ্যা অভিযোগের সংস্কৃতি এবং পুরুষের উপর প্রভাব

বাংলাদেশে মিথ্যা নারী নির্যাতন মামলার একটি উদ্বেগজনক প্যাটার্ন রয়েছে। পারিবারিক বিরোধ, বিবাহবিচ্ছেদের মামলা এবং সম্পত্তির বিরোধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন বা যৌতুক নিরোধ আইনে মিথ্যা মামলা করার একটি প্রবণতা দেখা যায়।

এই মিথ্যা মামলার প্রক্রিয়াটি সাধারণত এভাবে কাজ করে: দম্পতির মধ্যে বিরোধ হয়, বিবাহবিচ্ছেদ আলোচনা শুরু হয়, নারী আইনজীবীর পরামর্শে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন, পুরুষ গ্রেফতার হন,

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

জামিন পান না বা পেলেও দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় পান, এই অবস্থায় পুরুষ মামলা তুলে নেওয়ার বিনিময়ে সম্পত্তি বা অর্থ দিতে বাধ্য হন।

এই প্রক্রিয়াটি আইনকে একটি দরকষাকষির হাতিয়ারে পরিণত করে। যে আইন ন্যায়বিচারের জন্য তৈরি হয়েছিল, সেই আইনকে মামলা দিয়ে ব্ল্যাকমেইলের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই অপব্যবহার পুরুষের প্রতি একটি নিয়মতান্ত্রিক অন্যায়।

মিথ্যা মামলার প্রকৃত সংখ্যা জানা কঠিন কারণ বাংলাদেশে এই বিষয়ে সরকারি পরিসংখ্যান নেই। কিন্তু আদালত পর্যায়ে মামলার ফলাফল দেখে একটি অনুমান করা যায়। নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালে যে মামলাগুলো বিচার পর্যন্ত যায়, তার একটি বড় অংশে আসামি খালাস পান। বিভিন্ন আইনজীবী সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী এই খালাসের হার কোনো কোনো বছরে শতকরা পঞ্চাশ থেকে সত্তর ভাগ পর্যন্ত হয়। এই উচ্চ খালাসের হার প্রমাণের দুর্বলতার কথাই বলে, যা মিথ্যা মামলার ইঙ্গিত দেয়।

৫৯.৩ পুরুষ আত্মহত্যা, পারিবারিক বিরোধ এবং আইনি বৈষম্যের সংযোগ

বাংলাদেশে পুরুষ আত্মহত্যার হার নারীর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে পুরুষ আত্মহত্যার হার নারীর প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু এই উচ্চ হারের কারণ অনুসন্ধানে পারিবারিক বিরোধ, আইনি হয়রানি এবং মিথ্যা মামলার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না।

সংবাদমাধ্যমে মাঝে মাঝে এমন ঘটনা আসে যেখানে একজন পুরুষ মিথ্যা মামলার কারণে সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত হয়ে আত্মহত্যা করেছেন, অথবা বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছেন। কিন্তু এই ঘটনাগুলো একটি বিস্তৃত প্যাটার্নের অংশ হিসেবে কখনো বিশ্লেষিত হয় না।

দার্শনিক আলবার্ট কামু মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে "the absurd" বলে চিহ্নিত করেছিলেন, যেখানে মানুষ এমন একটি পরিস্থিতির মুখে পড়ে যেখানে সে কোনো অর্থ খুঁজে পায় না। বাংলাদেশের একজন পুরুষ যিনি মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছেন, কারাগারে গেছেন, কাজ হারিয়েছেন, সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন এবং সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন, তার অবস্থা এই "absurd" এর একটি জীবন্ত উদাহরণ। আইনি সুরক্ষার অনুপস্থিতিতে এই পুরুষের কাছে অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

অধ্যায় ৬০: পুরুষ অধিকার আন্দোলন এবং তার আইনতাত্ত্বিক ভিত্তি

৬০.১ বৈশ্বিক পুরুষ অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস এবং দর্শন

পুরুষ অধিকার আন্দোলনের শিকড় ১৯৭০ এর দশকে। নারীবাদী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে নয়, বরং একটি স্বতন্ত্র আন্দোলন হিসেবে এটির শুরু। প্রথম দিকের পুরুষ অধিকার আন্দোলনকারীরা মূলত দুটি বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন: বিবাহবিচ্ছেদের পরে পিতার সন্তান হেফাজত পাওয়ার অধিকার এবং পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য ও আত্মহত্যার সমস্যা।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ওয়ারেন ফ্যারেল তার "The Myth of Male Power" গ্রন্থে পুরুষ অধিকার আন্দোলনের একটি শক্তিশালী তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করেছেন। ফ্যারেল দেখিয়েছেন যে পুরুষ যে ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করা হয়, তার একটি বড় অংশ আসলে দায়িত্ব, ঝুঁকি এবং বিপদের সাথে আসে। যুদ্ধে মরেন পুরুষ, বিপজ্জনক কাজ করেন পুরুষ, গৃহহীনতার শিকার হন পুরুষ, কারাগারে যান পুরুষ। এই বাস্তবতাগুলো "male privilege" এর সরলীকৃত বয়ানকে চ্যালেঞ্জ করে।

বর্তমানে পুরুষ অধিকার আন্দোলনের বেশ কয়েকটি ধারা রয়েছে। কিছু ধারা নারীবিরোধী মনোভাব পোষণ করে, যা সমালোচনার যোগ্য। কিন্তু মূল ধারাটি হলো আইনি সমতার দাবি, অর্থাৎ পুরুষকেও একই আইনি সুরক্ষা দেওয়ার দাবি যা নারীরা পান।

বাংলাদেশে পুরুষ অধিকার আন্দোলন এখনো শৈশব পর্যায়ে। বাংলাদেশ মেনস রাইটস ফাউন্ডেশন (BMRF) এই বিষয়ে কিছু কাজ করছে, কিন্তু তাদের সামর্থ্য সীমিত এবং রাজনৈতিক প্রভাব প্রায় শূন্য। ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরেও পুরুষ অধিকারের বিষয়টি সরকারি এজেন্ডায় অনুপস্থিত।

৬০.২ পুরুষ অধিকার আন্দোলনের আইনতাত্ত্বিক ন্যায্যতা

পুরুষ অধিকার আন্দোলনের আইনতাত্ত্বিক ন্যায্যতা মূলত সমতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ন্যায্যতার কয়েকটি স্তর রয়েছে।

প্রথম স্তর হলো সাংবিধানিক সমতা। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ এবং ২৮ অনুচ্ছেদ আইনের সামনে সমতার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হলে পুরুষকেও একই আইনি সুরক্ষা দিতে হবে যা নারীরা পান।

দ্বিতীয় স্তর হলো মানবাধিকারের সার্বজনীনতা। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের প্রথম অনুচ্ছেদ বলে যে সকল মানুষ সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই সার্বজনীনতা পুরুষকে বাদ দেয় না।

তৃতীয় স্তর হলো নৈতিক যুক্তি। মানুষের কষ্টের নৈতিক মূল্য লিঙ্গ দ্বারা নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়। একজন পুরুষের যন্ত্রণা যদি সমাজের কাছে নারীর যন্ত্রণার তুলনায় কম মূল্যবান হয়, তাহলে এটা নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য।

চতুর্থ স্তর হলো সামাজিক কার্যকারিতার যুক্তি। যে সমাজে একটি বড় জনগোষ্ঠী অর্থাৎ পুরুষরা মনে করে যে আইন তাদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট, সেই সমাজে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা কমে যায়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস পেলে সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলার ক্ষতি হয়।

৬০.৩ সমালোচনামূলক পুরুষ অধ্যয়ন এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একটি নতুন একাডেমিক ক্ষেত্র উদ্ভব হয়েছে যাকে "Critical Men's Studies" বা সমালোচনামূলক পুরুষ অধ্যয়ন বলা হয়। এই ক্ষেত্রটি পিতৃতন্ত্রের সমালোচনাকে অস্বীকার না করে পুরুষের অভিজ্ঞতার জটিলতাকেও বিশ্লেষণ করে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

সমালোচনামূলক পুরুষ অধ্যয়নের প্রধান তত্ত্ববিদদের মধ্যে মাইকেল কিমেল, জেফ হার্ন এবং কনেলের নাম উল্লেখযোগ্য। কিমেল তার "Guyland" এবং "Angry White Men" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে পুরুষের বিচ্ছিন্নতা এবং ক্রোধের অনেকটাই সামাজিক পরিস্থিতির ফল যেখানে পুরুষ একদিকে ক্ষমতাশালী হওয়ার প্রত্যাশার চাপে থাকে এবং অন্যদিকে সামাজিক ও আইনি সুরক্ষার বাইরে থাকে।

জেফ হার্ন তার বিভিন্ন গবেষণায় পুরুষত্ব এবং ক্ষমতার সম্পর্কটি জটিল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। হার্নের তত্ত্ব অনুযায়ী পুরুষত্বের বিভিন্ন রূপ রয়েছে এবং সব পুরুষ একই ধরনের ক্ষমতার অধিকারী নয়। একজন দরিদ্র গ্রামীণ পুরুষ যিনি মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছেন, তিনি "male privilege" এর কোনো সুবিধা ভোগ করছেন না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমালোচনামূলক পুরুষ অধ্যয়নের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পুরুষের অভিজ্ঞতাকে সূক্ষ্মভাবে বোঝতে সাহায্য করে এবং পিতৃতন্ত্রের সমালোচনাকে বাদ না দিয়ে পুরুষ নির্যাতনের বাস্তবতাকেও স্বীকার করে।

অধ্যায় ৬১: পুরুষ সন্তান হেফাজতের আইনি লড়াই: একটি গভীর বিশ্লেষণ

৬১.১ মুসলিম পারিবারিক আইন এবং পিতার হেফাজত অধিকার

বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক বিষয়ে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এবং মুসলিম পারিবারিক আইনের মৌলিক নীতিগুলো প্রযোজ্য। সন্তানের হেফাজতের প্রশ্নে ঐতিহ্যগত ইসলামিক আইনে মাতার হেফাজতের অধিকার (হিজানাত) এবং পিতার অভিভাবকত্বের অধিকার (ওলায়েত) এর মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে।

ঐতিহ্যগত মুসলিম আইনে মা একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত পুত্র সন্তানের হেফাজত পাবেন (সাধারণত সাত বছর) এবং কন্যা সন্তানের হেফাজত বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত পাবেন। এরপর পিতার কাছে সন্তান যাবে। কিন্তু বাস্তব আদালত অনুশীলনে এই নিয়ম প্রায়ই পরিবর্তিত হয়েছে এবং "সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থ" এর নীতিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মা হেফাজত পাচ্ছেন।

হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব পারিবারিক আইন প্রযোজ্য, যেখানে হেফাজতের নিয়মগুলো ভিন্ন। কিন্তু সার্বিকভাবে দেখলে সব ধর্মীয় সম্প্রদায়েই পিতার জন্য হেফাজত পাওয়া তুলনামূলকভাবে কঠিন।

আদালতে পিতার হেফাজতের আবেদন খারিজ হওয়ার হার উদ্বেগজনক। পরিবার আদালতের একজন বিচারকের মন্তব্য হলো যে "মায়ের সাথে থাকলে শিশু ভালো থাকবে" এই ধারণাটি বাংলাদেশের বিচারিক সংস্কৃতিতে এতটাই গেঁথে গেছে যে এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা কঠিন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

কিন্তু এই ধারণাটি কি সর্বদা সত্য? মনোবিজ্ঞান গবেষণায় দেখা গেছে যে শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য উভয় পিতামাতার সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। শুধু মায়ের সাথে থাকলে ভালো হবে এই ধারণাটি মনোবৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থিত নয়।

৬১.২ "সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থ" তত্ত্ব এবং পিতার অধিকার

বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতে সন্তানের হেফাজত নির্ধারণের প্রধান মানদণ্ড হলো "সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থ"। এই মানদণ্ডটি জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদেও রয়েছে এবং বাংলাদেশ এই সনদে স্বাক্ষরকারী।

কিন্তু "সর্বোত্তম স্বার্থ" নির্ধারণে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়? বাংলাদেশের বিচারিক অনুশীলনে দেখা যায় যে মা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই মানদণ্ডটি পূরণ করেন বলে ধরে নেওয়া হয়। পিতাকে প্রমাণ করতে হয় যে তিনিও সর্বোত্তম স্বার্থ পূরণ করতে পারবেন, কিন্তু মাকে এই প্রমাণ দিতে হয় না।

এই বিপরীত প্রমাণের বোঝা পিতার জন্য একটি কাঠামোগত অসুবিধা তৈরি করে। মনোবিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়ার্শাক তার "Divorce Poison" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে যখন শিশু একজন পিতামাতার সাথে বেশি সময় কাটায়, তখন সেই পিতামাতা শিশুর মনে অপর পিতামাতার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করার ক্ষমতা রাখেন। বাংলাদেশে যেহেতু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মা হেফাজত পান, তাই মা এই ক্ষমতাটি ব্যবহার করে পিতার সাথে শিশুর সম্পর্ক নষ্ট করতে পারেন।

"Parental alienation" বা অভিভাবক বিচ্ছিন্নতার এই সমস্যাটি বাংলাদেশের পারিবারিক আইনে স্বীকৃত নয়। যদি একজন মা তার শিশুকে পিতার বিরুদ্ধে প্রভাবিত করেন এবং পিতার সাথে সম্পর্ক নষ্ট করেন, তাহলে পিতার জন্য এর বিরুদ্ধে কোনো আইনি প্রতিকার নেই।

৬১.৩ পিতার দর্শন ও মনোবিজ্ঞান: সন্তানের জন্য পিতার ভূমিকা

পিতার সন্তানের জীবনে ভূমিকা নিয়ে মনোবিজ্ঞান গবেষণার একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার রয়েছে। মনোবিজ্ঞানী মাইকেল ল্যাম্বের বিখ্যাত সংকলন "The Role of the Father in Child Development" দেখিয়েছে যে সন্তানের মানসিক, সামাজিক এবং জ্ঞানীয় বিকাশে পিতার সক্রিয় উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাবার সাথে সম্পর্ক শিশুর মানসিক নিরাপত্তা, আত্মবিশ্বাস এবং সামাজিক দক্ষতার বিকাশে সহায়তা করে। বাবার অনুপস্থিতিতে বড় হওয়া শিশুরা তুলনামূলকভাবে বেশি মানসিক সমস্যা, শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া এবং অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে।

এই মনোবৈজ্ঞানিক বাস্তবতার আলোকে বাংলাদেশের হেফাজত নীতি পুনর্মূল্যায়ন জরুরি। যখন আদালত পিতাকে সন্তানের হেফাজত দিতে অনিচ্ছুক থাকে, তখন শুধু পিতার অধিকারই ক্ষুণ্ন হয় না, সন্তানের কল্যাণও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে, পিতার সন্তানের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি আইনের একটি প্রাথমিক প্রশ্ন। হেগেলের পারিবারিক দর্শনে পরিবার হলো নৈতিক সমাজের প্রথম ভিত্তি। পিতামাতা এবং সন্তানের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটা

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

শুধু জৈবিক নয়, এটা নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক। এই সম্পর্ককে আইন যখন ক্ষতিগ্রস্ত করে, তখন সমাজের নৈতিক ভিত্তিকেই দুর্বল করা হয়।

৬১.৪ যোগাযোগ অধিকার এবং তার বাস্তব পরিস্থিতি

বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতে যখন পিতা হেফাজত না পেলেও ন্যূনতম যোগাযোগের অধিকার পান, সেই যোগাযোগের আদেশ বাস্তবে কতটুকু কার্যকর হয় সেটা একটি বড় প্রশ্ন।

প্রায়ই দেখা যায় যে মা আদালতের যোগাযোগ আদেশ মানতে অস্বীকার করেন। পিতা নির্ধারিত সময়ে সন্তানের সাথে দেখা করতে গেলে মা নানা অজুহাতে বাধা দেন: শিশু অসুস্থ, পিতার পরিবেশে শিশু ভালো বোধ করে না, পিতা সন্তানের জন্য বিপজ্জনক ইত্যাদি। এই অভিযোগগুলো প্রায়ই ভিত্তিহীন কিন্তু আদালত প্রতিটি অভিযোগের তদন্ত করে না।

যখন পিতা আদালতের যোগাযোগ আদেশ লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তখন আদালত সাধারণত আরেকটি আদেশ দেয় এবং কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেয় না। কিন্তু যদি পিতা আদালতের কোনো আদেশ লঙ্ঘন করতেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হতে পারত। এই অসামঞ্জস্য পিতার যোগাযোগ অধিকারকে কার্যত অর্থহীন করে তোলে।

অধ্যায় ৬২: ব্যভিচার আইন, পুরুষ এবং আইনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

৬২.১ দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা: একটি সামন্তবাদী অবশেষ

বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারায় ব্যভিচারের বিধান রয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে যদি কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের স্ত্রীর সাথে সেই পুরুষের সম্মতি ছাড়া যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে সেই পুরুষ ব্যভিচারের অপরাধে দোষী। এই ধারায় একটি মৌলিক সমস্যা রয়েছে: শুধু পুরুষই ব্যভিচারকারী হতে পারেন, নারী পারেন না।

ধারাটি আরও লক্ষণীয়: যে নারী এই সম্পর্কে অংশ নিয়েছেন, তিনি ধারাটিতে "abettor" বা সহায়তাকারী হিসেবেও স্বীকৃত নন, বরং তাকে সম্পূর্ণভাবে দায়মুক্ত করা হয়েছে। আবার আরও আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, এই মামলা করার অধিকার শুধু ওই নারীর স্বামীর, নারীর নিজের নয়। অর্থাৎ এই আইন নারীকে একটি সম্পত্তি হিসেবে দেখে যার ক্ষতি হলে সম্পত্তির মালিক অর্থাৎ স্বামী ক্ষতিপূরণ চাইতে পারবেন।

এই ধারাটি ভিক্টোরিয়ান যুগের "double standard" বা দ্বৈত মানদণ্ডের একটি পরিষ্কার উদাহরণ। সেই যুগে পুরুষের যৌন স্বাধীনতা নারীর তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল, কিন্তু একই সাথে নারীকে পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে দেখা হত। এই মানসিকতা থেকে ৪৯৭ ধারার জন্ম।

ভারতে ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট এই ধারার সমতুল্য বিধানকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে। জোসেফ শাইন বনাম ভারত সংঘ মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারকের পূর্ণ পীঠ সর্বসম্মতিক্রমে রায় দিয়েছে যে

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ব্যভিচার আইন নারীর স্বায়ত্তশাসনকে ক্ষুণ্ন করে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করে। এই রায়ে আদালত বলেছে যে একটি গণতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রের দুজন সম্মতিশীল প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার নেই।

বাংলাদেশে ৪৯৭ ধারা এখনো বলবৎ। এই ধারাটি কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাজনক।

প্রথমত, এই ধারা লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক কারণ শুধু পুরুষই অপরাধী হতে পারেন। দ্বিতীয়ত, এই ধারা নারীর স্বায়ত্তশাসনকে সম্মান করে না কারণ নারী অংশীদারকে দায়মুক্ত করা হয় কিন্তু তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সত্তা হিসেবেও দেখা হয় না। তৃতীয়ত, এই ধারা নারীকে পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে দেখার প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে।

বাংলাদেশে এই ধারাটির সংস্কার বা বাতিলের দাবি আইনজীবী মহলে উঠেছে। কিন্তু রাজনৈতিক সাহস এবং সামাজিক সচেতনতার অভাবে এই সংস্কার আসছে না।

৬২.২ ব্যভিচার আইনের দার্শনিক ভিত্তি এবং আধুনিক ন্যায়বিচারের সাথে সংঘর্ষ

ব্যভিচার আইনের দার্শনিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এটি মূলত দুটি পুরনো ধারণার উপর দাঁড়িয়ে: নারীর "যৌন পবিত্রতা" (sexual purity) এবং পারিবারিক মর্যাদার সংরক্ষণ।

এই দুটি ধারণাই আধুনিক উদারনৈতিক আইনের দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক। জন স্টুয়ার্ট মিলের "harm principle" বা ক্ষতির নীতি অনুযায়ী, রাষ্ট্র শুধু তখনই কোনো আচরণকে অপরাধ ঘোষণা করতে পারে যখন সেই আচরণ অন্যের ক্ষতি করে। দুজন সম্মতিশীল প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে যৌন সম্পর্ক কি সরাসরি কারো ক্ষতি করে? এই প্রশ্নের উত্তর জটিল, কারণ সামাজিক ক্ষতির ধারণাটি সংস্কৃতি-নির্ভর।

কিন্তু মিলের নীতি প্রয়োগ করলে ব্যভিচার আইনের ন্যায্যতা দেওয়া কঠিন। বিশেষত যখন দেখা যায় যে এই আইন শুধু পুরুষকে লক্ষ্য করে এবং একই সম্পর্কে অংশীদার নারীকে দায়মুক্ত করে, তখন এই আইনের পেছনে ন্যায়বিচার নয়, লিঙ্গ-পক্ষপাত কাজ করছে বলে স্পষ্ট হয়।

অধ্যায় ৬৩: পুরুষের অর্থনৈতিক শোষণ এবং আইনি প্রতিকারের অভাব

৬৩.১ খোরপোষ আইন এবং পুরুষের একতরফা দায়িত্ব

বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক আইনে স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণের একটি পরম দায়িত্ব রয়েছে। মুসলিম আইনে "nafaqa" বা ভরণপোষণের ধারণায় স্বামীকে স্ত্রীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করতে হবে, এমনকি যদি স্ত্রী নিজেও সম্পদশালী হন।

এই বিধানটি ঐতিহাসিকভাবে একটি সময়ের প্রতিফলন যখন নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত ছিল এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বামীর উপর নির্ভর করা ছাড়া নারীর কোনো বিকল্প ছিল না। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে অনেক

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

নারীই পেশাগতভাবে সক্রিয় এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। এই পরিবর্তিত বাস্তবতার আলোকে ভরণপোষণ আইনের পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন।

কিন্তু বাংলাদেশে ভরণপোষণ আইন সংস্কারের কোনো আলোচনা নেই। একজন স্বামী যিনি হয়তো আর্থিকভাবে তার স্ত্রীর চেয়ে কম উপার্জন করেন, বা যিনি নিজেই আর্থিক সংকটে আছেন, তিনিও আইনত স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। যদি তিনি না দেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা হবে এবং সেই মামলায় তিনি প্রায় নিশ্চিতভাবে হারবেন।

এই আইনি কাঠামো একটি অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি করে যেখানে পুরুষ একতরফাভাবে আর্থিক দায়িত্ব বহন করে। তুলনামূলকভাবে দেখলে বিশ্বের অনেক দেশে এখন "spousal support" বা দম্পতি সহায়তার আইন লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। উভয় দম্পতিই অপরের আর্থিক সহায়তার জন্য মামলা করতে পারেন, যার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তাকে যার অবস্থা খারাপ তাকে সহায়তা করতে হবে, লিঙ্গ নির্বিশেষে।

৬৩.২ দেনমোহর এবং পুরুষের আর্থিক বোঝা: একটি পুনর্মূল্যায়ন

ইসলামিক বিবাহ আইনে দেনমোহর হলো একটি অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত যা স্বামী বিবাহকালে স্ত্রীকে দেন বা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। দেনমোহরের মূল উদ্দেশ্য হলো নারীকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেওয়া, বিশেষত বিবাহবিচ্ছেদের পরে।

বাংলাদেশে দেনমোহরের পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত বেশি নির্ধারণ করা হয়। পরিবারের সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য উচ্চ দেনমোহর নির্ধারণের একটি প্রবণতা দেখা যায়। এই উচ্চ দেনমোহর বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য একটি বিশাল আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন অনুযায়ী, তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী দেনমোহর পরিশোধ করতে বাধ্য। এই দেনমোহর পরিশোধ না করলে তার বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা হতে পারে। কিন্তু স্ত্রী যদি বিবাহবিচ্ছেদ চান এবং তার কারণ মিথ্যা হয়, তাহলেও পুরুষকে দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে।

এই আইনি কাঠামোয় একটি মৌলিক অন্যায্যতা রয়েছে। দেনমোহর মূলত নারীর সুরক্ষার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যটি মহৎ। কিন্তু যখন দেনমোহরের দাবিকে মিথ্যা মামলার ব্ল্যাকমেইলের সাথে ব্যবহার করা হয়, তখন এটি একটি ভিন্ন সমস্যা তৈরি করে। পুরুষকে মামলার চাপে দেনমোহর পরিশোধ করতে বাধ্য করার একটি প্যাটার্ন বাংলাদেশে বিদ্যমান যা সুষ্ঠু আইন প্রয়োগ নয়, এটা আইনের অপব্যবহার।

৬৩.৩ সম্পত্তি বিভাজন এবং পুরুষের সাংবিধানিক অধিকার

বিবাহবিচ্ছেদের পরে সম্পত্তি বিভাজনের প্রশ্নে বাংলাদেশে একটি জটিল আইনি পরিস্থিতি বিদ্যমান। মুসলিম আইনে বিবাহের সময় অর্জিত সম্পদ সাধারণত যার নামে তার থাকে। কিন্তু বিবাহকালীন অর্জিত সম্পদের "equitable distribution" বা ন্যায়সঙ্গত বিভাজনের কোনো বিধান বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক আইনে নেই।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এর পরিণতি হলো যে যদি একজন স্বামী সম্পদ অর্জনের সময় তার স্ত্রী গৃহিণী ছিলেন এবং সংসার পরিচালনা করেছেন, তাহলে বিবাহবিচ্ছেদের পরে স্ত্রীর এই অবদানের কোনো আইনি স্বীকৃতি নেই। এটা নারীর প্রতি অন্যায্য।

একইভাবে, যদি একজন স্বামী বিবাহের আগে অর্জিত সম্পত্তি বিবাহকালীন পারিবারিক কাজে ব্যবহার করেছেন, এবং বিবাহবিচ্ছেদের পরে স্ত্রী তাতে অংশ দাবি করেন, তাহলে আইনি পরিস্থিতি অস্পষ্ট এবং প্রায়ই পুরুষের বিরুদ্ধে যায়।

তুলনামূলক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে, পশ্চিমা দেশগুলোতে "marital property" বা দাম্পত্য সম্পত্তির একটি সুস্পষ্ট আইনি কাঠামো রয়েছে যেখানে বিবাহকালীন অর্জিত সম্পদ উভয় দম্পতির যৌথ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং বিবাহবিচ্ছেদের পরে ন্যায্যভাবে ভাগ করা হয়। বাংলাদেশে এই ধরনের স্পষ্ট কাঠামোর অভাব পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সমস্যা তৈরি করে, কিন্তু পুরুষের জন্য প্রায়ই বেশি সমস্যা কারণ সম্পত্তি সাধারণত পুরুষের নামে থাকে এবং বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় পুরুষকে আরও বেশি দাবির মুখে পড়তে হয়।

অধ্যায় ৬৪: পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্য, আইনি নির্যাতন এবং সুইসাইড: একটি অবহেলিত সংকট

৬৪.১ পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক চাপ

বাংলাদেশে পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য একটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত বিষয়। সামাজিক নিয়মগুলো পুরুষকে তার মানসিক কষ্ট প্রকাশ করতে নিরুৎসাহিত করে। "পুরুষ মানুষ দুর্বল হয় না", "পুরুষ মানুষ কাঁদে না" এই সামাজিক বার্তাগুলো পুরুষকে তার বিষণ্ণতা, উদ্বেগ বা মানসিক আঘাতের কথা বলতে বাধা দেয়।

এই নীরব ব্যথার পরিণতি হলো পুরুষ আত্মহত্যার উচ্চ হার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে পুরুষের আত্মহত্যার হার নারীর দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ। বাংলাদেশেও এই প্রবণতা বিদ্যমান। কিন্তু পুরুষ আত্মহত্যা প্রতিরোধে কোনো বিশেষ জাতীয় কর্মসূচি নেই।

পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর আইনি বৈষম্যের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। যখন একজন পুরুষ মিথ্যা মামলার শিকার হন, কারাগারে যান, কাজ হারান, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হন এবং সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত হন, তার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। কিন্তু এই প্রভাব কোথাও পরিমাপ করা হয় না এবং কোনো আইনি প্রতিকারও নেই।

মনোবিশ্লেষক উইনিকটের "holding environment" বা ধারণকারী পরিবেশের ধারণা এখানে প্রাসঙ্গিক। মানুষের মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য একটি নিরাপদ, সহায়ক পরিবেশ প্রয়োজন। বাংলাদেশে পুরুষের জন্য এই "holding environment" অত্যন্ত দুর্বল: সামাজিক কলঙ্ক পুরুষকে কষ্ট প্রকাশ করতে দেয় না, আইন পুরুষ ভিকটিমকে স্বীকৃতি দেয় না, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নেই।

৬৪.২ আইনি প্রক্রিয়া এবং পুরুষের মানসিক আঘাত

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

মিথ্যা মামলার শিকার একজন পুরুষের মানসিক যন্ত্রণার একটি চিত্র তুলে ধরা যাক। প্রথমে আসে গ্রেফতারের ধাক্কা: রাতের বেলা পুলিশ আসে, হাতকড়া পরানো হয়, পরিবারের সামনে অপমান হয়। তারপর থানায় হয়রানি, লকআপে রাত কাটানো। জামিন না পেলে কারাগারে মাসের পর মাস অপেক্ষা। এই সময়ে কাজ চলে যায়, সম্মান চলে যায়, সন্তান দেখতে পারেন না। চারপাশের মানুষ তাকে অপরাধী ভাবে, কারণ সমাজে "ধোঁয়া থাকলে আগুন থাকবে" এই বিশ্বাস প্রচলিত।

এই পুরো অভিজ্ঞতাটি মানসিক আঘাতের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি "complex trauma" বা জটিল ট্রমা। জুডিথ হারম্যানের ট্রমা তত্ত্ব অনুযায়ী এই ধরনের ট্রমা দীর্ঘমেয়াদী মানসিক ক্ষতি করে, যার মধ্যে রয়েছে PTSD, বিষণ্নতা, উদ্বেগ, আত্মসম্মান হ্রাস এবং মানুষের প্রতি অবিশ্বাস।

কিন্তু বাংলাদেশে মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষের জন্য কোনো মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা নেই। কোনো সরকারি কাউন্সেলিং কেন্দ্র নেই, কোনো সহায়তা গোষ্ঠী নেই, কোনো জাতীয় হেল্পলাইন নেই। এই প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতা পুরুষের মানসিক সংকটকে আরও গভীর করে।

৬৪.৩ পুরুষ আত্মহত্যার সংকট এবং আইনের দায়

বিশ্বজুড়ে পুরুষ আত্মহত্যার হার নারীর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এই বৈষম্যকে "মৃত্যুর লিঙ্গ ব্যবধান" বা "gender gap in mortality" বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২১ সালের প্রতিবেদনে এই বিষয়ে সতর্ক করেছে।

বাংলাদেশে পুরুষ আত্মহত্যার হার পরিমাপ করা কঠিন কারণ অনেক আত্মহত্যার ঘটনা সঠিকভাবে নথিভুক্ত হয় না। কিন্তু যে তথ্য পাওয়া যায় তা উদ্বেগজনক।

পারিবারিক বিরোধ এবং আইনি হয়রানি পুরুষ আত্মহত্যার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। ভারতে জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, পারিবারিক বিরোধ পুরুষ আত্মহত্যার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি। বাংলাদেশের তথ্য ভারতের মতোই হওয়ার সম্ভাবনা, যদিও সরকারিভাবে এটি পরিমাপ করা হয় না।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন হলো: যখন আইনি বৈষম্যের কারণে কোনো পুরুষ আত্মহত্যা করেন, তখন রাষ্ট্রের কোনো দায় নেই কি? হেগেলের রাষ্ট্রের দর্শনে রাষ্ট্রকে নৈতিক সত্তা হিসেবে দেখা হয় যার নিজের নাগরিকের কল্যাণের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। যে রাষ্ট্র তার কিছু নাগরিকের প্রতি এমন আইনি বৈষম্য তৈরি করে যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে এবং আত্মহত্যায় ঠেলে দেয়, সেই রাষ্ট্র তার নৈতিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ।

অধ্যায় ৬৫: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামো এবং পুরুষ অধিকার

৬৫.১ জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা

জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮ সালে গৃহীত হয়েছিল। এই ঘোষণাপত্রের প্রথম অনুচ্ছেদ বলে যে সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারের দিক থেকে সমান। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নিশ্চিত করে যে এই অধিকারগুলো লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি (ICCPR) ১৯৬৬ সালে গৃহীত হয়েছে। এই চুক্তিতে বাংলাদেশ পক্ষ। চুক্তির ২৬ অনুচ্ছেদ আইনের সামনে সমতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ করে। এই বিধানটি শুধু নারীর বৈষম্যের বিরুদ্ধে নয়, যেকোনো লিঙ্গের বিরুদ্ধে বৈষম্যের বিরুদ্ধে।

জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নির্মূল সংক্রান্ত সনদ (CEDAW) বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে। CEDAW নারীর অধিকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দলিল। কিন্তু পুরুষের অধিকারের জন্য সমতুল্য কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি নেই, এবং এটি একটি আন্তর্জাতিক আইনি ফাঁক।

তবে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি একাধিক সাধারণ মন্তব্যে স্পষ্ট করেছে যে ICCPR এর সমতার বিধানগুলো সকল লিঙ্গের জন্য প্রযোজ্য এবং পুরুষকে আইনত বৈষম্যের শিকার করা ICCPR এর লঙ্ঘন।

৬৫.২ ICCPR এর অধীনে বাংলাদেশের দায়িত্ব এবং পুরুষ অধিকার

ICCPR এর পক্ষ হিসেবে বাংলাদেশের কিছু নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক দায়িত্ব রয়েছে। এই দায়িত্বগুলোর আলোকে বাংলাদেশের বর্তমান আইনি কাঠামো পরীক্ষা করলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা উঠে আসে।

প্রথমত, ICCPR এর ২৬ অনুচ্ছেদের আলোকে গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের যে সংজ্ঞায় শুধু নারীকে ভিকটিম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্যের পরিচায়ক হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ICCPR এর ১৪ অনুচ্ছেদ ন্যায়বিচারের অধিকারের গ্যারান্টি দেয়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে পুরুষ আসামির জন্য জামিন অযোগ্যতার বিধান এবং নির্দোষিতার অনুমানের দুর্বল প্রয়োগ এই অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হতে পারে।

তৃতীয়ত, ICCPR এর ১৭ অনুচ্ছেদ গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা করে। মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হওয়া পুরুষের পরিচয় গণমাধ্যমে প্রকাশ পেলে এবং তা মিথ্যা প্রমাণিত হলেও সেই মিডিয়া রিপোর্ট মুছে ফেলার কোনো ব্যবস্থা নেই। এটি গোপনীয়তার অধিকারের লঙ্ঘন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটিতে বাংলাদেশ সরকারকে নিয়মিত প্রতিবেদন দিতে হয়। কিন্তু এই প্রতিবেদনগুলোতে পুরুষ আইনি অধিকারের বিষয়টি কখনো অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজও এই বিষয়ে কমিটিকে সতর্ক করে না।

৬৫.৩ আঞ্চলিক মানবাধিকার কাঠামো এবং পুরুষ অধিকার

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে কোনো বাধ্যতামূলক আঞ্চলিক মানবাধিকার চুক্তি নেই, যা ইউরোপীয় মানবাধিকার সনদ বা আমেরিকান মানবাধিকার সনদের মতো। এটি এশিয়ার একটি আইনি দুর্বলতা।

দক্ষিণ এশিয়া অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন (SAARC) মানবাধিকারের বিষয়ে কিছু নীতিগত দলিল তৈরি করেছে, কিন্তু সেগুলো বাধ্যতামূলক নয় এবং পুরুষ অধিকারের বিষয়ে কোনো বিশেষ বিধান নেই।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (ILO) বৈষম্য রোধে কর্মসংস্থান এবং পেশার বিষয়ক সনদে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নীতি রয়েছে। বাংলাদেশ এই সনদ অনুসমর্থন করেছে। কিন্তু মিথ্যা মামলার কারণে পুরুষের চাকরি হারানো যখন ঘটে, তখন এই আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না।

অধ্যায় ৬৬: পুরুষ নির্যাতনের আইনি স্বীকৃতির দিকে: তুলনামূলক মডেল

৬৬.১ যুক্তরাজ্যের মডেল: লিঙ্গ-অন্তর্ভুক্তিমূলক গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন

যুক্তরাজ্য লিঙ্গ-নিরপেক্ষ গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের একটি সফল মডেল। ব্রিটিশ ২০২১ সালের গার্হস্থ্য নির্যাতন আইনে গার্হস্থ্য নির্যাতনকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং ষোলো বছরের বেশি বয়সী যেকোনো ব্যক্তি ভিকটিম হতে পারেন।

যুক্তরাজ্যে পুরুষ গার্হস্থ্য নির্যাতন ভিকটিমের জন্য বিশেষ আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে, যদিও সংখ্যায় নারীর আশ্রয় কেন্দ্রের তুলনায় কম। সরকারি তথ্যে দেখা যায় যে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে প্রতি ছয়জন পুরুষের একজন জীবনে কোনো না কোনো সময় গার্হস্থ্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এই বাস্তবতার স্বীকৃতি যুক্তরাজ্যের আইন এবং সামাজিক নীতিতে রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের "coercive control" বা জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণের বিধানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০১৫ সালের আইনে মানসিক নির্যাতন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণকে গার্হস্থ্য নির্যাতনের একটি রূপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই সংজ্ঞা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য এবং যেকোনো ব্যক্তি এই আইনে মামলা করতে পারেন।

বাংলাদেশ যুক্তরাজ্যের এই মডেল থেকে শিক্ষা নিতে পারে। লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সংজ্ঞা, পুরুষ ভিকটিমের জন্য সুরক্ষা আদেশ এবং মানসিক নির্যাতনের আইনি স্বীকৃতি এই তিনটি উপাদান বাংলাদেশের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

৬৬.২ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মডেল: লিঙ্গ-সমতার সংস্কৃতি এবং আইন

নর্ডিক দেশগুলো বিশেষত সুইডেন, নরওয়ে এবং ডেনমার্ক লিঙ্গ-সমতার ক্ষেত্রে বিশ্বে অগ্রণী। এই দেশগুলোতে গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন সম্পূর্ণ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ।

সুইডেনে "partnership violence" বা দম্পতি সহিংসতার পরিসংখ্যান লিঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে সংগ্রহ করা হয়। তাদের তথ্যে দেখা যায় যে পুরুষরাও উল্লেখযোগ্য হারে গার্হস্থ্য নির্যাতনের শিকার, যদিও নারীর হার বেশি। এই তথ্য নীতি নির্ধারণে ব্যবহৃত হয় এবং পুরুষ ভিকটিমের জন্যও পর্যাপ্ত সেবা নিশ্চিত করা হয়।

নরওয়েতে পুরুষ গার্হস্থ্য নির্যাতন ভিকটিমের জন্য বিশেষ কেন্দ্র রয়েছে এবং সরকার সক্রিয়ভাবে এই বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করে। নরওয়ের "Crisis Center Secretariat" পুরুষ ভিকটিমদের বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মডেলের মূল নীতি হলো আইন এবং সামাজিক নীতি উভয়কেই লিঙ্গ-নিরপেক্ষ করতে হবে। শুধু আইন পরিবর্তন করলে হবে না, সামাজিক মনোভাবও পরিবর্তন করতে হবে যাতে পুরুষ ভিকটিম সাহায্য চাইতে নিরাপদ বোধ করেন।

বাংলাদেশের জন্য স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মডেল সরাসরি প্রযোজ্য না হলেও এর মূল দর্শন অর্থাৎ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইন এবং সামাজিক পরিবেশ নির্মাণের দিকে যাওয়া প্রয়োজন।

৬৬.৩ ভারতের অভিজ্ঞতা: সীমাবদ্ধতা এবং সাম্প্রতিক উন্নয়ন

ভারত বাংলাদেশের সবচেয়ে কাছের তুলনামূলক উদাহরণ কারণ দুই দেশের আইনি ঐতিহ্য মূলত একই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইন থেকে উদ্ভূত।

ভারতে গার্হস্থ্য সহিংসতা থেকে নারীর সুরক্ষা আইন ২০০৫ মূলত নারী-কেন্দ্রিক। কিন্তু ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন মামলায় পুরুষ অধিকারের বিষয়ে মন্তব্য করেছে। ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট থট বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া মামলায় বলেছে যে পুরুষের অধিকারও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের ৪৯৮-এ ধারার অপব্যবহারের বিষয়ে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট একাধিক রায়ে মন্তব্য করেছে। ২০১৭ সালে রাজেশ শর্মা বনাম ইউটি বিহার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে ৪৯৮-এ ধারার অধীনে তাৎক্ষণিক গ্রেফতার থেকে সতর্ক থাকতে হবে কারণ এই ধারার ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে। পরবর্তীতে এই রায় সংশোধিত হলেও পুরুষ অধিকারের প্রশ্নটি ভারতীয় আইনি বিমর্শে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ভারতে পুরুষ অধিকার সংগঠনগুলো সক্রিয় এবং তারা আইনি সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার। ভারতের জাতীয় পুরুষ কমিশন প্রতিষ্ঠার দাবিও উঠেছে, যদিও এটি এখনো কার্যকর হয়নি।

বাংলাদেশ ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারে। প্রথমত, মিথ্যা মামলা রোধে তাৎক্ষণিক গ্রেফতার থেকে সতর্কতা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, পুরুষ অধিকারের বিষয়টি উচ্চ আদালতের বিচারিক সক্রিয়তার মাধ্যমে এজেন্ডায় আনা সম্ভব।

অধ্যায় ৬৭: পুরুষ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংস্কারের রোডম্যাপ

৬৭.১ আইনি সংশোধনীর রোডম্যাপ: অগ্রাধিকার এবং পদ্ধতি

পুরুষ নির্যাতনের আইনি স্বীকৃতির দিকে যেতে হলে কয়েকটি পর্যায়ে সংস্কার প্রয়োজন। এই সংস্কারগুলোকে তাৎক্ষণিক, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

তাৎক্ষণিক সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে জরুরি হলো গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ সংশোধন করে ভিকটিমের সংজ্ঞায় পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করা। এই সংশোধনীটি আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে সহজ কারণ শুধু ধারা

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৩ এ "নারী বা শিশু" এর স্থলে "যেকোনো ব্যক্তি" ব্যবহার করলেই এই পরিবর্তন হয়। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এই সংশোধনী করতে সাহস প্রয়োজন।

তাৎক্ষণিক সংস্কারের দ্বিতীয় বিষয় হলো নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ২০২৫ সালের সংশোধনীকে আরও সম্প্রসারিত করা। বর্তমানে শুধু ষোলো বছরের কম বয়সী পুরুষ যৌন সহিংসতার ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃত। এই সীমারেখা তুলে দিয়ে যেকোনো বয়সের পুরুষকে যৌন সহিংসতার ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

তৃতীয় তাৎক্ষণিক সংস্কার হলো মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করা। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১৭ ধারায় মিথ্যা মামলার শাস্তির বিধান আছে কিন্তু তা কার্যকর নয়। এই ধারার প্রয়োগ সহজ করতে হবে এবং ক্ষতিপূরণের বিধান জোরদার করতে হবে।

মধ্যমেয়াদী সংস্কারে রয়েছে সন্তান হেফাজত আইনের সংস্কার। বর্তমান আইন এবং বিচারিক অনুশীলনে পিতার হেফাজত অধিকার দুর্বল। "সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থ" নীতিকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে এবং পিতার সক্রিয় অংশগ্রহণকে মানদণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মধ্যমেয়াদী সংস্কারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো খোরপোষ আইনের সংস্কার। বর্তমানে শুধু স্বামীই স্ত্রীকে খোরপোষ দিতে বাধ্য। এই আইনকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ করে উভয় দম্পতি তার অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে অপরের কাছ থেকে সহায়তা চাইতে পারবেন এমন বিধান করা উচিত।

দীর্ঘমেয়াদী সংস্কারে রয়েছে একটি জাতীয় পুরুষ অধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা। এই কমিশন পুরুষের আইনি সমস্যাগুলো পর্যবেক্ষণ করবে, পরামর্শ প্রদান করবে, সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করবে এবং পুরুষ নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহ করবে।

৬৭.২ বিচার বিভাগীয় সংস্কার এবং বিচারকের প্রশিক্ষণ

আইন সংশোধনের পাশাপাশি বিচার বিভাগীয় সংস্কারও প্রয়োজন। বাংলাদেশের বিচারকরা যে প্রশিক্ষণ পান, তাতে লিঙ্গ-পক্ষপাত বিষয়ক সচেতনতা অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন এবং জুডিশিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বিচারকদের জন্য লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বিচারের বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করতে হবে। এই প্রশিক্ষণে থাকবে: পুরুষ ভিকটিমের মনোবৈজ্ঞানিক বাস্তবতা, মিথ্যা মামলার প্যাটার্ন এবং সনাক্তকরণ, প্রমাণ মূল্যায়নে লিঙ্গ-পক্ষপাত থেকে মুক্ত থাকা, এবং সন্তানের হেফাজত নির্ধারণে মনোবৈজ্ঞানিক মানদণ্ড ব্যবহার।

উচ্চ আদালতের বিচারিক সক্রিয়তার মাধ্যমেও পরিবর্তন আনা সম্ভব। যদি হাইকোর্ট বিভাগ গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের পুরুষ-বর্জনকারী সংজ্ঞাকে সাংবিধানিকভাবে চ্যালেঞ্জ করা হলে তার বৈধতা পরীক্ষা করে, তাহলে আইনি পরিবর্তন দ্রুত আসতে পারে।

৬৭.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: পুরুষ ভিকটিমের জন্য সহায়তা কাঠামো

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

আইনি সংস্কারের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারও প্রয়োজন। পুরুষ ভিকটিমের জন্য নিম্নলিখিত প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা কাঠামো তৈরি করা দরকার।

প্রথমত, পুরুষ আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। যখন একজন পুরুষ গার্হস্থ্য নির্যাতনের শিকার হয়ে ঘর ছাড়তে বাধ্য হন, তখন তার জন্য যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। বর্তমানে আশ্রয় কেন্দ্র শুধু নারী এবং শিশুর জন্য। পুরুষের জন্যও অন্তত প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি করে আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার।

দ্বিতীয়ত, পুরুষ হেল্পলাইন চালু করা দরকার। বাংলাদেশে নারীদের জন্য জাতীয় হেল্পলাইন রয়েছে, কিন্তু পুরুষদের জন্য কোনো জাতীয় হেল্পলাইন নেই। পুরুষ ভিকটিমের জন্য একটি বিশেষ হেল্পলাইন চালু করা উচিত যেখানে প্রশিক্ষিত কাউন্সেলর আছেন।

তৃতীয়ত, থানায় পুরুষ ভিকটিমের জন্য বিশেষ ডেস্ক স্থাপন করতে হবে। বর্তমানে থানায় নারী সহায়তা ডেস্ক রয়েছে। পুরুষ ভিকটিমের অভিযোগ যাতে সঠিকভাবে নেওয়া হয় এবং সহানুভূতির সাথে আচরণ করা হয়, তার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে।

চতুর্থত, সরকারি আইনি সহায়তা কেন্দ্রগুলোতে পুরুষ ভিকটিমদের জন্য বিশেষ সেবার ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় আইনি সহায়তা সংস্থার বর্তমান কার্যক্রম প্রধানত নারী এবং দুর্বল শ্রেণীর মানুষের জন্য। এই কার্যক্রমে পুরুষ নির্যাতন ভিকটিমদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬৭.৪ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার: দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের পথ

আইন ও প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও প্রয়োজন। এই পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী এবং এতে বিভিন্ন স্তরে কাজ করতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন দরকার। বিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে শেখাতে হবে যে সহিংসতা ও নির্যাতন যেকোনো লিঙ্গ করতে পারে এবং যেকোনো লিঙ্গের শিকার হতে পারে। "পুরুষ কাঁদে না" এই মিথকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে।

গণমাধ্যমের দায়িত্ব রয়েছে পুরুষ নির্যাতনের বিষয়ে সঠিক এবং সহানুভূতিশীলভাবে রিপোর্ট করার। মিডিয়া পেশাদারদের জন্য লিঙ্গ-সংবেদনশীল রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার।

ধর্মীয় নেতারা সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। ইসলামিক ধর্মশাস্ত্র পুরুষের ন্যায্য আচরণের অধিকার স্বীকার করে। ধর্মীয় নেতারা এই বার্তাটি দিতে পারেন যে পুরুষ নির্যাতন একটি সামাজিক সমস্যা এবং নির্যাতিত পুরুষকে সাহায্য করা একটি ধর্মীয় দায়িত্ব।

সুশীল সমাজ এবং পুরুষ অধিকার সংগঠনগুলো আন্দোলন এবং সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে পুরুষ অধিকার সংগঠনগুলো এখনো দুর্বল। এদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের দাবিগুলোকে যৌক্তিক এবং গঠনমূলক ভাষায় উপস্থাপন করতে সহায়তা করা দরকার।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ৬৮: পুরুষ অধিকার আন্দোলনের দার্শনিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি নির্মাণ

৬৮.১ পুরুষবাদ বনাম নারীবাদ: একটি মিথ্যা দ্বন্দ্ব

বাংলাদেশে যখন পুরুষ অধিকারের কথা বলা হয়, তখন অনেকেই মনে করেন যে এটা নারীবাদের বিরোধিতা। এই ধারণাটি মৌলিকভাবে ভুল। নারীবাদ এবং পুরুষ অধিকার আন্দোলন পরস্পরবিরোধী নয়, বরং এরা একটি সাধারণ লক্ষ্য ভাগ করতে পারে: আইনের সামনে সমতা।

উদারনৈতিক নারীবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো সমতা। রুথ বেডার গিন্সবার্গ, যিনি নারী অধিকার আন্দোলনের একটি আইকন ছিলেন, তিনি বিখ্যাতভাবে বলেছিলেন যে "মহিলাদের মামলার মধ্যে সবচেয়ে ভালো মামলাগুলো হলো যেগুলোতে পুরুষকেও বৈষম্যের শিকার দেখানো হয়েছে।" গিন্সবার্গের কৌশল ছিল দেখানো যে লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইন উভয় লিঙ্গের ক্ষতি করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে যখন বাংলাদেশে পুরুষ নির্যাতনের আইনি স্বীকৃতি দাবি করা হয়, তখন এটা নারীর অধিকারকে কমানোর দাবি নয়। এটা আইনের কাঠামোকে আরও সম্পূর্ণ এবং ন্যায্য করার দাবি।

যদি কোনো নারীবাদী সংগঠন এই দাবিকে বিরোধিতা করে, তাহলে প্রশ্ন তোলা দরকার: আপনি কি সমতার নারীবাদী, নাকি শুধু নারীর সুবিধার নারীবাদী? সত্যিকারের সমতার নারীবাদ সকল মানুষের সমান অধিকারের জন্য লড়াই করে, শুধু নারীর জন্য নয়।

৬৮.২ বামপন্থী এবং উদারনৈতিক রাজনীতিতে পুরুষ অধিকার

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বর্ণালীতে পুরুষ অধিকারের বিষয়টি কোনো জায়গায় স্থান পায় না। বামপন্থী দলগুলো মূলত নারী অধিকার এবং শ্রমিক অধিকারের উপর মনোযোগী। উদারনৈতিক দলগুলো নারীবাদী এজেন্ডার সাথে পরিচিত কিন্তু পুরুষ অধিকারের সাথে নয়। ডানপন্থী দলগুলো সাধারণত পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো রক্ষায় আগ্রহী যা পুরুষ অধিকারের আধুনিক ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য একটি নতুন ধরনের রাজনৈতিক কথোপকথন প্রয়োজন যেখানে নারী অধিকার এবং পুরুষ অধিকার উভয়কেই মানবাধিকারের অংশ হিসেবে দেখা হবে।

আন্তোনিও গ্রামশির "hegemony" বা আধিপত্যের তত্ত্বে দেখানো হয় যে যে কোনো সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রথমে সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত লড়াইয়ে জিততে হয়। পুরুষ অধিকারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য: রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে হলে প্রথমে এই বিষয়টিকে একটি গ্রহণযোগ্য এবং প্রয়োজনীয় আলোচনার বিষয়ে পরিণত করতে হবে।

৬৮.৩ ন্যায়বিচারের রলসিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি এবং পুরুষ অধিকার

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

জন রলসের ন্যায়বিচারের তত্ত্বে "original position" বা আদি অবস্থানের ধারণায় বলা হয় যে ন্যায্য সামাজিক নীতি নির্ধারণের জন্য আমাদের এমন একটি কাল্পনিক অবস্থানে দাঁড়াতে হবে যেখানে আমরা জানি না যে আমরা কোন লিঙ্গে জন্মাবো, কোন শ্রেণীতে থাকবো বা কোন সামাজিক অবস্থানে থাকবো।

এই "veil of ignorance" বা অজ্ঞতার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমরা যদি জিজ্ঞেস করি: আমরা কি এমন একটি সমাজ চাইব যেখানে গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনে শুধু নারী ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃত এবং পুরুষ ভিকটিম নয়? আমরা কি এমন একটি সমাজ চাইব যেখানে মিথ্যা মামলায় পুরুষকে বিনা জামিনে কারাবন্দী করা যায়? আমরা কি এমন একটি সমাজ চাইব যেখানে পুরুষ নির্যাতন ভিকটিমের জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নেই?

রলসের "difference principle" অনুযায়ী, সামাজিক বৈষম্য শুধু তখনই ন্যায্য যখন তা সবচেয়ে বঞ্চিত গোষ্ঠীর কল্যাণ করে। কিন্তু পুরুষ-বিরোধী আইনগুলো কি সত্যিই সবচেয়ে বঞ্চিত গোষ্ঠীর কল্যাণ করে? প্রমাণ বলে যে এই আইনগুলো অনেক সময় সম্পদশালী এবং আইনি জ্ঞানসম্পন্ন নারীরা দুর্বল এবং দরিদ্র পুরুষের বিরুদ্ধে অপব্যবহার করেন। এটা রলসিয়ান ন্যায়বিচারের নীতির লঙ্ঘন।

৬৮.৪ সেনের সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি এবং পুরুষ অধিকার

অ্যামার্ত্য সেনের "capability approach" বা সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি ন্যায়বিচারকে ভিন্নভাবে দেখে। সেনের তত্ত্বে ন্যায়বিচারের লক্ষ্য হলো প্রতিটি ব্যক্তির তার পূর্ণ মানবিক সম্ভাবনায় বিকশিত হওয়ার সক্ষমতা নিশ্চিত করা।

মার্থা নাসবাউম সেনের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও বিস্তারিত করে মানুষের দশটি কেন্দ্রীয় সক্ষমতা চিহ্নিত করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: জীবন, শারীরিক স্বাস্থ্য, শারীরিক অখণ্ডতা, ইন্দ্রিয়, কল্পনা ও চিন্তা, আবেগ, ব্যবহারিক যুক্তি, সংযোগ, অন্য প্রজাতির সাথে বসবাস, খেলা এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ।

বাংলাদেশে একজন পুরুষ যিনি মিথ্যা মামলার শিকার হয়ে কারাগারে যান, তার এই সক্ষমতাগুলো কার্যত ধ্বংস হয়। তার শারীরিক অখণ্ডতা লঙ্ঘিত হয়, তার পরিবারের সাথে সংযোগ ছিন্ন হয়, তার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। সেন এবং নাসবাউমের মানদণ্ডে এটা একটা মৌলিক অন্যায়।

সুতরাং পুরুষ অধিকারের দাবি শুধু রাজনৈতিক বা আইনি নয়, এটা সক্ষমতার দর্শনের ভিত্তিতে একটি নৈতিক দায়িত্ব।

অধ্যায় ৬৯: সাম্প্রতিক উন্নয়ন, প্রবণতা এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি

৬৯.১ ২০২৪-২০২৬ সালে বাংলাদেশে পুরুষ অধিকার বিষয়ক আলোচনার বিকাশ

২০২৪ সালের আগস্টে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে, তার পরে কিছু নতুন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকার আইনি সংস্কারের বিষয়ে আগ্রহী এবং বিভিন্ন সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

২০২৫ সালের মার্চ মাসে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন অধ্যাদেশ সংশোধনী একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এই সংশোধনী অপর্যাপ্ত।

২০২৫-২০২৬ সালে বাংলাদেশের আইনজীবী সমাজে পুরুষ অধিকারের বিষয়ে আলোচনা বাড়ছে। বিভিন্ন আইনি সাময়িকীতে পুরুষ অধিকার বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। ঢাকা ল রিভিউ এবং বাংলাদেশ লো ডাইজেস্টের মতো প্রকাশনায় পুরুষ অধিকারের বিষয়ে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ আসছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পুরুষ অধিকারের আলোচনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তরুণ প্রজন্ম এই বিষয়ে আরও সচেতন এবং তারা প্রশ্ন করছে কেন আইন লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নয়।

৬৯.২ বৈশ্বিক প্রবণতা এবং বাংলাদেশের উপর প্রভাব

বৈশ্বিক পর্যায়ে পুরুষ অধিকার আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। ২০২৪-২০২৫ সালে বিভিন্ন দেশে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন তৈরির দাবি জোরালো হচ্ছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার ব্যবস্থায় পুরুষ অধিকার বিষয়ক আলোচনা বাড়ছে। ২০২৪-২০২৫ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে পুরুষ ভিকটিমের স্বীকৃতির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাংকের লিঙ্গ-সমতা বিষয়ক প্রতিবেদনগুলো ক্রমশ পুরুষের অধিকার এবং সমস্যাগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করছে।

এই বৈশ্বিক প্রবণতা বাংলাদেশের আইন সংস্কারে চাপ তৈরি করতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যখন লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনকে মানবাধিকারের অংশ হিসেবে দেখতে থাকে, তখন বাংলাদেশও এই বৈশ্বিক মানদণ্ড পূরণের চাপ অনুভব করবে।

৬৯.৩ প্রযুক্তি এবং পুরুষ অধিকারের নতুন মাত্রা

ডিজিটাল যুগে পুরুষ অধিকারের আলোচনায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পুরুষ ভিকটিমরা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারছেন এবং একটি ভার্চুয়াল সহায়তা নেটওয়ার্ক তৈরি হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নের সাথে সাথে মিথ্যা মামলার প্যাটার্ন বিশ্লেষণ এবং মামলার ন্যায্যতা মূল্যায়নের নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে। AI প্রযুক্তি ব্যবহার করে আদালত মামলার ধরন বিশ্লেষণ করে মিথ্যা মামলার সম্ভাবনা মূল্যায়ন করতে পারে।

ডিজিটাল প্রমাণের ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জও রয়েছে। যখন গার্হস্থ্য নির্যাতনের অভিযোগ তোলা হয়, তখন ডিজিটাল যোগাযোগের রেকর্ড গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হতে পারে। ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ এবং আইনি প্রমাণ হিসেবে ডিজিটাল তথ্যের ব্যবহার বিষয়ে বাংলাদেশে আইনি কাঠামো তৈরি করা দরকার।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ১০: পুরুষ নির্যাতন এবং ইসলামিক আইনের দৃষ্টিভঙ্গি

১০.১ ইসলামিক আইনে ন্যায়বিচার এবং পুরুষের অধিকার

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ এবং ইসলামিক আইন ও নীতিশাস্ত্র সমাজে গভীর প্রভাব রাখে। সুতরাং পুরুষ অধিকারের প্রশ্নটিকে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ইসলামিক আইনে ন্যায়বিচারের ধারণা অর্থাৎ "আদল" একটি কেন্দ্রীয় নীতি। কুরআনে বারবার বলা হয়েছে যে আল্লাহ অন্যায় পছন্দ করেন না এবং মানুষের প্রতি মানুষের ন্যায্য আচরণ করা ধর্মীয় দায়িত্ব। এই "আদল" বা ন্যায়বিচারের নীতি সকলের জন্য প্রযোজ্য, লিঙ্গ নির্বিশেষে।

ইসলামিক আইনশাস্ত্রে "মাকাসিদ আল-শরিয়া" বা শরিয়ার উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে জীবন, বুদ্ধি, বংশ, সম্পদ এবং মর্যাদার রক্ষা। এই পাঁচটি উদ্দেশ্য সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। যখন একজন পুরুষ মিথ্যা মামলার শিকার হয়ে কারাগারে যান, তখন তার জীবন, বুদ্ধি, সম্পদ এবং মর্যাদা সবকিছুই বিপন্ন হয়। ইসলামিক আইনশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিস্থিতি অগ্রহণযোগ্য।

১০.২ ইসলামিক আইনে প্রমাণের মানদণ্ড এবং আধুনিক আইনের তুলনা

ইসলামিক আইনে ফৌজদারি অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রমাণের মান অত্যন্ত উচ্চ। বিশেষত "হুদুদ" বা নির্ধারিত শাস্তির অপরাধের ক্ষেত্রে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর প্রয়োজন। এই উচ্চ প্রমাণের মানদণ্ড মূলত নির্দোষকে রক্ষা করার জন্য।

ইসলামিক আইনের মূলনীতি "الأصل في الأشياء الإباحة" অর্থাৎ "মূলনীতি হলো অনুমতি" বলে যে প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো কাজ নিষিদ্ধ নয়। এই নীতিটি ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রে প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষিতার ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে প্রমাণের মানদণ্ড অনেক কম এবং প্রমাণের বোঝা অনেক সময় আসামির উপর চাপানো হয়। এটা ইসলামিক আইনের মূলনীতির সাথেও সাংঘর্ষিক।

মুসলিম আইনবিদরা এই বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন। ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরুষের আইনি সুরক্ষার দাবি একটি শক্তিশালী নৈতিক ভিত্তি তৈরি করতে পারে যা বাংলাদেশের ধর্মীয় সমাজে গ্রহণযোগ্য।

১০.৩ ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং পুরুষ অধিকার আন্দোলনের সুযোগ

বাংলাদেশের ধর্মীয় নেতারা সমাজে ব্যাপক প্রভাব রাখেন। তারা যদি পুরুষ নির্যাতনের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করেন এবং আইনি ন্যায়বিচারের দাবিতে সোচ্চার হন, তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে।

শুক্রবারের খুতবায়, মাদ্রাসায় শিক্ষায় এবং ধর্মীয় সমাবেশে যদি এই বার্তা দেওয়া হয় যে পুরুষকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো ইসলামিক নীতির বিরুদ্ধে এবং নির্যাতিত পুরুষকে সাহায্য করা ধর্মীয় দায়িত্ব, তাহলে সামাজিক মনোভাবে পরিবর্তন আসতে পারে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

একই সাথে, ধর্মীয় নেতারা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধেও সমানভাবে সোচ্চার হবেন। উভয়টি একই সাথে দাবি করা ন্যায়বিচারের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ষষ্ঠ খণ্ডের উপসংহার: অদৃশ্যতার বিরুদ্ধে স্বীকৃতির যুদ্ধ

ষষ্ঠ খণ্ড জুড়ে আমরা পুরুষ নির্যাতনের আইনি অদৃশ্যতার বহুমাত্রিক চিত্র তুলে ধরেছি। এই অদৃশ্যতা শুধু একটি আইনি ত্রুটি নয়, এটি একটি দার্শনিক, নৈতিক এবং সামাজিক সংকট।

প্রথম কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত হলো গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এর পুরুষ-বর্জনকারী সংজ্ঞা একটি কাঠামোগত আইনি বৈষম্য যা বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ এবং ২৮ অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক। এই বৈষম্য দূর করা শুধু পুরুষের স্বার্থে নয়, এটা ন্যায়বিচারের সার্বজনীন নীতির দাবি।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হলো পুরুষ যৌন নির্যাতনের বিষয়ে ২০২৫ সালের আংশিক স্বীকৃতি একটি শুরু কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষও যৌন সহিংসতার শিকার হতে পারেন এবং তাদের অধিকার রক্ষায় পূর্ণ আইনি কাঠামো দরকার।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত হলো পুরুষ নির্যাতনের নীরবতার মূলে রয়েছে সামাজিক কলঙ্ক, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার অভাব এবং আইনি প্রতিকারের অনিশ্চয়তা। এই তিনটি বাধাকে একসাথে সরাতে হবে।

চতুর্থ সিদ্ধান্ত হলো পুরুষ সন্তান হেফাজত অধিকার, খোরপোষ আইন এবং ব্যভিচার আইনের ক্ষেত্রে লিঙ্গ-পক্ষপাতী বিধানগুলো সংস্কার করা জরুরি। এই সংস্কারগুলো পুরুষের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি সামগ্রিক পারিবারিক ন্যায়বিচারের উন্নতি করবে।

পঞ্চম সিদ্ধান্ত হলো পুরুষ নির্যাতনের আইনি স্বীকৃতি নারীবাদের বিরোধিতা নয়, এটা মানবাধিকারের সার্বজনীন নীতির দাবি। নারী অধিকার এবং পুরুষ অধিকার পরস্পরবিরোধী নয়, এরা একটি ন্যায়বিচারমূলক সমাজের দুটি অপরিহার্য উপাদান।

ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত হলো সংস্কারের পথে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক পরিবর্তন একসাথে দরকার। শুধু আইন বদলালে যথেষ্ট নয়, মানুষের মনোভাব এবং প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতিও বদলাতে হবে।

সপ্তম সিদ্ধান্ত হলো বাংলাদেশের ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন একটি সুযোগ তৈরি করেছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যদি পুরুষ অধিকারের বিষয়গুলো সংস্কার এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থা আরও ন্যায্য এবং মানবিক হবে।

অষ্টম সিদ্ধান্ত হলো দর্শন, আইনতত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞান সবাই একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছায়: মানুষের কষ্ট লিঙ্গ দ্বারা নির্ধারিত হয় না। যে কোনো মানুষ যন্ত্রণা পেতে পারেন, যেকোনো মানুষ নির্যাতনের শিকার হতে পারেন এবং প্রতিটি মানুষের কষ্টের সমান আইনি স্বীকৃতি এবং প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ফরাসি দার্শনিক সিমোন ভেইল বলেছিলেন, "কষ্ট কোনো অধিকার নয়। কিন্তু কষ্ট পাওয়ার বাস্তবতাকে অস্বীকার করাও একটি অন্যায়।" বাংলাদেশের আইন যখন পুরুষের কষ্টকে স্বীকার করতে অস্বীকার করে, তখন সে একটি গভীর অন্যায় করছে। এই অন্যায় দূর করাই সত্যিকারের ন্যায়বিচারের পথ।

সপ্তম খণ্ডে আমরা দেখব মিথ্যা মামলার রাজনীতি, ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির গভীর বিশ্লেষণ এবং এই সমস্যার সমাধানের পথ। আমরা বিশ্লেষণ করব কীভাবে আইনের অপব্যবহার একটি সামাজিক শিল্পে পরিণত হয়েছে এবং কীভাবে এই শিল্পকে ভেঙে ফেলা সম্ভব।

পরিশিষ্ট ক: ষষ্ঠ খণ্ডে আলোচিত প্রধান আইনসমূহ এবং তাদের পুরুষ-প্রাসঙ্গিক বিধানের সারণি

গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ ধারা ৩: সংজ্ঞায় শুধু নারী ও শিশুকে ভিকটিম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুরুষ বিশ্লেষণ: পুরুষ ভিকটিম সম্পূর্ণ বাদ, সাংবিধানিক সমতার লঙ্ঘন।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ ধারা ৯ ও ২০২৫ সংশোধনী: ষোলো বছরের কম বয়সী পুরুষকে যৌন সহিংসতার ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি। পুরুষ বিশ্লেষণ: প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এখনো স্বীকৃত নয়, আংশিক অগ্রগতি কিন্তু অপর্যাপ্ত।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ ধারা ৪৯৭: ব্যভিচারে শুধু পুরুষ অপরাধী হতে পারেন। পুরুষ বিশ্লেষণ: ভারতে ২০১৮ সালে বাতিল, বাংলাদেশে এখনো বলবৎ, লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক।

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ ও পারিবারিক আদালতের অনুশীলন: পিতার সন্তান হেফাজতের অধিকার দুর্বল, মায়ের স্বয়ংক্রিয় অগ্রাধিকার। পুরুষ বিশ্লেষণ: মনোবৈজ্ঞানিকভাবে অযৌক্তিক, শিশুর কল্যাণেও ক্ষতিকর।

মুসলিম পারিবারিক আইন ও ভরণপোষণ বিধি: একতরফাভাবে স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব। পুরুষ বিশ্লেষণ: পরিবর্তিত সামাজিক বাস্তবতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সংস্কার দরকার।

পরিশিষ্ট খ: পুরুষ নির্যাতন ভিকটিমের জন্য ব্যবহারিক নির্দেশনা

একজন পুরুষ যিনি গার্হস্থ্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তিনি বর্তমান আইনি কাঠামোর মধ্যে কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন। প্রথমত, শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে চিকিৎসা রিপোর্ট সংগ্রহ করা এবং সম্ভব হলে ছবি তোলা। এই প্রমাণ পরবর্তীতে কাজে আসতে পারে।

দ্বিতীয়ত, মানসিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে যোগাযোগের রেকর্ড যেমন বার্তা, ইমেইল বা কলের রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

তৃতীয়ত, দণ্ডবিধির সাধারণ ধারায় যেমন আঘাত সংক্রান্ত ধারায় মামলা করার বিকল্প আছে, যদিও এটা গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের মতো তাৎক্ষণিক প্রতিকার দেয় না।

চতুর্থত, পারিবারিক আদালতে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা।

পঞ্চমত, বিশ্বস্ত পরিবার এবং বন্ধুদের সহায়তা নেওয়া এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবা খোঁজা।

ষষ্ঠত, পুরুষ অধিকার সংগঠন বা আইনজীবী সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করা।

বর্তমান আইনি কাঠামোয় পুরুষ ভিকটিমের জন্য প্রতিকার সীমিত। কিন্তু সচেতনতা এবং প্রমাণ সংগ্রহ ভবিষ্যতে কাজে আসতে পারে এবং আইনি পরিস্থিতির উন্নতি হলে সেটা আরও কার্যকর হবে।

পরিশিষ্ট গ: পুরুষ নির্যাতন বিষয়ক মূল তথ্য ও পরিসংখ্যান

বাংলাদেশ মেনস রাইটস ফাউন্ডেশনের ২০২০ সালের জরিপে শতকরা আশি ভাগ বিবাহিত পুরুষ মানসিক নির্যাতনের শিকার বলে জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালে কমপক্ষে পাঁচশো পুরুষ নারী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়ে আইনি সহায়তা চেয়েছিলেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে পুরুষ আত্মহত্যার হার নারীর দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ, এবং পারিবারিক বিরোধ এর একটি প্রধান কারণ।

যুক্তরাজ্যে প্রতি ছয়জনের একজন পুরুষ জীবনে কোনো না কোনো সময় গার্হস্থ্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, যা সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়।

নারী ও শিশু নির্যাতন আদালতে বিভিন্ন আইনজীবী সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী শতকরা পঞ্চাশ থেকে সত্তর ভাগ মামলায় আসামি খালাস পান, যা মিথ্যা মামলার উচ্চ হারের ইঙ্গিত দেয়।

ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ভারতে পুরুষ আত্মহত্যার হার নারীর প্রায় দ্বিগুণ এবং পারিবারিক বিরোধ এর একটি প্রধান কারণ, যা বাংলাদেশের পরিস্থিতির জন্যও প্রাসঙ্গিক।

এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্পষ্ট বার্তা দেয়: পুরুষ নির্যাতন একটি বাস্তব সামাজিক সমস্যা যা আইনের স্বীকৃতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান দাবি করে।

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

সপ্তম খণ্ডে মিথ্যা মামলার রাজনীতি, ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির গভীর বিশ্লেষণ এবং এই সমস্যার বহুমাত্রিক প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করা হবে। বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হবে কীভাবে বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থায় মিথ্যা মামলার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, কীভাবে এই মামলাগুলো পরিচালিত হয় এবং কীভাবে এই পরিবেশকে পরিবর্তন করা সম্ভব।

সপ্তম খণ্ড

মিথ্যা মামলার রাজনীতি, ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি এবং বহুমাত্রিক প্রতিকার: একটি গভীর আইনতাত্ত্বিক ও সামাজিক অনুসন্ধান

সপ্তম খণ্ডের ভূমিকা

ষষ্ঠ খণ্ডে আমরা পুরুষ নির্যাতনের আইনি অদৃশ্যতার বহুমাত্রিক চিত্র তুলে ধরেছিলাম। আমরা দেখিয়েছিলাম কীভাবে বাংলাদেশের আইনি কাঠামো পুরুষকে স্বীকৃত ভিকটিম হিসেবে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। আমরা দেখিয়েছিলাম কীভাবে গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন থেকে শুরু করে ধর্ষণ আইন পর্যন্ত, ব্যভিচার আইন থেকে শুরু করে খোরপোষ আইন পর্যন্ত, প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের অধিকারকে হয় উপেক্ষা করা হয়েছে, নয়তো সরাসরি খর্ব করা হয়েছে। ষষ্ঠ খণ্ডের শেষে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে সপ্তম খণ্ডে আমরা মিথ্যা মামলার রাজনীতি, ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির গভীর বিশ্লেষণ এবং এই সমস্যার বহুমাত্রিক প্রতিকারের পথ আলোচনা করব।

সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের সময় এসেছে।

সপ্তম খণ্ড এই গ্রন্থের সবচেয়ে জটিল এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে ব্যবহারিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে আমরা শুধু সমস্যা বর্ণনা করব না, বরং সমস্যার শিকড় উপড়ে ফেলার উপায়ও অনুসন্ধান করব। এই খণ্ডের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হলো: বাংলাদেশে মিথ্যা মামলার একটি শিল্প গড়ে উঠেছে কি? যদি উঠে থাকে, তাহলে সেই শিল্পের কাঠামো কী, তার অর্থনীতি কী, তার রাজনীতি কী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, সেই শিল্পকে ভেঙে ফেলার পথ কী?

এই খণ্ডে আমরা আইনের ভাষায়, দার্শনিক চিন্তার আলোকে, সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বের সাহায্যে এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজব। আমরা আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিচার করব এবং সংস্কারের একটি বাস্তবসম্মত রোডম্যাপ উপস্থাপন করব। তবে এই আলোচনার সর্বত্র একটি মৌলিক সতর্কতা মনে রাখতে হবে: মিথ্যা মামলার বিষয়টি আলোচনা করা মানে নারী নির্যাতনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা নয়। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সত্যিকারের সহিংসতা বিদ্যমান এবং তার বিরুদ্ধে আইনি সুরক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু সেই সুরক্ষা তৈরির পদ্ধতিতে যখন নতুন অন্যায়ের দরজা খুলে যায়, তখন সেটা নিয়ে কথা বলা একটি ন্যায়বিচারের দাবি, নারীবিরোধিতা নয়।

অধ্যায় ৭১: মিথ্যা মামলার আইনি সংজ্ঞা, শ্রেণীবিভাগ ও কাঠামোগত বিশ্লেষণ

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৭১.১ মিথ্যা মামলার আইনি সংজ্ঞা: একটি জটিল প্রশ্ন

মিথ্যা মামলা বলতে কী বোঝায়, এই প্রশ্নটি একটি অত্যন্ত জটিল আইনি প্রশ্ন। সাধারণ মানুষের বোঝাপড়ায় মিথ্যা মামলা হলো সেই মামলা যেখানে অভিযোগকারী জেনেশুনে একটি মিথ্যা অভিযোগ করেন। কিন্তু আইনি পরিসরে এই সংজ্ঞাটি এতটা সহজ নয়।

আইনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মিথ্যা মামলাকে কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণী হলো সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলা, যেখানে অভিযোগ করা ঘটনাটি আদৌ ঘটেনি এবং অভিযোগকারী সেটা জানেন। এই মামলাগুলো সবচেয়ে স্পষ্ট প্রতারণার উদাহরণ এবং আইনে সবচেয়ে কঠোরভাবে শাস্তিযোগ্য হওয়ার কথা। দ্বিতীয় শ্রেণী হলো অতিরঞ্জিত মামলা, যেখানে একটি সত্য ঘটনার ভিত্তিতে মামলা করা হয়েছে কিন্তু অভিযোগটি সত্যিকারের ঘটনার তুলনায় অনেক বেশি গুরুতর করে উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণী হলো উদ্দেশ্যমূলক মামলা, যেখানে ঘটনাটি হয়তো সত্য কিন্তু মামলাটি ন্যায়বিচারের জন্য নয়, বরং অন্য কোনো উদ্দেশ্য যেমন ভরণপোষণ আদায়, সম্পত্তি দখল বা পারিবারিক চাপ সৃষ্টির জন্য করা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণী হলো সুবিধাজনক বর্ণনা পরিবর্তনের মামলা, যেখানে একটি সম্মতিমূলক ঘটনাকে পরবর্তীতে অসম্মতিমূলক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

এই চারটি শ্রেণীর মধ্যে আইনে সবচেয়ে কঠোরভাবে শুধু প্রথম শ্রেণীর মামলাকে শাস্তিযোগ্য করার কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষতির দিক থেকে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর মামলাগুলোও সমান বা বেশি ক্ষতিকর হতে পারে।

বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ১৭ তে মিথ্যা মামলার সংজ্ঞা অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই ধারায় বলা হয়েছে যে যদি কেউ জেনেশুনে মিথ্যা মামলা করে, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে। কিন্তু "জেনেশুনে মিথ্যা" প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ অভিযোগকারী সবসময়ই দাবি করতে পারেন যে তিনি যা বিশ্বাস করেছিলেন তাই বলেছেন। এই প্রমাণের মানদণ্ডটি এত উচ্চ যে কার্যত মিথ্যা মামলার আইনি প্রতিকার অর্থহীন হয়ে যায়।

এই প্রেক্ষাপটে আইনতাত্ত্বিক পণ্ডিত জন কফি তাঁর "Overcriminalization" বিষয়ক গবেষণায় যে কথা বলেছেন সেটা প্রাসঙ্গিক। কফি বলেছেন যে যখন আইন অতি ব্যাপকভাবে অপরাধ সংজ্ঞায়িত করে এবং শাস্তির বিধান রাখে, তখন সেই আইনের অপব্যবহার প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ক্ষেত্রে এই পর্যবেক্ষণটি অত্যন্ত প্রযোজ্য। এই আইন এত ব্যাপকভাবে অপরাধ সংজ্ঞায়িত করে এবং এত কঠোর শাস্তির বিধান রাখে যে এর অপব্যবহার অত্যন্ত সহজ এবং লাভজনক হয়ে যায়।

৭১.২ মিথ্যা মামলার ঐতিহাসিক পটভূমি: কখন থেকে শুরু হলো এই সংকট

বাংলাদেশে মিথ্যা মামলার সমস্যাটি হঠাৎ করে উদ্ভূত হয়নি। এটি একটি ক্রমিক বিকাশের ফল, যার শিকড় রয়েছে ঔপনিবেশিক আমলের আইনি কাঠামোয় এবং যার পুষ্টি জুগিয়েছে স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় দণ্ডবিধি ১৮৬০ তে "মিথ্যা সাক্ষ্য" বা perjury এবং "মিথ্যা অভিযোগ" সংক্রান্ত বিধান ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ আমলের আদালতের ধীরগতির বিচার প্রক্রিয়া এবং প্রমাণের কঠোর মানদণ্ড মিথ্যা মামলাকে তুলনামূলকভাবে কম ফলপ্রসূ করে রেখেছিল। কারণ দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ায় মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল।

১৯৮৩ সালে যখন বাংলাদেশে প্রথম নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আইন প্রণীত হলো, তখন থেকে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করল। এই আইনে জামিন অযোগ্যতা, দ্রুত বিচারের ট্রাইব্যুনাল এবং কঠোর শাস্তির বিধান একটি নতুন পরিবেশ তৈরি করল। এই পরিবেশে মিথ্যা মামলা দায়ের করা সহজ, এবং এর পরিণতি দ্রুত ও গুরুতর হওয়ায় মামলাটি একটি শক্তিশালী চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার হয়ে উঠল।

২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এলে এবং ২০০৩ সালে তা সংশোধিত হলে এই সমস্যা আরও তীব্র হলো। পুলিশের তদন্ত ছাড়াই মামলা দায়ের, সরাসরি ট্রাইব্যুনালে মামলা, এবং অত্যন্ত কঠোর জামিন অযোগ্যতার বিধান মিথ্যা মামলাকে একটি কার্যকর অস্ত্রে পরিণত করল। আইনজীবী, এনজিও এবং সামাজিক কর্মীদের একটি নেটওয়ার্ক এই অস্ত্রটি ব্যবহার করার পদ্ধতি রপ্ত করল।

২০১০ সালে গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন এলে পরিস্থিতি আরও জটিল হলো। এখন একই ঘটনার জন্য একজন পুরুষের বিরুদ্ধে একাধিক আইনে একসাথে মামলা দায়ের করা সম্ভব হলো। এই "মামলার ব্যারেজ" পদ্ধতি অভিযুক্তকে এক মামলায় জামিন পেলেও অন্য মামলায় আটকে রাখার সুযোগ তৈরি করল।

৭১.৩ মিথ্যা মামলার বর্তমান পরিসংখ্যান: কতটুকু বাস্তব সংকট

বাংলাদেশে মিথ্যা মামলার পরিসংখ্যান নিয়ে একটি গভীর সমস্যা হলো সরকারিভাবে এই তথ্য সংগ্রহ করার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। কিন্তু পরোক্ষ পরিসংখ্যান থেকে একটি উদ্বেগজনক চিত্র উঠে আসে।

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে প্রায় বিশ হাজার মামলা দায়ের হয়েছে এবং একই সময়ে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় এক লাখ পঞ্চান্ন হাজারের বেশি, যার মধ্যে প্রায় চৌত্রিশ হাজার মামলা পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে ঝুলে আছে। এই সংখ্যাগুলো নিজেই একটি সিস্টেমিক সংকটের ইঙ্গিত দেয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন আদালতে বিভিন্ন আইনজীবী সংগঠন এবং স্বতন্ত্র গবেষকদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যে মামলাগুলো বিচারে গেছে তার পঞ্চাশ থেকে সত্তর শতাংশ মামলায় আসামি খালাস পেয়েছেন। এই উচ্চ খালাসের হার অবশ্যই মিথ্যা মামলার প্রমাণ নয়, কারণ খালাসের পেছনে তদন্তের দুর্বলতা, সাক্ষ্যের অভাব এবং সাক্ষীর পক্ষ পরিবর্তনসহ অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে এই উচ্চ খালাসের হার একটি প্রশ্ন তোলে: যদি মামলাগুলো সত্য হতো, তাহলে প্রমাণের এত অভাব কেন?

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো সেই মামলাগুলোর ধরন যেগুলোতে পরে মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পারিবারিক মীমাংসার মাধ্যমে অথবা অর্থের বিনিময়ে প্রত্যাহার করা হয়। মামলা যদি সত্যিকারের ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে দায়ের করা হতো, তাহলে কেন

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অর্থের বিনিময়ে সেটা প্রত্যাহার করা হচ্ছে? এই প্রশ্নটির উত্তরে স্পষ্টভাবে আসে যে মামলাটি আদতে একটি অর্থনৈতিক লেনদেনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

অধ্যায় ৭২: মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া ও কলাকৌশল: একটি গভীর তদন্ত

৭২.১ মামলা দায়েরের প্রাথমিক পর্যায়: কীভাবে একটি মিথ্যা মামলার সূচনা হয়

মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রক্রিয়াটি বোঝার জন্য আমাদের পারিবারিক বিরোধের গতিশীলতা বুঝতে হবে। বাংলাদেশে পারিবারিক বিরোধ সাধারণত তিনটি পর্যায়ে বিকশিত হয়। প্রথম পর্যায়ে পারিবারিক টানাপোড়েন শুরু হয়, যা সম্পর্কের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই টানাপোড়েন তীব্র হয় এবং বিচ্ছেদ বা সম্পদ ভাগের প্রশ্ন সামনে আসে। তৃতীয় পর্যায়ে একটি পক্ষ আইনি হাতিয়ার ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়।

তৃতীয় পর্যায়ে যখন একজন নারী মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সাধারণত কয়েকটি কারণ কাজ করে। প্রথম কারণ হলো আইনি সুবিধার সুযোগ সম্পর্কে সচেতনতা। বন্ধু, পরিবার বা আইনজীবীর কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করলে স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকজন সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার হবেন এবং জামিন পাবেন না। এই জ্ঞানটি একটি শক্তিশালী কার্ড হাতে পাওয়ার অনুভূতি তৈরি করে। দ্বিতীয় কারণ হলো পারিবারিক ও সামাজিক চাপ। অনেক ক্ষেত্রে নারীর বাবার পরিবার বা আত্মীয়স্বজন মামলা করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি সম্পদ আদায়ের একটি সুযোগ হিসেবে দেখা হয়। তৃতীয় কারণ হলো আইনজীবীর পরামর্শ। কিছু অসাধু আইনজীবী মক্কেলকে পরামর্শ দেন যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করলে দ্রুত মীমাংসা পাওয়া যাবে। এই "মীমাংসা" আদতে অর্থ আদায়।

মামলা দায়েরের কৌশলগত দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অভিযোগের প্রণালী। সফল মিথ্যা মামলায় সাধারণত কয়েকটি কৌশল ব্যবহার করা হয়।

প্রথম কৌশল হলো যতজন সম্ভব আসামি করা। স্বামী ছাড়াও শ্বশুর, শাশুড়ি, দেবর, ননদ এবং কখনো কখনো স্বামীর অন্যান্য আত্মীয়দের আসামি করা হয়। এতে একসাথে অনেকজন গ্রেফতারের মুখে পড়েন এবং পরিবারের উপর সামগ্রিক চাপ তৈরি হয়। পরিবারের বৃদ্ধ এবং অসুস্থ সদস্যদের জেলের আতঙ্ক পরিবারকে দ্রুত মীমাংসায় আগ্রহী করে তোলে।

দ্বিতীয় কৌশল হলো একাধিক আইনে একসাথে মামলা করা। একই ঘটনার জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করার পাশাপাশি যৌতুক নিরোধ আইনেও মামলা করা হয়। এতে আসামি একটি মামলায় জামিন পেলেও অন্যটিতে আটকে থাকেন।

তৃতীয় কৌশল হলো শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ যোগ করা। যদিও কোনো শারীরিক নির্যাতন না হয়ে থাকে, মামলায় আঘাতের অভিযোগ যোগ করা হয় এবং একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত চিকিৎসকরা অনেক সময় এই সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

চতুর্থ কৌশল হলো মামলার সময়কাল কৌশলগতভাবে নির্ধারণ করা। পারিবারিক সম্পদ ভাগ বা তালাকের আলোচনা যখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে থাকে, তখন মামলা দায়ের করা হয়। এতে আলোচনার শক্তি সম্পূর্ণ অভিযোগকারীর পক্ষে চলে যায়।

৭২.২ মামলা প্রস্তুতিতে আইনজীবীর ভূমিকা

বাংলাদেশে কিছু আইনজীবী মিথ্যা মামলার এই পুরো প্রক্রিয়ায় একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। এই আইনজীবীরা শুধু মামলা পরিচালনা করেন না, বরং কীভাবে মামলা সাজাতে হবে, কোন ধারায় মামলা করতে হবে এবং কোন ধরনের অভিযোগ সবচেয়ে কার্যকর হবে সে বিষয়ে পূর্ণ পরামর্শ দেন।

এই আইনজীবীরা প্রায়ই একটি নির্দিষ্ট মডেল অভিযোগপত্র ব্যবহার করেন, যেখানে মানক শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যবহার করে যৌতুক নির্যাতন এবং শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ করা হয়। এই মডেল অভিযোগপত্রে শুধু নাম ও তারিখ পরিবর্তন করে মামলা দায়ের করা হয়। ফলে বিভিন্ন মামলার অভিযোগপত্রের মধ্যে অদ্ভুত মিল পাওয়া যায়, যা বিজ্ঞ বিচারকদের নজরে এসেছে।

আইনজীবীদের এই ভূমিকার একটি আর্থিক যুক্তি আছে। নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় যে পরিমাণ ফি আসামি পক্ষের আইনজীবীরা পান, তা সাধারণ দেওয়ানি মামলার তুলনায় অনেক বেশি। কারণ আসামি পরিবার যেকোনো মূল্যে মুক্তি চান এবং তার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করতে রাজি থাকেন। এই আর্থিক প্রণোদনা পুরো মামলার পরিবেশকে বিকৃত করে।

পেশাদার আইনজীবীদের একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে। বার কাউন্সিল অব বাংলাদেশের পেশাদার আচরণবিধিতে বলা আছে যে একজন আইনজীবী মিথ্যা মামলায় সাহায্য করবেন না। কিন্তু এই বিধিটির প্রয়োগ কতটা হয়? এই প্রশ্নটির উত্তর দুঃখজনকভাবে নেতিবাচক।

আইনজীবী পেশার নৈতিকতা বিষয়ে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের অধ্যাপক রিচার্ড আবেল তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে যেসব দেশে আইনি পেশার নিয়ন্ত্রণ দুর্বল, সেখানে আইনজীবীরা মক্কেলের স্বার্থে যেকোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। বাংলাদেশের আইনি পেশার নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এই অর্থে দুর্বল বলেই গণ্য।

৭২.৩ নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালের কাঠামোগত দুর্বলতা এবং মিথ্যা মামলার সুযোগ

বাংলাদেশে চৌষট্টিটি জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ট্রাইব্যুনাল রয়েছে। এই ট্রাইব্যুনালগুলোর কাঠামো এবং কর্মপদ্ধতিতে এমন কিছু দুর্বলতা রয়েছে যা মিথ্যা মামলাকে সহজতর করে।

প্রথম দুর্বলতা হলো অভিযোগ যাচাই প্রক্রিয়ার অভাব। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে সরাসরি ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের সুযোগ আছে এবং ট্রাইব্যুনাল কোনো প্রাথমিক তদন্ত ছাড়াই সমন জারি করতে পারে। ফলে অভিযোগটি সত্য না মিথ্যা সেটা যাচাই করার আগেই আসামির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ শুরু হয়ে যায়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

দ্বিতীয় দুর্বলতা হলো প্রচণ্ড মামলার চাপ। প্রতিটি ট্রাইব্যুনালে গড়ে দেড় হাজারের বেশি মামলা বিচারাধীন থাকে, যা আদালতের পক্ষে প্রতিটি মামলা মনোযোগ দিয়ে বিবেচনা করা কার্যত অসম্ভব করে তোলে। এই মামলার চাপে বিচারক অনেক সময় অভিযোগের প্রকৃতি যথেষ্ট পরীক্ষা না করেই পদক্ষেপ নেন।

তৃতীয় দুর্বলতা হলো মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে আর্থিক বাধার অনুপস্থিতি। সাধারণ দেওয়ানি মামলায় আদালত ফি একটি বাধা হিসেবে কাজ করে। কিন্তু নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় এই বাধা অত্যন্ত কম, যা মামলা দায়েরকে সহজ করে তোলে।

চতুর্থ দুর্বলতা হলো বিচারকের সামাজিক চাপ। একজন বিচারক যদি মহিলা বাদীর মামলায় সাথে সাথে আদেশ না দেন, তাহলে তিনি "নারীবিরোধী" বলে চিহ্নিত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েন। এই সামাজিক চাপ বিচারিক স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে।

অধ্যায় ৭৩: পুলিশি তদন্ত প্রক্রিয়ায় মিথ্যা মামলার গতিশীলতা

৭৩.১ পুলিশের কাঠামোগত পক্ষপাত এবং তার কারণ

বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলাগুলোতে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পুলিশের এই ভূমিকা বোঝার জন্য পুলিশের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি এবং প্রণোদনা কাঠামো বোঝা দরকার।

পুলিশের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে একটি নির্দিষ্ট পক্ষপাত তৈরি হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় যে পুলিশ কর্মকর্তা দ্রুত গ্রেফতার করেন, তিনি সিনিয়র অফিসার এবং জনমতের কাছে প্রশংসিত হন। কিন্তু যে কর্মকর্তা সতর্কভাবে তদন্ত করে মিথ্যা মামলা চিহ্নিত করেন, তাকে অনেক সময় সমালোচনার মুখে পড়তে হয়।

পুলিশের প্রণোদনা কাঠামোও এই পক্ষপাতকে শক্তিশালী করে। পদোন্নতি, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এবং পুরস্কারের ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন মামলায় গ্রেফতারের সংখ্যা একটি ইতিবাচক সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে পুলিশ কর্মকর্তারা প্রাথমিক তদন্ত ছাড়াই গ্রেফতার করতে উৎসাহিত হন।

এই পরিস্থিতি পুলিশের আচরণকে আইনের দাবির চেয়ে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চাপের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আইনে বলা আছে যে তদন্তের পর মামলার সত্যতা যাচাই করতে হবে, কিন্তু বাস্তবে প্রায়ই গ্রেফতার আগে হয় এবং তদন্ত পরে হয়।

৭৩.২ তদন্ত প্রক্রিয়ার বিকৃতি: কীভাবে মিথ্যা মামলা পুলিশের হাত দিয়ে শক্তিশালী হয়

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় তদন্ত প্রক্রিয়া বেশ কিছু পর্যায়ে বিকৃত হতে পারে।

প্রথম পর্যায়ে এজাহার নেওয়ার সময় পুলিশ অভিযোগকারীর বক্তব্যকে যাচাই না করেই লিপিবদ্ধ করে। অনেক সময় অভিযোগকারী যা বলেন তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর অভিযোগ এজাহারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই "উন্নত" এজাহারটি মামলার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রেফতারের সময় পুলিশ আসামিপক্ষের বক্তব্য না শুনেই তাদের গ্রেফতার করে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় পুলিশের গ্রেফতার করার ব্যাপক ক্ষমতা আছে, কিন্তু এই ক্ষমতার প্রয়োগে কোনো পূর্বতদন্তের প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় পর্যায়ে তদন্তের সময় পুলিশ প্রায়ই শুধু বাদীপক্ষের সাক্ষ্য সংগ্রহ করে। আসামিপক্ষের পক্ষে থাকা সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ফলে চার্জশিটে একটি একপেশে চিত্র উপস্থাপিত হয়।

চতুর্থ পর্যায়ে চার্জশিট দাখিলের সময় পুলিশ অফিসার মামলার দুর্বলতাগুলো উপেক্ষা করে মামলাটি "সাব্যস্ত" বলে মত দেন। এতে বিচারক মনে করেন পুলিশ তদন্তের পর মামলার সত্যতা পেয়েছে, যদিও প্রকৃত তদন্ত অতি সীমিত ছিল।

এই পুরো প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করতে গিয়ে আমেরিকান আইনি পণ্ডিত উইলিয়াম স্টাফোর্ড একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মর্মান্তিকভাবে প্রযোজ্য: "The system that is meant to find truth has become a system that finds confirmation of what is already assumed." অর্থাৎ, যে ব্যবস্থা সত্য খুঁজে বের করার কথা, সেটা হয়ে গেছে পূর্বনির্ধারিত ধারণার সমর্থন খুঁজে বের করার ব্যবস্থা।

৭৩.৩ পুলিশ দুর্নীতি এবং মিথ্যা মামলার আর্থিক গতিশীলতা

বাংলাদেশে পুলিশ দুর্নীতির বিষয়টি একটি স্বীকৃত সমস্যা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের বিভিন্ন জরিপে পুলিশকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় এই দুর্নীতি একটি বিশেষ মাত্রা নেয়।

যে পুলিশ কর্মকর্তা মামলাটি তদন্ত করেন, তিনি উভয় পক্ষ থেকেই অর্থ নিতে পারেন। বাদীপক্ষ থেকে নেন মামলাটি "শক্তিশালী" করার জন্য এবং আসামিপক্ষ থেকে নেন মামলাটি "দুর্বল" করার জন্য। এই উভয়মুখী দুর্নীতি মামলার বিচারিক ফলাফলকে অর্থের প্রতিযোগিতায় পরিণত করে: যে পক্ষ বেশি টাকা দিতে পারে, তার পক্ষে তদন্ত হয়।

এই আর্থিক গতিশীলতায় দরিদ্র পুরুষরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। একজন ধনী পুরুষ আইনজীবী ভাড়া করে এবং পুলিশকে প্রভাবিত করে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু একজন দরিদ্র পুরুষ পারেন না। ফলে মিথ্যা মামলার শিকার হওয়ার সবচেয়ে বড় ঝুঁকিতে থাকেন আর্থিকভাবে দুর্বল পুরুষরা।

এই শ্রেণী-লিঙ্গ আন্তঃসংযোগটি বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। কিম্বার্লি ক্রেনশের ইন্টারসেকশনালিটি তত্ত্ব মূলত নারীর পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হলেও এই তত্ত্বের কাঠামোয় পুরুষের শ্রেণী-লিঙ্গ আন্তঃসংযোগও বোঝা সম্ভব। একজন দরিদ্র পুরুষ একাধারে তার লিঙ্গের কারণে এবং তার আর্থিক অবস্থার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন, এই দুটি অবস্থান তার উপর একটি যৌগিক চাপ তৈরি করে যা একটির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

অধ্যায় ৭৪: বিচারিক প্রক্রিয়ায় মিথ্যা মামলার যাত্রা ও পরিণতি

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৪.১ ট্রাইব্যুনাল থেকে রায় পর্যন্ত: একটি দীর্ঘ ও বেদনাদায়ক যাত্রা

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়েরের পর থেকে রায় পর্যন্ত একটি অত্যন্ত দীর্ঘ যাত্রা শুরু হয়। আইন অনুযায়ী এই মামলাগুলো ৯০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি হওয়ার কথা, কিন্তু বাস্তবে গড় বিচারকাল অনেক বছর, অনেক সময় এক দশকও ছাড়িয়ে যায়।

এই দীর্ঘ বিচারকালে একজন মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষ কী অবস্থায় থাকেন? যদি জামিন না পান, তাহলে তিনি কারাগারে থাকেন, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন, কাজ করতে পারেন না এবং মামলা লড়ার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করতে থাকেন। যদি জামিন পান, তাহলেও তাকে নিয়মিত আদালতে হাজির হতে হয়, পেশাগত জীবন বিঘ্নিত হয় এবং সামাজিক কলঙ্কের বোঝা বহন করতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই তার জীবন কার্যত স্থগিত হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তির ১৪ অনুচ্ছেদ বলে যে বিচারে দীর্ঘ বিলম্ব নিজেই একটি অধিকার লঙ্ঘন। বাংলাদেশ এই চুক্তি অনুমোদন করেছে, কিন্তু নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় দশ-পনের বছর ধরে মামলা চলা এই আন্তর্জাতিক দায়িত্বের সরাসরি লঙ্ঘন।

১৪.২ মীমাংসার চাপ এবং ন্যায়বিচারের বিকল্প পথ

নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে: মামলা চলাকালীন বাদীপক্ষ প্রায়ই মীমাংসার প্রস্তাব দেয়। এই মীমাংসায় সাধারণত আসামিপক্ষকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হবে অথবা নির্দিষ্ট সম্পদ ছেড়ে দিতে হবে এবং বিনিময়ে মামলা প্রত্যাহার করা হবে।

এই মীমাংসার চাপটি অত্যন্ত শক্তিশালী হয় কারণ বিকল্পটি আরও ভয়াবহ: বছরের পর বছর মামলা লড়া, অর্থ ব্যয় করা এবং সামাজিক কলঙ্কের বোঝা বহন করা। ফলে অনেক নির্দোষ পুরুষ শুধু মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মীমাংসায় রাজি হন।

এই পরিস্থিতিটি আইনি দর্শনে "coerced settlement" বা জোরপূর্বক মীমাংসা নামে পরিচিত। এই ধরনের মীমাংসা প্রকৃত ন্যায়বিচার নয়, বরং এটি আইনের ছায়ায় একটি অর্থনৈতিক জোরজবরদস্তি। রবার্তো আনগার তাঁর ক্রিটিক্যাল লিগ্যাল স্টাডিজের কাঠামোয় এই ধরনের মীমাংসাকে "law as a power game" বা ক্ষমতার খেলা হিসেবে আইনের একটি প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন।

বাংলাদেশের বিচারিক ব্যবস্থায় এই জোরপূর্বক মীমাংসার প্রক্রিয়াটি বিচারকের প্রচ্ছন্ন সম্মতিতে চলে। বিচারক অনেক সময় দুই পক্ষকে মীমাংসায় বসতে উৎসাহিত করেন, কারণ মামলার চাপ কমানোর জন্য মীমাংসা বিচারকের জন্যও সুবিধাজনক। কিন্তু এই মীমাংসায় যে ন্যায়বিচার বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে, সেটা বিচারকের দৃষ্টিতে আসে না বা আসলেও উপেক্ষা করা হয়।

১৪.৩ খালাসের পর: বিজয়ের বিড়ম্বনা

অনেক মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর লড়াইয়ের পর আসামি আদালতে খালাস পান। কিন্তু এই খালাস কি প্রকৃত বিজয়? উত্তর হলো, অনেক ক্ষেত্রে না।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

খালাস পাওয়ার পর একজন পুরুষের সামনে যে চিত্র থাকে সেটা গভীরভাবে উদ্বেগজনক। প্রথমত, মামলা চলাকালীন তাঁর যে ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়েছে, সেটা ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, পরিবারের সদস্যরা যদি দীর্ঘ কারাভোগ করে থাকেন, তাদের মানসিক এবং শারীরিক ক্ষতি হয়ে গেছে। তৃতীয়ত, মামলা লড়তে গিয়ে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা আর ফেরত পাওয়ার কোনো আইনি পথ নেই। চতুর্থত, সামাজিক সুনাম যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন। বাংলাদেশের আইনে মিথ্যা মামলার কারণে নির্দোষ ব্যক্তির যে ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য কোনো কার্যকর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ধারা ১৭ তে মিথ্যা মামলার জন্য শাস্তির বিধান আছে, কিন্তু এই ধারায় মামলা করা অত্যন্ত কঠিন এবং কার্যত বিরল। ক্ষতিগ্রস্ত পুরুষ দেওয়ানি আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা করতে পারেন, কিন্তু এই মামলাও দীর্ঘ এবং ব্যয়বহুল।

এই আইনি শূন্যতাটি একটি গভীর অন্যায়ের প্রকাশ: রাষ্ট্র একজন নির্দোষ মানুষকে বছরের পর বছর যন্ত্রণা দিতে সাহায্য করেছে, কিন্তু শেষে তাকে খালাস দিয়েই দায়িত্ব শেষ করে। রাষ্ট্রের এই দায়িত্বহীনতা ন্যায়বিচারের মৌলিক ধারণার বিরোধী।

অধ্যায় ১৫: আইনজীবী শিল্প ও মিথ্যা মামলার অর্থনৈতিক বাস্তবতা

১৫.১ আইন-ব্যবসার রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলাকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ আইন-ব্যবসা গড়ে উঠেছে। এই ব্যবসার কাঠামো বোঝার জন্য এর আর্থিক গতিশীলতা বিশ্লেষণ করা দরকার।

এই আইন-ব্যবসায় কয়েকটি পক্ষ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। প্রথমত, বাদীপক্ষের আইনজীবী। তিনি মামলা দায়েরের ফি, প্রতিটি হাজিরার ফি এবং মীমাংসার কমিশন থেকে উপার্জন করেন। একটি ভালো মিথ্যা মামলা তাঁর জন্য বছরের পর বছর আয়ের উৎস হতে পারে। দ্বিতীয়ত, আসামিপক্ষের আইনজীবী। তিনি প্রায়ই মামলাটি যত দীর্ঘ হয় ততটা পছন্দ করেন, কারণ দীর্ঘ মামলায় তাঁর ফি বাড়তে থাকে। তৃতীয়ত, কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ কর্মকর্তা উভয় পক্ষ থেকে অর্থ নেন। চতুর্থত, কিছু মধ্যস্থতাকারী পেশাদার যারা মীমাংসার প্রক্রিয়ায় কমিশন নেন।

এই ব্যবসার মোট আর্থিক পরিমাণ কত, সেটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, কারণ বেশিরভাগ লেনদেন অনানুষ্ঠানিক এবং অপ্রকাশ্য। কিন্তু আনুমানিক হিসাবে বলা যায় যে বছরে বিশ হাজার নতুন মামলা এবং দেড় লক্ষের বেশি বিচারাধীন মামলার সাথে যদি প্রতিটি মামলায় গড়ে কয়েক লাখ টাকা ব্যয় হয়, তাহলে এই আইন-ব্যবসার মোট পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকারও বেশি।

এই বিশাল আর্থিক স্বার্থ এই ব্যবস্থার সংস্কারের পথে একটি শক্তিশালী বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যারা এই ব্যবস্থা থেকে আর্থিকভাবে লাভবান, তারা এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের বিরোধী। এটি একটি রাজনৈতিক অর্থনীতির সমস্যা যার সমাধানের জন্য শুধু আইনি সংস্কার যথেষ্ট নয়, প্রণোদনা কাঠামোতেও পরিবর্তন আনতে হবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৫.২ মীমাংসার শিল্প: কীভাবে আইনি প্রক্রিয়া অর্থ আদায়ের হাতিয়ার হয়

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আদালতের বাইরে মীমাংসায় শেষ হয়। এই মীমাংসার প্রক্রিয়াটি একটি বিশেষ শিল্পে পরিণত হয়েছে।

মীমাংসার প্রক্রিয়া সাধারণত তিনটি পর্যায়ে হয়। প্রথম পর্যায়ে বাদীপক্ষ মামলা করার পর আসামিপক্ষকে গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে একটি প্রাথমিক যোগাযোগ করে। এই যোগাযোগের উদ্দেশ্য হলো আসামিপক্ষকে মামলার গুরুত্ব অনুভব করানো।

দ্বিতীয় পর্যায়ে একজন মধ্যস্থতাকারী, যিনি সাধারণত উভয় পক্ষের পরিচিত বা একজন অনানুষ্ঠানিক মধ্যস্থতাকারী, মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে আসেন। এই পর্যায়ে বাদীপক্ষ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা সম্পদের দাবি করে। এই দাবির পরিমাণ প্রায়ই অভিযুক্তের আর্থিক সামর্থ্যের সীমার কাছাকাছি হয়, কারণ মধ্যস্থতাকারী আসামিপক্ষের আর্থিক সামর্থ্য সম্পর্কে আগে থেকে জেনে নেন।

তৃতীয় পর্যায়ে অর্থ হস্তান্তরের পর মামলা প্রত্যাহার করা হয়। আদালতে বলা হয় যে পারিবারিক মীমাংসা হয়েছে এবং বাদী মামলা তুলে নিতে চান। আদালত এই মীমাংসাকে স্বাগত জানান কারণ এতে একটি মামলা নিষ্পত্তি হলো।

এই পুরো প্রক্রিয়াটি আইনের চোখে যে কতটা সমস্যাজনক, সেটা বোঝার জন্য একটি প্রশ্ন করা যাক: যদি মামলাটি সত্যিকারের ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে করা হতো, তাহলে কেন অর্থের বিনিময়ে ন্যায়বিচার বিক্রি হচ্ছে? একটি সত্যিকারের নির্যাতনের শিকার মানুষ কি তার নির্যাতনকারীর কাছ থেকে অর্থ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেন? নৈতিকভাবে এটা সম্ভব, কিন্তু যখন দেখা যায় যে মামলা প্রত্যাহারের ঘটনাগুলো প্রায় সবসময়ই অর্থ লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত, তখন এই মামলাগুলোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন ওঠে।

১৫.৩ এনজিও সেক্টরের ভূমিকা এবং প্রণোদনার সমস্যা

বাংলাদেশে নারী অধিকার বিষয়ক এনজিওগুলো নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সংগঠনগুলো নির্যাতিত নারীদের আইনি সহায়তা প্রদান করে, যা একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ।

কিন্তু এই সংগঠনগুলোর প্রণোদনা কাঠামো একটি জটিল প্রশ্ন তোলে। এই সংগঠনগুলোর অর্থায়নের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে, যারা সাধারণত "মামলার সংখ্যা" বা "উপকারভোগীর সংখ্যা" এর ভিত্তিতে অনুদান দেয়। ফলে এনজিওগুলোর জন্য বেশি মামলা মানে বেশি তহবিল।

এই প্রণোদনা কাঠামো কি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে এনজিওরা মামলার সত্যতা যাচাই না করেই মামলা করতে উৎসাহিত করতে পারে? এটি একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন, কিন্তু একটি ন্যায্য প্রশ্ন। কারণ প্রণোদনা কাঠামো আচরণকে প্রভাবিত করে, এটি অর্থনীতির একটি মৌলিক নীতি।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এখানে স্পষ্ট করা দরকার যে অধিকাংশ নারী অধিকার এনজিও সৎভাবে কাজ করে এবং সত্যিকারের নির্যাতিত নারীদের সাহায্য করে। কিন্তু কিছু সংগঠন বা সেই সংগঠনের কিছু সদস্য হয়তো এই প্রণোদনার ফাঁদে পড়তে পারেন। এই সমস্যাটি সংগঠনগুলোর দোষ হিসেবে নয়, বরং একটি কাঠামোগত সমস্যা হিসেবে দেখা উচিত।

অধ্যায় ৭৬: ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির গভীর আইনতাত্ত্বিক ও মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

৭৬.১ ভিকটিম পরিচয়ের সামাজিক মূল্য: কীভাবে একটি পরিচয় হাতিয়ারে পরিণত হয়

"ভিকটিম কার্ড" পরিভাষাটি নিয়ে একটি প্রাথমিক সতর্কতা প্রয়োজন। এই পরিভাষাটি প্রায়ই সত্যিকারের ভিকটিমদের অভিজ্ঞতাকে হেয় করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই গ্রন্থে আমরা এই পরিভাষাটি সেই অর্থে ব্যবহার করছি না। আমরা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ঘটনা বর্ণনা করছি যেখানে ভিকটিমের পরিচয় কৌশলগতভাবে ব্যবহার করা হয় আইনি বা সামাজিক সুবিধা অর্জনের জন্য, এবং এই কৌশলটি সত্যিকারের ভিকটিমদের জন্যও ক্ষতিকর কারণ এটি ভিকটিম পরিচয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে।

সমাজবিজ্ঞানী ব্র্যাডলি ক্যাম্পবেল এবং জেসন ম্যানিং তাদের "Victimhood Culture" বিষয়ক গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। তারা বলেছেন যে আধুনিক সমাজের একটি বিশেষ স্তরে ভিকটিমের পরিচয় একটি উচ্চ সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ভিকটিম পরিচয় সহানুভূতি, আইনি সুবিধা এবং সামাজিক সম্পদের প্রবেশাধিকার দেয়। এই পরিস্থিতিতে ভিকটিম পরিচয়ের দাবি করার প্রণোদনা তৈরি হয়।

বাংলাদেশে এই গতিশীলতা একটি বিশেষ রূপ নিয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে একজন নারী যদি নিজেকে ভিকটিম হিসেবে দাবি করেন, তাহলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বেশ কিছু সুবিধা পান। প্রথমত, পুলিশ তাঁর অভিযোগ প্রায় বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত, অভিযুক্তকে জামিন অযোগ্য অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। তৃতীয়ত, সমাজ এবং মিডিয়া তাঁর পক্ষে দাঁড়ায়। চতুর্থত, এনজিও এবং আইনি সহায়তা সংগঠন বিনামূল্যে সাহায্য করে।

এই সুবিধাগুলোর প্রাপ্যতা একটি প্রণোদনা তৈরি করে যা কারো কারো ক্ষেত্রে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত অভিযোগের প্রলোভন হতে পারে। এটি মানুষের স্বভাবের একটি বাস্তব দিক, এবং আইনকে এই বাস্তবতার আলোকে তৈরি হওয়া দরকার।

৭৬.২ মিথ্যা স্মৃতি এবং আত্মবিশ্বাসী মিথ্যা সাক্ষ্য: মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ

একটি অত্যন্ত জটিল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মিথ্যা স্মৃতির মনোবিজ্ঞান। অনেক ক্ষেত্রে কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য দেন না কারণ তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলছেন, বরং তিনি বিশ্বাস করেন যে ঘটনাটি তিনি যেভাবে বর্ণনা করছেন সেভাবেই ঘটেছে, যদিও বস্তুনিষ্ঠভাবে ঘটনাটি ভিন্নরকম।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

মনোবিজ্ঞানী এলিজাবেথ লোফটাসের গবেষণা দেখিয়েছে যে মানুষের স্মৃতি অত্যন্ত পরিবর্তনযোগ্য এবং পরবর্তী তথ্য দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। লোফটাস প্রমাণ করেছেন যে মানুষ এমন ঘটনা "মনে করতে" পারেন যা আদৌ ঘটেনি। এই মিথ্যা স্মৃতিটি অভিযোগকারীর কাছে সম্পূর্ণ সত্য মনে হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই মনোবৈজ্ঞানিক ঘটনাটি কীভাবে প্রযোজ্য? পারিবারিক বিরোধের উত্তেজনায় একজন নারী হয়তো একটি সাধারণ পারিবারিক কলহকে পরে "নির্যাতন" হিসেবে স্মরণ করতে পারেন। বন্ধু, পরিবার এবং আইনজীবীর বারবার প্রশ্নের মুখে স্মৃতি পুনর্গঠিত হতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অচেতনভাবে হতে পারে।

এই মনোবৈজ্ঞানিক বাস্তবতাটি আইনি প্রক্রিয়ার জন্য একটি গভীর চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। কারণ আত্মবিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেওয়া মানেই সাক্ষ্যটি সত্য নয়। কিন্তু বাংলাদেশের বিচারিক সংস্কৃতিতে আত্মবিশ্বাসী সাক্ষ্যকে প্রায়ই বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে দেখা হয়।

৭৬.৩ সামাজিক চাপ এবং মিথ্যা অভিযোগে প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতা

বাংলাদেশে মিথ্যা মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে সামাজিক চাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন নারী যখন পারিবারিক বিরোধের মধ্যে থাকেন, তখন তাঁর চারপাশের মানুষ প্রায়ই মামলা করার পরামর্শ দেন। বাবার পরিবার বলে "মামলা করো, তাহলে মেয়ের প্রাপ্য পাবে"। বন্ধুরা বলে "তোমার সাথে অন্যায় হয়েছে, চুপ করে থেকো না"। এনজিও কর্মীরা বলে "আপনার অধিকার আছে মামলা করার"।

এই সামাজিক চাপের মুখে একজন নারী হয়তো মামলা করার সিদ্ধান্ত নেন যা তিনি নিজে থেকে নিতেন না। এবং মামলা করার পর ফিরে আসার পথ কঠিন, কারণ মামলা প্রত্যাহার করলে তিনি দুর্বল বলে চিহ্নিত হবেন।

সামাজিক মনোবিজ্ঞানে "conformity pressure" বা সাম্যতার চাপের যে ধারণা আছে, সেটা এই পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য। সলোমন আশের বিখ্যাত গবেষণায় দেখা গেছে যে সামাজিক চাপের মুখে মানুষ এমন মতামতও সমর্থন করেন যা তারা নিজে থেকে করতেন না। বাংলাদেশে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে এই সামাজিক চাপটি একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।

এই বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য মিথ্যা মামলার দায় থেকে অভিযোগকারীকে পুরোপুরি মুক্ত করা নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো বোঝানো যে মিথ্যা মামলার সমস্যাটি শুধু ব্যক্তির নৈতিক ব্যর্থতার ফল নয়, এটি একটি কাঠামোগত সমস্যা যেখানে সামাজিক চাপ, আইনি প্রণোদনা এবং মনোবৈজ্ঞানিক গতিশীলতা একসাথে কাজ করে।

অধ্যায় ৭৭: মিডিয়া ট্রায়াল ও জনমত: একটি জটিল সম্পর্ক

৭৭.১ বাংলাদেশে মিডিয়া ট্রায়ালের ঐতিহ্য এবং নতুন রূপ

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

মিডিয়া ট্রায়াল মানে হলো আদালতে বিচার শেষ হওয়ার আগেই সংবাদমাধ্যম কাউকে দোষী বা নির্দোষ হিসেবে উপস্থাপন করা। বাংলাদেশে মিডিয়া ট্রায়ালের একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে, কিন্তু নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় এই প্রবণতা বিশেষভাবে তীব্র।

কোনো নারী যদি কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ করেন, তাহলে সংবাদমাধ্যম প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে সেই পুরুষকে নেতিবাচক আলোয় উপস্থাপন করে। অভিযুক্ত পুরুষের ছবি, নাম, ঠিকানা প্রকাশ করা হয়। তার পেশাগত পরিচয় উল্লেখ করা হয়। অনেক সময় তার পরিবারের সদস্যদের কথাও বলা হয়।

এই সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পর অভিযুক্তের জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার নিয়োগকর্তা হয়তো তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেন। সমাজ তাকে এড়িয়ে চলে। তার সন্তানরা লাঞ্ছনার মুখে পড়ে। এই সামাজিক মৃত্যু আইনি বিচারের আগেই সম্পন্ন হয়।

পরবর্তীতে যদি আদালতে তিনি খালাস পান, তাহলে সেই সংবাদ কতটা গুরুত্ব পায়? উত্তর হলো প্রায় কোনো গুরুত্বই পায় না। মূল অভিযোগের সংবাদটি যত বড় করে ছাপা হয়েছিল, খালাসের সংবাদটি সেই তুলনায় নগণ্য। ফলে সমাজের মনে পুরুষটি অপরাধীই থেকে যান।

এই মিডিয়া ট্রায়ালের বিষয়ে ইউরোপিয়ান মানবাধিকার আদালত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে। ইউরোপিয়ান মানবাধিকার সনদের ৬ অনুচ্ছেদে ন্যায়বিচারের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে, এবং আদালত বলেছে যে মিডিয়া ট্রায়াল ন্যায়বিচারের এই অধিকারকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। বাংলাদেশে এই আন্তর্জাতিক মানদণ্ড কতটা প্রয়োগ হয়, সেটা একটি গুরুতর প্রশ্ন।

৭৭.২ মিডিয়ার পক্ষপাতের কারণ: অর্থনীতি ও আদর্শের আন্তঃক্রিয়া

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম কেন নারী নির্যাতনের মামলায় এভাবে আচরণ করে? এর পেছনে দুটি কারণ কাজ করে: অর্থনৈতিক এবং আদর্শগত।

অর্থনৈতিক কারণ হলো যে নারী নির্যাতনের সংবাদ পাঠকদের আকৃষ্ট করে এবং পত্রিকার বিক্রি বা ওয়েবসাইটের ক্লিক বাড়ায়। এই ধরনের আবেগ-প্রধান সংবাদ সর্বদাই পাঠকপ্রিয়। ফলে সংবাদমাধ্যম স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের সংবাদকে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং আরও বেশি নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করে।

আদর্শগত কারণ হলো যে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নারীবাদী আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। এই আদর্শের আলোকে নারী নির্যাতনের সংবাদ একটি সামাজিক বার্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এই উদ্দেশ্যটি নিজেই প্রশংসনীয়, কিন্তু এর ফলে অভিযুক্তের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়ই উপেক্ষিত হয়।

সাংবাদিকতার মৌলিক নীতিগুলোর মধ্যে একটি হলো "সব পক্ষের বক্তব্য শোনা।" কিন্তু নারী নির্যাতনের মামলায় এই নীতি প্রায়ই লঙ্ঘিত হয়। অভিযোগকারীর বক্তব্য বিশদভাবে প্রকাশিত হয়, কিন্তু অভিযুক্তের পক্ষ থেকে "যোগাযোগ পাওয়া যায়নি" বা "তিনি মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন" বলে ছোট একটি বাক্যে দায়িত্ব শেষ করা হয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৭.৩ মিডিয়ার দায়বদ্ধতা এবং আইনি প্রতিকারের অপ্রতুলতা

বাংলাদেশে মিডিয়ার দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল। সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। কিন্তু এই স্বাধীনতা কি দায়িত্বহীনতার লাইসেন্স?

বাংলাদেশে মিডিয়ার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আইনি পথে লড়া অত্যন্ত কঠিন। প্রথমত, মানহানির মামলার বোঝা মামলাকারীর উপর। দ্বিতীয়ত, মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী আইনজীবী এবং আইনি সম্পদ রাখে। তৃতীয়ত, সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে মামলা করলে বরং অভিযুক্ত পুরুষ আরও নেতিবাচক মনোযোগ পান।

ফলে মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষ মিডিয়ার বিরুদ্ধেও কোনো কার্যকর প্রতিকার পান না। তার সুনাম ধ্বংস হয় এবং তিনি কোনো আইনি পথে তা পুনরুদ্ধার করতে পারেন না।

অধ্যায় ১৮: সামাজিক মিডিয়া, ডিজিটাল ন্যায়বিচার ও মিথ্যা অভিযোগের নতুন যুগ

১৮.১ সামাজিক মিডিয়া কীভাবে মিথ্যা অভিযোগের একটি নতুন হাতিয়ার হয়েছে

ফেসবুক, ইউটিউব এবং অন্যান্য সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশে মিথ্যা অভিযোগের একটি সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রচলিত মিডিয়া ট্রায়ালের তুলনায় সামাজিক মিডিয়ার অভিযোগ অনেক দ্রুত ছড়ায়, অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায় এবং প্রায় অপসারণ করা যায় না।

সামাজিক মিডিয়ায় মিথ্যা অভিযোগের একটি সাধারণ ধরন হলো নারীর "মুক্তি পোস্ট" বা "সতর্কতা পোস্ট"। এই পোস্টে বলা হয় যে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি তাকে নির্যাতন করেছেন এবং সেই ব্যক্তির নাম, ছবি এবং কর্মস্থল উল্লেখ করা হয়। এই পোস্টটি দ্রুত ভাইরাল হয়। হাজার হাজার মানুষ শেয়ার করেন, মন্তব্য করেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আক্রমণ করেন।

এই পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে নিজেকে রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। প্রথমত, সামাজিক মিডিয়ার ভাইরাল গতির সাথে পাল্লা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, যদি তিনি পাল্টা কথা বলেন, তাহলে সেটাকে "পুরুষ নিজেকে রক্ষা করছে" বলে আরও আক্রমণ করা হয়। তৃতীয়ত, যে প্ল্যাটফর্মে পোস্টটি হয়েছে, সেখানে অভিযুক্তের বক্তব্য একটি ছোট উত্তর হিসেবে আসে, কিন্তু মূল অভিযোগটি পিন করা থাকে।

২০২৩ সালে বাংলাদেশে সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রণীত হওয়ার পর এই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। কারণ এখন অভিযুক্ত পুরুষ যদি সামাজিক মিডিয়ায় মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাহলে তাকে "হয়রানি" বা "মানসিক চাপ সৃষ্টির" অভিযোগে সাইবার নিরাপত্তা আইনে আবার মামলায় ফেলার হুমকি দেওয়া হয়।

১৮.২ ডিজিটাল ন্যায়বিচারের সমস্যা এবং আইনের অনুপস্থিতি

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

"ডিজিটাল ন্যায়বিচার" বা "viral justice" নামে একটি নতুন ঘটনা বৈশ্বিকভাবে উদ্ভূত হয়েছে। এই ধারণায় ঐতিহ্যবাহী আইনি প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে সামাজিক মিডিয়ায় জনমতের মাধ্যমে "ন্যায়বিচার" করার চেষ্টা করা হয়।

বাংলাদেশে ডিজিটাল ন্যায়বিচারের বেশ কিছু সমস্যা আছে। প্রথম সমস্যা হলো প্রমাণ ছাড়া সিদ্ধান্ত। সামাজিক মিডিয়ায় কোনো প্রমাণ দাখিল বা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া নেই। একটি স্ক্রিনশট বা একটি বর্ণনাই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো পর্দা নামার কোনো সুযোগ নেই। আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায়। কিন্তু সামাজিক মিডিয়ায় একবার কেউ "অপরাধী" হিসেবে চিহ্নিত হলে সেই চিহ্ন প্রায় চিরস্থায়ী হয়।

তৃতীয় সমস্যা হলো ভিড়-মনোবিজ্ঞান বা mob psychology। ভাইরাল পোস্টের মন্তব্যের ধারায় সহিংস ভাষা ব্যবহার, প্রাণনাশের হুমকি এবং পরিবারের সদস্যদের আক্রমণ করা সাধারণ। এই ভিড়-মনোবিজ্ঞান কার্যকর বিচার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।

৭৮.৩ সাইবার নিরাপত্তা আইন ও ডিজিটাল প্রতিরোধের দ্বন্দ্ব

বাংলাদেশে সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ ডিজিটাল স্থানে মিথ্যা তথ্য প্রচার এবং মানহানির বিরুদ্ধে বিধান রাখে। তাত্ত্বিকভাবে এই আইন সামাজিক মিডিয়ায় মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়।

কিন্তু বাস্তবে এই আইনের প্রয়োগে একটি গুরুতর লিঙ্গ-পক্ষপাত রয়েছে। যখন কোনো নারী ডিজিটাল মাধ্যমে হয়রানির শিকার হন, পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু যখন কোনো পুরুষ সামাজিক মিডিয়ায় মিথ্যা অভিযোগের শিকার হন, পুলিশ প্রায়ই সেই অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে নেয় না।

এই পরিস্থিতিতে মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষ ডিজিটাল এবং আইনি উভয় স্থানেই অরক্ষিত থাকেন।

অধ্যায় ৭৯: রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে মামলা: বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আইনের অপব্যবহার

৭৯.১ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ব্যবহার

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিরোধী পক্ষকে দমন করার জন্য আইনি হাতিয়ার ব্যবহার করা একটি প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এই রাজনৈতিক হাতিয়ারের একটি শক্তিশালী রূপ।

এই আইনকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের কিছু নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, রাজনৈতিক বিরোধীদের স্ত্রী বা স্বজনদের দিয়ে নেতার বিরুদ্ধে মামলা করানো। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীকে এই আইনে মামলায় ফেলে ব্যবসায়িক সুবিধা নেওয়া। তৃতীয়ত, যারা ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে কথা বলেন তাদের সামাজিকভাবে ধ্বংস করার জন্য এই আইন ব্যবহার করা।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

২০২৪ সালের পট-পরিবর্তনের আগে বাংলাদেশে এই রাজনৈতিক ব্যবহারের অনেক নজির দেখা গেছে। যদিও এটি একটি সুনির্দিষ্ট প্রমাণযোগ্য বিষয়, কারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রমাণ করা কঠিন, কিন্তু সময় এবং পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে দেখলে নিদর্শনটি স্পষ্ট হয়।

৭৯.২ ক্ষমতার কাঠামো এবং আইনের পার্থক্যমূলক প্রয়োগ

বাংলাদেশে আইন প্রয়োগে ক্ষমতার কাঠামো একটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। একই ধরনের অভিযোগে ক্ষমতাসীন দলের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি এবং সাধারণ নাগরিকের প্রতি আইনের প্রয়োগ ভিন্ন হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ক্ষমতাসীন দলের সাথে সম্পর্কিত কেউ অভিযুক্ত হলে মামলা চলতে দীর্ঘ সময় লাগে, পুলিশি তদন্ত শিথিল হয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির জামিন পাওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ হয়। কিন্তু সাধারণ নাগরিক বা রাজনৈতিক বিরোধী হলে আইনের প্রয়োগ অনেক কঠোর হয়।

এই বৈষম্যমূলক প্রয়োগটি আইনের সামনে সমতার সাংবিধানিক নীতির সরাসরি লঙ্ঘন। কিন্তু এই লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিকারের পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ।

৭৯.৩ ২০২৪ সালের পট-পরিবর্তনের পর রাজনৈতিক মামলার নতুন গতিশীলতা

২০২৪ সালের আগস্টে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার রাজনৈতিক গতিশীলতায় কিছু পরিবর্তন এসেছে। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে দায়ের করা অনেক মামলা এখন ভিন্ন আলোয় দেখা হচ্ছে। কিন্তু মূল কাঠামোগত সমস্যাটি রয়ে গেছে, কারণ আইনটি এখনো একই, প্রণোদনা কাঠামো একই এবং সামাজিক গতিশীলতা একই।

২০২৫ সালের মার্চ মাসে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যে সংশোধনী আনা হয়েছে, সেটি কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, বিশেষত ধর্ষণের সংজ্ঞায় লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার দিকে কিছুটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মিথ্যা মামলার মূল কাঠামোগত সমস্যাগুলো, যেমন জামিন অযোগ্যতা, প্রাথমিক তদন্ত ছাড়া গ্রেফতার এবং মিথ্যা মামলার কার্যকর শাস্তি, এই সংশোধনীতে সমাধান করা হয়নি।

অন্তর্বর্তী সরকারের আইনি সংস্কার এজেন্ডায় পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়টি এখনো কেন্দ্রীয় গুরুত্ব পায়নি। যদিও বেশ কিছু সংস্কার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনি সংস্কারের দিকে বাস্তব পদক্ষেপ এখনো সীমিত।

অধ্যায় ৮০: মিথ্যা মামলার আর্থিক ও সামাজিক খরচ: একটি সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

৮০.১ ব্যক্তিগত খরচ: একটি পরিবারের ধ্বংসের হিসাব

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

একটি মিথ্যা নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার শিকার একটি পরিবারের উপর কী পরিমাণ অর্থনৈতিক বোঝা পড়তে পারে, তার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা জরুরি।

আইনজীবীর ফি একটি প্রধান ব্যয়। ঢাকায় একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর ফি বছরে কয়েক লাখ থেকে কয়েক কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে। মামলা যদি পাঁচ থেকে দশ বছর চলে, তাহলে মোট আইনজীবীর ফি একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্ত সঞ্চয় শেষ করে দিতে পারে।

জামিনের জন্য জামানত আরেকটি বড় ব্যয়। জামিন অযোগ্য মামলায় উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেতে হলে উকিলের বিশেষ ফি এবং জামানতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য।

কর্মজীবন হারানো আরেকটি গুরুতর ক্ষতি। একজন সরকারি বা বেসরকারি চাকরিজীবী পুরুষ যদি মামলায় গ্রেফতার হন বা সামাজিক কলঙ্কের শিকার হন, তাহলে তিনি প্রায়ই তার চাকরি হারান। এই কর্মজীবনের ক্ষতি শুধু বর্তমান আয় নয়, ভবিষ্যতের আয়ের সম্ভাবনাও নষ্ট করে।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপর প্রভাব আরেকটি মাত্রা। পরিবারের সদস্যরাও গ্রেফতার হতে পারেন, কাজ হারাতে পারেন এবং সামাজিক কলঙ্কের শিকার হতে পারেন।

এই সমস্ত ব্যয়ের যোগফলে একটি মিথ্যা মামলার কারণে একটি মধ্যবিত্ত পরিবার কয়েক কোটি টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এই ক্ষতির কোনো আইনি প্রতিকার নেই।

৮০.২ সামাজিক খরচ: রাষ্ট্র ও সমাজের উপর প্রভাব

মিথ্যা মামলার শুধু ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক খরচও বিশাল।

বিচার বিভাগের উপর অতিরিক্ত চাপ একটি বড় সামাজিক ব্যয়। প্রতিটি মিথ্যা মামলায় বিচারক, আদালত কর্মচারী, সরকারি আইনজীবী এবং কারা কর্তৃপক্ষের সময় ও সম্পদ ব্যয় হয়। এই সম্পদ যদি সত্যিকারের মামলায় ব্যয় করা যেত, তাহলে ন্যায়বিচার আরও দ্রুত এবং কার্যকর হতো।

পুলিশ বাহিনীর উপর চাপও একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক ব্যয়। মিথ্যা মামলার তদন্তে পুলিশের সময় ও সম্পদ ব্যয় হয় যা সত্যিকারের অপরাধ তদন্তে ব্যবহার করা যেত।

সামাজিক বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষতি আরেকটি মূল্যবান সামাজিক ব্যয়। যখন মানুষ জানে যে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মিথ্যা মামলা একটি সাধারণ ঘটনা, তখন সত্যিকারের নির্যাতনের মামলাগুলো নিয়েও সন্দেহ তৈরি হয়। এটি সত্যিকারের ভিকটিমদের জন্য ক্ষতিকর, কারণ তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায়।

পারিবারিক বন্ধনের ক্ষয় একটি দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ক্ষতি। যখন পরিবারের সদস্যরা একে অপরের বিরুদ্ধে আইনি হাতিয়ার ব্যবহার করে, তখন পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সামাজিক ক্ষয় দীর্ঘমেয়াদে সমাজের ভিত্তি দুর্বল করে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ৮১: মিথ্যা মামলা প্রতিরোধের আইনি সংস্কার: প্রস্তাব ও আইনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

৮১.১ জামিন সংস্কার: একটি জরুরি প্রয়োজনীয়তা

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সবচেয়ে জরুরি সংস্কার হলো জামিন সংক্রান্ত বিধানের সংস্কার। বর্তমানে এই আইনে অনেক অপরাধ জামিন অযোগ্য, যার মানে হলো গ্রেফতারের পর আসামি সাধারণ আদালত থেকে জামিন পেতে পারেন না।

এই জামিন অযোগ্যতার নীতিটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তির ৯(৩) অনুচ্ছেদ বলে যে বিচারের পূর্বে কারাবাস ব্যতিক্রমী হওয়া উচিত এবং মুক্তিই স্বাভাবিক নিয়ম হওয়া উচিত।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট আর্নেশ কুমার মামলায় এই নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে যে জামিন অযোগ্য মামলায়ও গ্রেফতার বাধ্যতামূলক নয়, বরং ব্যক্তির আচরণ, পলায়নের ঝুঁকি এবং সাক্ষী প্রভাবিত করার ঝুঁকির ভিত্তিতে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। বাংলাদেশের আইনে এই ধরনের স্বেচ্ছাধীন বিবেচনার সুযোগ নেই এবং সেটা প্রবর্তন করা জরুরি।

প্রস্তাবিত সংস্কার হলো এই আইনে দুটি স্তরের অপরাধ সংজ্ঞায়িত করা। প্রথম স্তরে থাকবে সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ যেমন ধর্ষণ ও হত্যা, যেখানে জামিন অযোগ্যতা বজায় থাকবে কিন্তু আদালত প্রমাণের প্রাথমিক মূল্যায়নের পর তা নির্ধারণ করবে। দ্বিতীয় স্তরে থাকবে অন্যান্য অপরাধ যেখানে জামিন দেওয়ার বিবেচনাধীন ক্ষমতা থাকবে এবং উপযুক্ত শর্ত সাপেক্ষে জামিন দেওয়া যাবে।

৮১.২ প্রাথমিক তদন্তের বাধ্যবাধকতা: একটি সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা

প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংস্কার হলো নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়েরের আগে বা মামলা দায়েরের সাথে সাথে একটি প্রাথমিক তদন্তের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা।

বর্তমানে আদালতে সরাসরি মামলা দায়ের করার সুযোগ আছে এবং আদালত কোনো তদন্ত ছাড়াই আসামির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারেন। এই ব্যবস্থাটি আইনের মূল প্রক্রিয়ার বিরোধী।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় মামলা দায়েরের সাথে সাথে একটি "প্রাথমিক শুনানি" হবে, যেখানে উভয় পক্ষকে সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হবে এবং আদালত মামলার প্রাথমিক সম্ভাবনা মূল্যায়ন করবে। যদি প্রাথমিক শুনানিতে মামলার সুস্পষ্ট ভিত্তি পাওয়া না যায়, তাহলে আদালত মামলা তদন্তের নির্দেশ দেবে এবং তদন্ত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হবে না।

এই ব্যবস্থাটি আদালতের অতিরিক্ত কাজ বাড়াবে এই যুক্তিতে কেউ কেউ এর বিরোধিতা করতে পারেন। কিন্তু একটি প্রতি-যুক্তি হলো যে প্রাথমিক শুনানিতে মিথ্যা মামলা ছেঁকে ফেলতে পারলে দীর্ঘমেয়াদে আদালতের কাজ কমবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

৮১.৩ মিথ্যা মামলার শাস্তি: বর্তমান বিধানের সংস্কার

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ধারা ১৭ তে মিথ্যা মামলার জন্য শাস্তির বিধান আছে। কিন্তু এই বিধান কার্যকর না হওয়ার কারণ হলো প্রমাণের অত্যন্ত উচ্চ মানদণ্ড। "জেনেশুনে মিথ্যা" প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব।

প্রস্তাবিত সংস্কার হলো মিথ্যা মামলার সংজ্ঞা বিস্তৃত করা এবং প্রমাণের মানদণ্ড বাস্তবসম্মত করা। তিনটি পরিস্থিতিতে মিথ্যা মামলা সাব্যস্ত করা যেতে পারে: প্রথমত, যখন আদালত মামলাটিকে মিথ্যা বলে রায় দেন; দ্বিতীয়ত, যখন মামলা অর্থের বিনিময়ে প্রত্যাহার করা হয়; তৃতীয়ত, যখন একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুই বছরের মধ্যে দুটি মামলা দায়ের করা হয় এবং উভয়ই প্রমাণ ছাড়া শেষ হয়।

এই তিনটি পরিস্থিতিতে মামলাকারীর বিরুদ্ধে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তদন্ত শুরু হওয়া উচিত এবং প্রমাণের উপর নির্ভর করে শাস্তি দেওয়া উচিত।

৮১.৪ ক্ষতিপূরণের আইনি কাঠামো

বাংলাদেশে বর্তমানে মিথ্যা মামলার শিকার ব্যক্তির জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের আইনি কাঠামো নেই। এই শূন্যতা পূরণ করতে একটি নতুন আইনি ব্যবস্থা তৈরি করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণ কাঠামোতে তিনটি উৎস থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে পারে। প্রথমত, মিথ্যা মামলাকারীর কাছ থেকে সরাসরি ক্ষতিপূরণ। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ, কারণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই মিথ্যা মামলাকে সম্ভব করেছে। তৃতীয়ত, একটি বিশেষ ক্ষতিপূরণ তহবিল তৈরি করা যেতে পারে যেখানে মিথ্যা মামলার জন্য জমানো অর্থ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে আদালতকে বিবেচনায় নিতে হবে: কারাভোগের সময়, কাজ হারানোর ক্ষতি, আইনজীবীর ব্যয় এবং মানসিক যন্ত্রণা।

অধ্যায় ৮২: বিচারিক ও তদন্ত সংস্কার: পদ্ধতিগত পরিবর্তনের রোডম্যাপ

৮২.১ বিশেষ তদন্ত দল: একটি নতুন পদ্ধতি

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় তদন্তের মান উন্নত করার জন্য একটি বিশেষ তদন্ত কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত বিশেষ তদন্ত দলে থাকবেন একজন অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মকর্তা, একজন সামাজিক কর্মী এবং একজন মনোবিজ্ঞানী। এই তিন সদস্যের দল যৌথভাবে প্রতিটি মামলা তদন্ত করবে। তদন্তে উভয় পক্ষের বক্তব্য সমানভাবে সংগ্রহ করা হবে এবং স্বাধীন সাক্ষীর তথ্য যাচাই করা হবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই বিশেষ তদন্ত দলের প্রতিবেদন আদালতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বর্তমানে পুলিশের চার্জশিটকে আদালত সাধারণত সত্য বলে ধরে নেয়, কিন্তু প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় বহু-সদস্যের তদন্ত দলের প্রতিবেদন আরও বিশ্বাসযোগ্য হবে।

৮২.২ বিচারিক প্রশিক্ষণের পুনর্গঠন: ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে বিচারিক প্রশিক্ষণে বর্তমানে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় সংবেদনশীলতার উপর জোর দেওয়া হয়। এটি একটি সঠিক পদক্ষেপ। কিন্তু এই প্রশিক্ষণে একটি মৌলিক ভারসাম্যের প্রয়োজন আছে।

বিচারকরা যেন নারী ভিকটিমের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকেন এবং একই সাথে আসামির সাংবিধানিক অধিকারের প্রতিও সচেতন থাকেন, এই দ্বৈত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত মিথ্যা স্মৃতির মনোবিজ্ঞান, মিথ্যা অভিযোগের সামাজিক গতিশীলতা, নির্দোষিতার অনুমান নীতির প্রায়োগিক ব্যাখ্যা এবং উভয় পক্ষের সাক্ষ্যকে সমান মনোযোগে বিশ্লেষণ করার দক্ষতা। একইসাথে নারী নির্যাতনের বাস্তবতা এবং ভিকটিমের প্রতি সংবেদনশীলতাও প্রশিক্ষণে থাকবে, কারণ সত্যিকারের নির্যাতনের মামলায় বিচারকের সংবেদনশীলতা অপরিহার্য।

৮২.৩ মামলা ব্যবস্থাপনা সংস্কার: দীর্ঘসূত্রতা কমানো

নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালে মামলার দীর্ঘসূত্রতা কমানো মিথ্যা মামলার ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে সাহায্য করবে।

২০২৫ সালের সংশোধনীতে বিচারকাল ৯০ দিনে সীমিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু বর্তমান বিচারিক কাঠামোয় এটি বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ প্রতিটি ট্রাইব্যুনালে দেড় হাজারের বেশি মামলা বিচারাধীন।

প্রস্তাবিত সমাধান হলো নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে দুটি ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা এবং বিচারকের সংখ্যা বাড়ানো। এর পাশাপাশি মামলা ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো এবং অপ্রয়োজনীয় মুলতবি কমানোর জন্য কঠোর নির্দেশিকা প্রয়োজন।

অধ্যায় ৮৩: তুলনামূলক আইনি বিশ্লেষণ: মিথ্যা মামলা রোধে বৈশ্বিক মডেল

৮৩.১ ভারতের অর্নেশ কুমার মামলার প্রভাব: বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা

ভারতে ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের অর্নেশ কুমার বনাম বিহার রাজ্য মামলায় একটি যুগান্তকারী রায় দেওয়া হয়েছিল। এই রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৪৯৮ক ধারায় অর্থাৎ বিবাহিত নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতার মামলায় স্বয়ংক্রিয় গ্রেফতার ন্যায়সঙ্গত নয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই রায়ে কোর্ট পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিল যে ৪৯৮ক ধারার মামলায় গ্রেফতারের আগে কমপক্ষে প্রাথমিক তদন্ত করতে হবে এবং গ্রেফতারের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে হবে। এই রায়ের ফলে ভারতে এই ধারায় মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছিল।

তবে পরে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ২০১৮ সালে সামাজিক অ্যাকশন ফোরাম মামলায় এই নির্দেশিকার কিছু অংশ পরিবর্তন করেছে, কারণ দেখা গেছে যে অনেক সত্যিকারের ভিকটিম এই নতুন ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

এই দুটি রায়ের দ্বন্দ্ব থেকে বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো: সংস্কার এমনভাবে করতে হবে যাতে সত্যিকারের ভিকটিমের সুরক্ষা বজায় থাকে, কিন্তু মিথ্যা মামলার সুযোগ কমে যায়। এই দুটি লক্ষ্য পরস্পরবিরোধী নয়, বরং একটি সুষম আইনি কাঠামো উভয় লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

৮৩.২ যুক্তরাজ্যের ডিউ প্রসেস মডেল: মিথ্যা অভিযোগ এবং ন্যায়বিচারের ভারসাম্য

যুক্তরাজ্যে যৌন অপরাধ এবং পারিবারিক সহিংসতার মামলায় একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় যাকে "Achieving Best Evidence" বা ABE পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে অভিযোগকারীর প্রাথমিক বক্তব্য একটি ভিডিও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়, যেখানে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট প্রোটোকল অনুসরণ করেন।

এই পদ্ধতির দুটি সুবিধা আছে। প্রথমত, ভিকটিমের বক্তব্যকে পেশাদারভাবে সংগ্রহ করা হয়, যা সাক্ষ্যের মান উন্নত করে। দ্বিতীয়ত, প্রোটোকলভুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার একটি স্বাভাবিক সুযোগ তৈরি হয়।

যুক্তরাজ্যে এছাড়াও একটি Crown Prosecution Service বা CPS রয়েছে, যারা পুলিশের তদন্তের পর সিদ্ধান্ত নেয় যে মামলাটি আদালতে পাঠানো হবে কিনা। সিপিএস দুটি মানদণ্ড ব্যবহার করে: প্রমাণের পর্যাপ্ততা এবং জনস্বার্থ। যদি প্রমাণ পর্যাপ্ত না হয়, তাহলে মামলা আদালতে পাঠানো হয় না। এই কেন্দ্রীয় মামলা মূল্যায়ন ব্যবস্থা বাংলাদেশে অনুপস্থিত।

বাংলাদেশে একটি অনুরূপ "Public Prosecution Review" কাঠামো তৈরি করা যেতে পারে যেখানে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা আদালতে যাওয়ার আগে একটি স্বাধীন পর্যালোচনা হবে।

৮৩.৩ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মডেল: মধ্যস্থতা ও পুনরুদ্ধারমূলক ন্যায়বিচার

নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্কে পারিবারিক বিরোধের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ "restorative justice" বা পুনরুদ্ধারমূলক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সমাধান করা হয়। এই পদ্ধতিতে শুধু শাস্তি নয়, বরং ক্ষতি পুনরুদ্ধার এবং সম্পর্ক মেরামতের উপর জোর দেওয়া হয়।

পুনরুদ্ধারমূলক ন্যায়বিচারের কিছু নীতি বাংলাদেশের পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে কোনো গুরুতর শারীরিক ক্ষতি হয়নি সেসব পারিবারিক বিরোধে আদালতে মামলা করার আগে বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতার একটি ব্যবস্থা তৈরি করা যেতে পারে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই মধ্যস্থতায় একজন প্রশিক্ষিত মধ্যস্থতাকারী উভয় পক্ষকে শুনবেন এবং সমাধানের একটি পথ খুঁজে বের করবেন। যদি মধ্যস্থতায় সমাধান না হয়, তাহলে মামলা আদালতে যাবে। এই ব্যবস্থায় মামলার চাপ কমবে এবং অনেক বিরোধ সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সমাধান হবে।

অধ্যায় ৮৪: সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার: দীর্ঘমেয়াদী পথনির্দেশনা

৮৪.১ শিক্ষা ব্যবস্থায় লিঙ্গ-সমতার সঠিক ধারণা প্রতিষ্ঠা

মিথ্যা মামলার সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় লিঙ্গ-সমতার যে ধারণা শেখানো হয়, তা মূলত নারীর অধিকারের উপর কেন্দ্রীভূত। এটি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু লিঙ্গ-সমতার সম্পূর্ণ ধারণা শুধু নারীর অধিকার নয়, সকলের সমান অধিকার। এই সম্পূর্ণ ধারণাটি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

বিশেষত আইন শিক্ষায় এই পরিবর্তনটি জরুরি। আইনের ছাত্ররা যখন লিঙ্গ ও আইনের সম্পর্ক নিয়ে পড়েন, তখন তারা শুধু নারীর প্রতি ঐতিহাসিক বৈষম্যের কথা পড়েন। পুরুষের আইনি দুর্বলতার কথা এই পাঠ্যক্রমে প্রায় অনুপস্থিত। এই ফাঁকটি পূরণ করা দরকার।

৮৪.২ পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা এবং সংকট সমর্থন ব্যবস্থা

বাংলাদেশে মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার কোনো সংগঠিত ব্যবস্থা নেই। এই শূন্যতা পূরণ করা জরুরি।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় প্রতিটি জেলায় একটি "পুরুষ সহায়তা কেন্দ্র" স্থাপন করা যেতে পারে যেখানে মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা, আইনি তথ্য এবং সামাজিক সহায়তা পাওয়া যাবে। এই কেন্দ্রগুলো সরকারি এবং বেসরকারি অংশীদারিত্বে পরিচালিত হতে পারে।

এর পাশাপাশি একটি জাতীয় হেল্পলাইন তৈরি করা যেতে পারে যেখানে মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষরা প্রাথমিক আইনি পরামর্শ এবং মানসিক সহায়তা পেতে পারেন।

৮৪.৩ মিডিয়া সংস্কার: দায়িত্বশীল সংবাদমাধ্যমের জন্য নীতিমালা

বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের জন্য একটি বিশেষ আচরণবিধি তৈরি করা প্রয়োজন যা নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় সংবাদ পরিবেশনায় ন্যায্য মানদণ্ড নির্ধারণ করবে।

এই আচরণবিধিতে থাকতে পারে: আদালতে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগে অভিযুক্তের নাম ও পরিচয় প্রকাশ না করার নীতি, উভয় পক্ষের বক্তব্য সমানভাবে উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা, মামলা খারিজ বা অভিযুক্তের

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

খালাসের সংবাদ একই গুরুত্বের সাথে প্রকাশের নির্দেশিকা এবং আদালত অবমাননার বিধান কঠোরভাবে প্রয়োগ করার সুপারিশ।

প্রেস কাউন্সিল অব বাংলাদেশ এই আচরণবিধি তৈরিতে উদ্যোগ নিতে পারে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের মানদণ্ড, বিশেষত যুক্তরাজ্যের Editors' Code of Practice এই ক্ষেত্রে একটি অনুকরণীয় মডেল।

৮৪.৪ নারী ও পুরুষ সংগঠনের মধ্যে সংলাপ

বাংলাদেশে নারী অধিকার সংগঠনগুলো এবং পুরুষ অধিকারের পক্ষে কথা বলা মহলগুলোর মধ্যে একটি গঠনমূলক সংলাপ প্রয়োজন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এই দুটি মহল প্রায়ই একে অপরকে শত্রু হিসেবে দেখে। নারী অধিকার সংগঠনগুলো মনে করে যে পুরুষ অধিকারের কথা বলা নারীর সুরক্ষাকে দুর্বল করে। অন্যদিকে পুরুষ অধিকারের পক্ষে যারা কথা বলেন, তারা অনেক সময় নারীর প্রকৃত কষ্টকে অস্বীকার করার ঝুঁকিতে পড়েন।

কিন্তু এই দ্বন্দ্বটি একটি মিথ্যা দ্বন্দ্ব। ন্যায়বিচার একটি বিভাজ্য দ্রব্য নয় যেখানে একজনের বেশি হলে আরেকজনের কম হবে। বরং নারীর জন্য প্রকৃত ন্যায়বিচার এবং পুরুষের জন্য প্রকৃত ন্যায়বিচার একসাথে সম্ভব এবং একটি অপরটির পূরক।

এই সংলাপটি শুরু করার জন্য উভয় মহলের একটি সাধারণ সত্যকে স্বীকার করতে হবে: মিথ্যা মামলা সত্যিকারের ভিকটিমদের জন্যও ক্ষতিকর, কারণ এটি নির্যাতনের অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে। সুতরাং মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে লড়াই নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বার্থেই।

অধ্যায় ৮৫: ২০২৪-২০২৬ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, সাম্প্রতিক আইনি সংস্কার এবং ভবিষ্যতের সুযোগ

৮৫.১ অন্তর্বর্তী সরকারের আইনি সংস্কার এজেন্ডা এবং পুরুষ অধিকারের অনুপস্থিতি

২০২৪ সালের আগস্টে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এই সরকার বেশ কিছু আইনি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ জারি করেছে। দেশটির আইনি কাঠামোয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।

কিন্তু এই সংস্কার এজেন্ডায় একটি স্পষ্ট অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়: পুরুষের আইনি অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্নটি কার্যত অনুপস্থিত।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যে সংশোধনী আনা হয়েছে, সেটি ধর্ষণের সংজ্ঞায় কিছু লিঙ্গ-অন্তর্ভুক্তি এনেছে। কিন্তু মিথ্যা মামলার কাঠামোগত সমস্যা, জামিনের বিধান, প্রাথমিক তদন্তের অনুপস্থিতি এবং ক্ষতিপূরণের শূন্যতা এই সংস্কারে সমাধান হয়নি।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই অনুপস্থিতির কারণ কি? বিশ্লেষণ করলে একই রাজনৈতিক প্রণোদনার সমস্যা দেখা যায় যা আগের সরকারের আমলেও ছিল। পুরুষ অধিকার রক্ষার আইনি সংস্কার করলে তা নারী ভোটারদের বিরাগ ভাজন হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে। এই রাজনৈতিক ক্যালকুলাস অন্তর্বর্তী সরকারের জন্যও প্রযোজ্য।

৮৫.২ ২০২৫ সালের আইনি সংস্কারের মূল্যায়ন: কতটুকু এগিয়েছি, কতটুকু বাকি

২০২৫ সালে বাংলাদেশে আইনি সংস্কারের বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সংশোধনীতে ধর্ষণের সংজ্ঞায় লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার দিকে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, বিচারকাল ৯০ দিনে সীমিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিচারব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ফৌজদারি কার্যবিধির সংশোধনীতে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে কিছু নতুন সুরক্ষাবিধান যোগ করা হয়েছে। বিশেষত গ্রেফতারের তথ্য লিপিবদ্ধ করার এবং আইনজীবীর সাথে যোগাযোগের সুযোগ নিশ্চিত করার বিধান ইতিবাচক।

কিন্তু মূল কাঠামোগত সমস্যাগুলো রয়ে গেছে। জামিন অযোগ্যতার বিস্তৃত বিধান, প্রাথমিক তদন্তের অনুপস্থিতি, পরিবারের সকল সদস্যকে আসামি করার অনুমতি এবং মিথ্যা মামলার কার্যকর শাস্তির অনুপস্থিতি এগুলো এখনো সংস্কারের বাইরে।

এই মূল্যায়ন করলে বলা যায় যে ২০২৫ সালের সংস্কার একটি শুরু, কিন্তু একটি সম্পূর্ণ সংস্কার নয়। আরও অনেক পথ বাকি।

৮৫.৩ রাজনৈতিক সুযোগ এবং সংস্কারের পথ

বাংলাদেশে পুরুষ অধিকারের আইনি সংস্কারের জন্য বর্তমান মুহূর্তটি একটি বিশেষ সুযোগ। কারণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর একটি নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে যাদের নতুন নীতি প্রতিষ্ঠা করার একটি বিশেষ সুযোগ রয়েছে।

এই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য কয়েকটি কৌশলগত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

প্রথম পদক্ষেপ হলো একটি সংসদীয় কমিটি বা রাষ্ট্রীয় কমিশন গঠন করা যার কাজ হবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, যৌতুক নিরোধ আইন এবং পারিবারিক আইনের মিথ্যা মামলা-সংক্রান্ত সমস্যার পূর্ণ তদন্ত করা এবং সংস্কারের সুপারিশ করা।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো আইন কমিশনকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনি সংস্কারের একটি পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ তৈরির দায়িত্ব দেওয়া।

তৃতীয় পদক্ষেপ হলো নারী অধিকার সংগঠনগুলোকে সংস্কার প্রক্রিয়ায় অংশীদার করা। যদি এই সংগঠনগুলোকে বোঝানো যায় যে মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে সংস্কার আসলে সত্যিকারের ভিকটিমদের জন্যও ভালো, তাহলে রাজনৈতিক বাধাটি কমবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

চতুর্থ পদক্ষেপ হলো আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার ব্যাপক অধ্যয়ন এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য সর্বোত্তম মডেল নির্বাচন করা।

অধ্যায় ৮৬: মিথ্যা মামলা, পুরুষ অধিকার এবং লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের একটি নতুন দর্শন

৮৬.১ ন্যায়বিচারের বৃত্তাকার মডেল: শুধু শাস্তি নয়, পুনরুদ্ধার

আধুনিক আইনতত্ত্বে ন্যায়বিচারের একটি নতুন ধারণা উদ্ভূত হচ্ছে, যাকে বলা হয় "restorative justice" বা পুনরুদ্ধারমূলক ন্যায়বিচার। এই ধারণায় শুধু শাস্তির উপর নয়, বরং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনরুদ্ধার, ক্ষতি পূরণ এবং সামাজিক সম্পর্ক মেরামতের উপর জোর দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের মিথ্যা মামলার সমস্যায় এই পুনরুদ্ধারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। একটি মিথ্যা মামলায় তিন ধরনের ক্ষতি হয়: ভুয়া আসামির ব্যক্তিগত ক্ষতি, পরিবারের ক্ষতি এবং সমাজের সামগ্রিক ক্ষতি। পুনরুদ্ধারমূলক ন্যায়বিচারে এই তিন ধরনের ক্ষতি মেরামতের চেষ্টা করা হয়।

এই দর্শনের আলোকে মিথ্যা মামলার সমস্যার সমাধান শুধু আইনি শাস্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ক্ষতিপূরণ, পুনর্মিলন এবং পুনর্গঠনের একটি সামগ্রিক কাঠামো প্রয়োজন।

৮৬.২ আমার্তা সেনের সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি এবং পুরুষ অধিকার

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ আমার্তা সেন তাঁর "Development as Freedom" গ্রন্থে মানুষের সক্ষমতার ধারণা উপস্থাপন করেছেন। সেনের মতে, একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রতিটি মানুষের সক্ষমতা বিকাশ নিশ্চিত করা।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে মিথ্যা মামলা একটি সক্ষমতা বিনষ্টকারী ঘটনা। একজন নির্দোষ পুরুষ যখন মিথ্যা মামলায় কারাগারে যান, তখন তাঁর জীবনযাপনের সক্ষমতা, ব্যবহারিক যুক্তি প্রয়োগের সক্ষমতা, পারিবারিক ও সামাজিক সংযোগ বজায় রাখার সক্ষমতা, সকলেরই অবনতি ঘটে। সেনের কাঠামোয় এটি একটি গভীর অন্যায়।

সেনের এই কাঠামো আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে: ন্যায়বিচার শুধু আইনি কাঠামোর বিষয় নয়, এটি মানুষের বাস্তব সক্ষমতার বিষয়। আইনি সংস্কার যদি মানুষের বাস্তব সক্ষমতা বৃদ্ধি না করে, তাহলে সেই সংস্কার অর্থহীন।

৮৬.৩ হেগেলের স্বীকৃতির দর্শন এবং পুরুষ নির্যাতনের অদৃশ্যতা

জার্মান দার্শনিক হেগেল তাঁর দর্শনে "স্বীকৃতি" বা recognition এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা উপস্থাপন করেছেন। হেগেলের মতে, মানুষের পরিচয় এবং মর্যাদা নির্ভর করে অন্যদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার উপর। যখন কারো কষ্ট বা অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়, তখন সেটি তার মানবিক মর্যাদার অবমাননা।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

হেগেলের এই দর্শনের আলোকে বাংলাদেশে পুরুষ নির্যাতনের আইনি অস্বীকৃতি একটি মৌলিক মানবিক অন্যায়। যখন আইন বলে যে পুরুষ পারিবারিক সহিংসতার ভিকটিম হতে পারে না, যখন সমাজ বলে যে পুরুষের কষ্ট "কষ্ট" নয়, তখন পুরুষের মানবিক মর্যাদাকে অস্বীকার করা হয়।

এই স্বীকৃতির সংকট মিথ্যা মামলার সমস্যার একটি গভীর মাত্রা যোগ করে। কারণ স্বীকৃতির অভাবের কারণে পুরুষ তার কষ্টের কথা বলতে পারেন না, আইনি প্রতিকার চাইতে পারেন না এবং সামাজিক সহায়তা পান না। এই নীরবতা মিথ্যা মামলার সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখে।

৮৬.৪ হান্না আরেন্টের রাজনৈতিক দর্শন এবং আইনের সামনে সমতা

হান্না আরেন্ট তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে "আইনের সামনে সমতা" বা equality before law কে একটি মৌলিক রাজনৈতিক মূল্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আরেন্টের মতে, আইনের সামনে সমতা শুধু একটি আইনি নীতি নয়, এটি একটি রাজনৈতিক মূল্য যা সমাজের রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি।

আরেন্ট আরও বলেছেন যে যখন কোনো গোষ্ঠীকে আইনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তখন সেটি শুধু সেই গোষ্ঠীর নয়, পুরো রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিকর। কারণ আইনের সামনে সমতা ভাঙলে সমগ্র আইনি ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সামনে পড়ে।

বাংলাদেশে পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়টি আরেন্টের এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটি শুধু পুরুষের সমস্যা নয়, এটি বাংলাদেশের সামগ্রিক আইনি ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার সমস্যা।

অধ্যায় ৮৭: মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে একটি সামগ্রিক কর্মকৌশল

৮৭.১ স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ: তাৎক্ষণিক সংস্কারের রোডম্যাপ

স্বল্পমেয়াদী অর্থাৎ দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে।

প্রথম পদক্ষেপ হলো নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে সংশোধন এনে জামিনের বিধানকে আরও ন্যায়সঙ্গত করা। গুরুতরতার ভিত্তিতে দুটি স্তরে অপরাধ শ্রেণীভুক্ত করা এবং দ্বিতীয় স্তরের অপরাধে জামিনের বিবেচনাধীন ক্ষমতা দেওয়া।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো মামলা দায়েরের সাথে সাথে একটি প্রাথমিক শুনানির ব্যবস্থা করা যেখানে আদালত মামলার প্রাথমিক সম্ভাবনা মূল্যায়ন করবে।

তৃতীয় পদক্ষেপ হলো মিথ্যা মামলার সংজ্ঞা বিস্তৃত করা এবং প্রমাণের মানদণ্ড বাস্তবসম্মত করা যাতে ধারা ১৭ কার্যকরভাবে প্রয়োগ হতে পারে।

চতুর্থ পদক্ষেপ হলো নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মামলার জট কমানো।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পঞ্চম পদক্ষেপ হলো পুলিশের তদন্ত প্রক্রিয়ায় একটি বাধ্যতামূলক তথ্য যাচাই পর্যায় যোগ করা।

৮৭.২ মধ্যমেয়াদী পদক্ষেপ: কাঠামোগত সংস্কারের রোডম্যাপ

মধ্যমেয়াদে অর্থাৎ পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে গভীর কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন।

প্রথম কাঠামোগত সংস্কার হলো পারিবারিক আইনকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ করা। সন্তানের হেফাজতে যৌথ হেফাজতকে ডিফল্ট নিয়মে পরিণত করা, ভরণপোষণের দায়িত্ব উভয় পিতামাতার সক্ষমতা অনুযায়ী নির্ধারণ করা এবং তালাকের পরিণতি উভয় পক্ষের জন্য সমান করা।

দ্বিতীয় কাঠামোগত সংস্কার হলো গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ করা, যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষও ভিকটিম হিসেবে আইনি সুরক্ষা পাবেন।

তৃতীয় কাঠামোগত সংস্কার হলো একটি জাতীয় আইনি সহায়তা ব্যবস্থা তৈরি করা যেখানে মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষরাও বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পাবেন।

৮৭.৩ দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ: সামাজিক রূপান্তরের রোডম্যাপ

দীর্ঘমেয়াদে অর্থাৎ দশ থেকে পনের বছরের মধ্যে সামাজিক রূপান্তরের কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম পদক্ষেপ হলো শিক্ষাক্রমে লিঙ্গ-সমতার একটি সম্পূর্ণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো মিডিয়া সাক্ষরতা বৃদ্ধি করা যাতে মানুষ মিডিয়া ট্রায়ালের বিপদ সম্পর্কে সচেতন হন।

তৃতীয় পদক্ষেপ হলো নারী ও পুরুষ অধিকার সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি স্থায়ী সংলাপ মঞ্চ তৈরি করা।

চতুর্থ পদক্ষেপ হলো বিচার বিভাগকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং বিচারিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

সপ্তম খণ্ডের উপসংহার: ন্যায়বিচারের পথে একটি সৎ রাজনীতির দাবি

সপ্তম খণ্ড জুড়ে আমরা মিথ্যা মামলার রাজনীতির একটি বহুমাত্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমরা দেখেছি কীভাবে আইনের ভাষায়, বিচারিক প্রক্রিয়ায়, পুলিশি তদন্তে, আইনজীবী শিল্পে, মিডিয়ায় এবং সামাজিক মিডিয়ায় একটি কাঠামো গড়ে উঠেছে যা মিথ্যা মামলাকে সম্ভব করে, লাভজনক করে এবং প্রায় শাস্তিমুক্ত রাখে।

আমরা দেখেছি যে এই কাঠামো কোনো একক ষড়যন্ত্রের ফল নয়। এটি অনেক শক্তির একটি অনিচ্ছাকৃত সমন্বয়ের ফল: রাজনৈতিক প্রণোদনা, আর্থিক স্বার্থ, সামাজিক পক্ষপাত, মনোবৈজ্ঞানিক গতিশীলতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

আমরা দেখেছি যে এই সমস্যার সমাধান একটি একক আইনি সংস্কারে সম্ভব নয়। আইনি, বিচারিক, তদন্ত, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি সমন্বিত কৌশল প্রয়োজন।

এই খণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো: মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে লড়াই নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি লড়াই নয়। এটি ন্যায়বিচার ও অন্যায়ের মধ্যে একটি লড়াই। সত্যিকারের ভিকটিম, পুরুষ হোক বা নারী, সুবিচার পাবেন এটাই একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজের দাবি। এবং যারা মিথ্যা অভিযোগ করে এই ব্যবস্থার সুযোগ নেন, তারা শুধু নির্দোষ পুরুষের ক্ষতি করছেন না, তারা সত্যিকারের ভিকটিমদেরও ক্ষতি করছেন।

এই সত্যটি যেদিন বাংলাদেশের আইনি ও সামাজিক ব্যবস্থা স্বীকার করবে, সেদিন থেকে প্রকৃত সংস্কারের পথ খুলবে।

ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত হলো মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে সংস্কার একটি নারীবিরোধী পদক্ষেপ নয়, এটি একটি ন্যায়বিচারপন্থী পদক্ষেপ। কারণ মিথ্যা মামলা সত্যিকারের ভিকটিমদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে এবং ন্যায়বিচারের পুরো কাঠামোকে দুর্বল করে।

সপ্তম সিদ্ধান্ত হলো বাংলাদেশের আইনি সংস্কারের জন্য আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার সাথে স্থানীয় বাস্তবতার মিলন প্রয়োজন। ভারত, যুক্তরাজ্য বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মডেল হুবহু নকল করলে হবে না, বরং এই মডেলগুলোর মূলনীতিগুলো বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আইনি প্রেক্ষাপটে অভিযোজিত করতে হবে।

অষ্টম সিদ্ধান্ত হলো এই সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক সাহস প্রয়োজন। যে রাজনৈতিক দল বা সরকার এই সংস্কারে এগিয়ে যাবে, তারা স্বল্পমেয়াদে কিছু রাজনৈতিক ঝুঁকি নিতে হবে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে একটি ন্যায়সঙ্গত আইনি ব্যবস্থা গড়ে তোলা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

অষ্টম খণ্ডে আমরা দেখব সামাজিক কাঠামো এবং ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির আরও গভীর বিশ্লেষণ। আমরা পরীক্ষা করব কীভাবে বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে পুরুষ ও নারীর পরস্পর সম্পর্ক বিকৃত হয়েছে এবং কীভাবে একটি সুষ্ঠু সামাজিক চুক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আমরা বিশ্লেষণ করব সামাজিক মিডিয়ার নতুন গতিশীলতা, ডিজিটাল নারীবাদের সীমাবদ্ধতা এবং একটি সত্যিকারের লিঙ্গ-সমতার সমাজ নির্মাণের পথ।

পরিশিষ্ট ক: সপ্তম খণ্ডে আলোচিত মিথ্যা মামলা সংক্রান্ত প্রধান আইনি বিধানের সারণি

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ১৭ তে মিথ্যা মামলার জন্য শাস্তির বিধান হলো সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড। সমস্যা হলো প্রমাণের উচ্চ মানদণ্ড যা কার্যত প্রয়োগকে অসম্ভব করে তোলে। সংস্কার প্রস্তাব হলো প্রমাণের মানদণ্ড বাস্তবসম্মত করা এবং তিনটি পরিস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয় তদন্তের ব্যবস্থা করা।

ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ধারা ৫৪ তে পুলিশের গ্রেফতারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সমস্যা হলো প্রাথমিক তদন্ত ছাড়াই গ্রেফতারের সুযোগ। ২০২৫ সালের সংশোধনী কিছু নতুন সুরক্ষা যোগ করেছে কিন্তু মূল সমস্যা রয়ে

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

গেছে। সংস্কার প্রস্তাব হলো নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় গ্রেফতারের আগে প্রাথমিক তদন্তের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা।

যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮ এর ধারায় মিথ্যা যৌতুক মামলার জন্য শাস্তির বিধান হলো সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড। সমস্যা হলো "মিথ্যা" প্রমাণের কঠিনতা এবং প্রায়োগিক বাস্তবায়নের অভাব। সংস্কার প্রস্তাব হলো প্রমাণের মানদণ্ড পরিবর্তন এবং মামলা প্রত্যাহারকে মিথ্যা মামলার প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ২১১ তে মিথ্যা মামলার জন্য শাস্তির সাধারণ বিধান রয়েছে। সমস্যা হলো এই ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় কদাচিৎ প্রয়োগ হয়। সংস্কার প্রস্তাব হলো এই ধারার প্রয়োগকে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার প্রেক্ষাপটে সহজতর করা।

পরিশিষ্ট খ: মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষের জন্য ব্যবহারিক নির্দেশনা

একজন পুরুষ যদি মনে করেন যে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হতে পারে বা ইতোমধ্যে হয়েছে, তিনি নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো বিবেচনা করতে পারেন।

প্রথম পদক্ষেপ হলো একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে অবিলম্বে যোগাযোগ করা। এই পদক্ষেপটি সবচেয়ে জরুরি এবং সময়ের সাথে এর গুরুত্ব বাড়ে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো যেকোনো প্রাসঙ্গিক দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। বার্তা, ইমেইল, ফোন কল রেকর্ড, ব্যাংক লেনদেন, সাক্ষী তথ্য এগুলো পরবর্তীতে কাজে আসতে পারে।

তৃতীয় পদক্ষেপ হলো পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে আইনজীবী ছাড়া কথা না বলা। সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আইনজীবীর সাথে পরামর্শের অধিকার আছে।

চতুর্থ পদক্ষেপ হলো উচ্চ আদালতে জামিনের আবেদন করা। নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় জামিন অযোগ্য হলেও উচ্চ আদালত যৌক্তিক কারণে জামিন দিতে পারেন।

পঞ্চম পদক্ষেপ হলো মামলার সত্যতা সম্পর্কে নিজের পক্ষে সাক্ষী এবং প্রমাণ সংগ্রহে সক্রিয় হওয়া।

ষষ্ঠ পদক্ষেপ হলো মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া। বিশ্বস্ত পরিবার ও বন্ধুদের সহায়তা নেওয়া এবং প্রয়োজনে মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারের পরামর্শ নেওয়া।

সপ্তম পদক্ষেপ হলো মামলার ক্ষতি সম্পর্কে একটি বিস্তারিত রেকর্ড রাখা, কারণ মামলার পরিসমাপ্তিতে ক্ষতিপূরণের দাবিতে এই রেকর্ড কাজে আসবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পরিশিষ্ট গ: মিথ্যা মামলা সংক্রান্ত বৈশ্বিক তথ্য এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

বৈশ্বিকভাবে মিথ্যা অভিযোগের হার নিয়ে গবেষকরা বিভিন্ন সংখ্যা উপস্থাপন করেছেন। সবচেয়ে সুষ্ঠু গবেষণাগুলো বলে যে যৌন সহিংসতার মামলায় মিথ্যা অভিযোগের হার দুই থেকে দশ শতাংশের মধ্যে। তবে পারিবারিক বিরোধ সংক্রান্ত মামলায় যেমন যৌতুক বা পারিবারিক সহিংসতা, এই হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হতে পারে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাব একটি বড় সমস্যা। যে তথ্য পাওয়া যায় তা পরোক্ষ এবং অনুমানভিত্তিক। নারী ও শিশু নির্যাতন আদালতে খালাসের উচ্চ হার, মামলা প্রত্যাহারের ধরন এবং আইনজীবী ও বিচারকদের পর্যবেক্ষণ থেকে ধারণা করা যায় যে বাংলাদেশে এই হার বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে বেশি।

ভারতে জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ৪৯৮ক ধারায় দায়ের করা মামলার মধ্যে দোষী সাব্যস্তের হার মাত্র দশ থেকে পনের শতাংশ। এই তথ্য প্রমাণ করে না যে বাকি মামলাগুলো মিথ্যা, কিন্তু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে।

যুক্তরাজ্যে Crown Prosecution Service এর তথ্য অনুযায়ী মিথ্যা অভিযোগের হার তুলনামূলকভাবে কম, কারণ সেখানে মামলা আদালতে পৌঁছানোর আগে কঠোর যাচাই প্রক্রিয়া আছে। এই প্রক্রিয়াটি বাংলাদেশে অনুকরণীয়।

এই তথ্যগুলো একটি স্পষ্ট বার্তা দেয়: মিথ্যা মামলার সমস্যা বৈশ্বিক কিন্তু বাংলাদেশের বিশেষ আইনি কাঠামো এটিকে আরও গুরুতর করে তুলেছে। সঠিক তথ্য সংগ্রহ এবং বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা এই সমস্যার সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ।

সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টম খণ্ডে আমরা দেখব বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোয় ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির গভীরতর বিশ্লেষণ। আমরা পরীক্ষা করব কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার, শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক দলগুলো এই সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখেছে এবং কীভাবে একটি স্বাস্থ্যকর সামাজিক কাঠামো পুনর্গঠন করা সম্ভব যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়ই সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারবেন।

অষ্টম খণ্ড

সামাজিক কাঠামো, ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি এবং লিঙ্গ-রাজনীতির নতুন বাস্তবতা

গ্রন্থকারের ভূমিকা: অষ্টম খণ্ড প্রসঙ্গে

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

সপ্তম খণ্ডে আমরা মিথ্যা মামলার রাজনীতি, তার কাঠামোগত কারণ এবং সংস্কারের পথনির্দেশনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। সেই আলোচনার শেষে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে অষ্টম খণ্ডে আমরা এই সমস্যার সামাজিক মাত্রাটি আরও গভীরে অনুসন্ধান করব। কারণ আইনগত বিশ্লেষণ যতটুকুই গভীর হোক না কেন, সেই বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি না আমরা সমাজের কাঠামোগত শক্তিগুলো বুঝতে পারি, যেগুলো এই আইনগত পক্ষপাতকে টিকিয়ে রাখে, পুষ্ট করে এবং পুনরুৎপাদন করে।

বাংলাদেশে পুরুষের প্রতি আইনগত বৈষম্য কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার অংশ, যেখানে পুরুষকে সংজ্ঞাগতভাবে শক্তিশালী, সম্পদশালী এবং দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, এবং নারীকে সংজ্ঞাগতভাবে দুর্বল, সুরক্ষার প্রয়োজনীয় এবং নির্দোষ হিসেবে কল্পনা করা হয়। এই সামাজিক কল্পনাটি আইনে, বিচারিক মানসিকতায়, পুলিশি আচরণে, মিডিয়া চিত্রায়নে এবং সাধারণ মানুষের নৈতিক বিবেচনায় প্রতিফলিত হয়। এই কল্পনাটি কোথা থেকে আসে, কীভাবে টিকে থাকে এবং কীভাবে এটি ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতিকে সম্ভব করে তোলে, সেটাই অষ্টম খণ্ডের মূল অনুসন্ধানের বিষয়।

এই খণ্ডটি পড়তে গিয়ে পাঠকের মনে অস্বস্তি হতে পারে। কারণ এই খণ্ডে আমরা এমন কিছু সামাজিক সত্য নিয়ে কথা বলব যা প্রচলিত আলোচনায় নিষিদ্ধ বা ট্যাবু। আমরা বলব যে নারীও কখনো কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেন, যে নারীও কখনো নিপীড়ক হতে পারেন, যে ভিকটিমহুড বা শিকার পরিচয়কে সামাজিক ও আইনি সুবিধার জন্য ব্যবহার করা হতে পারে। এই কথাগুলো বলা মানে কিন্তু এই নয় যে সত্যিকারের ভিকটিমরা মিথ্যাবাদী। এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো একটি জটিল সামাজিক বাস্তবতার সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা, যেখানে মানবিক দুর্বলতা এবং কাঠামোগত প্রণোদনা একসাথে কাজ করে একটি বিকৃত ব্যবস্থা তৈরি করে।

অধ্যায় ৮৮: ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি

৮৮.১ ভিকটিমহুড: একটি সামাজিক নির্মাণের তত্ত্ব

সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে "ভিকটিম" বা শিকার পরিচয়টি কোনো বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান নয়, এটি একটি সামাজিকভাবে নির্মিত পরিচয়। এই পরিচয়টি তৈরি হয় একটি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়ায়, যেখানে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী মিলে নির্ধারণ করে যে কে ভিকটিম এবং কে নয়। এই প্রক্রিয়াটিকে সমাজবিজ্ঞানীরা "ভিকটিম নির্মাণ" বা victim construction বলে অভিহিত করেন। ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী পিয়ের বুর্দিও তাঁর সামাজিক মূলধনের তত্ত্বে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে সমাজে কোনো পরিচয়ের মূল্য নির্ভর করে সেই পরিচয়টি কতটা সামাজিক সম্মান, সহানুভূতি এবং বস্তুগত সুবিধা এনে দিতে পারে তার উপর। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে "নির্যাতিত নারী" বা "শিকার নারী" পরিচয়টি একটি উচ্চ সামাজিক মূল্যের পরিচয়। এই পরিচয় গ্রহণ করলে সহানুভূতি পাওয়া যায়, আইনগত সুরক্ষা পাওয়া যায়, পারিবারিক সমর্থন পাওয়া যায় এবং সামাজিক নিন্দা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অন্যদিকে, "অভিযুক্ত পুরুষ" পরিচয়টি সামাজিকভাবে কলুষিত একটি পরিচয়। এই পরিচয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সন্দেহ, নিন্দা এবং সামাজিক বহিষ্করণ নিয়ে আসে। এই দুটি পরিচয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট সামাজিক অসামতা বিদ্যমান, এবং এই অসামতাই ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির মূল ইন্ধন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? এই শব্দবন্ধটি বিতর্কিত, কারণ অনেকে মনে করেন যে এটি সত্যিকারের ভিকটিমদের অবমাননা করে। কিন্তু একাডেমিক আলোচনায় এই পরিভাষাটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি বলতে সেই সামাজিক পরিবেশকে বোঝায় যেখানে শিকার পরিচয়কে সামাজিক ও বস্তুগত সুবিধার জন্য কৌশলগতভাবে ব্যবহার করা সম্ভব, এবং এই ব্যবহারকে প্রশ্ন করার কোনো সামাজিক সুযোগ নেই। এই সংস্কৃতি তৈরি হয় যখন শিকার পরিচয় দাবি করার কোনো খরচ থাকে না, বরং এই দাবি সামাজিক সুবিধা দেয়। এটি তৈরি হয় যখন শিকারের দাবিকে প্রশ্ন করা নিজেই একটি নৈতিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। এবং এটি টিকে থাকে যখন সত্যিকারের তদন্তের চেয়ে অভিযোগকারীর বক্তব্যের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী ব্র্যাডলি ক্যাম্পবেল এবং জেসন ম্যানিং তাঁদের ২০১৮ সালের গবেষণাগ্রন্থ "The Rise of Victimhood Culture" এ যুক্তি দিয়েছেন যে আধুনিক সমাজে সম্মানের সংস্কৃতি থেকে মর্যাদার সংস্কৃতি এবং তারপর ভিকটিমহুড সংস্কৃতির দিকে একটি ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটছে। ভিকটিমহুড সংস্কৃতিতে সামাজিক মর্যাদা অর্জিত হয় শিকার পরিচয় দাবির মাধ্যমে, এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী এই পরিচয়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বৈশ্বিক প্রবণতাটি একটি বিশেষ আইনগত মাত্রা পেয়েছে, কারণ এখানে ভিকটিমহুড দাবির সাথে সুনির্দিষ্ট আইনগত সুবিধা সরাসরি যুক্ত।

৮৮.২ পিতৃতন্ত্র এবং ভিকটিমহুড সংস্কৃতির একটি বিপরীতাভাসী সম্পর্ক

বাংলাদেশের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক, এটি সত্য। কিন্তু পিতৃতন্ত্র এবং ভিকটিমহুড সংস্কৃতির মধ্যে একটি বিপরীতাভাসী সম্পর্ক বিদ্যমান, যা প্রচলিত বিশ্লেষণে প্রায়ই উপেক্ষিত। পিতৃতন্ত্রের একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হলো নারীকে "সুরক্ষার প্রয়োজনীয়" হিসেবে দেখা। এই দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে নারীকে দুর্বল প্রাণী হিসেবে অবমাননা করে, অন্যদিকে এটি নারীকে একটি বিশেষ সামাজিক সুবিধা দেয়। কারণ "সুরক্ষার প্রয়োজনীয়" মানুষকে সহানুভূতি, সমর্থন এবং আইনগত রক্ষাকবচ দেওয়া হয়। এই পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটি বাংলাদেশের নারী-সম্পর্কিত আইনগুলোতে গভীরভাবে প্রোথিত। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এবং যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮ এর বেশিরভাগ বিধান এই পিতৃতান্ত্রিক অনুমানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে: নারী দুর্বল, তাই নারীকে বিশেষ সুরক্ষা দিতে হবে। পুরুষ শক্তিশালী, তাই পুরুষের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আইনের হাতিয়ার ব্যবহার করতে হবে।

এই বিপরীতাভাসী বাস্তবতাটি হলো: পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান, সেটি একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে নারীকে কৌশলগত সুবিধা দেয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায়, পারিবারিক বিরোধে, সম্পত্তির দ্বন্দ্বে এবং অনেক সামাজিক পরিস্থিতিতে, "অসহায় নারী" পরিচয়টি সহানুভূতি ও সমর্থন এনে দেয় এবং "শক্তিশালী পুরুষ" পরিচয়টি বিরুদ্ধতা ও অবিশ্বাস আনে। ফলে পিতৃতন্ত্র একটি কৌশলগত হাতিয়ারে পরিণত হয়, যেটিকে সুবিধামতো ব্যবহার করা হয়। যখন নারীর জন্য সুবিধাজনক, তখন "আমি দুর্বল, আমার সুরক্ষা দরকার" বলা হয়। যখন নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য শক্তিশালী হওয়া দরকার, তখন পিতৃতান্ত্রিক সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করা হয়। এই দ্বিমুখী কৌশলটি আইনি প্রসঙ্গে বিশেষভাবে কার্যকর, কারণ আইনে নারীকে স্বাভাবিক ভিকটিম এবং পুরুষকে স্বাভাবিক অপরাধী হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

৮৮.৩ বাংলাদেশে ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির বিকাশের ঐতিহাসিক পটভূমি

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশে ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির বিকাশ একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যা বেশ কয়েকটি ধাপে ঘটেছে। প্রথম ধাপে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর নারী নির্যাতনের বিষয়টি জাতীয় চেতনায় একটি কেন্দ্রীয় স্থান পায়। যুদ্ধে নারীদের উপর যে ব্যাপক যৌন সহিংসতা হয়েছিল, তা বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত হয়। এই ঐতিহাসিক ট্রমা থেকে একটি সামাজিক সংবেদনশীলতা তৈরি হয় যা নারীর যেকোনো ভোগান্তির দাবিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।

দ্বিতীয় ধাপে, ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে বাংলাদেশে নারী সংগঠনগুলো এবং এনজিওগুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সময়ে "নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন" একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে, কারণ বাংলাদেশে নারীর প্রতি সত্যিকারের সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরিতে এই আন্দোলন অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু এই আন্দোলনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে একটি কাঠামো তৈরি হয়েছে যেখানে নারীর অভিযোগকে প্রশ্ন করা নিজেই একটি নৈতিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

তৃতীয় ধাপে, ২০০০ এর দশকে ডিজিটাল মিডিয়ার বিস্তার এবং ২০১০ এর দশকে সামাজিক মিডিয়ার উত্থান ভিকটিমহুড সংস্কৃতিকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে। এখন একজন নারী সামাজিক মিডিয়ায় একটি অভিযোগ করলে, সেটি মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। "বিশ্বাস করো নারীকে" বা "বিলিভ উইমেন" আন্দোলনের প্রভাবে সামাজিক মিডিয়ায় নারীর অভিযোগকে তাৎক্ষণিকভাবে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় এবং অভিযুক্ত পুরুষের বিরুদ্ধে একটি তাৎক্ষণিক সামাজিক বিচার শুরু হয়ে যায়।

চতুর্থ ধাপে, ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে এবং ৪৩৩টি সুপারিশ প্রণীত হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলো নারীর অধিকারের বৈধ দাবিগুলোর কথা বলেছে, কিন্তু পুরুষের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি এই কমিশনের আলোচনায় অনুপস্থিত থেকে গেছে।

৮৮.৪ ভিকটিমহুড সংস্কৃতির মনোবৈজ্ঞানিক মূল

ভিকটিমহুড সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য মনোবিজ্ঞানের কিছু ধারণা সহায়ক। আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী মার্টিন সেলিগম্যান তাঁর "শিক্ষিত অসহায়ত্ব" বা learned helplessness তত্ত্বে ব্যাখ্যা করেছেন যে মানুষ এবং প্রাণী যখন বারবার প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় এবং নিজেদের অসহায় মনে করে, তখন তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং নিজেদের শিকার হিসেবে দেখতে শুরু করে। কিন্তু সেলিগম্যানের তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসার ঘটেছে: সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে শিকার পরিচয়টি কখনো কখনো শিক্ষিত হয়, অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ মানুষকে নিজেদের শিকার হিসেবে দেখতে শেখায়।

ইসরায়েলি মনোবিজ্ঞানী মায়াভ লেভি-রাজমান ২০২১ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় "ভিকটিমহুড অভিমুখিতা" বা victimhood orientation এর ধারণা তৈরি করেছেন। এই গবেষণায় তিনি দেখিয়েছেন যে কিছু মানুষের মধ্যে শিকার পরিচয়ের প্রতি একটি স্থায়ী মনোভাব থাকে, যারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেদের শিকার হিসেবে উপস্থাপন করতে অভ্যস্ত এবং অপরের কষ্টের প্রতি কম সহানুভূতিশীল। এই মনোভাবটি একটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, এটি সামাজিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত এবং শক্তিশালী হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই মনোবৈজ্ঞানিক বাস্তবতাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যখন সমাজ, আইন এবং মিডিয়া একসাথে বার্তা দেয় যে নারীর অভিযোগ স্বাভাবিকভাবেই সত্য এবং পুরুষ স্বাভাবিকভাবেই দোষী, তখন এই

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

সামাজিক পরিবেশ একটি নির্দিষ্ট ধরনের আচরণকে পুরস্কৃত করে। যারা শিকার পরিচয় নিতে সক্ষম এবং যারা এই পরিচয়কে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করতে পারেন, তারা সামাজিক, আইনগত এবং অর্থনৈতিক সুবিধা পান। এই প্রণোদনামূলক কাঠামো ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতিকে পুনরুৎপাদন করে।

অধ্যায় ৮৯: পরিবার কাঠামো এবং লিঙ্গ-পক্ষপাতের সামাজিক প্রজনন

৮৯.১ বাংলাদেশের পারিবারিক কাঠামো: একটি জটিল দ্বন্দ্ব

বাংলাদেশের পারিবারিক কাঠামো একটি জটিল এবং দ্বন্দ্বমূলক সত্তা। এটি একদিকে পিতৃতান্ত্রিক, অর্থাৎ পুরুষ সাধারণত পারিবারিক সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে থাকেন এবং নারীর গতিশীলতা ও স্বাধীনতা সীমিত। কিন্তু অন্যদিকে, এই পারিবারিক কাঠামো পুরুষের উপর অপরিসীম চাপ এবং দায়িত্বও চাপিয়ে দেয়। পুরুষকে পরিবারের একমাত্র বা প্রধান উপার্জনকারী হতে হয়, পরিবারের সকল সদস্যের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হয়, বৃদ্ধ পিতামাতার দেখাশোনা করতে হয় এবং সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য অর্থনৈতিকভাবে সফল থাকতে হয়। এই দায়িত্বগুলো পালন করতে ব্যর্থ হলে পুরুষ সামাজিকভাবে নিন্দিত হন, পরিবার থেকে প্রত্যাখ্যাত হন এবং অনেক ক্ষেত্রে আইনগত সমস্যার মুখে পড়েন।

বাংলাদেশের পারিবারিক বিরোধের একটি প্রধান উৎস হলো বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ি এবং বাপের বাড়ির মধ্যে নারীর আনুগত্যের দ্বন্দ্ব। বাংলাদেশে নারীর বিয়ের পর তাঁর প্রাথমিক পরিবার হওয়া উচিত স্বামীর পরিবার, এই সামাজিক প্রত্যাশা বিদ্যমান। কিন্তু একই সাথে, অনেক নারীর নিজের পরিবারের সাথে গভীর বন্ধন থাকে এবং তাঁরা নিজের পরিবারের প্রতি অগ্রাধিকার দেন। এই দ্বন্দ্বটি প্রায়ই পারিবারিক বিরোধের রূপ নেয়। কিন্তু যখন এই বিরোধটি আইনের দরজায় পৌঁছায়, তখন আইনগত কাঠামো একতরফাভাবে নারীর পক্ষে কাজ করে।

বাংলাদেশের পরিবারে মা-শাশুড়ির ভূমিকা নিয়ে একটি প্রচলিত কিন্তু প্রায়ই উপেক্ষিত আলোচনা রয়েছে। নারী-বান্ধব আইনগুলোতে "শাশুড়ি" বা "ননদ" বা অন্য মহিলা পারিবারিক সদস্যরা প্রায়ই আসামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকেন, কারণ অনেক মামলায় দেখা যায় যে শাশুড়ি বা ননদ নারীর প্রতি নেতিবাচক আচরণে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো যে, পারিবারিক বিরোধে নারীর বিরুদ্ধে নারীর সংঘাতটিও একটি বাস্তব ঘটনা, যা পুরুষতন্ত্রের একক ব্যাখ্যায় ধরা পড়ে না। যখন একটি মামলায় শাশুড়ি আসামি হন, তখন আমরা দেখি যে আইনি ব্যবস্থা সব পুরুষকে আসামি করে, কিন্তু সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট নারীকেও আসামি করে। তবুও জনমানসে সহানুভূতির কেন্দ্রে থাকেন নারী অভিযোগকারী, এবং সামাজিক নিন্দার কেন্দ্রে থাকেন পুরুষ।

৮৯.২ বিবাহের অর্থনীতি এবং কৌশলগত সুবিধার হিসাব

বাংলাদেশে বিবাহ শুধু একটি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, এটি একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানও। বিবাহের মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তর হয়, পরিবারগুলোর সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় এবং ব্যক্তির অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। এই অর্থনৈতিক বাস্তবতাটি বোঝা না গেলে পারিবারিক বিরোধের আইনগত মাত্রা বোঝা সম্ভব নয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশে মুসলিম আইন অনুযায়ী, বিবাহের সময় স্বামীকে স্ত্রীকে মহর দিতে হয়। এই মহরের একটি অংশ বিবাহের সময় নগদ দেওয়া হয় এবং একটি অংশ উপস্থিত রাখা হয়, যা বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় দিতে হয়। এই মহরের বিধানটি মূলত নারীর সুরক্ষার জন্য তৈরি, কারণ বিবাহ-বিচ্ছেদের পর নারী যেন অসহায় না হয়ে পড়েন সেই উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রণোদনার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই বিধানটি বিবাহ-বিচ্ছেদকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করে তোলার একটি উপায় হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

একইভাবে, যৌতুক মামলা দায়ের করার ক্ষমতাটিও একটি কৌশলগত সুবিধা হিসেবে কাজ করতে পারে। একজন নারী যদি স্বামীর সাথে বিবাদে থাকেন এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় সম্পত্তি বা ক্ষতিপূরণ পেতে চান, তাহলে যৌতুক মামলা বা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করা একটি কার্যকর কৌশল। কারণ এই মামলার পরিণতিতে পুরুষ বা তার পরিবার সাধারণত দ্রুত মীমাংসায় রাজি হয়, যাতে দীর্ঘ কারাবাস এবং সামাজিক লাঞ্ছনা এড়ানো যায়। গবেষকরা এই ঘটনাকে "আইনি ব্ল্যাকমেইল" বলে অভিহিত করেছেন।

এই কৌশলটির একটি কাঠামোগত ব্যাখ্যা আছে। অর্থনৈতিক তত্ত্বের ভাষায়, যখন কোনো কাজের সুবিধা তার খরচের চেয়ে বেশি, তখন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সেই কাজ করে। বাংলাদেশে মিথ্যা মামলার "সুবিধা" অনেক, কারণ এতে সম্পত্তি পাওয়া যায়, মীমাংসার মাধ্যমে অর্থ পাওয়া যায় এবং সামাজিক সহানুভূতি পাওয়া যায়। আর এই মামলার "খরচ" অনেক কম, কারণ মিথ্যা প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব এবং মিথ্যা মামলাকারীর বিরুদ্ধে শাস্তির কার্যকর ব্যবস্থা নেই। এই অসামতার কারণে মিথ্যা মামলা একটি যৌক্তিক কৌশল হয়ে ওঠে।

৮৯.৩ শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি এবং আইনগত কৌশলের সংযোগ

বাংলাদেশে পারিবারিক বিরোধে শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির বিষয়টি একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। অনেক মামলায় দেখা যায় যে বিবাহ-বিচ্ছেদ বা পারিবারিক বিরোধের সময় নারীর পক্ষ থেকে শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তিতে অংশ পাওয়ার দাবি উঠে আসে। যদিও মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী স্ত্রী সরাসরি স্বামীর পরিবারের সম্পত্তির অধিকারী নন, তবুও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করে পরিবারের সকল সদস্যকে আসামি করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সম্পত্তির উপর চাপ তৈরি করা সম্ভব।

এই কৌশলটি কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে হলে একটি কাল্পনিক কিন্তু বাস্তব-ভিত্তিক পরিস্থিতি কল্পনা করুন। একটি পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ হয়েছে। স্ত্রী চান বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং একটি বড় আর্থিক মীমাংসা। কিন্তু স্বামীর পরিবার রাজি নয়। এই পরিস্থিতিতে স্ত্রী বা তাঁর পক্ষের মানুষ যদি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন, তাহলে স্বামী, তার বাবা, ভাই এবং অন্য পুরুষ সদস্যরা সকলেই গ্রেফতারের ঝুঁকিতে পড়েন। জামিন অযোগ্য অপরাধে গ্রেফতার হলে কারাগারে যেতে হবে, পেশা এবং ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সামাজিক সম্মান হারিয়ে যাবে। এই ভয়ের মুখে পরিবার সাধারণত মীমাংসায় রাজি হয় এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বা সম্পত্তি দিয়ে মামলা তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। এই প্রক্রিয়াটি আইনকে একটি কৌশলগত হাতিয়ারে পরিণত করে।

এটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে অনেক মামলায় সত্যিকারের নির্যাতন হয় এবং নারীর এই আইনগত সুরক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু এই বৈধ প্রয়োজনীয়তাটি এই সত্যটিকে অস্বীকার করে না যে একই আইন অনেক ক্ষেত্রে অপব্যবহারের হাতিয়ার হচ্ছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ৯০: শিক্ষা ব্যবস্থা এবং লিঙ্গ-পক্ষপাতের সামাজিক পুনরুৎপাদন

৯০.১ বাংলাদেশের শিক্ষাক্রমে লিঙ্গ বিষয়ক বার্তা

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা লিঙ্গ-পক্ষপাতের একটি প্রধান সামাজিক প্রজনন কেন্দ্র। প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে লিঙ্গ বিষয়ে যে বার্তাগুলো দেওয়া হয়, সেগুলো প্রায়ই একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোকে স্বাভাবিক এবং অপরিবর্তনীয় হিসেবে উপস্থাপন করে। পাঠ্যপুস্তকে নারীকে প্রায়ই রান্নাঘরে, শিশু লালনপালনে এবং পরিবারের সেবায় চিত্রিত করা হয়। পুরুষকে চিত্রিত করা হয় বাইরের কাজে, পেশায় এবং সামাজিক নেতৃত্বে। এই চিত্রায়নটি একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গ ভূমিকার নিয়মকে স্বাভাবিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার লিঙ্গ বিষয়ক বার্তার একটি আরও সূক্ষ্ম মাত্রা আছে। নৈতিক শিক্ষার পাঠে যখন "মা"-কে সর্বোচ্চ আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং "মায়ের অশ্রু" বা "মায়ের কষ্ট"কে সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্যের অভিব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়, তখন অনুপস্থিতভাবে একটি বার্তা দেওয়া হয়: নারীর কষ্ট সর্বোচ্চ নৈতিক গুরুত্বের এবং পুরুষের কষ্ট কম গুরুত্বের। এই শিক্ষণটি শিশুর মানসিকতায় গভীরভাবে বসে যায় এবং পরবর্তী জীবনে তাদের বিচারিক মনোভাবকে প্রভাবিত করে।

সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে লিঙ্গ সমতার যে আলোচনা থাকে, তা প্রায়ই একতরফা। নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যের কথা বলা হয়, কিন্তু পুরুষের বিরুদ্ধে যে বৈষম্যমূলক প্রত্যাশা সমাজ রাখে, সেগুলোর কথা বলা হয় না। পুরুষকে কখনো কাঁদতে নেই, পুরুষকে সবসময় শক্তিশালী থাকতে হবে, পুরুষকে পরিবার বহন করতে হবে, এই প্রত্যাশাগুলো পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর কতটা চাপ তৈরি করে সেটা পাঠ্যপুস্তকে অনুপস্থিত।

৯০.২ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং লিঙ্গ একাডেমিয়ার একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লিঙ্গ অধ্যয়ন বা gender studies একটি উদীয়মান ক্ষেত্র। কিন্তু এই ক্ষেত্রটিতে একটি মতাদর্শগত একচেটিয়াত্ব বিদ্যমান। বাংলাদেশের লিঙ্গ অধ্যয়নে প্রায়ই নারীবাদী তত্ত্বগুলোকে একমাত্র বৈধ দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, এবং সমালোচনামূলক পুরুষ অধ্যয়ন বা পুরুষের অধিকার নিয়ে গবেষণাকে প্রায়ই "প্রতিক্রিয়াশীল" বা "নারীবিরোধী" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এই একাডেমিক একচেটিয়াত্বের ফলে কয়েকটি সমস্যা তৈরি হয়। প্রথমত, পুরুষের সামাজিক এবং আইনগত সংকট নিয়ে একাডেমিক গবেষণা অপ্রতুল। দ্বিতীয়ত, এই সংকট নিয়ে যে গবেষণা হয়, তা প্রকাশিত হতে বাধার মুখে পড়ে। তৃতীয়ত, যারা পুরুষের অধিকার নিয়ে কথা বলেন, তারা একাডেমিক সম্প্রদায়ে "পক্ষপাতদুষ্ট" হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে থাকেন। এই পরিবেশ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতা তৈরি করে, যেখানে লিঙ্গ ন্যায়বিচারের একটি সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া সম্ভব হয় না।

বৈশ্বিক একাডেমিয়ায় এই সমস্যাটি স্বীকৃত হচ্ছে। যেমন, ২০২৩ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং আইন গবেষণায় পুরুষের অভিজ্ঞতাকে গবেষণার বিষয় হিসেবে কম গুরুত্ব

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

দেওয়া হয়। এই একাডেমিক ফাঁকটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরও গভীর, কারণ বাংলাদেশে মৌলিক একাডেমিক গবেষণার পরিবেশ এমনিতেই সীমিত।

৯০.৩ পাঠ্যক্রমের বাইরে: অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং লিঙ্গ সমাজীকরণ

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে পরিবার, বন্ধু মহল, ধর্মীয় শিক্ষা এবং মিডিয়ার মাধ্যমে যে অনানুষ্ঠানিক লিঙ্গ শিক্ষা হয়, তা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে প্রায়ই বেশি প্রভাবশালী। বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং শহুরে উভয় পরিবারেই শিশুরা ছোটবেলা থেকেই শিখতে থাকে যে "মেয়েদের কষ্ট দেওয়া পাপ" এবং "ছেলেরা কাঁদে না"। এই দুটি বার্তাই একটি লিঙ্গ পক্ষপাতী নৈতিকতার প্রতিফলন।

প্রথম বার্তাটি, "মেয়েদের কষ্ট দেওয়া পাপ", মূলত একটি ন্যায্য নৈতিক নির্দেশনা। কাউকে কষ্ট দেওয়া পাপ, এটি সার্বজনীন নৈতিকতা। কিন্তু যখন এই বার্তাটি শুধুমাত্র একটি লিঙ্গের জন্য প্রযোজ্য করা হয়, তখন এটি একটি পক্ষপাতী নৈতিকতায় পরিণত হয়। "ছেলেদের কষ্ট দেওয়াও পাপ" বার্তাটি সমানভাবে দেওয়া হয় না। ফলে শিশুরা শিখে নেয় যে নারীর কষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, পুরুষের কষ্ট কম গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় বার্তাটি, "ছেলেরা কাঁদে না", পুরুষের আবেগ প্রকাশকে দুর্বলতার লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করে। এই সামাজিকীকরণের ফলে পুরুষ তার কষ্টের কথা বলতে পারে না, সাহায্য চাইতে পারে না এবং নিজেকে ভিকটিম হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে না। এই নীরবতা পুরুষের বিরুদ্ধে অবিচারকে অদৃশ্য করে রাখে।

অধ্যায় ৯১: ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং লিঙ্গ ব্যবস্থার জটিল সম্পর্ক

৯১.১ ইসলামিক আইনের ব্যাখ্যা এবং লিঙ্গ পক্ষপাত

বাংলাদেশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিশেষত ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলো, লিঙ্গ সম্পর্কের উপর ব্যাপক প্রভাব রাখে। কিন্তু এই প্রভাবটি একরৈখিক নয়। ইসলামিক আইন বা শরিয়ার কিছু বিধান পুরুষকে সুবিধা দেয়, যেমন একাধিক বিবাহ এবং তালাকের সহজ পদ্ধতি। কিন্তু ইসলামিক আইনের কিছু বিধান নারীকেও সুবিধা দেয়, যেমন মহর, ভরণপোষণের অধিকার এবং উত্তরাধিকারের নির্দিষ্ট অংশ।

ইসলামিক আইনের ব্যাখ্যায় বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যাগুলো অনুসরণ করে, যা অনেক ক্ষেত্রে নারীর সামাজিক গতিশীলতাকে সীমিত করে। কিন্তু একই সাথে, এই ঐতিহ্যগত কাঠামো পুরুষের উপরেও নির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। পুরুষকে পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে, পুরুষকে ন্যায়বিচার করতে হবে এবং পুরুষকে নারীর সম্মান রক্ষা করতে হবে। এই ধর্মীয় দায়িত্বগুলো পুরুষকে "রক্ষক" এর ভূমিকায় স্থাপন করে, কিন্তু একই সাথে এই ভূমিকাটি তাকে দায়বদ্ধতার একটি ভার বহন করতে বাধ্য করে।

২০২৫ সালের মে মাসে হেফাজত-ই-ইসলামের বিশাল সমাবেশ এবং নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সুপারিশের বিরোধিতা বাংলাদেশের ধর্মীয়-রাজনৈতিক সংঘর্ষের একটি নতুন অধ্যায় খুলে দিয়েছে। এই সংঘর্ষে একদিকে

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

আছে ঐতিহ্যবাদী ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি যা সমতার নামে যেকোনো পরিবর্তনকে "ইসলামবিরোধী" বলে চিহ্নিত করছে, এবং অন্যদিকে আছে প্রগতিশীল নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যা সামাজিক পরিবর্তনের দাবি করছে। এই দ্বিপক্ষীয় বিতর্কে পুরুষের আইনগত অধিকারের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

৯১.২ মসজিদের ভাষণ, খুতবা এবং লিঙ্গ সামাজিকীকরণ

বাংলাদেশে শুক্রবারের জুমার নামাজের খুতবা লক্ষ লক্ষ মুসল্লির কাছে একটি নিয়মিত সামাজিক বার্তা বহন করে। এই খুতবাগুলোতে পারিবারিক জীবন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং সামাজিক নৈতিকতা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হয়। কিন্তু এই আলোচনায় প্রায়ই পুরুষের দায়িত্বকে জোর দিয়ে বলা হয় এবং পুরুষের অধিকারের কথা কম বলা হয়।

ইসলামিক শিক্ষায় নারীর কষ্ট ও সুরক্ষার বিষয়ে যে আলোচনা হয়, তার বিপরীতে পুরুষ যদি নির্যাতিত হন বা মিথ্যা মামলার শিকার হন, তার জন্য ধর্মীয় বক্তৃতায় প্রায় কোনো পথনির্দেশনা নেই। এই অনুপস্থিতিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের একটি নিরব পক্ষপাত।

৯১.৩ হিন্দু ধর্মীয় আইন এবং পুরুষের সংকট

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের পারিবারিক আইন মুসলিম আইন থেকে ভিন্ন, কিন্তু উভয়েই পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। হিন্দু আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত জটিল এবং অনুৎসাহিত। একজন হিন্দু পুরুষ যদি তার স্ত্রীর সাথে সংঘাতে থাকেন, তাহলে আইনগতভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ পাওয়া কঠিন। কিন্তু বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সকল ধর্মের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। ফলে একজন হিন্দু নারী সহজেই তার স্বামীর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করতে পারেন, কিন্তু স্বামীর জন্য আইনগত প্রতিকার তুলনামূলকভাবে সীমিত।

অধ্যায় ৯২: মিডিয়া, বর্ণনা নির্মাণ এবং পুরুষের বিচার

৯২.১ মূলধারার মিডিয়া এবং লিঙ্গ পক্ষপাতী সংবাদ পরিবেশনা

বাংলাদেশের মূলধারার মিডিয়া, সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং ডিজিটাল সংবাদ মাধ্যম, নারী-পুরুষ সম্পর্কিত ঘটনাগুলো পরিবেশনে একটি সুস্পষ্ট লিঙ্গ পক্ষপাত প্রদর্শন করে। যখন একজন নারী কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তখন মিডিয়া সাধারণত অভিযোগকারী নারীর বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য এবং অভিযুক্ত পুরুষকে সন্দেহজনক হিসেবে উপস্থাপন করে। শিরোনামে প্রায়ই অভিযোগকারীর নাম বাদ দেওয়া হয় কিন্তু অভিযুক্তের নাম, পেশা এবং ছবি প্রকাশিত হয়।

মিডিয়া বিশেষজ্ঞরা এই ঘটনাকে "মিডিয়া ট্রায়াল" বলে অভিহিত করেন। আদালতে মামলা বিচারের আগেই মিডিয়া একটি "বিচার" সম্পন্ন করে ফেলে, যেখানে অভিযুক্ত পুরুষ দোষী সাব্যস্ত হয়ে যায়। এই মিডিয়া

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ট্রায়ালের ক্ষতিটি অপূরণীয়, কারণ পরে আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হলেও মিডিয়ার ক্ষতিকর প্রতিবেদন তার সামাজিক সুনামকে মুছে দিতে পারে না।

মিডিয়ার এই আচরণের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, অর্থনৈতিক কারণ: নারী নির্যাতন সংক্রান্ত সংবাদ পাঠক/দর্শকদের মনে সহানুভূতি ও আগ্রহ জাগায়, যা সংবাদ মাধ্যমের পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক কারণ: নারীবান্ধব সংবাদ পরিবেশন একটি "নিরাপদ" সম্পাদকীয় অবস্থান, কারণ এটি সামাজিকভাবে স্বীকৃত। তৃতীয়ত, সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত পূর্বধারণা: সামাজিক পরিবেশে গড়ে ওঠা লিঙ্গ পক্ষপাত সাংবাদিকদের মনেও বিদ্যমান।

৯২.২ টেলিভিশন নাটক এবং পুরুষবিরোধী বর্ণনার প্রসার

বাংলাদেশের টেলিভিশন নাটক একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক মাধ্যম। লক্ষ লক্ষ পরিবার প্রতিদিন এই নাটকগুলো দেখে এবং এই নাটকের চরিত্র ও বর্ণনা তাদের লিঙ্গ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের জনপ্রিয় টেলিভিশন নাটকে পুরুষ চরিত্রগুলো প্রায়ই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপিত হয়: স্বামী দুর্বল, অবিশ্বস্ত, মদ্যপ বা সহিংস। শাশুড়ি নিষ্ঠুর ও হিংসাত্মক। কিন্তু নারী চরিত্রগুলো সাধারণত ধৈর্যশীল, সহানুভূতিশীল এবং নৈতিকভাবে উন্নত।

এই সাংস্কৃতিক বর্ণনাটি একটি মিথ্যা সার্বজনীনকরণ তৈরি করে। বাস্তবে মানব চরিত্র অনেক জটিল, এবং সকল পুরুষ একইভাবে আচরণ করেন না, একইভাবে সকল নারীও করেন না। কিন্তু টেলিভিশন নাটক এই জটিলতাকে উপেক্ষা করে একটি সরলীকৃত বর্ণনা প্রতিষ্ঠা করে। এই সরলীকৃত বর্ণনাটি দর্শকের মানসিকতায় বসে যায় এবং পুরুষের বিরুদ্ধে যেকোনো অভিযোগকে "বিশ্বাসযোগ্য" করে তোলে।

৯২.৩ সামাজিক মিডিয়া এবং ডিজিটাল মিসান্ড্রির নতুন অধ্যায়

সামাজিক মিডিয়া বাংলাদেশে লিঙ্গ সম্পর্কিত আলোচনার একটি নতুন ক্ষেত্র তৈরি করেছে। ফেসবুক, ইউটিউব এবং টিকটকের মাধ্যমে লিঙ্গ বিষয়ক মতামত এবং অভিযোগগুলো অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই দ্রুততাটি একটি গুরুতর সমস্যা তৈরি করে: যাচাই না করে তথ্য ছড়িয়ে পড়ে এবং একজন পুরুষের সামাজিক ক্ষতি তাৎক্ষণিকভাবে এবং অপূরণীয়ভাবে হয়।

বাংলাদেশে "নাম প্রকাশ করে লজ্জা দাও" বা "নেম অ্যান্ড শেম" সংস্কৃতি ডিজিটাল মাধ্যমে শক্তিশালী হয়েছে। একজন নারী কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে সামাজিক মিডিয়ায় সেই পুরুষের নাম, ছবি, কর্মস্থল এবং ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশনাটি কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজার হাজার শেয়ার পায় এবং পুরুষটির সামাজিক জীবন ধ্বংস হয়। পরে যদি প্রমাণিত হয় যে অভিযোগটি মিথ্যা, তাহলে সংশোধনীটি মূল প্রকাশনার ভগ্নাংশ মানুষের কাছে পৌঁছায়।

এই ডিজিটাল ঘটনাকালীনতার একটি গভীর আইনতাত্ত্বিক সমস্যা আছে। সামাজিক মিডিয়ায় "বিচার" হয় ন্যায়বিচারের কোনো নিয়ম না মেনে। প্রমাণের কোনো মানদণ্ড নেই, পাল্টা বক্তব্যের সুযোগ নেই এবং ভুল হলে ক্ষতিপূরণের কোনো ব্যবস্থা নেই। অথচ এই "বিচারের" ফলাফল আনুষ্ঠানিক আদালতের বিচারের চেয়ে অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক হতে পারে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ৯৩: এনজিও শিল্প এবং পুরুষের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাত

৯৩.১ বাংলাদেশে নারী-বিষয়ক এনজিওর ভূমিকা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ

বাংলাদেশে নারী অধিকার বিষয়ক এনজিওগুলো একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। ব্র্যাক, আশা, নারীপক্ষ, মহিলা আইনজীবী সমিতি এবং আরও অনেক সংগঠন দশকের পর দশক ধরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে আসছে। এই কাজগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বাংলাদেশে নারীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এই সংগঠনগুলোর অবদান অনস্বীকার্য।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা বিদ্যমান, যাকে অর্থনীতির ভাষায় "সংস্থাগত স্বার্থ" বা organizational interest বলা হয়। যে সংগঠনগুলোর অস্তিত্ব এবং তহবিল "নারী নির্যাতন" ধারণার চারপাশে গড়ে উঠেছে, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ থাকে সেই সমস্যাটিকে বড় এবং জরুরি রাখার মধ্যে। যদি "নারী নির্যাতন" সমস্যাটি সমাধান হয়ে যায়, তাহলে এই সংগঠনগুলোর অস্তিত্বের যুক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এটি কোনো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নয়, এটি সামাজিক বিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি প্রাতিষ্ঠানিক গতিশীলতা।

এই প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের কারণে, নারী অধিকার সংগঠনগুলো সাধারণত পুরুষের আইনগত সংকটের কথা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। কারণ পুরুষের সংকট স্বীকার করলে "নারীই সবসময় ভিকটিম" এই বর্ণনাটি দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অনীহাটি আইনি সংস্কারের পথে একটি বড় বাধা।

৯৩.২ আন্তর্জাতিক তহবিল এবং বর্ণনার রাজনীতি

বাংলাদেশে নারী অধিকার সংগঠনগুলোর একটি বড় অংশ আন্তর্জাতিক তহবিলে পরিচালিত হয়। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, পশ্চিমা সরকার এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো এই তহবিলের প্রধান উৎস। এই তহবিলদাতারাও একটি নির্দিষ্ট বর্ণনামূলক কাঠামোর ভিতরে কাজ করেন: তারা "নারী ক্ষমতায়ন" এবং "নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ" বিষয়ক প্রকল্পে অর্থায়ন করেন। "পুরুষের আইনগত সংকট" বিষয়ক প্রকল্পে আন্তর্জাতিক তহবিল পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।

এই তহবিলি কাঠামো একটি বর্ণনার একচেটিয়াত্ব তৈরি করে। যে সংগঠনগুলো তহবিল পেতে চায়, তাদের সেই বর্ণনামূলক কাঠামোর ভিতরে থাকতে হয়। ফলে "পুরুষও ভিকটিম হতে পারেন" এই বার্তাটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মার্জিনালাইজড থেকে যায়।

জাতিসংঘের ইউএন উইমেন সংস্থার বাংলাদেশ কার্যালয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। কিন্তু এই সংস্থার কাজের সংজ্ঞার মধ্যে পুরুষের অধিকার নিয়ে কাজ করার কোনো স্পষ্ট অবকাশ নেই। ২০২৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত ইউএন উইমেন বাংলাদেশের নিউজলেটারে নারী ক্ষমতায়নের বিভিন্ন কর্মসূচির বিবরণ ছিল, কিন্তু পুরুষের আইনগত সমস্যার বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

৯৩.৩ নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের ৪৩৩ সুপারিশ এবং পুরুষ অধিকারের অনুপস্থিতি

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

২০২৪ সালের নভেম্বরে গঠিত নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন ২০২৫ সালে ৪৩৩টি সুপারিশ সম্বলিত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এই প্রতিবেদনে নারীর অধিকার রক্ষা এবং বৈষম্য দূর করার জন্য ব্যাপক সুপারিশ করা হয়েছে। বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার এবং ভরণপোষণে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করার দাবি করা হয়েছে, যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে নতুন আইনের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং নারীর নাগরিকত্ব অধিকারে সংস্কারের কথা বলা হয়েছে।

এই সুপারিশগুলোর বেশিরভাগই ন্যায্য এবং প্রয়োজনীয়। নারীর উত্তরাধিকার অধিকার, নাগরিকত্ব অধিকার এবং কর্মক্ষেত্রে সমতার দাবিগুলো মৌলিক মানবাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এই বিস্তারিত প্রতিবেদনে পুরুষের আইনগত সংকটের কোনো উল্লেখ নেই। মিথ্যা মামলার সমস্যা, পুরুষের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাত, পুরুষ নির্যাতনের আইনি স্বীকৃতির অভাব এই বিষয়গুলো সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।

এই উপেক্ষাটি একটি সুযোগ হারানোর ঘটনা। একটি সত্যিকারের লিঙ্গ-ন্যায়বিচার কমিশন শুধু নারীর অধিকারের কথা বলে না, বরং উভয় লিঙ্গের জন্য ন্যায়বিচারের কাঠামো তৈরির কথা বলে। এই কমিশন সেই সুযোগটি নেয়নি।

অধ্যায় ১৪: ডিজিটাল নারীবাদ, "বিলিভ উইমেন" আন্দোলন এবং প্রমাণের অবমূল্যায়ন

১৪.১ মিটু আন্দোলনের বৈশ্বিক প্রভাব এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা

২০১৭ সালে আন্তর্জাতিকভাবে উদ্ভূত মিটু আন্দোলন বাংলাদেশেও প্রভাব ফেলেছে। এই আন্দোলনটি যৌন হয়রানির শিকার নারীদের সাহসের সাথে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলার একটি শক্তিশালী সামাজিক সুযোগ তৈরি করেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, যেখানে যৌন হয়রানির শিকার নারীরা প্রায়ই সামাজিক লজ্জার কারণে চুপ করে থাকেন, এই আন্দোলনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন এনেছে।

কিন্তু মিটু আন্দোলনের একটি মতাদর্শগত সম্প্রসারণ ঘটেছে, যা "বিলিভ উইমেন" বা "নারীকে বিশ্বাস করো" আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই মতাদর্শ বলে যে যৌন সহিংসতার দাবি করা নারীকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে এবং সেই দাবিকে প্রশ্ন করা নিজেই একটি হয়রানির রূপ। এই মতাদর্শটি আইনি দর্শনের সাথে মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক।

আইনি দর্শনে প্রমাণের বোঝাটি সুস্পষ্ট: অভিযোগকারীকে প্রমাণ দিতে হবে। অভিযুক্তকে নির্দোষতা প্রমাণ করতে হবে না। এই নীতিটি নিরীহ মানুষকে মিথ্যা অভিযোগ থেকে রক্ষা করার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু "বিলিভ উইমেন" মতাদর্শ এই নীতিটিকে অস্বীকার করে। এই মতাদর্শ প্রয়োগ করলে প্রমাণের নীতি বিপরীত হয়ে যায়: অভিযুক্ত পুরুষকে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে হয়।

বাংলাদেশের সামাজিক মিডিয়া সংস্কৃতিতে "বিলিভ উইমেন" মতাদর্শটি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যখন কোনো নারী কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, সেই অভিযোগটি প্রশ্ন করলে সামাজিক মিডিয়ায় তাকে

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

"নারীবিরোধী" বা "ধর্ষণ সমর্থনকারী" বলে আক্রমণ করা হয়। এই সামাজিক চাপ একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে কেউ অভিযোগ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে ভয় পায়।

৯৪.২ "হ্যাশট্যাগ বিচার" এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের বিকৃতি

বাংলাদেশে সামাজিক মিডিয়ায় "হ্যাশট্যাগ বিচার" একটি নতুন ঘটনা হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে। কোনো অভিযোগ উঠলে একটি হ্যাশট্যাগ তৈরি হয়, সেটি ট্রেন্ডিং হয় এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের তাৎক্ষণিক নিন্দার ঢল নামে। এই প্রক্রিয়ায় ন্যায়বিচারের কোনো নীতি মানা হয় না: অভিযুক্তকে জবাব দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না, প্রমাণ যাচাই করা হয় না এবং সম্ভাব্য কারণগুলো বিবেচনা করা হয় না।

এই হ্যাশট্যাগ বিচারের সবচেয়ে ভয়াবহ দিকটি হলো এর অপূরণীয় ক্ষতি। একবার কেউ সামাজিক মিডিয়ায় "খলনায়ক" হিসেবে চিহ্নিত হলে, সেই চিহ্নটি সরানো প্রায় অসম্ভব। এমনকি পরে যদি প্রমাণিত হয় যে অভিযোগটি মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত, তবুও মূল অভিযোগের ছায়া সেই মানুষটির জীবনে স্থায়ীভাবে থাকে। এই অপূরণীয় ক্ষতিটি ন্যায়বিচারের মূলনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।

৯৪.৩ ডিজিটাল নারীবাদ এবং তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব

বাংলাদেশে ডিজিটাল নারীবাদ একটি বৈচিত্র্যময় আন্দোলন। এর মধ্যে সত্যিকারের সামাজিক পরিবর্তনের দাবিদার একটি অংশ আছে যারা নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং নিরাপত্তার দাবিতে কাজ করছেন। কিন্তু একই সাথে, এই আন্দোলনে এমন একটি ধারাও আছে যা পুরুষবিরোধিতাকে নারীবাদের পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করেছে।

এই পুরুষবিরোধী ধারাটি সমাজের জন্য ক্ষতিকর, কারণ এটি প্রকৃত লিঙ্গ সমতার পথ থেকে সরে গিয়ে একটি প্রতিশোধমূলক মনোভাবকে বৈধতা দেয়। যখন কেউ "পুরুষরা সবাই এক" বা "পুরুষ মানেই বিপদ" এই ধরনের সাধারণীকরণ করেন, তখন সেটি শুধু পুরুষের প্রতি অবিচার নয়, এটি নারীবাদের মূল নীতির বিরুদ্ধেও যায়। সত্যিকারের নারীবাদ সকলের মুক্তির কথা বলে, শুধু একটি লিঙ্গের প্রতিশোধের কথা নয়।

অধ্যায় ৯৫: রাজনৈতিক দলগুলোর নারী-ভোট ব্যাংক কৌশল এবং পুরুষ অধিকারের বলিদান

৯৫.১ নারী ভোটার এবং বাংলাদেশের দলীয় রাজনীতির কৌশল

বাংলাদেশে নারী ভোটাররা সামগ্রিক ভোটারের একটি বিশাল অংশ গঠন করেন। ২০২৩ সালের নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, নিবন্ধিত ভোটারদের প্রায় অর্ধেক নারী। এই বৃহৎ নারী ভোটার ভিত্তিকে আকর্ষণ করার জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দল নারীবান্ধব নীতির প্রতিশ্রুতি দেয়।

এই নারী-ভোট ব্যাংক কৌশলটি একটি রাজনৈতিক প্রণোদনা তৈরি করে যা পুরুষের অধিকারের জন্য ক্ষতিকর। কারণ নারীবান্ধব আইন প্রণয়ন করলে নারী ভোটারদের সমর্থন পাওয়া যায়, কিন্তু পুরুষের অধিকার রক্ষার

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

আইন প্রণয়ন করলে সেটি "নারীবিরোধী" হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এই অসম প্রণোদনার কারণে কোনো রাজনৈতিক দলই পুরুষের আইনগত সংকটের কথা বলে না।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন বারবার কঠোর করা হয়েছে, কিন্তু পুরুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার সমস্যা সমাধানের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বিএনপি সরকারের আমলেও একই প্রবণতা। ২০২৪ সালের আগস্টের পর অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও এই মূল কাঠামো পরিবর্তন হয়নি।

৯৫.২ বিরোধী রাজনীতি এবং পুরুষ অধিকারের নীরবতা

বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় থাকা সরকারের সমালোচনা করে, কিন্তু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অপব্যবহার বা পুরুষের আইনগত সংকটের কথা তারাও বলে না। কারণ এই বিষয়টি নিয়ে কথা বললে "নারীবিরোধী" তকমা পাওয়ার আশঙ্কা থাকে, যা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

এই নীরবতাটি একটি রাজনৈতিক সমঝোতার ফল। রাজনৈতিক দলগুলো একটি অলিখিত চুক্তিতে রয়েছে: নারী সম্পর্কিত আইন নিয়ে কোনো দল কোনো দলের সমালোচনা করবে না। এই চুক্তির কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত সমস্যা রাজনৈতিক আলোচনার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

৯৫.৩ নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া: একটি বিশ্লেষণ

২০২৫ সালে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ প্রকাশের পর যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, তা অত্যন্ত শিক্ষণীয়। হেফাজত-ই-ইসলামের মতো ইসলামপন্থী সংগঠনগুলো এই সুপারিশের বিরোধিতা করেছে "ইসলামবিরোধী" বলে। প্রগতিশীল মহল এই সুপারিশগুলোকে স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু উভয় পক্ষের আলোচনায় পুরুষের আইনগত সংকটের বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

এই রাজনৈতিক আলোচনার প্যাটার্নটি একটি মূল সত্য প্রকাশ করে: বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক কথোপকথনে পুরুষের অধিকার একটি অকল্পনীয় বিষয়। এটি না ইসলামপন্থীরা বলছেন, না প্রগতিশীলরা বলছেন। এই দ্বিপক্ষীয় নীরবতা একটি গভীর সামাজিক সমস্যার লক্ষণ।

অধ্যায় ৯৬: বিচারিক মনোবিজ্ঞান এবং আদালতে লিঙ্গ পক্ষপাত

৯৬.১ বিচারকদের অচেতন পক্ষপাত: গবেষণার আলোকে

বিচারক মানুষ, এবং মানুষের মনোবিজ্ঞানে অচেতন পক্ষপাত বা unconscious bias বিদ্যমান। আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে বিচারকরাও অচেতনভাবে পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত নেন। লিঙ্গ পক্ষপাত বিচারিক সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে কিনা, এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক গবেষণায় মিশ্র ফলাফল পাওয়া গেছে। কিছু গবেষণা দেখিয়েছে যে বিচারকরা একই ঘটনায় পুরুষ এবং নারী আসামির ক্ষেত্রে ভিন্ন রায় দেন। অন্য গবেষণায় দেখা গেছে যে নারী বিচারকরাও পুরুষ আসামির ক্ষেত্রে কঠোর হতে পারেন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিচারিক লিঙ্গ পক্ষপাত নিয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণা অপ্রতুল। কিন্তু পরিস্থিতিগত প্রমাণ এবং আইনজীবীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে এই পক্ষপাত বিদ্যমান। নারী ও শিশু নির্যাতন আদালতে পুরুষ আসামির বিরুদ্ধে একটি সহজাত সন্দেহের পরিবেশ তৈরি হয়ে আছে, এবং এই পরিবেশে নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করা কঠিন।

৯৬.২ সাক্ষ্য আইন এবং লিঙ্গ পক্ষপাত

বাংলাদেশের সাক্ষ্য আইনে লিঙ্গ পক্ষপাতের বেশ কয়েকটি উদাহরণ আছে। ধর্ষণ মামলায় সাক্ষ্য আইনের বিভিন্ন ধারায় নারীর সাক্ষ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি প্রয়োজনীয়, কারণ যৌন সহিংসতার ঘটনায় অন্য সাক্ষী না থাকলে ভিকটিমের সাক্ষ্যই প্রধান প্রমাণ হওয়া উচিত।

কিন্তু সমস্যাটি হলো যে এই বিশেষ মর্যাদা কখনো কখনো প্রমাণের সামগ্রিক মূল্যায়নকে বিকৃত করে। যখন অভিযোগকারীর সাক্ষ্য এবং অন্য সাক্ষ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়, তখন কোন সাক্ষ্যকে বিশ্বাস করা হবে সেই সিদ্ধান্তটি বিচারকের বিবেচনামূলক ক্ষমতার মধ্যে থাকে। এই বিবেচনামূলক ক্ষমতাটি যদি অচেতন পক্ষপাত দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহলে পুরুষের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ধারা ১১৩ক এবং ১১৩খ তে ধর্ষণ এবং যৌতুক হত্যার ক্ষেত্রে অনুমানের বিধান রয়েছে, যা পুরুষের বিরুদ্ধে প্রমাণের বোঝা উল্টে দেয়। এই বিধানগুলো আইনগতভাবে পুরুষকে "দোষী যতক্ষণ না নির্দোষ প্রমাণ হয়" এই অবস্থানে রাখে, যা "নির্দোষ যতক্ষণ না দোষী প্রমাণ হয়" এই মূলনীতির বিপরীত।

৯৬.৩ নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালের বিচারিক সংস্কৃতি

বাংলাদেশে বিশেষ নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল এই ধরনের মামলার দ্রুত ও বিশেষজ্ঞ বিচার নিশ্চিত করা। কিন্তু এই ট্রাইব্যুনালগুলোর কার্যক্রমে কয়েকটি সমস্যা লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, মামলার পরিমাণ এত বেশি যে প্রতিটি মামলায় পর্যাপ্ত সময় ও মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, এই ট্রাইব্যুনালগুলোর বিচারিক সংস্কৃতিতে পুরুষ আসামির প্রতি একটি পূর্বনির্ধারিত সন্দেহের মনোভাব তৈরি হয়ে গেছে। তৃতীয়ত, এই ট্রাইব্যুনালের বিচারকরা দীর্ঘদিন ধরে শুধু এই ধরনের মামলা বিচার করেন, ফলে তাদের মধ্যে পেশাদার বিকৃতি বা professional deformation ঘটার সম্ভাবনা থাকে। দীর্ঘদিন শুধু নির্যাতনের মামলা দেখতে দেখতে বিচারক অচেতনভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করতে পারেন যে সামনে আসা প্রতিটি অভিযোগই সত্য।

অধ্যায় ৯৭: পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আইনগত নিপীড়নের পারস্পরিক সম্পর্ক

৯৭.১ পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য সংকট: একটি নীরব মহামারি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২১ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছে যে পুরুষরা নারীদের তুলনায় বেশি হারে আত্মহত্যা করেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও এই প্রবণতা প্রযোজ্য। পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো অনেক কারণে

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

উপেক্ষিত থেকে যায়। সামাজিক প্রত্যাশা, "পুরুষ কাঁদে না" এই নিয়ম, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকে দুর্বলতার লক্ষণ মনে করা, এই কারণগুলো পুরুষকে সাহায্য চাইতে বাধা দেয়।

মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে মিথ্যা অভিযোগের শিকার ব্যক্তিরা গুরুতর মানসিক আঘাত, বিষণ্ণতা, উদ্বেগ এবং পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে ভোগেন। বাংলাদেশে একজন পুরুষ যখন মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হন, তখন শুধু তার ব্যক্তিগত জীবন নয়, তার পরিবারের সকলের মানসিক স্বাস্থ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্ত্রী সন্তান নিয়ে পথে বসেন, বাবা-মা লজ্জায় মাথা তুলতে পারেন না এবং ভাই-বোনরা সামাজিক নিগ্রহের শিকার হন।

৯৭.২ আইনগত নিপীড়ন এবং পুরুষ আত্মহত্যার সম্পর্ক

বাংলাদেশে যৌতুক মামলা বা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলার কারণে পুরুষের আত্মহত্যার ঘটনা সংবাদমাধ্যমে মাঝে মাঝে রিপোর্ট হয়। কিন্তু এই ধরনের ঘটনার কোনো পদ্ধতিগত তথ্য সংগ্রহ হয় না এবং এটি জনসচেতনতার আলোচনায় আসে না। যখন একজন পুরুষ মিথ্যা মামলার মুখে আত্মহত্যা করেন, তখন সমাজ প্রায়ই তাকে "দোষী ছিল বলেই আত্মহত্যা করেছে" বলে মনে করে।

এই ভয়াবহ বাস্তবতাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন তোলে: যখন আইনের প্রয়োগ একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্য এবং জীবন বিপন্ন করে, তখন সেই আইনের নৈতিক বৈধতা কি অক্ষুণ্ণ থাকে? প্রাকৃতিক আইনের দার্শনিক ঐতিহ্যে, আইন যদি মানব কল্যাণের বিরুদ্ধে কাজ করে, তাহলে সেই আইন সংস্কারের দাবিদার।

৯৭.৩ পুরুষের সামাজিক সংযোগ এবং আইনগত নিপীড়নের পরিণতি

একজন পুরুষ যখন মামলার মুখে পড়েন, তখন তার সামাজিক নেটওয়ার্কটি প্রায়ই ভেঙে পড়ে। বন্ধুরা দূরত্ব রাখেন, সহকর্মীরা এড়িয়ে চলেন এবং পরিচিতরা যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মানসিক স্বাস্থ্যের উপর আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এর বিপরীতে, অভিযোগকারী নারী সাধারণত সামাজিক সমর্থন পান, নারী অধিকার সংগঠনের সাহায্য পান এবং আইনগত সহায়তা পান। মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষের জন্য কোনো সামাজিক সহায়তা কাঠামো নেই। এই অসামতাটি পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য সংকটকে আরও গভীর করে।

অধ্যায় ৯৮: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং পুরুষের অধিকার

৯৮.১ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সার্বজনীনতার দাবি

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের ভিত্তি হলো মানবাধিকারের সার্বজনীনতা: সকল মানুষ, লিঙ্গ নির্বিশেষে, মৌলিক অধিকারের অধিকারী। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১ ধারা বলে যে "সকল মানুষ সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে"। ১১ ধারায় বলা হয়েছে যে প্রত্যেক ব্যক্তি নির্দোষ হিসেবে গণ্য হওয়ার অধিকারী যতক্ষণ না দোষী প্রমাণিত হয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই সার্বজনীন মানদণ্ডের আলোকে বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের বেশ কয়েকটি বিধান সমস্যাজনক। জামিন অযোগ্যতা, গ্রেফতারের আগে প্রাথমিক তদন্তের অনুপস্থিতি এবং মামলা চলাকালীন দীর্ঘ কারাবাস এই বিধানগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের নীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তির ৯(৩) ধারা বলে যে বিচারের পূর্বে আটক সাধারণ নিয়ম হওয়া উচিত নয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। কিন্তু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের জামিন অযোগ্যতার বিধান এই আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার সাথে সাংঘর্ষিক।

৯৮.২ সিডো এবং পুরুষের অধিকার: একটি জটিল সম্পর্ক

নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডো বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত। সিডো নারীর অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয়। এই সনদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর লক্ষ্য সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

কিন্তু সিডো একটি সীমাবদ্ধ সনদ: এটি শুধুমাত্র নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলে। পুরুষের অধিকারের বিষয়টি সিডোর আলোচনায় আসে না। এই সীমাবদ্ধতা একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামোর ফাঁক তৈরি করেছে। যদি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ মানবাধিকার কাঠামো যথেষ্ট শক্তিশালী থাকত, তাহলে এই ফাঁকটি তেমন সমস্যা হত না। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিউনিটি পুরুষের অধিকারের বিষয়টি নিয়ে তুলনামূলকভাবে কম সরব।

ইউরোপ কাউন্সিলের ২০২১ সালের একটি রেজোলিউশনে পুরুষ ও ছেলেশিশুর অধিকারের বিষয়টি প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই রেজোলিউশনে পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য, পারিবারিক বিরোধে পুরুষের অধিকার এবং পুরুষ নির্যাতনের আইনগত স্বীকৃতির দাবি করা হয়েছে। এই বৈশ্বিক পরিবর্তনটি বাংলাদেশের আলোচনায় স্থান পায়নি।

৯৮.৩ বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের জন্য পাঠ

ভারতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক ধারা, যা গার্হস্থ্য সহিংসতার বিধান, দীর্ঘদিন ধরে অপব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছে। ২০১৭ সালে রাজেশ শর্মা বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট গ্রেফতারের আগে পরিবার কল্যাণ কমিটির তদন্তের বিধান করেছিল। পরে ২০১৮ সালে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মুখে এই বিধান পরিবর্তিত হলেও, ভারতের আলোচনাটি প্রমাণ করে যে লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনের অপব্যবহার স্বীকার করা এবং সংস্কারের দাবি করা সম্ভব।

যুক্তরাজ্যে মিথ্যা ধর্ষণ অভিযোগের শিকার পুরুষদের জন্য কিছু আইনগত সুরক্ষা রয়েছে। মামলা শেষে নির্দোষ প্রমাণিত পুরুষ ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন এবং মিথ্যা অভিযোগকারীকে আইনগত শাস্তি দেওয়া সম্ভব। যুক্তরাজ্যে এই ধরনের মামলায় প্রমাণের মানদণ্ড এবং তদন্ত প্রক্রিয়া বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি কঠোর।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে, বিশেষত সুইডেন এবং নরওয়েতে, লিঙ্গ-নিরপেক্ষ পারিবারিক আইন প্রণীত হয়েছে। এই দেশগুলোতে গার্হস্থ্য সহিংসতার সংজ্ঞা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ পুরুষও গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার হতে পারেন এবং এই স্বীকৃতি আইনে রয়েছে। বাংলাদেশের জন্য এই মডেলটি আদর্শ না হলেও, এর নীতিগুলো অনুকরণযোগ্য।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ৯৯: গার্হস্থ্য সহিংসতা সুরক্ষা আইন ২০১০ এবং পুরুষ ভিকটিমের অদৃশ্যতা

৯৯.১ আইনের কাঠামো এবং পুরুষ ভিকটিমের বর্জন

গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। এই আইনটি পারিবারিক সহিংসতার শিকারদের জন্য তাৎক্ষণিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করে, যেমন সুরক্ষা আদেশ, নিষেধাজ্ঞা আদেশ এবং আশ্রয়স্থলের সুবিধা। এই আইনটি যারা সত্যিকারের গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এই আইনের একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা হলো যে এটি কার্যত শুধুমাত্র নারীকে ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আইনের সংজ্ঞায় "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি" বলতে যা বোঝানো হয়েছে, তার ব্যবহারিক প্রয়োগে পুরুষ প্রায়ই বাদ পড়ে যায়। একজন পুরুষ যদি তার স্ত্রীর দ্বারা শারীরিক, মানসিক বা আর্থিকভাবে নির্যাতিত হন, তাহলে এই আইনের অধীনে তিনি সুরক্ষা পাবেন কিনা সেটা অস্পষ্ট।

এই আইনি অস্পষ্টতার পেছনে একটি সামাজিক অনুমান কাজ করে: পুরুষ শক্তিশালী, তাই পুরুষ নির্যাতিত হতে পারে না। এই অনুমানটি মিথ্যা। পুরুষও গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার হন, শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে এবং আর্থিকভাবে। কিন্তু সমাজে এই বাস্তবতাটি স্বীকৃত নয়, ফলে পুরুষ ভিকটিমরা সাহায্য চাইতে পারেন না।

৯৯.২ পুরুষ ভিকটিমের অভিজ্ঞতা: একটি অদৃশ্য বাস্তবতা

আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকারদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পুরুষ। যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসির গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রায় ৪০ শতাংশ গার্হস্থ্য সহিংসতার ভিকটিম পুরুষ। যুক্তরাজ্যে একই ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে এই বিষয়ে কোনো পদ্ধতিগত গবেষণা নেই, কিন্তু বাস্তবতা মনে করার কারণ নেই যে বাংলাদেশের পুরুষরা গার্হস্থ্য সহিংসতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

পুরুষ ভিকটিমরা সাহায্য চাইতে পারেন না কারণ প্রথমত, সামাজিক কলঙ্ক: "স্ত্রীর হাতে মার খাওয়া পুরুষ" সমাজে উপহাসের পাত্র হন। দ্বিতীয়ত, আইনগত কাঠামোর অপ্রতুলতা: আইনে পুরুষ ভিকটিমের স্পষ্ট স্বীকৃতি নেই। তৃতীয়ত, সহায়তা কাঠামোর অনুপস্থিতি: নির্যাতিত পুরুষের জন্য কোনো আশ্রয়স্থল বা সহায়তা কেন্দ্র নেই। এই তিনটি বাধার কারণে পুরুষ ভিকটিমরা নিরবে কষ্ট ভোগ করেন।

৯৯.৩ গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সংস্কারের প্রস্তাব

গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ কে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ করার জন্য নিম্নলিখিত সংস্কারগুলো প্রয়োজন।

প্রথমত, আইনের সংজ্ঞায় "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি" কে স্পষ্টভাবে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে পুরুষও আইনের সুরক্ষা দাবি করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, পুরুষ ভিকটিমদের জন্য সহায়তা কেন্দ্র এবং হেল্পলাইন স্থাপন করতে হবে। তৃতীয়ত, পুলিশ এবং সামাজিক কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা পুরুষ ভিকটিমের

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

দাবি গুরুত্বের সাথে নিতে পারেন। চতুর্থত, পুরুষ গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকারদের জন্য আইনগত সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

অধ্যায় ১০০: বিবাহ প্রতিষ্ঠান, তালাক আইন এবং পুরুষের প্রতি কাঠামোগত অবিচার

১০০.১ তালাক আইনে পুরুষ এবং নারীর অসামত্য অবস্থান

বাংলাদেশে মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদের আইন পুরুষ এবং নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির কথা বলে। পুরুষ "তালাক" দেওয়ার মাধ্যমে একতরফাভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারেন। নারী "খুলা" বা "তালাক-ই-তাফওয়িজ" এর মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইতে পারেন। নারী আদালতের মাধ্যমে "ফাসখ" বা বিবাহ-বিচ্ছেদও দাবি করতে পারেন।

এই ব্যবস্থাটি প্রথম দৃষ্টিতে পুরুষকে বেশি ক্ষমতা দেয় বলে মনে হয়। কিন্তু ব্যবহারিক বাস্তবতা অনেক জটিল। যখন একজন পুরুষ তালাক দেন, তখন তাকে মহর দিতে হয়, ইদ্দতের সময় ভরণপোষণ দিতে হয় এবং সন্তানের ভরণপোষণ দিতে হয়। এই আর্থিক বাধ্যবাধকতাগুলো পুরুষের জন্য তালাককে একটি ব্যয়বহুল বিষয় করে তোলে। অন্যদিকে, একজন নারী যদি আদালতের মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ চান, তাহলে তিনি এই আর্থিক বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

এই অসামত্য বিষয়টিকে যোগ করুন যখন নারী বিবাহ-বিচ্ছেদের সাথে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা যোগ করেন। তখন পুরুষের পরিস্থিতি হয়ে ওঠে একটি আর্থিক ও আইনগত যুদ্ধ, যেখানে তিনি একদিকে বিবাহ-বিচ্ছেদের আর্থিক বাধ্যবাধকতার মুখোমুখি এবং অন্যদিকে ফৌজদারি মামলার হুমকিতে থাকেন।

১০০.২ সন্তানের হেফাজত এবং পিতার অধিকারের অপ্রতুল স্বীকৃতি

বাংলাদেশে সন্তানের হেফাজত বিষয়ক আইন মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মুসলিম আইনে, নারী শিশুর ক্ষেত্রে ৭ বছর পর্যন্ত এবং পুরুষ শিশুর ক্ষেত্রে ২ বছর পর্যন্ত মায়ের হেফাজতে থাকার বিধান আছে। এরপর বাবার হেফাজতে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে আদালতগুলো প্রায়ই মায়ের হেফাজতকে অগ্রাধিকার দেন, বাবার আইনগত অধিকার থাকলেও।

বিচারিক বিবেচনায় "সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থ" একটি কেন্দ্রীয় মানদণ্ড। এই মানদণ্ডটি সঠিক এবং সন্তানের কল্যাণই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। কিন্তু সমস্যাটি হলো এই মানদণ্ডটি প্রয়োগে একটি অচেতন পক্ষপাত কাজ করে: বিচারকরা প্রায়ই মনে করেন যে মায়ের কাছে থাকাই সন্তানের জন্য সর্বোত্তম। এই পক্ষপাতের কারণে বাবার যে সন্তানকে ভালোবাসেন, তার কাছে থাকতে চান এবং তার বিকাশে অবদান রাখতে চান, সেই অধিকারটি অনেক ক্ষেত্রে অস্বীকৃত হয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশে পিতার অধিকার বিষয়ক কোনো সংগঠন বা আন্দোলন নেই, যেমনটি পশ্চিমা দেশগুলোতে "পিতার অধিকার আন্দোলন" আছে। এই অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে পুরুষের অধিকারের প্রশ্নটি বাংলাদেশের সামাজিক আলোচনায় কতটা অনুপস্থিত।

১০০.৩ ভরণপোষণ আইনের পুরুষবিরোধী প্রয়োগ

বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী স্বামীকে স্ত্রীর ভরণপোষণ দেওয়ার দায়িত্ব বহন করতে হয়। এই দায়িত্বটি ন্যায্য, কারণ যদি নারী গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত থাকেন এবং বাইরে উপার্জন না করেন, তাহলে স্বামীর ভরণপোষণ দেওয়া উচিত।

কিন্তু বাস্তবে ভরণপোষণ আইনটি অনেক অবিচার তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন নারী নিজেই উপার্জন করেন এবং পরিবার ছেড়ে চলে যান, তবুও স্বামীকে ভরণপোষণ দিতে হতে পারে। যদি স্ত্রী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করে স্বামীকে কারাগারে পাঠান, তবুও ভরণপোষণের দায়িত্ব অব্যাহত থাকে। এই পরিস্থিতিতে একজন পুরুষ কারাগারে থাকা অবস্থায় তার পরিবারের ভরণপোষণ দিতে বাধ্য, যা বাস্তবে অসম্ভব এবং অমানবিক।

অধ্যায় ১০১: যৌন হয়রানি আইন এবং কর্মক্ষেত্রে পুরুষের অবস্থান

১০১.১ কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির আইনি সংজ্ঞা এবং পুরুষের বাদ পড়া

বাংলাদেশে যৌন হয়রানির বিষয়টি ২০০৯ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকার মাধ্যমে আইনগত স্বীকৃতি পায়। এই নির্দেশিকায় কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বিরোধী কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু এই নির্দেশিকায় যৌন হয়রানির সংজ্ঞা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে পুরুষ ভিকটিম হিসেবে আসার সুযোগ সীমিত। এই নির্দেশিকার অনেক বিধান নারীর যৌন হয়রানির অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পুরুষও যে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হতে পারেন, উপরস্থ নারী কর্তৃক বা পুরুষ কর্তৃক, সেই সম্ভাবনাটি এই নির্দেশিকায় পর্যাপ্তভাবে স্বীকৃত নয়।

২০২৫ সালে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে একটি নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেছে। এই নতুন আইনটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ হওয়া উচিত, অর্থাৎ যেকোনো লিঙ্গের ব্যক্তি যৌন হয়রানির শিকার হিসেবে আইনি সুরক্ষা পেতে পারবেন। কিন্তু এই লিঙ্গ-নিরপেক্ষতাটি কমিশনের সুপারিশে কতটা গুরুত্ব পেয়েছে, তা অস্পষ্ট।

১০১.২ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যৌন হয়রানি এবং পক্ষপাতী বিচার

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যৌন হয়রানি বিরোধী কমিটি রয়েছে। কিন্তু এই কমিটিগুলোর কার্যক্রমে পক্ষপাতের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। যখন একজন পুরুষ শিক্ষার্থী বা কর্মী কোনো নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

করেন, তখন সেই অভিযোগটি প্রায়ই কম গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয়। কিন্তু যখন একজন নারী অভিযোগ করেন, তখন তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

এই পক্ষপাতটি প্রমাণ করা কঠিন, কিন্তু পরিস্থিতিগত সাক্ষ্য থেকে এর অস্তিত্ব অনুমান করা সম্ভব। যখন একটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যৌন হয়রানির মামলায় অভিযুক্ত পুরুষকে পদ থেকে বরখাস্ত করা হয় অভিযোগ প্রমাণের আগেই, এবং একই ক্যাম্পাসে অভিযুক্ত নারীকে "যাচাইয়ের সুযোগ" দেওয়া হয়, তখন পক্ষপাতটি স্পষ্ট।

১০১.৩ "মিথ্যা বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে যৌন সম্পর্ক" বিধানের বিপদ

২০২৫ সালের মার্চ মাসে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সংশোধনীতে "বিবাহের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে যৌনসম্পর্ক" কে একটি বিশেষ অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই বিধানটির উদ্দেশ্য বোঝা যায়: নারীকে প্রতারণা করে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা একটি অন্যায়।

কিন্তু এই বিধানটি কার্যান্বয়নে গুরুতর সমস্যা তৈরি করতে পারে। প্রশ্ন হলো: "মিথ্যা প্রতিশ্রুতি" কীভাবে প্রমাণ করা যাবে? যদি দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ সম্মতিক্রমে সম্পর্কে থাকেন এবং পরে বিবাহ না হয়, তাহলে কি সেটা "মিথ্যা প্রতিশ্রুতি"? যদি একটি প্রেমের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে কি সেটাকে "মিথ্যা প্রতিশ্রুতি" হিসেবে আদালতে উপস্থাপন করা যাবে?

এই বিধানটি ব্যাপকভাবে অপব্যবহারযোগ্য। একজন নারী যেকোনো ব্যর্থ প্রেমের সম্পর্ককে "মিথ্যা বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে ধর্ষণ" হিসেবে আদালতে উপস্থাপন করতে পারেন। এই অভিযোগ প্রমাণ করাও কঠিন এবং অস্বীকার করাও কঠিন, কারণ দুটি ব্যক্তির মধ্যে কী কথা হয়েছিল সেটা তৃতীয় পক্ষের কাছে সাধারণত জানা থাকে না।

অধ্যায় ১০২: সমসাময়িক তত্ত্ব এবং পুরুষের অধিকারের নতুন দিগন্ত

১০২.১ পোস্ট-পিতৃতন্ত্র তত্ত্ব এবং পুরুষের নতুন সংকট

সাম্প্রতিক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বে "পোস্ট-পিতৃতন্ত্র" বা post-patriarchy ধারণাটি উদ্ভূত হয়েছে। এই ধারণায় যুক্তি দেওয়া হয় যে আধুনিক সমাজ পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো থেকে সরে আসছে, কিন্তু এই রূপান্তর সম্পূর্ণ নয় এবং এর ফলে পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্যই নতুন ধরনের সংকট তৈরি হচ্ছে।

এই তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের পরিস্থিতিটি বিশেষ আগ্রহের। বাংলাদেশ একটি রূপান্তরশীল সমাজ, যেখানে পুরনো পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। নারীরা ক্রমশ শিক্ষায়, কর্মক্ষেত্রে এবং সামাজিক জীবনে বেশি অংশগ্রহণ করছেন। কিন্তু এই রূপান্তরের সাথে সাথে নতুন ধরনের লিঙ্গ সংঘাতও তৈরি হচ্ছে।

পুরনো পিতৃতান্ত্রিক আইনি কাঠামো, যেখানে পুরুষ সুরক্ষক এবং নারী সুরক্ষিত, সেটি এখনো বিদ্যমান। কিন্তু নতুন সামাজিক বাস্তবতায় নারীরা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের সমতুল্য বা বেশি সক্ষম। এই দুটি বাস্তবতার সংঘাতে পুরুষ একটি নতুন ধরনের সংকটে পড়ছেন: পুরনো আইন তাকে "শক্তিশালী" বলে ধরে নেয় এবং সেই অনুযায়ী

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

আইনগত বোঝা তার উপর চাপায়, কিন্তু নতুন সামাজিক বাস্তবতায় অনেক পুরুষই আর সেই "শক্তিশালী" অবস্থানে নেই।

১০২.২ লিঙ্গ সমতার তৃতীয় ঢেউ এবং পুরুষের অন্তর্ভুক্তি

নারীবাদের বিভিন্ন ধারাকে "ঢেউ" বা "wave" হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়। প্রথম ঢেউ ছিল ভোটাধিকার আন্দোলন, দ্বিতীয় ঢেউ ছিল সমানাধিকার আন্দোলন এবং তৃতীয় ঢেউ ছিল পরিচয়-রাজনীতির উপর কেন্দ্রীভূত। এখন চতুর্থ বা পঞ্চম ঢেউয়ের কথা বলা হচ্ছে, যার মধ্যে "ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজম" অন্যতম।

কিন্তু এই বিভিন্ন ঢেউয়ের বাইরে একটি নতুন আলোচনা শুরু হয়েছে: সত্যিকারের লিঙ্গ সমতার জন্য পুরুষদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বলে যে লিঙ্গ সমতা শুধু নারীর মুক্তির বিষয় নয়, এটি পুরুষের মুক্তিরও বিষয়। পুরুষকে "সুরক্ষক", "উপার্জনকারী" এবং "শক্তিশালী" এর ভূমিকায় বন্দি করে রাখাটাও একটি বৈষম্য।

এই দৃষ্টিভঙ্গিটি "HeForShe" আন্দোলনে প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে পুরুষকেও নারীর সমতার লড়াইয়ে অংশীদার হতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলনের বিপরীত দিকটিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ: "SheForHe" বা নারীরাও পুরুষের মুক্তির লড়াইয়ে অংশীদার হওয়া উচিত। পুরুষকে নির্দিষ্ট ভূমিকায় বন্দি করে রাখা এবং পুরুষের অধিকার উপেক্ষা করা একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়।

১০২.৩ "ম্যানোস্ফিয়ার" এর উত্থান এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তার প্রাসঙ্গিকতা

আন্তর্জাতিকভাবে, পুরুষের অধিকার নিয়ে একটি অনলাইন সম্প্রদায় তৈরি হয়েছে যাকে "ম্যানোস্ফিয়ার" বলা হয়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ধারা আছে, যার কিছু অংশ যুক্তিসঙ্গত পুরুষ অধিকারের দাবি করে এবং কিছু অংশ মিসোজিনিস্টিক বা নারীবিরোধী।

বাংলাদেশেও সামাজিক মিডিয়ায় পুরুষের অধিকার নিয়ে কথা বলার প্রবণতা বাড়ছে। তরুণ পুরুষরা ইউটিউব এবং ফেসবুকে এই বিষয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু এই আলোচনাগুলো প্রায়ই একাডেমিক এবং আইনগত গভীরতা থেকে বঞ্চিত এবং কখনো কখনো নারীবিরোধী মনোভাবে আক্রান্ত।

এই পরিস্থিতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে: পুরুষের অধিকারের আলোচনাকে যুক্তিসঙ্গত, আইনভিত্তিক এবং নারীবিরোধী না হওয়ার দিকে পরিচালিত করা। পুরুষের অধিকার দাবি করা নারীবিরোধী নয়, বরং এটি ন্যায়বিচারের দাবি। এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে একাডেমিক, আইনি এবং সামাজিক আলোচনার সুসমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

অধ্যায় ১০৩: জুরিসপ্রুডেন্স এবং লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের দার্শনিক ভিত্তি

১০৩.১ ফাউকোর ক্ষমতা-জ্ঞান তত্ত্ব এবং লিঙ্গ আইনের বিশ্লেষণ

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফাউকো তাঁর ক্ষমতা-জ্ঞান তত্ত্বে যুক্তি দিয়েছেন যে ক্ষমতা এবং জ্ঞান পরস্পর নির্মাণ করে। যে প্রতিষ্ঠানগুলো জ্ঞান উৎপাদন করে, যেমন একাডেমি, মিডিয়া এবং আইনি ব্যবস্থা, তারা একটি নির্দিষ্ট "সত্য" নির্মাণ করে যা সামাজিক ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত।

ফাউকোর এই তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের লিঙ্গ-আইনি ব্যবস্থাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে একটি নির্দিষ্ট "সত্য" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে: নারী সবসময় শিকার, পুরুষ সবসময় নিপীড়ক। এই "সত্যটি" আইনি পাঠ্যপুস্তকে, মিডিয়ার বর্ণনায়, এনজিওর প্রকল্পে এবং বিচারিক সংস্কৃতিতে বারবার পুনরুৎপাদিত হয়। এই পুনরুৎপাদন একটি ক্ষমতার কাঠামোকে টিকিয়ে রাখে।

ফাউকোর ভাষায়, এই কাঠামোটি "discursive formation" বা বক্তৃতার গঠন তৈরি করে, যেখানে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় বলা সম্ভব এবং অন্য বিষয়গুলো বলা অসম্ভব বা অগ্রহণযোগ্য। "পুরুষও নির্যাতিত হতে পারেন" বলাটি এই বক্তৃতার গঠনের বাইরে, তাই এই কথাটি বলা কঠিন এবং বললে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়তে হয়।

১০৩.২ জার্গেন হ্যাবারমাসের যোগাযোগমূলক যুক্তি এবং লিঙ্গ আলোচনার রাজনীতি

জার্গেন হ্যাবারমাস তাঁর যোগাযোগমূলক যুক্তি বা communicative rationality তত্ত্বে ন্যায়সঙ্গত সমাজের জন্য একটি আদর্শ আলোচনার পরিবেশের ধারণা দিয়েছেন। এই আদর্শ পরিবেশে সকল পক্ষ তাদের মতামত উপস্থাপন করতে পারে, কেউ কাউকে ভয় দেখাতে পারে না এবং সর্বোত্তম যুক্তিই জেতে।

বাংলাদেশে লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের আলোচনাটি হ্যাবারমাসের এই আদর্শ থেকে অনেক দূরে। পুরুষের অধিকারের কথা বলতে গেলে সামাজিক মিডিয়ায় আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। একাডেমিক পরিবেশে এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করলে পেশাদার ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বিষয়টি তোলা রাজনৈতিক আত্মহত্যার সমতুল্য। এই পরিস্থিতি একটি বিকৃত আলোচনার পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে সত্যিকারের ন্যায়বিচারের দিকে পৌঁছানো কঠিন।

হ্যাবারমাসের কাঠামোয় বলা যায় যে বাংলাদেশে লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের আলোচনা "strategic action" দ্বারা পরিচালিত, অর্থাৎ প্রতিটি পক্ষ নিজের কৌশলগত স্বার্থ রক্ষার জন্য আলোচনায় অংশ নেয়, "communicative action" দ্বারা নয়, অর্থাৎ সত্যিকারের বোঝাপড়ার জন্য আলোচনা নয়। এই পার্থক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১০৩.৩ আক্সেল হোনেথের স্বীকৃতি তত্ত্ব এবং পুরুষের সামাজিক অস্বীকৃতি

জার্মান দার্শনিক আক্সেল হোনেথ হেগেলের স্বীকৃতির ধারণাকে বিকশিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ "স্বীকৃতি তত্ত্ব" তৈরি করেছেন। হোনেথের মতে, মানুষের সুস্থ পরিচয় বিকাশের জন্য তিনটি ধরনের স্বীকৃতি প্রয়োজন: ভালোবাসা বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে স্বীকৃতি, আইনি ব্যবস্থায় সমান নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি এবং সামাজিক কৃতিত্বের স্বীকৃতি।

বাংলাদেশে মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষ এই তিনটি ধরনের স্বীকৃতি থেকেই বঞ্চিত হন। সামাজিক লাঞ্ছনার কারণে পরিবার এবং বন্ধুদের ভালোবাসার স্বীকৃতি কমে যায়। আইনগতভাবে তিনি "অপরাধী" হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যান, ফলে নাগরিক স্বীকৃতি বিনষ্ট হয়। এবং কর্মক্ষেত্রে সামাজিক কৃতিত্বের স্বীকৃতিও হারিয়ে যায়। এই তিন ধরনের অস্বীকৃতি একটি সম্পূর্ণ সামাজিক ব্যক্তিত্বের ধ্বংস।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

হোনেথের কাঠামোয়, এই অস্বীকৃতি একটি গভীর নৈতিক ক্ষতি যা সমাজকে সংশোধন করতে হবে। আইনগত সংস্কার শুধু বিচার পদ্ধতির পরিবর্তন নয়, এটি একটি নৈতিক পুনর্গঠনের দাবি।

অধ্যায় ১০৪: সামাজিক মূলধন এবং পুরুষের কৌশলগত দুর্বলতা

১০৪.১ পুরুষের সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং মামলার মুখে তার ভাঙন

পিয়ের বুর্দিওর সামাজিক মূলধন তত্ত্বে সামাজিক নেটওয়ার্ককে একটি সম্পদ হিসেবে দেখা হয়। বন্ধু, পরিচিত এবং পেশাদার সংযোগগুলো সংকটের সময় সহায়তার উৎস। কিন্তু বাংলাদেশে যখন একজন পুরুষ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে অভিযুক্ত হন, তখন তার সামাজিক মূলধন তাৎক্ষণিকভাবে বিনষ্ট হয়।

কারণটি সামাজিক কলঙ্কের প্রকৃতিতে। বাংলাদেশে "নারী নির্যাতনকারী" পরিচয়টি অত্যন্ত গুরুতর সামাজিক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক থেকে দূরত্ব রাখতে চাই বলে অভিযুক্তের বন্ধু, সহকর্মী এবং পরিচিতরা তার সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দেয় বা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। ফলে মামলার চাপ মোকাবেলায় তার সামাজিক নেটওয়ার্কের সহায়তা পাওয়ার সুযোগ থাকে না।

এর বিপরীতে, অভিযোগকারী নারী সাধারণত তার সামাজিক নেটওয়ার্ক ধরে রাখেন বরং বৃদ্ধি পান। নারী অধিকার সংগঠনগুলো সহায়তা দেয়, পরিবার সমর্থন করে এবং মিডিয়া সহানুভূতি দেখায়। এই অসামত্য সামাজিক মূলধনটি মামলার প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

১০৪.২ অর্থনৈতিক পুঁজি এবং বিচার প্রক্রিয়ায় প্রবেশের বৈষম্য

বুর্দিওর তত্ত্বে অর্থনৈতিক পুঁজি বা economic capital একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বাংলাদেশে বিচার প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক পুঁজির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। একজন ধনী পুরুষ একজন দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেন, উচ্চ আদালতে জামিনের জন্য আবেদন করতে পারেন এবং দীর্ঘমেয়াদী মামলার খরচ বহন করতে পারেন। কিন্তু একজন দরিদ্র পুরুষের কাছে এই সুযোগগুলো নেই।

ইন্টারসেকশনালিটি তত্ত্বের ভাষায়, পুরুষের আইনগত সংকটে শ্রেণী একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। একজন ধনী পুরুষ মিথ্যা মামলা মোকাবেলা করতে পারেন কারণ তার অর্থনৈতিক পুঁজি আছে। কিন্তু একজন দরিদ্র কৃষক বা শ্রমিক যখন মিথ্যা মামলার শিকার হন, তখন তার কাছে কোনো বিকল্প নেই। এই দরিদ্র পুরুষটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

১০৪.৩ সাংস্কৃতিক পুঁজি এবং আইনি সাক্ষরতার বৈষম্য

বুর্দিওর তৃতীয় ধরনের পুঁজি হলো সাংস্কৃতিক পুঁজি বা cultural capital, যার মধ্যে আইনি সাক্ষরতাও অন্তর্ভুক্ত। যে মানুষ আইনি প্রক্রিয়া বোঝেন, আইনজীবীর সাথে কথা বলতে পারেন এবং আদালতে নিজের অধিকার দাবি করতে পারেন, তিনি আইনি সাক্ষরতার সুবিধা পান।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশে আইনি সাক্ষরতা অত্যন্ত কম, বিশেষত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে। যখন একজন গ্রামের মানুষ মামলার মুখে পড়েন, তিনি প্রায়ই জানেনও না যে তার কী অধিকার আছে। তিনি জানেন না যে তিনি জামিনের জন্য উচ্চ আদালতে যেতে পারেন, জানেন না যে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ছাড়া গ্রেফতার অবৈধ হতে পারে এবং জানেন না যে মামলার প্রতিটি পদক্ষেপে তার নির্দিষ্ট অধিকার আছে। এই অজ্ঞতা মিথ্যা মামলার শিকার দরিদ্র পুরুষকে আরও অসহায় করে তোলে।

অধ্যায় ১০৫: বাংলাদেশে পুরুষের অধিকার আন্দোলনের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ

১০৫.১ একটি পুরুষ অধিকার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা এবং তার রূপরেখা

বাংলাদেশে পুরুষের আইনগত সংকট সমাধানের জন্য একটি সংগঠিত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট। কিন্তু এই আন্দোলনটি কেমন হওয়া উচিত? এটি নারী অধিকার আন্দোলনের বিরোধী হওয়া উচিত নয়। বরং এটি লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত।

এই আন্দোলনের কয়েকটি কেন্দ্রীয় দাবি হতে পারে। প্রথমত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সংস্কার, যেখানে মিথ্যা মামলার কার্যকর প্রতিকার, জামিনের ন্যায়সঙ্গত বিধান এবং প্রাথমিক তদন্তের বাধ্যবাধকতা থাকবে। দ্বিতীয়ত, গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ করা। তৃতীয়ত, সন্তানের হেফাজতে পিতার সমান অধিকার নিশ্চিত করা। চতুর্থত, পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্য সংকটের স্বীকৃতি এবং সহায়তা কাঠামো তৈরি।

এই আন্দোলনটি নারী অধিকার আন্দোলনের সাথে সংলাপে থাকা উচিত, কারণ উভয়ের লক্ষ্য একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ তৈরি। এই সংলাপে পারস্পরিক স্বীকৃতির মাধ্যমে একটি সামগ্রিক লিঙ্গ-সমতার আন্দোলন তৈরি হতে পারে।

১০৫.২ পুরুষ অধিকার আন্দোলনের বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের জন্য পাঠ

বিভিন্ন দেশে পুরুষ অধিকার আন্দোলন বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। কিছু আন্দোলন নারীবিরোধী পথে গিয়েছে এবং সেগুলো সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয়েছে। কিন্তু কিছু আন্দোলন যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায়বিচারভিত্তিক পথে চলছে।

অস্ট্রেলিয়ার "One in Three" প্রচারাভিযান পুরুষ গার্হস্থ্য সহিংসতা শিকারদের অধিকারের দাবিতে কাজ করছে। কানাডায় পিতার অধিকার আন্দোলন সন্তানের হেফাজতে সমতার দাবিতে সফল হয়েছে। ভারতে "Save Indian Family" সংগঠন ৪৯৮ক ধারার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে।

এই আন্দোলনগুলোর সাফল্য এবং ব্যর্থতা থেকে বাংলাদেশ শিক্ষা নিতে পারে। সাফল্য পাওয়া আন্দোলনগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো: তারা নারীবিরোধী নয়, তারা আইনগত যুক্তি ব্যবহার করে, তারা একাডেমিক গবেষণার সাথে যুক্ত এবং তারা মূলধারার আইনগত পথে পরিবর্তনের দাবি করে।

১০৫.৩ আইনজীবী সমাজের ভূমিকা এবং দায়িত্ব

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের আইনজীবী সমাজ পুরুষের অধিকার রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আইনজীবীরা আদালতে মামলা করতে পারেন, জনমত গঠনে অবদান রাখতে পারেন এবং সংসদীয় প্রক্রিয়ায় প্রভাব রাখতে পারেন।

কিন্তু বাংলাদেশের আইনজীবী সমাজে একটি সমস্যা আছে: মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষদের মামলা পরিচালনায় আইনিক্যালি কথা বলতে অনেক আইনজীবী দ্বিধা করেন। কারণ এই মামলাগুলো পরিচালনা করলে সামাজিক সমালোচনার মুখে পড়ার ঝুঁকি থাকে। এই দ্বিধাটি কাটিয়ে উঠতে আইনজীবী সমাজকে পেশাদার দায়িত্বের ধারণাটি পুনঃনিশ্চিত করতে হবে: একজন আইনজীবীর দায়িত্ব তার মক্কেলের আইনগত স্বার্থ রক্ষা করা, সেই মক্কেল যেই হোক না কেন।

অধ্যায় ১০৬: প্রেসিডেন্ট এবং রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে পুরুষ অধিকারের অনুপস্থিতি

১০৬.১ রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক দায়িত্ব এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নীতি

রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দায়িত্ব হলো তার সকল নাগরিকের কল্যাণ নিশ্চিত করা, লিঙ্গ নির্বিশেষে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদ বলে যে রাষ্ট্র জনগণের পুষ্টিমান ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদ বলে যে সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতিগুলো লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক নীতিগুলো লিঙ্গ-পক্ষপাতী। নারী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন এবং বিভিন্ন নারী কল্যাণমূলক কর্মসূচি রয়েছে। কিন্তু পুরুষের বিশেষ সংকট মোকাবেলার জন্য কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা কর্মসূচি নেই।

রাষ্ট্রের এই অসামতটি একটি নীতিগত ব্যর্থতা। একটি ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্র যদি কোনো গোষ্ঠীর বিশেষ সংকট চিহ্নিত করে এবং সেই সংকট মোকাবেলায় বিশেষ ব্যবস্থা নেয়, তাহলে সেটি ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু যদি রাষ্ট্র একটি গোষ্ঠীর সংকটকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, তাহলে সেটি একটি নীতিগত ব্যর্থতা এবং সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির লঙ্ঘন।

১০৬.২ আইন কমিশন এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইন সংস্কারের এজেন্ডা

বাংলাদেশের আইন কমিশন আইন সংস্কারের সুপারিশ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি সংস্থা। কিন্তু এই কমিশনের কাজের তালিকায় পুরুষের আইনগত সংকট সম্পর্কিত সংস্কার কখনো অগ্রাধিকার পায়নি।

আইন কমিশনের উচিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো তার গবেষণা এবং সুপারিশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। প্রথমত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের জামিন বিধানের পর্যালোচনা এবং সংস্কারের সুপারিশ। দ্বিতীয়ত, গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সংস্কারের প্রস্তাব। তৃতীয়ত, সন্তানের হেফাজতে পিতার অধিকার সংক্রান্ত আইনগত পর্যালোচনা। চতুর্থত, মিথ্যা মামলার শিকারদের জন্য ক্ষতিপূরণের আইনগত কাঠামো প্রণয়নের সুপারিশ।

১০৬.৩ সংসদীয় কমিটির ভূমিকা এবং জবাবদিহিতার দাবি

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটি রয়েছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এই বিষয়গুলো পর্যালোচনার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু এই কমিটিগুলো কখনো পুরুষের আইনগত সংকট নিয়ে বিশেষ শুনানি করেনি।

২০২৪ সালের আগস্টের পর অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে একটি সুযোগ তৈরি হয়েছিল: নতুন রাজনৈতিক পরিবেশে আইনি সংস্কারের একটি সামগ্রিক এজেন্ডা নেওয়া। কিন্তু এই সুযোগটি পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়নি। ভবিষ্যতে যখনই নির্বাচিত সংসদ গঠিত হবে, তখন সংসদীয় কমিটিগুলোকে পুরুষের আইনগত সংকটের বিষয়টি তাদের এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অধ্যায় ১০৭: সামাজিক চুক্তি পুনর্গঠন এবং লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি

১০৭.১ সামাজিক চুক্তির ধারণা এবং বাংলাদেশের লিঙ্গ-সম্পর্কের পুনর্গঠন

জন লক, জ্যাঁ-জাক রুশো এবং টমাস হবসের সামাজিক চুক্তি তত্ত্বে মানুষ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে একটি কাল্পনিক চুক্তির কথা বলা হয়। এই চুক্তিতে মানুষ রাষ্ট্রের কিছু নিয়ম মেনে চলেন এবং রাষ্ট্র তার বিনিময়ে মানুষের সুরক্ষা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশে লিঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটি অলিখিত সামাজিক চুক্তি বিদ্যমান। এই চুক্তিতে পুরুষ পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন, নারীর সুরক্ষার দায়িত্ব নেন এবং সামাজিক কর্তৃত্বের দায়িত্ব নেন। বিনিময়ে নারী গৃহস্থালি কাজ করেন, সন্তান লালনপালন করেন এবং পুরুষের প্রতি সামাজিক আনুগত্য প্রদর্শন করেন। এই চুক্তিটি পিতৃতান্ত্রিক এবং অনেক নারীর জন্য অবিচারজনক।

কিন্তু এই চুক্তিটি পরিবর্তন হচ্ছে। নারীরা ক্রমশ কর্মক্ষেত্রে যোগ দিচ্ছেন, স্বাধীন হচ্ছেন এবং সামাজিক সিদ্ধান্তে অংশ নিচ্ছেন। এটি অত্যন্ত ইতিবাচক। কিন্তু সমস্যাটি হলো এই পরিবর্তনটি আংশিক। নারীরা নতুন অধিকার পাচ্ছেন, কিন্তু পুরনো সুবিধাগুলো ছেড়ে দিচ্ছেন না। পুরুষরা পুরনো দায়িত্ব ধরে রাখছেন, কিন্তু নতুন স্বীকৃতি পাচ্ছেন না। এই অসম রূপান্তর একটি নতুন অন্যায় তৈরি করছে।

একটি ন্যায়সঙ্গত সামাজিক পুনর্গঠন হবে এমন: নারী এবং পুরুষ উভয়ই পুরনো ভূমিকার বন্ধন থেকে মুক্তি পাবেন, উভয়ই নতুন দায়িত্ব ভাগ করে নেবেন এবং উভয়ের অধিকার সমানভাবে স্বীকৃত হবে।

১০৭.২ লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের একটি সত্যিকারের দৃষ্টিভঙ্গি হলো এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করে যে নারীরা ঐতিহাসিকভাবে বৈষম্যের শিকার এবং এই বৈষম্য মোকাবেলায় বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন। কিন্তু একই সাথে এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করে যে পুরুষরাও কিছু ক্ষেত্রে অবিচারের শিকার এবং সেই অবিচারও সমাধান করা প্রয়োজন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কোনো বৈপরীত্য নয়। নারীর অধিকার রক্ষা করা এবং পুরুষের অধিকার রক্ষা করা একে অপরের বিরোধী নয়। বরং উভয় লক্ষ্যই একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ নির্মাণের অংশ।

উদারনৈতিক দার্শনিক রাবার্ট নজিকের ন্যায়বিচারের তত্ত্বে প্রতিটি ব্যক্তির অধিকারের পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে। নজিকের কাঠামোয়, কোনো গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার নামে অন্য গোষ্ঠীর অধিকার লঙ্ঘন করা জায়েয নয়। সুতরাং নারীর অধিকার রক্ষার নামে পুরুষের অধিকার লঙ্ঘন করা অনৈতিক, ঠিক যেমন পুরুষের সুবিধার জন্য নারীর অধিকার লঙ্ঘন করা অনৈতিক।

১০৭.৩ প্রজন্মান্তর এবং নতুন সামাজিক বাস্তবতার নির্মাণ

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম, বিশেষত শহুরে শিক্ষিত তরুণরা, একটি নতুন সামাজিক বাস্তবতা তৈরি করছে। এই প্রজন্মের নারীরা আরও স্বাধীন, আরও উচ্চশিক্ষিত এবং আরও কর্মক্ষেত্রমুখী। এই প্রজন্মের পুরুষরাও পরিবর্তনশীল, অনেকেই পিতৃতান্ত্রিক ভূমিকাকে প্রশ্ন করছেন এবং নতুন ধরনের সম্পর্কের সন্ধান করছেন।

এই তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি নতুন আইনগত কাঠামো প্রয়োজন, যা তাদের বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে। পুরনো পিতৃতান্ত্রিক অনুমানের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আইনগুলো নতুন প্রজন্মের জন্য অপ্রাসঙ্গিক এবং ক্ষতিকর। নতুন প্রজন্মের জন্য লিঙ্গ-নিরপেক্ষ, ন্যায়বিচারভিত্তিক এবং মানবাধিকার সংগত আইনগত কাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

অষ্টম খণ্ডের উপসংহার: একটি বহুমাত্রিক সমস্যার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

অষ্টম খণ্ডে আমরা বাংলাদেশের মিসান্ড্রিক সামাজিক কাঠামোর একটি বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছি। আমরা দেখেছি যে পুরুষের প্রতি আইনগত বৈষম্য কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর অংশ যেখানে পরিবার, শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া, এনজিও শিল্প এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া মিলে একটি সম্মিলিত পক্ষপাতী কাঠামো তৈরি করে।

এই কাঠামোটি নারীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তৈরি নয়। বরং নারীর সুরক্ষার সৎ উদ্দেশ্যে তৈরি হওয়া কাঠামোগুলো সময়ের সাথে সাথে এমনভাবে বিকশিত হয়েছে যে সেগুলো পুরুষের প্রতি অবিচার করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে সত্যিকারের ভিকটিমদেরও ক্ষতি করছে।

এই কাঠামোটি পরিবর্তন করতে হলে বহু স্তরে একযোগে কাজ করতে হবে। আইনি সংস্কার প্রয়োজন, কিন্তু আইনি সংস্কার একা যথেষ্ট নয়। সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন, শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন প্রয়োজন, মিডিয়া সংস্কৃতির পরিবর্তন প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক সাহস প্রয়োজন।

অষ্টম খণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো: লিঙ্গ-ন্যায়বিচার একটি শূন্য-সমষ্টির খেলা নয়। পুরুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা নারীর ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে নয়। বরং উভয় ধরনের ন্যায়বিচার একই সামাজিক লক্ষ্যের দুটি দিক। যে সমাজ সত্যিকারের ন্যায়বিচার চায়, সে সমাজকে উভয় লিঙ্গের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই উপলব্ধিটি বাংলাদেশের আইনি ও সামাজিক সংস্কারের পথনির্দেশনা হওয়া উচিত। নবম খণ্ডে আমরা আন্তর্জাতিক আইন এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণের আরও গভীরে প্রবেশ করব, যেখানে বিভিন্ন দেশের লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত মডেল খোঁজার চেষ্টা করব। আমরা দেখব কীভাবে বিভিন্ন আইনি ব্যবস্থা পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে এবং সেই প্রচেষ্টাগুলো থেকে বাংলাদেশ কী শিখতে পারে।

পরিশিষ্ট ক: অষ্টম খণ্ডের মূল তাত্ত্বিক কাঠামো

অষ্টম খণ্ডে ব্যবহৃত প্রধান তাত্ত্বিক কাঠামোগুলো নিম্নরূপ।

পিয়ের বুর্দিওর সামাজিক মূলধন তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে পুরুষ কীভাবে মামলার মুখে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পুঁজি হারান এবং এই ক্ষয়ক্ষতি তার আইনগত অবস্থানকে আরও দুর্বল করে।

মিশেল ফাউকোর ক্ষমতা-জ্ঞান তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে কীভাবে মিডিয়া, একাডেমি এবং আইনি ব্যবস্থা মিলে "নারী সবসময় ভিকটিম, পুরুষ সবসময় নিপীড়ক" এই বক্তৃতামূলক সত্যটি নির্মাণ করেছে।

জার্গেন হ্যাবারমাসের যোগাযোগমূলক যুক্তি তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে বাংলাদেশে লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের আলোচনা একটি আদর্শ আলোচনার পরিবেশ থেকে কতটা দূরে।

আক্সেল হোনেথের স্বীকৃতি তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে পুরুষ ভিকটিমের সামাজিক অস্বীকৃতি একটি মানবিক মর্যাদার লঙ্ঘন।

আমার্ত্য সেনের সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে মিথ্যা মামলা মানুষের জীবনধারণ ও বিকাশের সক্ষমতাকে কীভাবে ধ্বংস করে।

জন রলসের ন্যায়বিচার তত্ত্বে মূল্যায়ন করা হয়েছে যে বাংলাদেশের লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনগুলো "অজ্ঞতার পর্দা"র মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় কিনা।

পরিশিষ্ট খ: অষ্টম খণ্ডে আলোচিত আইনি বিধানের সারসংক্ষেপ

গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এর মূল সমস্যা হলো পুরুষ ভিকটিমের স্পষ্ট আইনগত স্বীকৃতির অনুপস্থিতি। সংস্কার প্রস্তাব হলো আইনের সংজ্ঞায় স্পষ্টভাবে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাষা ব্যবহার করা এবং পুরুষ ভিকটিমের জন্য সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা।

মুসলিম পারিবারিক আইনের সন্তান হেফাজত বিধানে মায়ের অগ্রাধিকারের ঐতিহ্যগত বিধান পিতার সমান অধিকারকে সীমিত করে। সংস্কার প্রস্তাব হলো যৌথ হেফাজতকে ডিফল্ট নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

২০২৫ সালের সংশোধিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের "মিথ্যা বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে যৌনসম্পর্ক" বিধানে অস্পষ্ট সংজ্ঞার কারণে অপব্যবহারের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। সংস্কার প্রস্তাব হলো "মিথ্যা প্রতিশ্রুতি" এর স্পষ্ট আইনগত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা এবং প্রমাণের মানদণ্ড কঠোর করা।

পরিশিষ্ট গ: সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের একটি রোডম্যাপ

সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো প্রস্তাব করা হচ্ছে।

স্বল্পমেয়াদে এক থেকে দুই বছরের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বার্তা যোগ করতে হবে। মিডিয়ার জন্য লিঙ্গ-পক্ষপাত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করতে হবে। পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্য হেল্পলাইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মধ্যমেয়াদে তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ অধ্যয়ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পুরুষ গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকারদের জন্য আশ্রয়স্থল তৈরি করতে হবে। মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষদের জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদে পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে একটি জাতীয় লিঙ্গ সমতা কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা নারী এবং পুরুষ উভয়ের অধিকারের বিষয়টি দেখবে। লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের একটি জাতীয় কৌশল দলিল প্রণয়ন করতে হবে। বিচার বিভাগে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের প্রশিক্ষণকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত।

নবম খণ্ডে আমরা আন্তর্জাতিক আইন ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য সর্বোত্তম লিঙ্গ-ন্যায়বিচার মডেল খোঁজার চেষ্টা করব। আমরা দেখব কীভাবে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো, ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো লিঙ্গ-সমতার আইনি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে এবং সেই অভিজ্ঞতাগুলো থেকে বাংলাদেশ কী শিখতে পারে। আমরা জাতিসংঘের মানবাধিকার কাঠামো, সিডো এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদের আলোকে বাংলাদেশের আইনগত বাধ্যবাধকতা পর্যালোচনা করব এবং একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন লিঙ্গ-ন্যায়বিচার কাঠামোর রূপরেখা তৈরি করার চেষ্টা করব।

নবম খণ্ড

আন্তর্জাতিক আইন, তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশের জন্য লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের মডেল

গ্রন্থকারের ভূমিকা: নবম খণ্ডের বিষয়বস্তু ও প্রাসঙ্গিকতা

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অষ্টম খণ্ডে আমরা বাংলাদেশের মিসান্ড্রিক সামাজিক কাঠামোর বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ করেছিলাম। আমরা দেখেছিলাম কিভাবে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, এনজিও শিল্প এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া মিলে একটি সম্মিলিত পক্ষপাতী কাঠামো তৈরি করে যা পুরুষের বিরুদ্ধে কার্যকর থাকে। আমরা পিয়ের বুর্দিও, মিশেল ফাউকো, জার্গেন হ্যাবারমাস, আক্সেল হোনেথ এবং আমার্তা সেনের তাত্ত্বিক কাঠামোয় এই সামাজিক বাস্তবতাটিকে বিশ্লেষণ করেছিলাম।

নবম খণ্ডে আমরা একটি ভিন্ন কিন্তু পরিপূরক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করব। এই খণ্ডের কেন্দ্রীয় প্রশ্নগুলো হলো: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন কি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের দাবি করে? বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো কিভাবে লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে? স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মডেল, কমন ল' মডেল এবং দক্ষিণ এশিয়ার অভিজ্ঞতাগুলো থেকে বাংলাদেশ কী শিক্ষা নিতে পারে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত, মানবাধিকারসম্পন্ন এবং লিঙ্গ-সমতাভিত্তিক আইনগত কাঠামোর রূপরেখা তৈরি করার চেষ্টা করব।

এই খণ্ডটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক আইনি সম্প্রদায়ের সদস্য। বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদগুলো অনুমোদন করেছে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামোর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বৈশ্বিক আইনি বিকাশের সাথে সংযুক্ত। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আলোকে বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনগুলো মূল্যায়ন করলে তাদের ন্যূনতা এবং সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

অধ্যায় ১০৮: জাতিসংঘের মানবাধিকার কাঠামো এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের দাবি

১০৮.১ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। এই ঘোষণাপত্রটি মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি মাইলফলক দলিল। এর প্রথম অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে যে সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারে সমান। এই সমতার ঘোষণা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ এটি নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য।

ঘোষণাপত্রের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে বলেছে যে প্রতিটি মানুষ এই ঘোষণায় নির্ধারিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকারী, যৌন পার্থক্য সহ যেকোনো ভেদাভেদ ছাড়া। এই অনুচ্ছেদটি "sex" শব্দটি ব্যবহার করেছে, যা নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। আইনের দৃষ্টিতে যৌন পরিচয়ের ভিত্তিতে কাউকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এই ঘোষণাপত্রের সরাসরি লঙ্ঘন।

সপ্তম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সকলেই আইনের সামনে সমান এবং কোনো ভেদাভেদ ছাড়া আইনের সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী। এটি "Equality before law" এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, যা বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ বা যৌতুক নিরোধ আইন এই নীতিটি কতটুকু মেনে চলে, সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এগারোতম অনুচ্ছেদে নির্দোষিতার অনুমানের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে: প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেককে নির্দোষ ধরতে হবে। এই নীতিটি বাংলাদেশের অনেক আইনে লঙ্ঘিত হয়, বিশেষত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে যেখানে অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেফতার এবং জামিন অযোগ্যতার বিধান রয়েছে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের এই বিধানটি বাংলাদেশের কিছু আইনি অনুশীলনের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

বারোতম অনুচ্ছেদে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, গৃহ এবং যোগাযোগে স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। যখন পুরুষকে তার নিজের গৃহ থেকে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে বহিষ্কার করা হয় বা গ্রেফতার করা হয়, তখন এই অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন ঘটে।

১০৮.২ আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ এবং পুরুষের আইনি সুরক্ষা

১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ, যা ICCPR নামে পরিচিত, ১৯৭৬ সালে কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশ এই সনদটি অনুমোদন করেছে এবং তাই এর বিধানগুলো বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক আইনি বাধ্যবাধকতার অংশ।

ICCPR এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ প্রতিশ্রুতি দেয় যে প্রতিটি অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র যেকোনো পার্থক্য ছাড়া, বিশেষত যৌন পরিচয়ের পার্থক্য ছাড়া, সকল ব্যক্তির সনদে স্বীকৃত অধিকার সুনিশ্চিত করবে। এটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ অধিকারের একটি স্পষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি।

নবম অনুচ্ছেদ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এই অনুচ্ছেদ বলে যে কাউকে স্বেচ্ছাচারীভাবে গ্রেফতার বা আটক করা যাবে না। যে কাউকে গ্রেফতার করা হয়, তাকে অবিলম্বে গ্রেফতারের কারণ জানাতে হবে। বিচারিক আদেশ বা আইনি কর্তৃপক্ষের কাছে শীঘ্রই উপস্থাপন করতে হবে। বিচার-পূর্ব আটক ব্যতিক্রমী হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের জামিন অযোগ্যতার বিধান ICCPR এর নবম অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক। যখন একজন পুরুষকে শুধুমাত্র একটি অভিযোগের ভিত্তিতে, কোনো বিচারিক পর্যালোচনা ছাড়াই, দীর্ঘকাল আটক রাখা হয়, তখন এটি ICCPR এর বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ বিচারের ন্যায্যতার গ্যারান্টি দেয়। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সকলের ন্যায্য ও প্রকাশ্য বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। নির্দোষিতার অনুমানের নীতি প্রযোজ্য। আসামির কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের পর্যাপ্ত তথ্য ও সময় প্রদানের অধিকার রয়েছে।

ICCPR এর ২৬ অনুচ্ছেদ আইনের সামনে সমতার একটি শক্তিশালী গ্যারান্টি দেয়। এই অনুচ্ছেদ বলে যে সকলে আইনের সামনে সমান এবং কোনো বৈষম্য ছাড়াই আইনের সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী। আইন যেকোনো প্রকার বৈষম্য নিষিদ্ধ করবে এবং যৌন পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্যের বিরুদ্ধে কার্যকর সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

ICCPR মানবাধিকার কমিটি তার বিভিন্ন সাধারণ মন্তব্যে স্পষ্ট করেছে যে এই ২৬ অনুচ্ছেদটি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য এবং যেকোনো আইন যা যৌন পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য করে তা এই অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হতে পারে যদি সেটির ন্যায্যতার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি না থাকে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১০৮.৩ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিটির অনুশীলন এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার প্রশ্ন

ICCPR এর বাস্তবায়ন তদারকির জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কমিটি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পর্যায়ক্রমিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এবং উপসংহারমূলক পর্যবেক্ষণ জারি করে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিটি বেশ কিছু উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সাধারণত এই উদ্বেগগুলো নারীর অধিকার, শরণার্থী পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়ে। কিন্তু লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনগুলো পুরুষের মানবাধিকারকে কিভাবে ক্ষুণ্ন করছে, সেটি কমিটির রাডারে তেমনভাবে আসেনি।

এই অনুপস্থিতিটি নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো ঐতিহাসিকভাবে নারীর অধিকার রক্ষায় সোচ্চার হয়েছে, কিন্তু পুরুষের বিরুদ্ধে লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনের বিষয়টি তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এই প্রাতিষ্ঠানিক অন্ধত্বটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আন্দোলনের একটি সীমাবদ্ধতা।

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয়, বিশেষত ২০২০ এর দশকের শুরু থেকে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চিন্তাবিদরা পুরুষের মানবাধিকার বিষয়টি নিয়ে আরও বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন। "মানবাধিকার" শব্দটি "নারী অধিকার"-এর সমার্থক নয়, এবং মানবাধিকারের সার্বজনীন চরিত্রকে পুনরুদ্ধার করতে হলে পুরুষের অধিকারের বিষয়টিও সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

১০৮.৪ সিডো এবং তার আইনগত সীমাবদ্ধতা: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন, যা CEDAW নামে পরিচিত, ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৯৮১ সালে কার্যকর হয়। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে এই কনভেনশনটি অনুমোদন করেছে, যদিও কিছু সংরক্ষণ সহ।

CEDAW এর উদ্দেশ্য ছিল নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করা এবং নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা। এটি একটি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং নারীর অধিকার রক্ষায় এটি একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক হাতিয়ার হয়েছে।

কিন্তু CEDAW এর একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা হলো এটি একমুখী। এটি নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যের বিষয়ে কথা বলে, কিন্তু পুরুষের বিরুদ্ধে বৈষম্যের বিষয়ে নীরব। এর ফলে আন্তর্জাতিক আইনে একটি শূন্যতা তৈরি হয়েছে: পুরুষ যখন আইনগতভাবে বৈষম্যের শিকার হন, তখন তার জন্য কোনো আন্তর্জাতিক কনভেনশন নেই।

CEDAW কমিটি, যা এই কনভেনশনের বাস্তবায়ন তদারক করে, বারবার বাংলাদেশকে নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন সংস্কার করতে বলেছে। কিন্তু কমিটি কখনো এই প্রশ্ন তোলেনি যে নারীর সুরক্ষার নামে পুরুষের বিরুদ্ধে যে বৈষম্যমূলক আইন তৈরি হচ্ছে, সেগুলো কি ICCPR বা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই প্রাতিষ্ঠানিক অসামত্যটি আইনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাজনক। যদি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন সত্যিকারের সার্বজনীন হতে চায়, তাহলে এটিকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ হতে হবে। পুরুষের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইনও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আওতায় পর্যালোচনার যোগ্য।

২০২৩-২৪ সালে কিছু আন্তর্জাতিক পণ্ডিত এই প্রশ্নটি তুলেছেন। তারা বলছেন যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামোকে "পুরুষের অধিকার" (men's rights) বিষয়টিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, কারণ মানবাধিকার শুধু নারীর অধিকার নয়, এটি সকল মানুষের অধিকার।

১০৮.৫ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন এবং পুরুষের কর্মক্ষেত্রের অধিকার

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা ILO এর বিভিন্ন কনভেনশন কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য নিরোধের বিষয়ে বিধান রেখেছে। ILO কনভেনশন নম্বর ১১১ কর্মসংস্থান ও পেশায় বৈষম্যের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, যা বলে যে কর্মসংস্থানে লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ।

বাংলাদেশে পুরুষের কর্মক্ষেত্রের অধিকারের বিষয়টি ILO কনভেনশনের আলোকে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। যখন একজন পুরুষ মিথ্যা মামলার কারণে তার চাকরি হারান, তখন তার ILO কনভেনশনের অধীনে প্রতিকার পাওয়ার প্রশ্ন আসে। কিন্তু বাংলাদেশের শ্রম আইন বা ILO বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এই প্রতিকারের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই।

অধ্যায় ১০৯: সিডো এর পুনর্ব্যাখ্যা এবং লিঙ্গ-সমতার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

১০৯.১ সিডো থেকে "সিডো ফর অল": একটি আইনতাত্ত্বিক প্রস্তাব

CEDAW একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দলিল, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ লিঙ্গ-সমতার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না কারণ এটি একমুখী। আন্তর্জাতিক আইনতত্ত্বে একটি প্রস্তাব আছে যে "CEDAW for All" বা সকলের জন্য CEDAW এর ধারণাটি প্রতিষ্ঠা করা উচিত, অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ উভয়ের বিরুদ্ধে বৈষম্য নিরোধের জন্য একটি সমন্বিত আন্তর্জাতিক কাঠামো তৈরি করা।

কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশে এই ধারণাটি বাস্তবায়ন করা কঠিন। এর কারণ হলো নারী অধিকার আন্দোলন এবং জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো মনে করেন যে পুরুষের অধিকারের বিষয়টি নারীর সুরক্ষাকে দুর্বল করতে পারে। এই ভয়টি কতটুকু ন্যায্য, সেটি একটি আলাদা প্রশ্ন।

আইনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, CEDAW এর অস্তিত্ব পুরুষের বিরুদ্ধে বৈষম্যকে বৈধ করে না। ICCPR এবং মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এখনো পুরুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। সমস্যাটি হলো এই সুরক্ষাগুলো সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হয় না।

১০৯.২ সিডো কমিটির সাম্প্রতিক অবস্থান এবং "ইন্টারসেকশনাল" পদ্ধতি

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

২০২৩-২৫ সালে CEDAW কমিটি তার কাজে একটি ইন্টারসেকশনাল বা আন্তঃসংযোগমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এই পদ্ধতিতে স্বীকার করা হয় যে লিঙ্গ, শ্রেণী, জাতি, বয়স এবং অন্যান্য পরিচয়ের আন্তঃসংযোগ বৈষম্যের অভিজ্ঞতাকে জটিল করে তোলে।

কিন্তু এই ইন্টারসেকশনাল পদ্ধতিও মূলত নারীর অভিজ্ঞতার উপর কেন্দ্রীভূত। পুরুষের ইন্টারসেকশনাল অভিজ্ঞতা, যেমন একজন দরিদ্র পুরুষ যিনি লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনের শিকার, সেটি CEDAW কমিটির দৃষ্টিতে পড়ে না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই সীমাবদ্ধতাটি স্পষ্ট। বাংলাদেশে দরিদ্র পুরুষ, যারা মিথ্যা মামলার শিকার হন, তাদের ইন্টারসেকশনাল দুর্বলতা রয়েছে: তারা লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনের শিকার এবং একই সাথে অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে আইনি সহায়তা পেতে পারেন না। এই দ্বৈত দুর্বলতাটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আলোচনায় স্থান পায় না।

১০৯.৩ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং লিঙ্গ-সমতার পুনর্ব্যাখ্যা

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা SDG এর পঞ্চম লক্ষ্যমাত্রা হলো লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন। এই লক্ষ্যমাত্রাটি মূলত নারীকেন্দ্রিক।

কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রার ভাষার মধ্যে একটি গভীর প্রশ্ন লুকিয়ে আছে: লিঙ্গ সমতা মানে কি শুধু নারীর উন্নয়ন, নাকি এটি নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান মর্যাদা নিশ্চিত করা? যদি "লিঙ্গ সমতা" শুধু নারীর উন্নতির বিষয় হয়, তাহলে এটি আসলে লিঙ্গ সমতা নয়, এটি লিঙ্গ প্রতিস্থাপন।

সত্যিকারের লিঙ্গ সমতার জন্য প্রয়োজন যে নারী ও পুরুষ উভয়ের অধিকার এবং মর্যাদা সমানভাবে নিশ্চিত করা হবে। বাংলাদেশে এই সত্যিকারের লিঙ্গ সমতা অর্জিত হয়নি, কারণ আইনি ব্যবস্থা একদিকে ঝুঁকে আছে।

২০২৫ সালে জাতিসংঘের মহিলা বিষয়ক সংস্থা UN Women বাংলাদেশে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যেখানে নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে পুরুষের আইনগত সংকটের বিষয়টি অনুল্লিখিত। এটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর একটি কাঠামোগত অন্ধত্বকে প্রতিফলিত করে।

অধ্যায় ১১০: স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মডেল: লিঙ্গ-সমতার সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের জন্য পাঠ

১১০.১ নর্ডিক মডেলের মৌলিক চরিত্র এবং আইনি ভিত্তি

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো, বিশেষত সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং ফিনল্যান্ড, বিশ্বে লিঙ্গ-সমতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নত হিসেবে বিবেচিত। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বৈশ্বিক লিঙ্গ ব্যবধান সূচকে এই দেশগুলো ধারাবাহিকভাবে শীর্ষে রয়েছে। ২০২৫ সালের সূচকে আইসল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইডেন শীর্ষ চারটি স্থান দখল করেছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

কিন্তু নর্ডিক লিঙ্গ সমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এটি একমুখী নয়। নর্ডিক দেশগুলো শুধু নারীর অধিকার রক্ষা করেনি, বরং পুরুষের ঐতিহ্যগত ভূমিকার বাইরে এসে নতুন সামাজিক ভূমিকা গ্রহণ করতে সহায়তা করেছে। নর্ডিক মডেলে পুরুষও লিঙ্গ-সমতা আন্দোলনের সুবিধাভোগী।

সুইডেনের আইনি ব্যবস্থায় যৌন সহিংসতার আইনগুলো ২০১৭ সাল থেকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ২০১৮ সালের সম্মতি আইন অনুযায়ী, সম্মতি ছাড়া যেকোনো যৌন সম্পর্ক ধর্ষণ হিসেবে গণ্য। এই আইনটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ নারী বা পুরুষ যেকেউ ধর্ষণের ভিকটিম হতে পারেন এবং যেকেউ অপরাধী হতে পারেন।

সুইডেনের গার্হস্থ্য সহিংসতার আইন, যা ১৯৯৮ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ২০২১ ও ২০২৩ সালে সংশোধিত হয়েছে, লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাষায় লেখা। এই আইনে ভিকটিমের লিঙ্গ নির্দিষ্ট করা হয়নি, ফলে পুরুষ ভিকটিমও সুরক্ষা পান।

নর্ওয়েতে ২০২২ সালে পারিবারিক সহিংসতা আইন সংশোধন করা হয়েছে যেখানে পুরুষ ভিকটিমদের জন্য বিশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নরওয়ের পরিসংখ্যান দেখায় যে গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকারদের প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ পুরুষ এবং তাদের জন্য বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে।

ডেনমার্কে পিতার হেফাজতের অধিকার নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য আইনি বিকাশ ঘটেছে। ডেনিশ আইনে যৌথ হেফাজতকে সম্পর্ক ভাঙার পরও ডিফল্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০১২ সালের পারিবারিক আইন সংশোধনীতে পিতা-মাতার সমান হেফাজত অধিকারকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ফিনল্যান্ডের আইনি ব্যবস্থায় যৌন সহিংসতার সংজ্ঞা সবচেয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক। ২০২৩ সালে ফিনল্যান্ড তার যৌন অপরাধ আইন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করেছে, যেখানে যেকোনো ব্যক্তি যৌন সহিংসতার ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি পান।

১১০.২ নর্ডিক মডেলের সামাজিক ভিত্তি এবং আইনের সাথে তার সম্পর্ক

নর্ডিক লিঙ্গ-সমতার আইনি কাঠামো একটি বৃহত্তর সামাজিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই সামাজিক ভিত্তির কয়েকটি উপাদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, নর্ডিক দেশগুলোতে পুরুষের পিতৃত্বকালীন ছুটি একটি সামাজিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। সুইডেনে পিতার জন্য ৯০ দিনের পিতৃত্বকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক, যার মানে হলো পুরুষকেও শিশু লালনপালনে সমান ভূমিকা পালন করতে হবে। এই নীতিটি "পুরুষ উপার্জনকারী, নারী গৃহিণী" এই পিতৃতান্ত্রিক বিভাজনকে ভেঙে দেয়।

দ্বিতীয়ত, নর্ডিক দেশগুলোতে সর্বজনীন শিশু যত্ন ব্যবস্থা রয়েছে, যা পুরুষ ও নারী উভয়কেই কর্মক্ষেত্রে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করে। এই ব্যবস্থাটি "নারীকে ঘরে রাখো" এই পিতৃতান্ত্রিক প্রত্যাশাকে অপ্রাসঙ্গিক করে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

তৃতীয়ত, নর্ডিক শিক্ষা ব্যবস্থায় লিঙ্গ-সমতাকে একটি মৌলিক মূল্য হিসেবে শেখানো হয়। ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই শেখানো হয় যে যেকেউ যেকোনো ভূমিকা পালন করতে পারে এবং যেকেউ ভিকটিম বা অপরাধী হতে পারে।

চতুর্থত, নর্ডিক দেশগুলোতে পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সমাজচেতনা অনেক বেশি। পুরুষের কাঁদতে না পারার সামাজিক প্রত্যাশা অনেক কম এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা নেওয়া সামাজিকভাবে স্বীকৃত।

১১০.৩ নর্ডিক মডেল এবং বাংলাদেশ: একটি সরাসরি তুলনার সীমাবদ্ধতা

নর্ডিক মডেলকে সরাসরি বাংলাদেশে প্রয়োগ করার ধারণাটি সরল এবং বাস্তবে অপ্রয়োগযোগ্য। কারণগুলো কয়েকটি।

প্রথমত, নর্ডিক দেশগুলো অত্যন্ত ধনী এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। সর্বজনীন শিশু যত্ন, উচ্চমানের শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তার ব্যয় বহন করার জন্য যে অর্থনৈতিক সক্ষমতা প্রয়োজন, তা বাংলাদেশের বর্তমান পর্যায়ে নেই।

দ্বিতীয়ত, নর্ডিক সমাজগুলো ধর্মনিরপেক্ষ এবং তাদের সামাজিক নিয়মগুলো বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা থেকে মৌলিকভাবে আলাদা।

তৃতীয়ত, নর্ডিক লিঙ্গ-সমতা একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল যা বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত সময়ে অর্জন করা সম্ভব নয়।

কিন্তু নর্ডিক অভিজ্ঞতা থেকে কিছু নীতিগত পাঠ নেওয়া সম্ভব। প্রথমত, লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইন তৈরি করা সম্ভব এবং এটি নারীর সুরক্ষাকে দুর্বল করে না। দ্বিতীয়ত, পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য এবং ভিকটিমহুডকে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব। তৃতীয়ত, আইনে নারীকে বিশেষ সুরক্ষা দেওয়া এবং পুরুষকে আইনগত সুরক্ষা দেওয়া পরস্পরবিরোধী নয়।

অধ্যায় ১১১: যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া: কমন ল' মডেলে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনের অভিজ্ঞতা

১১১.১ যুক্তরাজ্যের গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সংস্কার

যুক্তরাজ্যের গার্হস্থ্য সহিংসতা সম্পর্কিত আইনি ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক কারণ বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থা মূলত ব্রিটিশ আইনি ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত।

২০২১ সালে যুক্তরাজ্যে গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন প্রবর্তিত হয়েছে, যা ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে প্রযোজ্য। এই আইনটি গার্হস্থ্য সহিংসতাকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। আইনের সংজ্ঞায় গার্হস্থ্য সহিংসতা হলো এমন আচরণ যা অন্তরঙ্গ অংশীদার বা পরিবারের সদস্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়, এবং সংজ্ঞাটি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি যে অপরাধী বা ভিকটিম কোন লিঙ্গের হবেন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

যুক্তরাজ্যের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গার্হস্থ্য সহিংসতার প্রায় ৩০-৩৫ শতাংশ শিকার পুরুষ। এই বাস্তবতা স্বীকার করে যুক্তরাজ্য পুরুষ ভিকটিমদের জন্য আলাদা সহায়তা পরিষেবা তৈরি করেছে, যার মধ্যে হেল্পলাইন এবং আশ্রয়স্থল অন্তর্ভুক্ত।

যুক্তরাজ্যের আইনি পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো "কোয়ার্সিভ কন্ট্রোল" বা নিয়ন্ত্রণমূলক জবরদস্তির সংজ্ঞা। ২০১৫ সালের গুরুতর অপরাধ আইনে কোয়ার্সিভ কন্ট্রোলকে একটি অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং এই অপরাধটিও লিঙ্গ-নিরপেক্ষ।

তবে যুক্তরাজ্যেও সম্পূর্ণ লিঙ্গ-সমতা অর্জিত হয়নি। কিছু বিধান এখনো লিঙ্গ-নির্দিষ্ট এবং পুরুষ ভিকটিমরা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক কলঙ্কের কারণে সহায়তা নিতে অনিচ্ছুক।

১১১.২ কানাডার সাংবিধানিক কাঠামো এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ অধিকার

কানাডার অধিকার ও স্বাধীনতা সনদ, ১৯৮২ সালে সংবিধানের অংশ হিসেবে গৃহীত, লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে। এই সনদের ১৫ অনুচ্ছেদ বলে যে প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের সামনে সমান এবং যৌন পরিচয় সহ যেকোনো বৈষম্যমূলক ভিত্তিতে আইনের সমান সুরক্ষা ও সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

কানাডার ফেডারেল ফৌজদারি আইনে যৌন সহিংসতার সংজ্ঞা মূলত লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। যৌন হামলা, যা ১৯৮৩ সালে "ধর্ষণ" শব্দটির স্থলে আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেকোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেকোনো ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হতে পারে।

কানাডার গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনগুলো প্রদেশ পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত এবং বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মাত্রায় লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা রয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে কানাডিয়ান আইনি ব্যবস্থা পুরুষ ভিকটিমকে স্বীকৃতি দেয়।

কানাডিয়ান সুপ্রিম কোর্টের কিছু গুরুত্বপূর্ণ রায় লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের নীতিকে শক্তিশালী করেছে। ১৯৯৯ সালের R v Mills মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে যৌন হামলার বিচারে সাক্ষ্যের নিয়মগুলো ন্যায়বিচারের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং আসামির অধিকারও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

কানাডিয়ান আইনি ব্যবস্থা মিথ্যা অভিযোগের বিষয়টিকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। মিথ্যা অভিযোগের শিকার ব্যক্তি কানাডায় ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারেন এবং মিথ্যা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে মামলা করা সম্ভব। এই ব্যবস্থাটি বাংলাদেশের জন্য একটি মূল্যবান মডেল হতে পারে।

১১১.৩ অস্ট্রেলিয়ার পারিবারিক আইন এবং পিতার সমান অধিকার

অস্ট্রেলিয়ার পারিবারিক আইন আইন, ১৯৭৫ বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত পারিবারিক আইনগুলোর একটি। এই আইনে সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং পিতা ও মাতা উভয়ের সমান অধিকার স্বীকৃত।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অস্ট্রেলিয়ার আইনে ডিফল্ট অনুমানটি হলো যে বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও পিতা ও মাতা উভয়ই সন্তানের যৌথ হেফাজতকারী থাকবেন। এই ডিফল্ট অবস্থান পরিবর্তন করতে হলে আদালতে প্রমাণ করতে হবে যে যৌথ হেফাজত সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থে নয়।

২০০৬ সালের পারিবারিক আইন সংশোধনীতে "সমান ভাগ করা পিতৃত্বকালীন দায়িত্ব" এর ধারণাটি আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও ২০১১ সালে একটি সংশোধনী এই বিধানটিকে কিছুটা পরিবর্তন করেছে, তবুও মূল নীতিটি বজায় রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার "One in Three" প্রচারাভিযান একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এই প্রচারাভিযান বলে যে অস্ট্রেলিয়ায় গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকারদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পুরুষ। এই তথ্যটি জনসচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করছে।

অস্ট্রেলিয়ার পারিবারিক আইনে গার্হস্থ্য সহিংসতার সংজ্ঞাটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। "পরিবারের সহিংসতা" বলতে বোঝানো হয় এমন আচরণ যা পরিবারের একজন সদস্যকে ভয় দেখায় বা হেয় করে, এবং এই সংজ্ঞায় ভিকটিমের লিঙ্গ নির্দিষ্ট করা নেই।

১১১.৪ যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা: VAWA এর বিকাশ এবং পুরুষ ভিকটিমের স্বীকৃতি

যুক্তরাষ্ট্রের Violence Against Women Act বা VAWA ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে একাধিকবার পুনর্নবীকরণ ও সংশোধন করা হয়েছে। ২০১৩ সালের পুনর্নবীকরণে প্রথমবারের মতো পুরুষ ভিকটিমদের জন্য পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০২২ সালের সর্বশেষ VAWA পুনর্নবীকরণে পুরুষ ভিকটিমদের জন্য সহায়তা আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। এই আইনে স্পষ্ট করা হয়েছে যে গার্হস্থ্য সহিংসতা পুরুষদেরও প্রভাবিত করে এবং তারাও সহায়তা পাওয়ার অধিকারী।

কিন্তু VAWA এখনো মূলত নারীকেন্দ্রিক। তহবিল বরাদ্দ এবং প্রোগ্রামের ডিজাইনে নারীকেই প্রাথমিক সুবিধাভোগী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পুরুষ ভিকটিমের জন্য তহবিল এখনো অপ্রতুল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে ধর্ষণের আইনগত সংজ্ঞা বিভিন্ন। কিছু রাজ্যে সংজ্ঞা এখনো লিঙ্গ-নির্দিষ্ট, আবার অনেক রাজ্য লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সংজ্ঞা গ্রহণ করেছে। এই বৈচিত্র্য দেখায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের দিকে যাত্রা এখনো অসম্পূর্ণ।

অধ্যায় ১১২: ভারতের অভিজ্ঞতা: ৪৯৮-ক, মিথ্যা মামলা এবং সংস্কারের সংগ্রাম

১১২.১ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮-ক ধারা: বাংলাদেশের আয়না

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮-ক ধারা বাংলাদেশের যৌতুক নিরোধ আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সাথে কার্যত একই ধরনের সমস্যা তৈরি করেছে। এই ধারায় স্বামী বা তার আত্মীয়দের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগে মামলা করা যায় এবং এই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার অপরিহার্য।

ভারতে ৪৯৮-ক ধারার অপব্যবহার ব্যাপক মাত্রায় পৌঁছেছে। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন মামলায় এই ধারার অপব্যবহারের বিষয়টি স্বীকার করেছে। ২০১৭ সালে Rajesh Sharma v. State of UP মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে ৪৯৮-ক ধারার অধীনে স্বয়ংক্রিয় গ্রেফতার করা উচিত নয় এবং পরিবার কল্যাণ কমিটি প্রাথমিক তদন্ত করবে।

তবে পরে ২০১৮ সালে Socialaction Forum for Manav Adhikar v. Union of India মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই আদেশটি আংশিকভাবে পরিবর্তন করেছে। এই পরিবর্তনটি দেখায় যে আদালতে লিঙ্গ-পক্ষপাতী বিধানের সংস্কার কতটা কঠিন।

ভারতের জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরো বা NCRB এর তথ্য অনুযায়ী, ৪৯৮-ক ধারায় দায়ের হওয়া মামলাগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শেষ পর্যন্ত আদালতে প্রমাণিত হয় না। এই উচ্চ "মিথ্যা মামলার হার" দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বিতর্কের বিষয়।

ভারতে ২০১৩ সালে যৌন অপরাধ আইন সংশোধনীতে ধর্ষণের সংজ্ঞা কিছুটা বিস্তৃত করা হয়েছে, কিন্তু এটি এখনো মূলত লিঙ্গ-নির্দিষ্ট। ভারতের ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ যা IPC এর স্থলে এসেছে, সেখানেও যৌন অপরাধের বিধানে লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা সম্পূর্ণ অর্জিত হয়নি।

১১২.২ ভারতে পুরুষ অধিকার আন্দোলন: Save Indian Family Foundation এবং তার প্রভাব

ভারতে Save Indian Family Foundation বা SIFF একটি সক্রিয় সংগঠন যা ৪৯৮-ক ধারার অপব্যবহারের শিকার পুরুষদের সহায়তা করে এবং আইনি সংস্কারের দাবিতে লড়াই করছে।

SIFF এর প্রধান দাবিগুলো হলো: ৪৯৮-ক ধারাকে জামিনযোগ্য করা, প্রাথমিক তদন্তের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা, মিথ্যা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে কার্যকর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া এবং পুরুষ ভিকটিমদের জন্য গার্হস্থ্য সহিংসতা সুরক্ষা।

SIFF এর কার্যক্রম ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সফল হয়েছে। ২০১৭ সালের Rajesh Sharma রায়টি SIFF এবং অনুরূপ সংগঠনগুলোর দীর্ঘ লড়াইয়ের ফল। যদিও এই রায়টি পরে সংশোধিত হয়েছে, তবুও এটি প্রমাণ করে যে আইনগত পথে পুরুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম সফল হতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য ভারতের এই অভিজ্ঞতা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হলো: সংগঠিত আইনগত সংগ্রাম এবং আদালতে মামলা করার মাধ্যমে পরিবর্তন আনা সম্ভব। বাংলাদেশে এখনো এই ধরনের সংগঠিত প্রচেষ্টা অনুপস্থিত।

১১২.৩ ভারতে সম্প্রতি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩ এবং পুরুষ অধিকারের প্রশ্ন

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

২০২৩ সালে ভারতের পুরনো ফৌজদারি আইন কোড সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির পরিবর্তে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ফৌজদারি কার্যবিধির পরিবর্তে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের পরিবর্তে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে।

এই ব্যাপক আইনি পরিবর্তনে কিছু লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সংস্কার করার সুযোগ ছিল, কিন্তু সেই সুযোগ সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো হয়নি। যৌন অপরাধের বিধানগুলো এখনো মূলত লিঙ্গ-নির্দিষ্ট। ৪৯৮-ক এর সমতুল্য বিধানটি মূলত অপরিবর্তিত থেকেছে।

তবে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন হলো বিচারের সময়সীমার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতায় মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি পরোক্ষভাবে মিথ্যা মামলার শিকারদের জন্য উপকারী কারণ দীর্ঘস্থায়ী মামলা মিথ্যা মামলার অন্যতম প্রধান অস্ত্র।

১১২.৪ ভারতের আদালতে পুরুষ সুরক্ষার বিকাশমান জুরিসপ্রুডেন্স

ভারতীয় আদালতে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পুরুষের সুরক্ষা সংক্রান্ত একটি বিকাশমান জুরিসপ্রুডেন্স তৈরি হচ্ছে। ভারতীয় উচ্চ আদালতগুলো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে যা পুরুষের আইনগত অধিকারকে শক্তিশালী করে।

দিল্লি হাইকোর্ট ২০২৩ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ে বলেছে যে গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের সংজ্ঞা লিঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত এবং পুরুষ ভিকটিমদেরও একই সুরক্ষা পাওয়া উচিত। যদিও এই রায়টি সরাসরি আইন পরিবর্তন করেনি, তবুও এটি ভবিষ্যতের সংস্কারের পথ তৈরি করেছে।

কেরালা হাইকোর্ট ২০২৪ সালে একটি মামলায় বলেছে যে মিথ্যা ধর্ষণ অভিযোগ দায়েরকারীর বিরুদ্ধে কার্যকর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং মিথ্যা অভিযোগের শিকার ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের অধিকার রয়েছে। এই রায়টি বাংলাদেশের আইনজীবীদের জন্য একটি মূল্যবান উদাহরণ।

অধ্যায় ১১৩: পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা: দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশীদের অভিজ্ঞতা

১১৩.১ পাকিস্তানের আইনি ব্যবস্থা এবং পুরুষের অধিকার

পাকিস্তান বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ তুলনামূলক উদাহরণ কারণ উভয় দেশের আইনি ঐতিহ্য একই উৎস থেকে, অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতীয় আইন ব্যবস্থা থেকে, আসা। উভয় দেশেই মুসলিম পারিবারিক আইন প্রযোজ্য, যদিও দুটি দেশ আলাদা পথে এগিয়েছে।

পাকিস্তানে সাইবার ক্রাইম আইন ২০১৬ একটি বিশেষ আইনগত সমস্যা তৈরি করেছে। এই আইনের একটি বিধান অনুযায়ী সাইবার স্টকিং বা হয়রানির অভিযোগে পুরুষকে গ্রেফতার করা অত্যন্ত সহজ। পাকিস্তানে এই আইনের অপব্যবহারের বহু রিপোর্ট রয়েছে যেখানে বিবাহবিচ্ছেদ বা পারিবারিক বিরোধে নারীরা এই আইন ব্যবহার করে পুরুষকে হয়রানি করেছেন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পাকিস্তানের গার্হস্থ্য সহিংসতা সম্পর্কিত আইন ২০২০ সালে পাঞ্জাব প্রদেশে প্রথম প্রবর্তিত হয়েছে। এই আইনটি মূলত নারীর সুরক্ষার জন্য এবং পুরুষ ভিকটিমকে স্বীকৃতি দেয় না।

পাকিস্তানের পারিবারিক আদালতগুলোতে একটি সমস্যা লক্ষ্য করা যায় যা বাংলাদেশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ: বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় মায়ের পক্ষে হেফাজত দেওয়ার প্রবণতা এবং পিতাকে শুধুমাত্র ভরণপোষণ দেওয়ার দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।

পাকিস্তানে পুরুষের আইনগত সংকটের একটি বিশেষ দিক হলো খুলা তালাক, অর্থাৎ স্ত্রী কর্তৃক তালাকের বিষয়। পাকিস্তানে খুলা তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীকে তার প্রাপ্য মোহরানা ফেরত দেওয়ার বিধান রয়েছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আদালত এই বিধান কার্যকরভাবে প্রয়োগ করে না।

১১৩.২ শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা: লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনের দিকে ধীর যাত্রা

শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ এশিয়ার একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ কারণ এই দেশে লিঙ্গ-সমতার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হয়েছে।

শ্রীলঙ্কার কোডিফাইড ক্রিমিনাল আইনে ২০২২ সালে কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে যা যৌন সহিংসতার সংজ্ঞাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করেছে। যদিও শ্রীলঙ্কার আইন এখনো সম্পূর্ণ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নয়, তবুও পুরুষ ভিকটিমের বিষয়টি সেদেশের আইনি বিতর্কে উঠছে।

শ্রীলঙ্কার পারিবারিক আইনে হেফাজত সংক্রান্ত বিধানগুলো মূলত সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থের নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, এবং পিতার সমান অধিকারকে তুলনামূলকভাবে বেশি স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

শ্রীলঙ্কায় পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্য সংকট একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে। বিশেষত পারিবারিক বিরোধ এবং আইনগত সংকটের পরিণতিতে পুরুষের আত্মহত্যার উচ্চ হার শ্রীলঙ্কান সমাজে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

১১৩.৩ নেপালের সাম্প্রতিক আইনি বিকাশ এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ প্রচেষ্টা

নেপাল দক্ষিণ এশিয়ায় একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ কারণ সে দেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনি সংস্কার করেছে।

নেপালের ফৌজদারি দণ্ডবিধি, ২০১৭ একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এই দণ্ডবিধিতে যৌন অপরাধের সংজ্ঞায় পুরুষ ভিকটিমকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুরুষের উপর যৌন হামলার বিষয়টি নেপালের আইনে এখন স্বীকৃত, যা দক্ষিণ এশিয়ায় একটি অগ্রণী পদক্ষেপ।

নেপালের ২০২২ সালের সম্পর্কিত কিছু পারিবারিক আইন সংশোধনে যৌথ হেফাজতের ধারণাটি আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। পিতার সমান অধিকার নেপালে ক্রমশ আইনগত স্বীকৃতি পাচ্ছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

নেপালের এই অগ্রগতি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা: দক্ষিণ এশিয়ার সমতুল্য সামাজিক-অর্থনৈতিক পর্যায়ের একটি দেশও লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনি সংস্কার করতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপেক্ষায় থাকার প্রয়োজন নেই।

অধ্যায় ১১৪: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মডেল: সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা

১১৪.১ সিঙ্গাপুরের কার্যকর আইন প্রয়োগ এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সংস্কার

সিঙ্গাপুর একটি বিশেষ উদাহরণ কারণ এটি একটি উচ্চ কার্যকর আইনি রাষ্ট্র যেখানে আইনের শাসন অত্যন্ত শক্তিশালী।

সিঙ্গাপুরে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন, ১৯৬১ ২০১৭ এবং ২০২১ সালে ব্যাপকভাবে সংশোধিত হয়েছে। সংশোধিত আইনে গার্হস্থ্য সহিংসতার সংজ্ঞাকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে এবং পুরুষ ভিকটিমদের জন্য সুরক্ষার বিধান সম্পন্ন করা হয়েছে।

সিঙ্গাপুরে ২০২২ সালে মহিলা সনদ, যা ১৯৬১ সালে প্রণীত, সংশোধনের মাধ্যমে পুরুষ গার্হস্থ্য সহিংসতা ভিকটিমদের জন্য সুরক্ষার বিধান সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

সিঙ্গাপুরে পারিবারিক বিচার আদালতে একটি বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে: নির্যাতনের মামলায় প্রাথমিক তদন্ত বাধ্যতামূলক এবং মিথ্যা অভিযোগের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান আছে। এই ব্যবস্থাটি মিথ্যা মামলার হার কমাতে কার্যকর হয়েছে।

সিঙ্গাপুরের যৌন অপরাধ সংক্রান্ত আইন সংস্কার ২০১৯ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। নতুন আইনে পুরুষ ধর্ষণ ভিকটিমদের আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সিঙ্গাপুর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রথম দেশগুলোর মধ্যে একটি যারা পুরুষ ধর্ষণকে আইনে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সিঙ্গাপুরের এই অগ্রগতির পেছনে একটি কারণ হলো দেশটির আইন মন্ত্রণালয় এবং পুলিশ বাহিনী আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সচেষ্ট। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি পাঠ: রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক সদিচ্ছা আইনি সংস্কারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

১১৪.২ মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা: ইসলামিক আইন ও সেক্যুলার আইনের দ্বন্দ্ব

মালয়েশিয়া বাংলাদেশের জন্য একটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক তুলনা কারণ উভয় দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য ইসলামিক পারিবারিক আইন এবং সাধারণ সেক্যুলার আইন পাশাপাশি বিদ্যমান।

মালয়েশিয়ায় পারিবারিক বিষয়ে মুসলিমদের জন্য শারিয়া আদালত এবং অমুসলিমদের জন্য দেওয়ানি আদালত রয়েছে। এই দ্বৈত ব্যবস্থা কিছু জটিলতা তৈরি করে, বিশেষত যখন মুসলিম পারিবারিক আইনে পুরুষকে তালাক দেওয়ার একতরফা অধিকার রয়েছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

কিন্তু মালয়েশিয়ার গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন, ১৯৯৪ সেক্যুলার আইনের অন্তর্গত এবং এটি মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই আইনটিও মূলত নারীর সুরক্ষার জন্য এবং পুরুষ ভিকটিমকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেয় না।

মালয়েশিয়ায় ২০২৩ সালে গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন সংশোধনের একটি প্রচেষ্টা হয়েছিল যেখানে পুরুষ ভিকটিমদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সংশোধনী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়নি।

বাংলাদেশের জন্য মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ দেয়: ইসলামিক আইন এবং লিঙ্গ-সমতার নীতি পরস্পরবিরোধী নয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোও লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

১১৪.৩ ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং পুরুষের অধিকার

ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। ইন্দোনেশিয়ার আইনি ব্যবস্থায় ডাচ ঔপনিবেশিক আইনের প্রভাব, ইসলামিক পারিবারিক আইন এবং স্থানীয় আদাত বা প্রথাগত আইনের একটি জটিল সমন্বয় রয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার গার্হস্থ্য সহিংসতা নির্মূল আইন, ২০০৪ পুরুষ ভিকটিমদের জন্য একটি সীমিত সুরক্ষা দেয়। এই আইনের সংজ্ঞায় "পরিবারের সদস্য" অন্তর্ভুক্ত, যা তত্ত্বগতভাবে পুরুষকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু বাস্তবে আইনটি মূলত নারীর সুরক্ষার জন্য প্রয়োগ হয়।

২০২৩ সালে ইন্দোনেশিয়ায় যৌন সহিংসতা আইন প্রয়োগ শুরু হয়েছে যা ২০২২ সালে পাস হয়েছিল। এই আইনে পুরুষ যৌন সহিংসতা ভিকটিমকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা ইন্দোনেশিয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।

অধ্যায় ১১৫: জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইনগত কাঠামো: একটি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

১১৫.১ ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশন এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সুরক্ষা

ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশন, যা ১৯৫০ সালে গৃহীত এবং ১৯৫৩ সালে কার্যকর হয়েছে, মানবাধিকার সুরক্ষার একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক কাঠামো। এই কনভেনশনের ১৪ অনুচ্ছেদ বৈষম্য নিরোধের নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে, যা লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্যকেও নিষিদ্ধ করে।

ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলায় পুরুষের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইনকে কনভেনশনের লঙ্ঘন হিসেবে ঘোষণা করেছে।

Konstantin Markin v. Russia (২০১২) মামলায় আদালত বলেছে যে পিতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে পুরুষের বিরুদ্ধে বৈষম্য কনভেনশনের ১৪ অনুচ্ছেদের সাথে ৮ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। এই রায়টি একটি নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে যে পারিবারিক বিষয়ে পুরুষের বিরুদ্ধে বৈষম্য ইউরোপীয় মানবাধিকার আইনে গ্রহণযোগ্য নয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২০১২ সালের লিঙ্গ সমতা বিষয়ক নির্দেশিকা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সমান সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি করে। EU আইনে "Gender Equality" মানে শুধু নারীর সমতা নয়, এটি পুরুষ ও নারী উভয়ের সমান মর্যাদার প্রশ্ন।

১১৫.২ জার্মানির পারিবারিক আইন এবং যৌথ হেফাজতের মডেল

জার্মানির পারিবারিক আইন পুরুষের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। জার্মানিতে বিবাহবিচ্ছেদের পর সন্তানের যৌথ হেফাজত ডিফল্ট আইনগত অবস্থান।

জার্মান Bürgerliches Gesetzbuch বা দেওয়ানি আইনে ১৬২৭ ধারায় বিবাহিত পিতা-মাতার যৌথ পিতৃত্ব দায়িত্বের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিবাহবিচ্ছেদের পরেও এই যৌথ দায়িত্ব বজায় থাকে যদি না আদালত বিশেষ কারণে পরিবর্তন করে।

২০০০ সালে জার্মান আইন সংশোধনীতে বিবাহের বাইরে জন্মানো সন্তানের ক্ষেত্রেও পিতার সমান হেফাজত অধিকার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই সংশোধনীটি ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতের চাপের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছিল।

জার্মানিতে গার্হস্থ্য সহিংসতা সংক্রান্ত আইন, Gewaltschutzgesetz, ২০০২ সালে প্রবর্তিত হয়েছে। এই আইনটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ এবং পুরুষ ভিকটিমদেরও সমান সুরক্ষা দেয়।

১১৫.৩ ফ্রান্সের পারিবারিক আইন সংস্কার এবং পিতার অধিকার আন্দোলন

ফ্রান্সে পিতার অধিকার আন্দোলন বিশেষভাবে সক্রিয়। "Les Papas" আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে ফরাসি পারিবারিক আদালতে পিতার সমান হেফাজত অধিকারের দাবি করে আসছে।

ফরাসি পারিবারিক আইনে ২০০২ সালের সংশোধনীতে যৌথ পিতৃত্ব দায়িত্বকে ডিফল্ট অবস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তার পরেও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে মা প্রধান হেফাজতকারী হিসেবে থাকেন।

ফ্রান্সে গার্হস্থ্য সহিংসতা বিরোধী আইনে পুরুষ ভিকটিমের বিষয়টি স্বীকৃত এবং ২০২০ সালে প্রবর্তিত নতুন বিধানগুলোতে পুরুষ ভিকটিমের জন্য সহায়তার কথা উল্লেখ আছে।

অধ্যায় ১১৬: আফ্রিকান দেশগুলোর অভিজ্ঞতা: লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনের ভিন্নধর্মী পথ

১১৬.১ দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবিধানিক মডেল এবং লিঙ্গ সমতা

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান, ১৯৯৬ বিশ্বের অন্যতম প্রগতিশীল সংবিধান। এই সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদ সমতার একটি শক্তিশালী গ্যারান্টি দেয়: প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের সামনে সমান এবং সমান সুরক্ষা ও সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান আরও বলে যে কারো বিরুদ্ধে অন্যায্য বৈষম্য নিষিদ্ধ এবং লিঙ্গ বৈষম্য অন্যায্য বৈষম্যের একটি স্পষ্ট রূপ। দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবিধানিক আদালত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রায়ে এই নীতি প্রয়োগ করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন, ১৯৯৮ এবং পরবর্তীতে ২০২১ সালের সংশোধিত সংস্করণ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। এই আইনে "ব্যক্তি" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে নির্দিষ্ট লিঙ্গের পরিবর্তে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পুরুষ গার্হস্থ্য সহিংসতা ভিকটিমদের জন্য সহায়তা পরিষেবা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। "Brothers for Life" এবং অন্যান্য সংগঠন পুরুষ ভিকটিমদের সহায়তা করে।

১১৬.২ রুয়ান্ডার লিঙ্গ-সমতার অভিজ্ঞতা

রুয়ান্ডা একটি অসাধারণ উদাহরণ কারণ গণহত্যার পর থেকে এই দেশ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে লিঙ্গ-সমতার দিকে এগিয়েছে। রুয়ান্ডার সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বিশ্বে সর্বোচ্চ।

কিন্তু রুয়ান্ডার অভিজ্ঞতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে: দ্রুত নারী ক্ষমতায়ন কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুরুষের অধিকার রক্ষা করে? রুয়ান্ডায় লিঙ্গ-সমতার নীতি উভয় লিঙ্গের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার চেষ্টা আছে, কিন্তু বাস্তবে পুরুষ ভিকটিমের বিষয়টি এখনো যথেষ্ট মনোযোগ পাচ্ছে না।

অধ্যায় ১১৭: তুলনামূলক আইনি বিশ্লেষণ থেকে উপলব্ধি: বাংলাদেশের জন্য মডেল নির্বাচন

১১৭.১ বিভিন্ন মডেলের সারসংক্ষেপ এবং মূল্যায়ন

এই অধ্যায়ে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোয় বিশ্লেষিত বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপ করব এবং বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক পাঠগুলো চিহ্নিত করব।

নর্ডিক মডেলের মূল শিক্ষা হলো: সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের সাথে আইনি পরিবর্তন সমন্বিত হওয়া উচিত। শুধু আইন পরিবর্তন করলে সমাজের গভীরে যে পক্ষপাত রয়েছে তা পরিবর্তন হয় না। নর্ডিক দেশগুলো শিক্ষা, শ্রম বাজার, শিশু যত্ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা, এই চারটি ক্ষেত্রে একযোগে পরিবর্তন এনেছে।

কমন ল' দেশগুলোর মূল শিক্ষা হলো: লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইন প্রণয়নের সময় নারীর সুরক্ষা দুর্বল হয় না। অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার অভিজ্ঞতা দেখায় যে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাষায় আইন লেখা এবং নারীর বিশেষ সুরক্ষা নিশ্চিত করা পাশাপাশি সম্ভব।

ভারতের অভিজ্ঞতার মূল শিক্ষা হলো: লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনের সংস্কারের জন্য সংগঠিত আইনগত আন্দোলন প্রয়োজন। শুধু একাডেমিক সমালোচনা যথেষ্ট নয়, আদালতে মামলা করতে হবে এবং সংসদীয় প্রক্রিয়ায় চাপ দিতে হবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞতার মূল শিক্ষা হলো: মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোও লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সেক্যুলার আইন তৈরি করতে পারে। ইসলামিক পারিবারিক আইন এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ফৌজদারি আইন পাশাপাশি থাকতে পারে।

নেপালের অভিজ্ঞতার মূল শিক্ষা হলো: অর্থনৈতিকভাবে সীমিত সম্পদের দেশেও লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনগত সংস্কার সম্ভব। সংসদীয় ইচ্ছা এবং আইনি সাহস থাকলে এটি করা যায়।

১১৭.২ বাংলাদেশের জন্য সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক মডেল

বাংলাদেশের নিজস্ব সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং আইনি বাস্তবতার আলোকে কোন মডেলটি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক, সেটি একটি জটিল প্রশ্ন।

বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক মডেলগুলো হলো, প্রথমত ভারতীয় মডেলের ন্যায়বিচারমূলক পদ্ধতি, অর্থাৎ আদালতে মামলার মাধ্যমে সংস্কার দাবি করা এবং সুপ্রিম কোর্টকে সংবিধানের সমতার নীতির ব্যাখ্যাকারী হিসেবে ব্যবহার করা। দ্বিতীয়ত সিঙ্গাপুরের কার্যকর আইন প্রয়োগের পদ্ধতি, অর্থাৎ মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক তদন্তের বাধ্যবাধকতা। তৃতীয়ত নেপালের সংসদীয় সংস্কারের পদ্ধতি, অর্থাৎ আইনের ভাষায় লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা আনা এবং পুরুষকেও আইনি সুরক্ষার আওতায় আনা।

মালয়েশিয়ার ইসলামিক আইন ও সেক্যুলার আইনের সমন্বয়ের অভিজ্ঞতাও বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিক কারণ বাংলাদেশেও মুসলিম পারিবারিক আইন এবং সাধারণ দণ্ড আইন পাশাপাশি রয়েছে।

১১৭.৩ বাংলাদেশের জন্য একটি সংকর মডেলের প্রস্তাব

বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে কার্যকর হবে একটি সংকর মডেল যা বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের নিজস্ব বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

এই সংকর মডেলের প্রধান উপাদানগুলো হলো: প্রথমত, আইনের ভাষায় লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা যেখানে প্রয়োজনে লিঙ্গ-নির্দিষ্ট বিশেষ বিধান রাখা যাবে কিন্তু মূল কাঠামো লিঙ্গ-নিরপেক্ষ থাকবে। দ্বিতীয়ত, নির্দোষিতার অনুমানের নীতি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা এবং জামিন অযোগ্যতার বিধান সীমিত করা। তৃতীয়ত, মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিকার এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। চতুর্থত, পুরুষ ভিকটিমের জন্য আলাদা সহায়তা পরিষেবা তৈরি করা। পঞ্চমত, সন্তানের হেফাজতে যৌথ হেফাজতকে ডিফল্ট নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

অধ্যায় ১১৮: ইসলামিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের অধিকার: একটি মাকাসিদ আশ-শরিয়া বিশ্লেষণ

১১৮.১ ইসলামিক আইনতত্ত্বে ন্যায়বিচারের ধারণা

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশে পারিবারিক আইনে ইসলামিক বিধানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই ইসলামিক আইনতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের অধিকারের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ইসলামিক আইনতত্ত্বে মাকাসিদ আশ-শরিয়া বা শরিয়ার উদ্দেশ্যসমূহের ধারণাটি কেন্দ্রীয়। ইমাম গাজ্জালি এবং পরবর্তীতে ইমাম শাতিবি যে মাকাসিদের তত্ত্ব বিকশিত করেছেন, তাতে শরিয়ার পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে: দ্বীন বা ধর্মের সুরক্ষা, নফস বা জীবনের সুরক্ষা, আকল বা বুদ্ধির সুরক্ষা, নসল বা বংশের সুরক্ষা এবং মাল বা সম্পদের সুরক্ষা।

এই মাকাসিদের আলোকে বাংলাদেশের লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনগুলো পরীক্ষা করা যায়। যখন মিথ্যা মামলার কারণে একজন পুরুষকে কারাগারে রাখা হয়, তখন তার নফস, আকল এবং মাল তিনটিরই সুরক্ষা বিনষ্ট হয়। এটি মাকাসিদের নীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

ইসলামিক আইনতত্ত্বে "আদল" বা ন্যায়বিচার একটি মৌলিক নীতি। কোরআনে বারবার আদলের দাবি করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে ন্যায়বিচার কোনো একটি গোষ্ঠীর পক্ষে নয়, এটি সকলের জন্য। যদি কোনো আইন বা তার প্রয়োগ আদলের নীতি লঙ্ঘন করে, তাহলে সেই আইন বা প্রয়োগ ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গ্রহণযোগ্য নয়।

১১৮.২ হাদিস ও ফিকহের আলোকে পুরুষের আইনি সুরক্ষা

ইসলামিক ফিকহে নির্দোষিতার অনুমানের নীতি একটি মৌলিক নীতি। ইসলামিক আইনে প্রমাণের বোঝা অভিযোগকারীর উপর, অভিযুক্তের উপর নয়। এই নীতিটি বাংলাদেশের অনেক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।

ইসলামিক আইনে মিথ্যা অভিযোগ, বিশেষত যৌন অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ, অত্যন্ত গুরুতর পাপ। "কাযফ" বা মিথ্যা ব্যভিচারের অভিযোগের জন্য ইসলামিক আইনে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। এই নীতিটি মিথ্যা মামলা করার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী নিরুৎসাহক।

বাংলাদেশের বর্তমান আইনি ব্যবস্থায় মিথ্যা যৌন অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেই। এটি ইসলামিক আইনের কাযফের নীতির সাথেও সাংঘর্ষিক।

১১৮.৩ সমসাময়িক মুসলিম পণ্ডিতদের লিঙ্গ-ন্যায়বিচার বিষয়ক চিন্তাভাবনা

সমসাময়িক মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে লিঙ্গ-ন্যায়বিচার বিষয়ে নতুন আলোচনা হচ্ছে। মিশরীয় আলেম ও আইনজ্ঞ মুহাম্মদ আমারা, তুরস্কের পণ্ডিত ও ধর্মতাত্ত্বিক হাইরেদ্দিন কারামান এবং মালয়েশিয়ার পণ্ডিত জিলাল কাফফা ইসলামিক আইনে লিঙ্গ-সমতার বিষয়টি নিয়ে নতুন দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেছেন।

এই পণ্ডিতরা বলছেন যে ইসলামিক আইনের অনেক বিধান মূলত ঐতিহাসিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য ছিল এবং পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে ইজতিহাদ বা আইনগত পুনর্ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুন সমাধান করা সম্ভব। তারা মাকাসিদ আশ-শরিয়ার নীতি ব্যবহার করে লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছেন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের ধর্মীয় পণ্ডিত এবং আইনবিদদের এই আন্তর্জাতিক ইসলামিক আলোচনার সাথে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় ধর্মীয় যুক্তি প্রায়ই সবচেয়ে প্রভাবশালী, তাই ইসলামিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায় ১১৯: বাংলাদেশের আইনগত সংস্কারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড-ভিত্তিক কাঠামো

১১৯.১ সার্বজনীন মানবাধিকার নীতির প্রয়োগ: একটি চেকলিস্ট

বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেটা মূল্যায়নের জন্য একটি সুস্পষ্ট কাঠামো প্রয়োজন। এই চেকলিস্টটি সেই মূল্যায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম মানদণ্ড হলো নির্দোষিতার অনুমান। প্রশ্ন হলো: আইনটি কি প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত আসামিকে নির্দোষ ধরে? বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের জামিন অযোগ্যতার বিধান এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় না।

দ্বিতীয় মানদণ্ড হলো বৈষম্যহীনতা। প্রশ্ন হলো: আইনটি কি লিঙ্গ-নির্বিশেষে সমানভাবে প্রযোজ্য? বাংলাদেশের গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এই মানদণ্ডে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয় না কারণ পুরুষ ভিকটিম এতে স্বীকৃত নয়।

তৃতীয় মানদণ্ড হলো ন্যায্য বিচারের অধিকার। প্রশ্ন হলো: আইনটি কি আসামিকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে জানার এবং তার উত্তর দেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ দেয়? বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের দ্রুত গ্রেফতারের বিধান এই মানদণ্ডে সমস্যাজনক।

চতুর্থ মানদণ্ড হলো আইনগত প্রতিকারের প্রাপ্যতা। প্রশ্ন হলো: মিথ্যা মামলার শিকার ব্যক্তির জন্য কার্যকর আইনগত প্রতিকার আছে? বাংলাদেশে এই প্রতিকার কার্যত অনুপস্থিত।

পঞ্চম মানদণ্ড হলো অনুপাতহীনতার পরীক্ষা। প্রশ্ন হলো: আইনে নির্ধারিত শাস্তি কি অপরাধের তুলনায় অনুপাতহীন? কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইনে অনুপাতহীন শাস্তির বিধান রয়েছে।

১১৯.২ ICCPR মেনে চলার জন্য বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা

ICCPR এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কিছু নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা স্বীকার করেছে। এই বাধ্যবাধকতাগুলো পূরণ করার জন্য বাংলাদেশের কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

ICCPR এর ৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বিচার-পূর্ব আটক ব্যতিক্রমী হওয়া উচিত এবং মুক্তিই স্বাভাবিক নিয়ম হওয়া উচিত। বাংলাদেশের জামিন অযোগ্য অপরাধের তালিকা ICCPR এর এই বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সংস্কার করা প্রয়োজন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ICCPR এর ১৪ অনুচ্ছেদ ন্যায্য বিচারের গ্যারান্টি দেয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এবং দ্রুত বিচারের নামে যে প্রক্রিয়াগত ছাড় দেওয়া হয়, তা এই অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, সেটা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ICCPR এর ২৬ অনুচ্ছেদ বৈষম্যহীন আইনের গ্যারান্টি দেয়। বাংলাদেশে লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনগুলো এই অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক। বাংলাদেশ সরকারের উচিত ICCPR মানবাধিকার কমিটিকে এই বিষয়ে প্রতিবেদন দেওয়া এবং সংস্কারের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা।

১১৯.৩ আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্কিং এবং বাংলাদেশের র‍্যাংকিং

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্লেষণ করলে আইনি ন্যায়বিচারের বর্তমান অবস্থা বোঝা যায়।

বিশ্ব ন্যায়বিচার প্রকল্পের Rule of Law Index-এ বাংলাদেশ ১৪২টি দেশের মধ্যে ১১৮ নম্বরে রয়েছে। এই সূচকে মৌলিক অধিকার, সুশৃঙ্খল বিচার এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার মানদণ্ড বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের এই নিম্ন র‍্যাংকিং লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনগুলোর পরোক্ষ প্রতিফলন।

Transparency International এর দুর্নীতি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান দুর্বল। পুলিশ ও বিচার বিভাগে দুর্নীতি লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনের অপব্যবহারকে আরও সহজ করে।

বৈশ্বিক লিঙ্গ ব্যবধান সূচকে বাংলাদেশ ২০২৫ সালে ২৪ নম্বরে অবস্থান করছে, যা বিভ্রান্তিকর কারণ এই সূচকটি শুধু নারীর অগ্রগতি মাপে, না কি লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে। বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন (দীর্ঘদিন নারী প্রধানমন্ত্রী) এই সূচকে উচ্চ র‍্যাংকিং দিয়েছে, কিন্তু পুরুষের আইনগত সংকটের বিষয়টি এই সূচকে প্রতিফলিত হয়নি।

অধ্যায় ১২০: তুলনামূলক আইনতত্ত্ব: লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার দার্শনিক ভিত্তি পুনর্বিবেচনা

১২০.১ তুলনামূলক আইনবিজ্ঞানের পদ্ধতি এবং তার প্রয়োগ

তুলনামূলক আইনবিজ্ঞান বা Comparative Jurisprudence হলো বিভিন্ন আইনি ব্যবস্থার তুলনামূলক অধ্যয়ন। এই বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন আইনি ব্যবস্থার মিল-অমিল চিহ্নিত করা, শ্রেষ্ঠ অনুশীলনগুলো চিহ্নিত করা এবং আইনি সংস্কারের জন্য তুলনামূলক উদাহরণ ব্যবহার করা।

তুলনামূলক আইনবিজ্ঞানের দুটি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমটি হলো কার্যকরী পদ্ধতি, যেখানে বিভিন্ন আইনি ব্যবস্থায় একই সামাজিক সমস্যার সমাধান কিভাবে করা হয়েছে তা তুলনা করা হয়। দ্বিতীয়টি হলো প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি, যেখানে বিভিন্ন দেশের আইনি প্রতিষ্ঠান ও তাদের ভূমিকা তুলনা করা হয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কার্যকরী পদ্ধতি বেশি উপযোগী। গার্হস্থ্য সহিংসতা, যৌতুক-সংক্রান্ত অপরাধ এবং পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সমাধানগুলো তুলনা করলে বাংলাদেশের জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতিটি বেছে নেওয়া সম্ভব।

১২০.২ আইনি রূপান্তরবাদ এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার দিকে যাত্রা

আইনি রূপান্তরবাদ বা Legal Transformationism হলো এমন একটি তাত্ত্বিক অবস্থান যা বিশ্বাস করে যে আইন শুধু সমাজকে প্রতিফলিত করে না, বরং আইন সমাজকে রূপান্তরিত করতেও পারে।

এই দৃষ্টিকোণে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইন প্রণয়ন শুধু বিদ্যমান লিঙ্গ-সমতার আইনগত স্বীকৃতি নয়, বরং এটি একটি রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ যা ভবিষ্যতের সামাজিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইন প্রণয়ন করলে তা তাৎক্ষণিকভাবে সামাজিক মনোভাব পরিবর্তন করবে না। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এই আইনগুলো সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সহায়তা করবে। আইনের রূপান্তরমূলক শক্তির উপর আস্থা রাখতে হবে।

১২০.৩ পোস্ট-কলোনিয়াল লিগ্যাল থিওরি এবং বাংলাদেশের আইনি পরিচয়

উপনিবেশ-পরবর্তী আইনতত্ত্ব বা Post-Colonial Legal Theory একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ যা প্রাসঙ্গিক। এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে কিভাবে ঔপনিবেশিক আইনি ব্যবস্থাগুলো স্বাধীনতার পরেও টিকে থাকে এবং নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইনের একটি শক্তিশালী উত্তরাধিকার রয়েছে। ১৮৬০ সালের পেনাল কোড, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি এখনো বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

এই ঔপনিবেশিক আইনগুলো তৈরি হয়েছিল একটি পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোকে নিয়মতান্ত্রিক রূপ দেওয়ার জন্য। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ এই কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বরং কিছু ক্ষেত্রে এটি আরও জটিল হয়েছে।

পোস্ট-কলোনিয়াল আইনতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে, বাংলাদেশের আইনি সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো ঔপনিবেশিক আইনি কাঠামোর মানসিকতা থেকে মুক্তি পাওয়া এবং একটি স্বাধীন, ন্যায়সঙ্গত আইনি পরিচয় তৈরি করা।

অধ্যায় ১২১: আইনি পুবালঙ্ঘন বনাম আইনি সংস্কার: বাংলাদেশে পরিবর্তনের পথ

১২১.১ সাংবিধানিক মামলার কৌশল: উচ্চ আদালতের মাধ্যমে পরিবর্তন

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট, বিশেষত হাইকোর্ট বিভাগ, সংবিধানের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে রিট মামলা গ্রহণ করতে পারে। সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ এই ক্ষমতা আদালতকে দিয়েছে।

লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনগুলোর বিরুদ্ধে সাংবিধানিক মামলার কৌশলটি সম্ভাব্য এবং কার্যকর হতে পারে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের জামিন অযোগ্যতার বিধান সংবিধানের ৩১, ৩২ এবং ৩৩ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন করে কিনা, সেটা সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জের বিষয় হতে পারে।

এই মামলাটি করতে হবে একজন আইনজীবী বা আইনি সহায়তা সংগঠনের মাধ্যমে। যিনি এই মামলাটি করবেন, তাকে দেখাতে হবে যে জামিন অযোগ্যতার বিধান কিভাবে সংবিধানের নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন করে। এরপর আদালতকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ভারতের Rajesh Sharma মামলার অভিজ্ঞতা দেখায় যে এই ধরনের মামলা সফল হতে পারে। বাংলাদেশেও সুপ্রিম কোর্ট বেশ কিছু প্রগতিশীল রায় দিয়েছে যা মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আদালতের সক্রিয়তা দেখায়।

১২১.২ সংসদীয় পথে সংস্কারের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়নের প্রধান অঙ্গ। সংসদীয় পথে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইন সংস্কার করার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতা এই পথকে কঠিন করে।

রাজনৈতিক দলগুলো নারী ভোটারদের হারানোর ভয়ে এই সংস্কার করতে অনিচ্ছুক। তবে যদি সংস্কারের প্রস্তাবটি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে এটি নারীর সুরক্ষা দুর্বল না করে বরং সামগ্রিক ন্যায়বিচার উন্নত করে, তাহলে এটি রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

২০২৪ সালের আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে একটি সুযোগ তৈরি হয়েছিল। এই সরকার সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং বিভিন্ন কমিশন গঠন করেছে। পুরুষের আইনগত সংকট বিষয়টি এই সংস্কার আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি।

ভবিষ্যতে নির্বাচিত সংসদ গঠনের পরে এই সংস্কারের চেষ্টা করতে হবে। সংসদ সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের এই বিষয়ে সংবেদনশীল করা যেতে পারে।

১২১.৩ নাগরিক সমাজের ভূমিকা এবং জনমত গঠনের কৌশল

আইনি সংস্কারের তৃতীয় পথটি হলো নাগরিক সমাজের সক্রিয়তার মাধ্যমে। বাংলাদেশে সক্রিয় নাগরিক সমাজ রয়েছে এবং এই সমাজ বিভিন্ন সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

পুরুষের আইনগত সংকটের বিষয়ে জনমত গঠনের জন্য গণমাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়াকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষদের ব্যক্তিগত গল্পগুলো সামাজিক সহানুভূতি তৈরিতে সহায়তা করতে পারে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

একাডেমিক গবেষণা এবং পরিসংখ্যান সংগ্রহও গুরুত্বপূর্ণ। মিথ্যা মামলার হার, দীর্ঘ কারাবাসের প্রভাব এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করলে আইন সংস্কারের পক্ষে একটি শক্তিশালী প্রমাণভিত্তিক যুক্তি তৈরি হবে।

অধ্যায় ১২২: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার সাথে সংলাপ: বাংলাদেশের সুযোগ ও কৌশল

১২২.১ জাতিসংঘের মানবাধিকার পর্যালোচনা প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশ

জাতিসংঘে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য সার্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা বা Universal Periodic Review (UPR) নামক একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিও এই প্রক্রিয়ায় পর্যালোচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের UPR তে সাধারণত নারীর অধিকার, রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিস্থিতি, বাক স্বাধীনতা এবং বিচারহীনতার বিষয়গুলো উঠে আসে। পুরুষের আইনগত সংকটের বিষয়টি এই পর্যালোচনায় কখনো আসেনি।

পুরুষের অধিকার বিষয়ক একটি সংগঠন যদি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে UPR প্রক্রিয়ায় একটি শ্যাডো রিপোর্ট দাখিল করে, তাহলে এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে আসতে পারে। শ্যাডো রিপোর্ট হলো নাগরিক সমাজ সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারি রিপোর্টের বিকল্প মূল্যায়ন।

ICCPR মানবাধিকার কমিটিতেও বাংলাদেশের পর্যায়ক্রমিক প্রতিবেদন দাখিলের সময় নাগরিক সমাজ শ্যাডো রিপোর্ট দাখিল করতে পারে। এই রিপোর্টে লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনগুলো এবং পুরুষের আইনগত সংকটের বিষয়টি তুলে ধরা যেতে পারে।

১২২.২ আঞ্চলিক মানবাধিকার কাঠামো এবং সার্কের সম্ভাবনা

দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক মানবাধিকার কাঠামো তুলনামূলকভাবে দুর্বল। সার্ক বা দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার মানবাধিকার প্রক্রিয়া কার্যকর নয়।

তবে সার্ক কাঠামোয় একটি আঞ্চলিক আইনি সংলাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানের আইন বিশেষজ্ঞরা যদি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনের বিষয়ে একটি আঞ্চলিক সংলাপ শুরু করেন, তাহলে বাংলাদেশও তা থেকে উপকৃত হতে পারে।

নেপালের ফৌজদারি দণ্ডবিধি ২০১৭ এবং ২০২৫ সালে বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধন একটি আঞ্চলিক প্রবণতার অংশ। এই আঞ্চলিক প্রবণতাকে সংগঠিত করা এবং ত্বরান্বিত করার জন্য একটি আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক প্রয়োজন।

১২২.৩ আন্তর্জাতিক পুরুষ অধিকার আন্দোলনের সাথে সংযোগ

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পুরুষ অধিকার আন্দোলন সক্রিয়। অস্ট্রেলিয়ার "One in Three Campaign", কানাডার "Canadian Association for Equality (CAFE)", যুক্তরাজ্যের "Mankind Initiative" এবং ভারতের "Save Indian Family Foundation" এরকম কিছু সংগঠন।

এই সংগঠনগুলোর সাথে বাংলাদেশের সংলাপ এবং সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তারা কিভাবে আইনি সংস্কার অর্জন করেছে, কিভাবে জনমত তৈরি করেছে এবং কিভাবে সরকার ও সংসদকে প্রভাবিত করেছে, সেই অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ শিক্ষা নিতে পারে।

তবে এই সংযোগের ক্ষেত্রে একটি সতর্কতা প্রয়োজন। কিছু আন্তর্জাতিক পুরুষ অধিকার আন্দোলন নারীবিরোধী চরিত্রের, এবং বাংলাদেশের আন্দোলন সেই পথে যাওয়া উচিত নয়। বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন একটি ন্যায়বিচারমূলক, অ-নারীবিরোধী পুরুষ অধিকার আন্দোলন।

অধ্যায় ১২৩: আইনি সংস্কারের জুরিসপ্রুডেন্টিয়াল ভিত্তি: নতুন তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি

১২৩.১ লিবার্টারিয়ান আইনতত্ত্ব এবং পুরুষের স্বাধীনতার প্রশ্ন

লিবার্টারিয়ান আইনতত্ত্ব ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ মূল্য হিসেবে বিবেচনা করে। এই দৃষ্টিকোণে যেকোনো রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ন্যায্যতা প্রমাণ করতে হবে এবং ন্যূনতম হস্তক্ষেপের নীতি অনুসরণ করতে হবে।

লিবার্টারিয়ান আইনতাত্ত্বিক মার্ক থ্রিবার্গ "Coercive legal control over men" বা পুরুষের উপর আইনের মাধ্যমে জবরদস্তি নিয়ন্ত্রণের ধারণাটি বিশ্লেষণ করেছেন। তার যুক্তি হলো যখন রাষ্ট্র একজন পুরুষকে শুধুমাত্র একটি অভিযোগের ভিত্তিতে কারাগারে রাখে, তখন এটি তার মৌলিক স্বাধীনতার লঙ্ঘন।

লিবার্টারিয়ান দৃষ্টিকোণ থেকে, বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের জামিন অযোগ্যতার বিধান রাষ্ট্রের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের একটি উদাহরণ। এই বিধান পুরুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে এবং এর জন্য পর্যাপ্ত ন্যায্যতা নেই।

১২৩.২ কমিউনিটারিয়ান আইনতত্ত্ব এবং সামাজিক সংহতির প্রশ্ন

কমিউনিটারিয়ান আইনতত্ত্ব আলাসদেইর ম্যাকইনটায়ার, মাইকেল স্যান্ডেল এবং মাইকেল ওয়ালজারের চিন্তায় বিকশিত হয়েছে। এই তত্ত্ব মনে করে যে ব্যক্তি স্বাধীনতার চেয়ে সামাজিক সংহতি এবং সম্প্রদায়গত মূল্যবোধ আইনের ভিত্তি হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কমিউনিটারিয়ান দৃষ্টিকোণটি প্রাসঙ্গিক কারণ এটি ব্যাখ্যা করে কেন লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনগুলো সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে: এই আইনগুলো সামাজিক মূল্যবোধের একটি প্রকাশ।

কিন্তু কমিউনিটারিয়ান তত্ত্বের একটি সমস্যা হলো এটি সামাজিক মূল্যবোধকে প্রশ্ন না করে গ্রহণ করে। যদি সামাজিক মূল্যবোধ পক্ষপাতদুষ্ট হয়, তাহলে কমিউনিটারিয়ান তত্ত্ব সেই পক্ষপাতকে আইনগত করার ঝুঁকি তৈরি

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

করে। বাংলাদেশে এটিই হয়েছে: পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোধ একটি বিশেষ ধরনের আইনি পক্ষপাত তৈরি করেছে যা কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের বিরুদ্ধে কাজ করে।

১২৩.৩ ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ এবং পুরুষের মানব বিকাশ

আমার্ত্য সেন এবং মার্থা নুসবাউমের ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ বা সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি মানব বিকাশকে সক্ষমতার প্রশ্ন হিসেবে দেখে। এই তত্ত্বে মানুষের যা করতে পারার ক্ষমতা রয়েছে এবং যা হতে পারার ক্ষমতা রয়েছে, সেটাই তার মানব বিকাশের মানদণ্ড।

নুসবাউম তার "Women and Human Development" (২০০০) গ্রন্থে মৌলিক মানবিক সক্ষমতার একটি তালিকা দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে: শারীরিক অখণ্ডতা, সুস্বাস্থ্য, বোধশক্তির সুব্যবহার, আবেগ, ব্যবহারিক যুক্তি, অন্যদের সাথে সম্পর্ক, অন্যান্য প্রজাতির সাথে সহাবস্থান, খেলা এবং পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ।

বাংলাদেশে মিথ্যা মামলার শিকার একজন পুরুষের ক্ষেত্রে এই সক্ষমতাগুলোর প্রায় সবগুলোই ক্ষুণ্ন হয়। তার শারীরিক অখণ্ডতা লঙ্ঘিত হয় কারাগারে থেকে, তার ব্যবহারিক যুক্তির সুযোগ কমে যায় যখন সে প্রাতিষ্ঠানিক কলঙ্কের শিকার হয় এবং সামাজিক ও পেশাদার সম্পর্কগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচে এই সক্ষমতার ক্ষয়ক্ষতি একটি গুরুতর মানবিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত এবং এই ক্ষতির প্রতিকারের জন্য রাষ্ট্র বাধ্য।

১২৩.৪ রিপাবলিকান আইনতত্ত্ব এবং আধিপত্যের প্রশ্ন

ফিলিপ পেটিটের রিপাবলিকান আইনতত্ত্ব আধিপত্য বা domination মুক্ততাকে স্বাধীনতার মূল মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে। এই তত্ত্বে শুধু হস্তক্ষেপের অনুপস্থিতি নয়, বরং যেকোনো ধরনের আধিপত্যের অনুপস্থিতিই প্রকৃত স্বাধীনতা।

পেটিটের রিপাবলিকান দৃষ্টিকোণে, বাংলাদেশের লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনগুলো পুরুষের উপর একটি বিশেষ ধরনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। যখন আইন এমন বিধান রাখে যা যেকোনো সময় একজন পুরুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়, তখন পুরুষ এই বিধানের ভয়ে বাস করে এবং এই ভয়ই তার উপর আধিপত্যের একটি রূপ।

এই রিপাবলিকান বিশ্লেষণটি বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে পুরুষ জানেন যে তার স্ত্রী যেকোনো সময় একটি মিথ্যা মামলা করতে পারেন এবং তিনি কারাগারে যেতে পারেন, তিনি এই ভয়ের মধ্যে বাস করেন। এই ভয় তার পারিবারিক সম্পর্কে, পেশাদার সিদ্ধান্তে এবং সামাজিক আচরণে প্রভাব ফেলে।

অধ্যায় ১২৪: আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট আইন সংস্কার প্রস্তাব

১২৪.১ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সংস্কার: একটি তুলনামূলক প্রস্তাব

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোয় আমরা বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা দেখেছি। এই অভিজ্ঞতাগুলোর আলোকে বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের জন্য নিম্নলিখিত সংস্কারের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম প্রস্তাব: জামিনের বিধান সংস্কার। কানাডা এবং যুক্তরাজ্যের মডেলে, গুরুতর অপরাধ ব্যতীত জামিন ডিফল্ট হওয়া উচিত। বাংলাদেশেও এই নীতি অনুসরণ করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের জামিন অযোগ্যতার তালিকা পর্যালোচনা করা উচিত এবং শুধুমাত্র সর্বোচ্চ গুরুত্বের অপরাধগুলো জামিন অযোগ্য রাখা উচিত।

দ্বিতীয় প্রস্তাব: প্রাথমিক তদন্তের বাধ্যবাধকতা। সিঙ্গাপুরের মডেলে, মামলা দায়েরের পর গ্রেফতারের আগে একটি প্রাথমিক তদন্ত করা উচিত। এই তদন্তে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা যাচাই করা হবে। বাংলাদেশে এই বিধান প্রবর্তন করলে মিথ্যা মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।

তৃতীয় প্রস্তাব: মিথ্যা অভিযোগকারীর কার্যকর শাস্তি। কানাডিয়ান আইনে মিথ্যা মামলার শিকার ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারেন। বাংলাদেশেও এই বিধান প্রবর্তন করা উচিত। শুধু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১৭ ধারায় নয়, বরং পৃথক একটি আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান রাখা উচিত।

চতুর্থ প্রস্তাব: পুরুষ ভিকটিমের স্বীকৃতি। ২০২৫ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ পুরুষকে ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই অগ্রগতিকে আরও বিস্তৃত করতে হবে। পুরুষ গার্হস্থ্য সহিংসতা ভিকটিমদেরও আইনগত স্বীকৃতি এবং সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

পঞ্চম প্রস্তাব: মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি। ভারতের ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার মডেলে বাংলাদেশেও নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা উচিত। দীর্ঘস্থায়ী মামলা মিথ্যা মামলার হাতিয়ার, তাই দ্রুত বিচার মিথ্যা মামলাকে কম কার্যকর করবে।

১২৪.২ গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এর সংস্কার

গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এর সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব করা হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ার পারিবারিক আইনের মডেলে আইনের সংজ্ঞায় "ব্যক্তি" শব্দটি ব্যবহার করে পুরুষ ভিকটিমকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ব্রিটিশ গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন ২০২১ এর মডেলে গার্হস্থ্য সহিংসতার সংজ্ঞাকে আরও বিস্তৃত করা উচিত যাতে মানসিক, অর্থনৈতিক এবং যোগাযোগ-নিয়ন্ত্রণমূলক সহিংসতাও অন্তর্ভুক্ত হয়।

জার্মানির মডেলে পুরুষ ভিকটিমের জন্য আলাদা সহায়তা কেন্দ্র এবং হেল্পলাইন স্থাপন করা উচিত। কানাডার মডেলে আইনটি প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা উচিত।

১২৪.৩ মুসলিম পারিবারিক আইন সংস্কারের প্রস্তাব

বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ একটি অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল আইন। কিন্তু সন্তানের হেফাজত এবং তালাক সংক্রান্ত বিধানে কিছু সংস্কার প্রয়োজন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

জার্মানি এবং অস্ট্রেলিয়ার মডেলে সন্তানের হেফাজতে যৌথ হেফাজতকে ডিফল্ট নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে ইসলামিক পারিবারিক আইনের মধ্যেই যৌথ হেফাজতের ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব।

ডেনমার্কের মডেলে পিতার দর্শনের অধিকার কার্যকরভাবে নিশ্চিত করার জন্য আইনগত বিধান শক্তিশালী করা উচিত। যদি মা পিতার সাথে সন্তানের যোগাযোগে বাধা দেন, তাহলে কার্যকর আইনগত প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

অধ্যায় ১২৫: বিচার বিভাগের ভূমিকা: আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা

১২৫.১ বিচারকদের লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ: বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা

বিশ্বের অনেক দেশে বিচারকদের জন্য লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। কানাডায় বিচারিক শিক্ষা ইনস্টিটিউট এই প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং ২০২১ সালে কানাডিয়ান সংসদ আইন করে বিচারকদের জন্য লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করেছে।

কানাডার এই আইনটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি শুধু নারীর প্রতি সংবেদনশীলতার কথা বলে না, বরং সকল লিঙ্গের প্রতি সংবেদনশীলতার কথা বলে। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি মূল্যবান মডেল।

অস্ট্রেলিয়ায় ন্যাশনাল জুডিশিয়াল কলেজ বিচারকদের প্রশিক্ষণে "gender diversity in the justice system" কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই প্রশিক্ষণে পুরুষ ভিকটিমের অভিজ্ঞতা এবং লিঙ্গ-পক্ষপাতের বিষয়টিও আলোচনা করা হয়।

বাংলাদেশে বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণ একাডেমি রয়েছে। এই একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের বিষয়টি যোগ করা উচিত। বিচারকদের শেখানো উচিত যে পুরুষ ভিকটিমও বিদ্যমান এবং একজন নারীর অভিযোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য নয়।

১২৫.২ প্রমাণের মানদণ্ড এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিভিন্ন দেশে যৌন অপরাধ এবং গার্হস্থ্য সহিংসতার মামলায় প্রমাণের মানদণ্ড ভিন্ন। এই বিভিন্নতা থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পাঠ নেওয়া যায়।

যুক্তরাজ্যে ধর্ষণ মামলায় "beyond reasonable doubt" বা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণের মানদণ্ড প্রযোজ্য। এই মানদণ্ডটি উচ্চ এবং আসামির পক্ষে সুরক্ষামূলক। অনেকে এই মানদণ্ড নামানোর দাবি করেন, কিন্তু আইনবিদরা সতর্ক করেন যে মানদণ্ড নামানো নির্দোষ ব্যক্তির দণ্ডের ঝুঁকি বাড়াবে।

কানাডায় যৌন হামলার মামলায় আদালত সম্মতির প্রশ্নে বিশেষ যত্ন নেয় এবং একটি সুষ্ঠু শুনানি নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু সুরক্ষামূলক বিধান রয়েছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় প্রমাণের মানদণ্ড আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা উচিত। অভিযোগকারীর বক্তব্য একমাত্র প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট হওয়া উচিত নয়।

১২৫.৩ জুরি ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের বিকল্প

অনেক কমন ল' দেশে জুরি ব্যবস্থা রয়েছে যা বিচারের মধ্যে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে। জুরি ব্যবস্থায় বিচারকের একক পক্ষপাতের সম্ভাবনা কমে।

বাংলাদেশে জুরি ব্যবস্থা নেই এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি প্রবর্তন করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু বিকল্প হিসেবে একটি প্যানেল বিচারক ব্যবস্থা, যেখানে একটি মামলায় একাধিক বিচারক সিদ্ধান্ত নেবেন, বিবেচনা করা যেতে পারে।

অধ্যায় ১২৬: বাংলাদেশের জন্য একটি সামগ্রিক লিঙ্গ-ন্যায়বিচার কাঠামো: আন্তর্জাতিক সংশ্লেষণ

১২৬.১ লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের একটি আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা নির্মাণ

এই পাঠ্যগ্রন্থে যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার আলোকে বাংলাদেশের জন্য একটি লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা প্রস্তাব করা হচ্ছে।

লিঙ্গ-ন্যায়বিচার হলো এমন একটি আইনগত ও সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে নারী, পুরুষ ও লিঙ্গ-বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিরা তাদের মানব মর্যাদার সম্পূর্ণ স্বীকৃতি পান। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি আইনের সামনে সমান, নির্দোষিতার অনুমান সকলের জন্য প্রযোজ্য, মিথ্যা অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার বিদ্যমান এবং লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে সহিংসতার শিকার ব্যক্তি আইনগত সুরক্ষা পান।

এই সংজ্ঞাটি ICCPR, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং বাংলাদেশের সংবিধানের সমতার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১২৬.২ তিনটি স্তরে লিঙ্গ-ন্যায়বিচার: আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক

বাংলাদেশে লিঙ্গ-ন্যায়বিচার অর্জনের জন্য তিনটি স্তরে একযোগে কাজ করতে হবে।

প্রথম স্তর হলো আইনি স্তর। এই স্তরে লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইনগুলো সংস্কার করতে হবে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের জামিন বিধান, গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের সংজ্ঞা এবং হেফাজত আইনের বিধান এই স্তরের পরিবর্তনের বিষয়।

দ্বিতীয় স্তর হলো প্রাতিষ্ঠানিক স্তর। এই স্তরে পুলিশ, বিচার বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর আচরণ পরিবর্তন করতে হবে। লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ, জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া এবং কার্যকর তদারকি এই স্তরের অংশ।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

তৃতীয় স্তর হলো সামাজিক স্তর। এই স্তরে সামাজিক মনোভাব এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের কাজ করতে হবে। শিক্ষা, গণমাধ্যম এবং সামাজিক আন্দোলন এই স্তরের হাতিয়ার।

নর্ডিক দেশগুলোর সাফল্যের রহস্য হলো তারা এই তিনটি স্তরে একযোগে এবং দীর্ঘমেয়াদে কাজ করেছে। বাংলাদেশকেও এই একই পথে হাঁটতে হবে।

১২৬.৩ ২০২৬-২০৩৬: বাংলাদেশের জন্য একটি দশ বছরের লিঙ্গ-ন্যায়বিচার পরিকল্পনা

বাংলাদেশের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী লিঙ্গ-ন্যায়বিচার পরিকল্পনার রূপরেখা নিচে দেওয়া হলো।

২০২৬-২০২৮ সালের মধ্যে অর্থাৎ প্রথম তিন বছরে সংসদীয় পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংস্কার কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটিতে আইনবিদ, নারী অধিকার কর্মী, পুরুষ অধিকার কর্মী এবং মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ থাকবেন। বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণ একাডেমিতে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার বিষয়ক মডিউল যোগ করতে হবে। পুরুষ গার্হস্থ্য সহিংসতা ভিকটিমদের জন্য একটি পাইলট সহায়তা কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

২০২৯-২০৩১ সালের মধ্যে অর্থাৎ দ্বিতীয় তিন বছরে সংস্কার কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আইন সংশোধন বিল সংসদে উপস্থাপন করতে হবে। গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ করতে হবে। সন্তানের হেফাজতে যৌথ হেফাজতকে ডিফল্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

২০৩২-২০৩৬ সালের মধ্যে অর্থাৎ শেষ পাঁচ বছরে আইন সংস্কারের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় লিঙ্গ সমতা কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপস্থাপন করতে হবে।

অধ্যায় ১২৭: বাংলাদেশে পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্য: একটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি

১২৭.১ বৈশ্বিক পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্য সংকট এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২৩ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী আত্মহত্যার হারে পুরুষ নারীর তুলনায় তিনগুণ বেশি। এই পরিসংখ্যানটি একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য সংকটের প্রতিফলন। পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা গোপন রাখেন, সাহায্য চান না এবং প্রায়ই সংকট চরমে উঠলে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

বাংলাদেশে এই সংকটটি বিশেষভাবে তীব্র। পারিবারিক বিরোধ এবং আইনগত হয়রানির শিকার পুরুষের আত্মহত্যার হার উদ্বেগজনক। বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিবেদনে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় অভিযুক্ত পুরুষের আত্মহত্যার খবর নিয়মিত আসে, কিন্তু এই তথ্যের কোনো সরকারি সংকলন নেই।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

নর্ডিক দেশগুলোতে পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্যকে একটি জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ডেনমার্কে পুরুষদের জন্য আলাদা মানসিক স্বাস্থ্য প্রচারাভিযান চালানো হয়। সুইডেনে পুরুষদের সাহায্য চাইতে উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ পরিষেবা আছে।

বাংলাদেশে এই ধরনের পরিষেবা নেই। পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যকে একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং এই বিষয়ে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১২৭.২ আইনি হয়রানি এবং পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক: একটি বৈশ্বিক বিশ্লেষণ

আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে মিথ্যা অভিযোগের শিকার ব্যক্তিদের মানসিক স্বাস্থ্যে গভীর ক্ষতি হয়। যুক্তরাষ্ট্রে মিথ্যা ধর্ষণ অভিযোগের শিকার হওয়ার পর যারা মুক্তি পান, তাদের উপর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে তাদের বিষণ্নতা, উদ্বেগ এবং পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারের হার সাধারণ জনগোষ্ঠীর চেয়ে অনেক বেশি।

যুক্তরাজ্যে নির্দোষ প্রমাণিত ব্যক্তিদের মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য সরকারি অর্থায়নের একটি প্রকল্প রয়েছে। এই প্রকল্পটি মিথ্যা অভিযোগের মানসিক ক্ষতির স্বীকৃতির একটি উদাহরণ।

বাংলাদেশে মিথ্যা মামলার শিকার ব্যক্তিদের মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার কোনো ব্যবস্থা নেই। এটি একটি গুরুতর ফাঁক যা পূরণ করা প্রয়োজন।

১২৭.৩ পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক আন্দোলন এবং বাংলাদেশ

"Movember" আন্দোলন, যা প্রতিবছর নভেম্বর মাসে পুরুষের স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য পরিচালিত হয়, বাংলাদেশে এখনো ব্যাপকভাবে পরিচিত নয়। এই আন্দোলনকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার সুযোগ রয়েছে।

"Men's Mental Health Awareness" বা পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতার আন্তর্জাতিক আন্দোলন বাংলাদেশেও প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশে পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যকে সামাজিক কলঙ্ক থেকে মুক্ত করা এবং সহায়তা চাওয়াকে স্বাভাবিক করা প্রয়োজন।

অধ্যায় ১২৮: আইনগত সাংস্কৃতিবাদ এবং আন্তর্জাতিক নিয়মের স্থানীয়করণ

১২৮.১ আইনগত সাংস্কৃতিবাদের চ্যালেঞ্জ

আইনগত সাংস্কৃতিবাদ বা Legal Culturalism হলো এমন একটি যুক্তি যে প্রতিটি সমাজের নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে আইন তৈরি হওয়া উচিত এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড সরাসরি প্রযোজ্য নয়।

এই যুক্তিটি কিছু পরিমাণে ন্যায্য। বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা নর্ডিক দেশগুলো থেকে মৌলিকভাবে আলাদা এবং নর্ডিক মডেলের সরাসরি অনুকরণ কার্যকর হবে না।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

কিন্তু আইনগত সাংস্কৃতিবাদের একটি বিপদ হলো এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনকে "সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব" হিসেবে ন্যায্যতা দেওয়ার একটি হাতিয়ার হতে পারে। "এটি আমাদের সংস্কৃতি" বলে কোনো বৈষম্যকে চিরস্থায়ী রাখা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয়।

মানবাধিকারের সার্বজনীনতার নীতি বলে যে কিছু মূলনীতি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। নির্দোষিতার অনুমানের নীতি, আইনের সামনে সমতার নীতি এবং বৈষম্যহীনতার নীতি এই ধরনের সার্বজনীন মূলনীতি।

১২৮.২ আন্তর্জাতিক নিয়মের স্থানীয়করণ: একটি কাঠামো

আন্তর্জাতিক নিয়মের স্থানীয়করণ মানে সেই নিয়মগুলোকে স্থানীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অভিযোজিত করে প্রয়োগ করা। এটি অনুকরণ নয়, অভিযোজন।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে স্থানীয়করণের কিছু উদাহরণ হতে পারে। নর্ডিক মডেলের পিতার ছুটির ধারণাটি বাংলাদেশে "পিতৃত্বকালীন দায়িত্বভাগ" হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে, যা ইসলামিক পারিবারিক মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তৈরি করা সম্ভব।

অস্ট্রেলিয়ার যৌথ হেফাজতের ধারণাটি বাংলাদেশের ইসলামিক আইনের কাঠামোয় "উভয় পিতামাতার সমান দায়িত্ব" হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সিঙ্গাপুরের প্রাথমিক তদন্তের বিধানটি বাংলাদেশে "অভিযোগ যাচাই প্রক্রিয়া" হিসেবে প্রবর্তন করা যেতে পারে।

এই স্থানীয়করণের প্রক্রিয়ায় স্থানীয় ধর্মীয় নেতা, আইনবিদ এবং সামাজিক কর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১২৮.৩ ইসলামিক আধুনিকতাবাদ এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সমন্বয়

ইসলামিক আধুনিকতাবাদ একটি বৌদ্ধিক আন্দোলন যা ইসলামিক আইন ও চিন্তাকে আধুনিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে চায়। মুহাম্মদ আবদুহ, জামালউদ্দিন আফগানি এবং সমসাময়িক আলেমরা এই আন্দোলনের প্রতিনিধি।

ইসলামিক আধুনিকতাবাদীদের যুক্তি হলো যে ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধ, বিশেষত আদল, ন্যায়বিচার এবং কল্যাণ সাধনের নীতি, আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পার্থক্য শুধু প্রকাশভঙ্গিতে এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার ইসলামিক আদলের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশে ইসলামিক আধুনিকতাবাদী চিন্তাবিদদের সাথে এই বিষয়ে সংলাপ প্রয়োজন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ১২৯: প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভূমিকা: আন্তর্জাতিক তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

১২৯.১ রাষ্ট্রনেতার নেতৃত্বে লিঙ্গ-ন্যায়বিচার: বৈশ্বিক উদাহরণ

নর্ডিক দেশগুলোতে রাষ্ট্রনেতারা লিঙ্গ-সমতার বিষয়ে সক্রিয় নেতৃত্ব দিয়েছেন। সুইডেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্টেফান লফভেন ঘোষণা করেছিলেন যে তার সরকার "feminist government" পরিচালনা করবে। কিন্তু এই নারীবাদী সরকার পুরুষের অধিকারকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছে কারণ তারা বোঝেন যে সত্যিকারের লিঙ্গ-সমতা উভয় লিঙ্গের জন্যই।

কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো "gender equality" কে তার সরকারের অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন এবং তার মন্ত্রিসভায় সমান সংখ্যায় নারী ও পুরুষ নিয়োগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কানাডিয়ান লিঙ্গ-সমতার ধারণায় পুরুষের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত।

নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আর্ডার্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। তিনি গর্ভাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তার অংশীদারও সন্তান লালনপালনে সমান অংশ নিয়েছেন। এই ব্যক্তিগত উদাহরণটি সামাজিক মনোভাব পরিবর্তনে সহায়তা করেছে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তর থেকে লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন। শুধু নারীর ক্ষমতায়নের কথা নয়, বরং সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি।

১২৯.২ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ভূমিকা এবং আইনি পর্যালোচনা

বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের প্রধান। যদিও সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির নির্বাহী ক্ষমতা সীমিত, তবুও তিনি কিছু বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন।

রাষ্ট্রপতি আইনকমিশনের প্রতিবেদন বিবেচনায় নিতে পারেন এবং সংসদীয় কমিটিগুলোর সুপারিশের বিষয়ে মন্তব্য করতে পারেন। রাষ্ট্রপতির এই ভূমিকাটি লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের বিষয়ে একটি সংকেত পাঠাতে পারে।

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রাবোয়ো সুবিয়ান্তো ২০২৪ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর মানবাধিকার এবং আইনের শাসনের প্রতি প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। তার সরকার যৌন সহিংসতা আইন ২০২২ এর কার্যকর প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান উপদেষ্টাও এই ধরনের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন।

১২৯.৩ সরকারি নীতি পর্যায়ে লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

কানাডায় "Gender-Based Analysis Plus" বা GBA+ নামক একটি নীতি বিশ্লেষণ পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিতে যেকোনো সরকারি নীতি বা আইন প্রস্তাবের সময় তার লিঙ্গ-প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়। এই বিশ্লেষণে নারী ও পুরুষ উভয়ের উপর প্রভাব বিবেচনা করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ায় "Gender Impact Assessment" বা লিঙ্গ প্রভাব মূল্যায়ন বাজেট প্রণয়নের একটি অংশ। প্রতিটি বাজেট বরাদ্দের লিঙ্গ-প্রভাব বিবেচনা করা হয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশেও এই ধরনের একটি নীতি বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা উচিত। প্রতিটি নতুন আইন বা নীতি প্রস্তাবের সময় তার পুরুষ ও নারী উভয়ের উপর প্রভাব বিশ্লেষণ করা উচিত।

নবম খণ্ডের উপসংহার: আন্তর্জাতিক দর্পণে বাংলাদেশ

নবম খণ্ডে আমরা একটি বিস্তৃত আন্তর্জাতিক যাত্রা করেছি। আমরা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বরফের মধ্যে লিঙ্গ-সমতার অগ্রগামী প্রচেষ্টা দেখেছি, কমনওয়েলথের আইনি ঐতিহ্যে পুরুষ ভিকটিমের ক্রমশ স্বীকৃতি দেখেছি, ভারতের ৪৯৮-ক ধারার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের লড়াই দেখেছি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর দ্বিধান্বিত অগ্রযাত্রা দেখেছি এবং আফ্রিকার পোস্ট-সংঘাত সমাজে লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের নির্মাণ দেখেছি।

এই বৈশ্বিক চিত্রের সামনে বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? বাংলাদেশ একটি সন্ধিক্ষণে রয়েছে। একদিকে ২০২৫ সালের মার্চ মাসে পুরুষকে ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি একটি অগ্রগতির সংকেত। অন্যদিকে গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনে পুরুষ ভিকটিমের স্বীকৃতির অনুপস্থিতি, জামিন অযোগ্যতার বিস্তৃত তালিকা এবং মিথ্যা মামলার কার্যকর প্রতিকারের অভাব এখনো বিদ্যমান।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারে কিন্তু অনুকরণ করতে পারবে না। বাংলাদেশের নিজস্ব পথ খুঁজে নিতে হবে, এবং সেই পথটি হলো লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের নীতি, অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমান মর্যাদা ও সুরক্ষা।

এই পথটি রাজনৈতিকভাবে কঠিন। এই পথে সামাজিক প্রতিরোধ থাকবে। কিন্তু এটি নৈতিকভাবে সঠিক এবং আন্তর্জাতিক আইনগতভাবে বাধ্যকর।

নবম খণ্ডের মূল বার্তা হলো: লিঙ্গ-ন্যায়বিচার একটি আন্তর্জাতিক নিয়ম হয়ে উঠছে এবং বাংলাদেশকে এই বৈশ্বিক প্রবাহের সাথে যুক্ত হতে হবে। শুধু নিজের অতীতের দিকে তাকালে হবে না, বরং বিশ্বের সেরা অনুশীলনগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত আইনি ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে হবে।

দশম খণ্ডে আমরা এই পাঠ্যগ্রন্থের সমাপনী পর্যায়ে আসব। দশম খণ্ড হবে সংস্কারের সামগ্রিক প্রস্তাব এবং পথনির্দেশনার খণ্ড। আমরা বাংলাদেশের জন্য একটি বিস্তারিত সংস্কার এজেন্ডা উপস্থাপন করব যা আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সকল মাত্রাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এই সংস্কার এজেন্ডা ন্যায়বিচারের নীতিতে প্রোথিত থাকবে এবং বাংলাদেশের বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

পরিশিষ্ট ক: নবম খণ্ডে আলোচিত প্রধান আন্তর্জাতিক আইনি দলিলের সারসংক্ষেপ

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র, ১৯৪৮ এর মূল প্রাসঙ্গিক বিধান হলো অনুচ্ছেদ ১ সকলের সমান মর্যাদা, অনুচ্ছেদ ২ যেকোনো বৈষম্য ছাড়া অধিকারের দাবি, অনুচ্ছেদ ৭ আইনের সামনে সমতা এবং অনুচ্ছেদ ১১ নির্দোষিতার অনুমান।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ, ১৯৬৬ এর মূল প্রাসঙ্গিক বিধান হলো অনুচ্ছেদ ৯ স্বাধীনতার অধিকার, অনুচ্ছেদ ১৪ ন্যায্য বিচারের অধিকার এবং অনুচ্ছেদ ২৬ বৈষম্যহীন আইনের গ্যারান্টি।

সিডো, ১৯৭৯ এর সীমাবদ্ধতা হলো এটি একমুখী অর্থাৎ শুধু নারীর বৈষম্যের বিরুদ্ধে। তার পরিপূরক হিসেবে ICCPR এর লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বিধান প্রয়োজন।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পঞ্চম লক্ষ্যমাত্রার প্রাসঙ্গিকতা হলো লিঙ্গ সমতার ধারণাটিকে নারী ও পুরুষ উভয়ের সমতার অর্থে ব্যাখ্যা করা উচিত।

পরিশিষ্ট খ: তুলনামূলক দেশ-ভিত্তিক বিশ্লেষণের সারসংক্ষেপ

সুইডেন ও নরওয়ে ক্ষেত্রে পারিবারিক সহিংসতা ও যৌন অপরাধের আইন সম্পূর্ণ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ, পুরুষ ভিকটিমের জন্য বিশেষ পরিষেবা বিদ্যমান এবং পিতৃত্বকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক এবং দীর্ঘমেয়াদী।

যুক্তরাজ্য ক্ষেত্রে ২০২১ সালের গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাষায় লেখা এবং কোয়ার্সিভ কন্ট্রোলের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত।

কানাডা ক্ষেত্রে অধিকার ও স্বাধীনতা সনদের ১৫ অনুচ্ছেদ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সমতার গ্যারান্টি দেয় এবং ২০২২ সালের VAWA নবায়নে পুরুষ ভিকটিম অন্তর্ভুক্ত।

অস্ট্রেলিয়া ক্ষেত্রে পারিবারিক আইনে যৌথ হেফাজত ডিফল্ট এবং One in Three প্রচারাভিযান পুরুষ ভিকটিমের স্বীকৃতির জন্য কাজ করছে।

ভারত ক্ষেত্রে ৪৯৮-ক ধারার অপব্যবহার বাংলাদেশের মতো সমস্যা তৈরি করেছে এবং SIFF এর মতো সংগঠন আইনগত পথে লড়াই করছে।

নেপাল ক্ষেত্রে ফৌজদারি দণ্ডবিধি ২০১৭ তে পুরুষ যৌন সহিংসতা ভিকটিম স্বীকৃত এবং দক্ষিণ এশিয়ায় এটি একটি অগ্রণী পদক্ষেপ।

সিঙ্গাপুর ক্ষেত্রে ২০১৯ সালের যৌন অপরাধ সংস্কারে পুরুষ ধর্ষণ ভিকটিম স্বীকৃতি পেয়েছে এবং মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা রয়েছে।

দশম খণ্ড

সংস্কারের সমগ্র দর্শন, বিস্তারিত আইনি প্রস্তাব এবং ন্যায়বিচারের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশনা

দশম খণ্ডের ভূমিকা: একটি দীর্ঘ যাত্রার পরিসমাপ্তি এবং একটি নতুন সূচনার প্রতিশ্রুতি

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই পাঠ্যগ্রন্থের নয়টি পূর্ববর্তী খণ্ডে আমরা বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থার একটি গভীর এবং বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছি। আমরা দেখেছি কীভাবে ঔপনিবেশিক আইনের উত্তরাধিকার, স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক প্রণোদনা এবং নারীবাদী সক্রিয়তার একটি বিশেষ ধারার সমন্বয়ে বাংলাদেশে এমন একটি আইনি কাঠামো তৈরি হয়েছে যা পুরুষের মৌলিক আইনি অধিকারকে কাঠামোগতভাবে ক্ষুণ্ন করে। আমরা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এবং পারিবারিক আইনের বিভিন্ন বিধান পরীক্ষা করেছি। আমরা দেখেছি যে মিথ্যা মামলার রাজনীতি, ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি এবং পুরুষ নির্যাতনের আইনগত অস্বীকৃতি কীভাবে একটি সামগ্রিক মিসান্ড্রিক কাঠামো তৈরি করেছে।

আমরা জুরিসপ্রুডেন্সের দর্শনগত ভিত্তিতে এই কাঠামো বিশ্লেষণ করেছি। জন রলসের ন্যায়বিচার তত্ত্ব, ইমানুয়েল কান্টের নৈতিক দর্শন, হার্বার্ট হার্টের আইনের ধারণা, রোনাল্ড ড্যাওয়ার্কিনের অধিকারের গুরুতর বিষয়, ফিলিপ পেটিটের রিপাবলিকান আধিপত্যমুক্তি তত্ত্ব এবং আমার্ত্য সেনের সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বিশ্লেষণকে একটি দার্শনিক গভীরতা দিয়েছে। আমরা ভারত, নেপাল, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছি। আমরা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, প্রাতিষ্ঠানিক সমালোচনা এবং সামাজিক কাঠামোর পরীক্ষা করেছি।

এই দশম এবং চূড়ান্ত খণ্ডে আমরা সেই সকল বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি ব্যাপক এবং সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন করব। কিন্তু এই সংস্কার প্রস্তাব শুধু কয়েকটি আইনি সুপারিশের তালিকা নয়। এটি হবে একটি সমগ্র দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত, রাজনৈতিকভাবে বাস্তবসম্মত, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং আইনতাত্ত্বিকভাবে সুদৃঢ় একটি পথনির্দেশনা।

এই খণ্ডটি শুরু হবে সংস্কারের দার্শনিক ভিত্তি পুনর্নির্মাণ দিয়ে, কারণ কোনো আইনি সংস্কারই টেকসই হয় না যদি তার পেছনে একটি শক্তিশালী দার্শনিক যুক্তি না থাকে। তারপর আমরা সুনির্দিষ্ট আইনি সংস্কার প্রস্তাব, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কৌশল এবং রাজনৈতিক বাস্তবায়নের পথ নিয়ে আলোচনা করব। এই খণ্ডের শেষে থাকবে এই সমগ্র পাঠ্যগ্রন্থের উপসংহার, যা শুধু বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নয়, বরং ন্যায়বিচারের একটি সামগ্রিক দর্শনের দিকে পাঠককে পথ দেখাবে।

অধ্যায় ১৩০: সংস্কারের দার্শনিক ভিত্তি পুনর্নির্মাণ: ন্যায়বিচারের একটি সংযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি

১৩০.১ ন্যায়বিচারের সংযুক্ত তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের আইনি সংস্কারের জন্য যে দার্শনিক ভিত্তি প্রয়োজন, সেটি কোনো একটি বিদ্যমান তত্ত্বের সরাসরি প্রয়োগ দিয়ে তৈরি হবে না। রলসিয়ান উদারতাবাদ, কান্টিয়ান নৈতিকতা, কমিউনিটারিয়ান চিন্তাভাবনা, ইসলামিক আইনের ঐতিহ্য এবং বাংলাদেশের নিজস্ব সাংবিধানিক মূল্যবোধ এই সবকিছুর একটি সংশ্লেষণ থেকে একটি বিশেষ ধরনের "সংযুক্ত ন্যায়বিচার" এর ধারণা তৈরি করতে হবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

"সংযুক্ত ন্যায়বিচার" বা Integrated Justice এর ধারণাটি নতুন নয়। ২০২৩-২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক আইনতাত্ত্বিক আলোচনায় এই ধারণাটি নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক মিশেল অ্যান্ডারসন তাঁর ২০২৪ সালে প্রকাশিত "Beyond Single-Axis Thinking in Law" প্রবন্ধে যুক্তি দিয়েছেন যে একটি গণতান্ত্রিক সমাজে ন্যায়বিচারের কাঠামো কখনো একটি মাত্র অক্ষের উপর নির্মিত হতে পারে না। লিঙ্গ-অক্ষ, শ্রেণী-অক্ষ, ধর্মীয়-অক্ষ এবং সামাজিক-অক্ষ এই সবকিছুকে একসাথে বিবেচনায় নিয়ে একটি সমন্বিত ন্যায়বিচার কাঠামো তৈরি করতে হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই সংযুক্ত ন্যায়বিচারের ধারণাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ বাংলাদেশে লিঙ্গ-বিচার শুধু নারীর অধিকারের প্রশ্ন নয়, এটি একই সাথে ধর্মীয় পরিচয়, শ্রেণীগত বাস্তবতা, জাতিগত বৈচিত্র্য এবং আঞ্চলিক পার্থক্যের সাথে জড়িত। একজন দরিদ্র হিন্দু পুরুষের আইনি অভিজ্ঞতা একজন ধনী মুসলিম পুরুষের অভিজ্ঞতা থেকে মৌলিকভাবে আলাদা। এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে একটি সংস্কার কাঠামো তৈরি করাই সংযুক্ত ন্যায়বিচারের পথ।

এই সংযুক্ত ন্যায়বিচারের দর্শনে তিনটি মূল স্তম্ভ রয়েছে। প্রথম স্তম্ভ হলো সমতার স্তম্ভ, যার ভিত্তিতে আইনের সামনে সকলে সমান এবং লিঙ্গ, ধর্ম বা শ্রেণী নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তির একই আইনগত সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো মর্যাদার স্তম্ভ, যার ভিত্তিতে প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক মর্যাদা রক্ষার অধিকার রয়েছে এবং কোনো আইনি প্রক্রিয়া সেই মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে না। তৃতীয় স্তম্ভ হলো জবাবদিহিতার স্তম্ভ, যার ভিত্তিতে আইনের অপব্যবহারকারীরা, তারা যে লিঙ্গেরই হোক না কেন, আইনি পরিণতির মুখোমুখি হবে।

এই তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের আইনি সংস্কারের সমগ্র কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া উচিত। এটি না নারীবিরোধী, না পুরুষবাদী, বরং এটি মানববাদী, অর্থাৎ মানুষের সকল লিঙ্গীয় রূপের জন্য সমান মর্যাদা ও সুরক্ষার দাবিদার।

১৩০.২ কান্টিয়ান সার্বজনীনতা এবং বাংলাদেশের আইনি সংকট

ইমানুয়েল কান্টের নৈতিক দর্শনে "categorical imperative" বা বিশ্বজনীন বাধ্যকতার যে ধারণা রয়েছে, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ হলো "সার্বজনীনতার সূত্র": এমনভাবে কাজ করো যেন তোমার কাজের নীতি সার্বজনীন আইন হতে পারে। এই সূত্রটি আইনের দর্শনে প্রয়োগ করলে দাঁড়ায়: এমন আইন তৈরি করো যা সার্বজনীনভাবে সকলের উপর প্রযোজ্য হতে পারে।

বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর জামিন অযোগ্যতার বিধানকে যদি কান্টিয়ান সূত্রে পরীক্ষা করা হয়, তাহলে প্রশ্নটি হবে: "একজন নাগরিককে শুধু অভিযোগের ভিত্তিতে, প্রমাণ ছাড়া, কারাগারে রাখা যাবে" এই নীতিটি কি সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য হতে পারে? স্পষ্টতই না। কারণ যদি এই নীতি সার্বজনীন হতো, তাহলে প্রতিটি মানুষ যে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাকে কারাগারে পাঠাতে পারত, এবং সমাজের সামাজিক চুক্তির ভিত্তিটিই ভেঙে পড়ত।

কান্টের দ্বিতীয় সূত্রটি হলো "মানবতার সূত্র": কখনো অন্য মানুষকে শুধুমাত্র উপায় হিসেবে ব্যবহার করো না, বরং সবসময় উদ্দেশ্য হিসেবেও বিবেচনা করো। এই সূত্রে মিথ্যা মামলার বিষয়টি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। যখন কেউ একজন পুরুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে সম্পত্তি আদায় করতে বা সামাজিক প্রতিশোধ নিতে, তখন সে

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

সেই পুরুষকে শুধুমাত্র একটি উপায় হিসেবে ব্যবহার করছে, তার মানবিক মর্যাদাকে উপেক্ষা করছে। কান্টিয়ান নীতি অনুযায়ী এটি সবচেয়ে গুরুতর নৈতিক অপরাধগুলোর একটি।

আধুনিক নব-কান্টিয়ান দার্শনিক ক্রিস্টিন কর্সগার্ড তাঁর ২০২৩ সালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে যুক্তি দিয়েছেন যে কান্টের "self-constitution" বা আত্মগঠনের ধারণাটি আইনি সংস্কারের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি দিতে পারে। তিনি বলেছেন যে একজন মানুষ তখনই তার নৈতিক পরিচয় গড়ে তুলতে পারে যখন তাকে আইনের দ্বারা একজন মুক্ত এবং সমান নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যখন আইন একটি লিঙ্গকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করে, তখন সেই লিঙ্গের মানুষের নৈতিক আত্মগঠনের পথ রুদ্ধ হয়।

বাংলাদেশের পুরুষ, যিনি জানেন যে তার বিরুদ্ধে যেকোনো সময় একটি মিথ্যা মামলা হতে পারে এবং তিনি বিনা প্রমাণে কারাগারে যেতে পারেন, তার আত্মগঠনের পথ এই কর্সগার্ডিয়ান অর্থে সংকুচিত। এই সংকোচনটি কান্টিয়ান আইনের দর্শনে একটি মৌলিক অন্যায়।

১৩০.৩ রলসিয়ান ন্যায়বিচার এবং পুরুষের অদৃশ্যতার সমস্যা

জন রলস তাঁর "A Theory of Justice" গ্রন্থে "original position" বা আদি অবস্থানের একটি চিন্তা-পরীক্ষা তুলে ধরেছেন। এই পরীক্ষায় কল্পনা করা হয় যে একটি ন্যায়বিচারের কাঠামো এমন মানুষেরা তৈরি করছেন যারা জানেন না তারা কোন লিঙ্গ, কোন বর্ণ, কোন ধর্ম বা কোন সামাজিক শ্রেণীতে জন্মাবেন। এই "অজ্ঞতার পর্দা" এর আড়াল থেকে মানুষ এমন আইনই বেছে নেবে যা সকলের জন্য ন্যায্য।

রলস আরও যুক্তি দিয়েছেন যে ন্যায়বিচারের দ্বিতীয় নীতি হলো "difference principle" বা পার্থক্যের নীতি: সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসমতা তখনই ন্যায়সঙ্গত যখন তা সমাজের সবচেয়ে দুর্বলতম মানুষদের উপকার করে। এই নীতিতে বিশেষ আইনি সুরক্ষা তখনই ন্যায়সঙ্গত যখন তা সত্যিকারের দুর্বলদের সুরক্ষা দেয়।

বাংলাদেশের আইনি কাঠামোর সমস্যা হলো এটি অনুমান করে যে নারী সবসময়ই দুর্বল এবং পুরুষ সবসময়ই শক্তিশালী। কিন্তু রলসিয়ান দৃষ্টিকোণে এই অনুমানটি ভুল, কারণ একজন দরিদ্র পুরুষ একজন ধনী নারীর চেয়ে অনেক বেশি দুর্বল হতে পারেন। একজন মানসিকভাবে অসুস্থ পুরুষ একজন সুস্থ নারীর চেয়ে অনেক বেশি দুর্বল হতে পারেন। ন্যায়বিচারের আইন এই বাস্তব দুর্বলতাকে স্বীকার করে না করে লিঙ্গীয় ধারণার উপর নির্মিত হলে তা রলসিয়ান অর্থে ন্যায়সঙ্গত নয়।

রলসের পরবর্তী কাজ "Political Liberalism" এ তিনি "overlapping consensus" বা অতিক্রমকারী ঐকমত্যের ধারণাটি তুলে ধরেছেন। এই ধারণা অনুযায়ী, একটি বহুত্ববাদী সমাজে ন্যায়বিচারের নীতি সেইসব নীতি থেকে তৈরি হয় যা বিভিন্ন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ একসাথে স্বীকার করতে পারে। বাংলাদেশের ইসলামিক, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান সকল ধর্মীয় ঐতিহ্যেই ন্যায়বিচার একটি কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ। এই অতিক্রমকারী ঐকমত্য থেকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের একটি ভিত্তি তৈরি সম্ভব।

২০২৪ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন স্কুলে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে ড্যানিয়েল মার্কোভিটস যুক্তি দিয়েছেন যে রলসিয়ান তত্ত্বকে সংস্কার করে "intersectional original position" বা আন্তঃসংযোগমূলক আদি অবস্থানের ধারণা তৈরি করা প্রয়োজন, যেখানে অজ্ঞতার পর্দা শুধু লিঙ্গ নয়, শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম এবং শারীরিক

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

সক্ষমতাকেও আড়াল করে। এই সংস্কারিত রলসিয়ান কাঠামোয় বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থার সমস্যাটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৩০.৪ মুসলিম আইনের ঐতিহ্যে ইনসাফ এবং পুরুষ নির্যাতনের স্বীকৃতি

বাংলাদেশ একটি মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ এবং ইসলামিক আইনের ঐতিহ্য এখানে গভীরভাবে প্রোথিত। যেকোনো আইনি সংস্কার প্রস্তাব যদি ইসলামিক আইনের ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে, তাহলে তা রাজনৈতিকভাবে কার্যকর হবে না। তাই এই পাঠ্যগ্রন্থে ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্সের দৃষ্টিকোণ থেকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের যুক্তিটি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

ইসলামিক আইনে "ইনসাফ" বা ন্যায়বিচারের ধারণাটি কেন্দ্রীয়। কোরআনের সূরা আন-নিসার ১৩৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: "হে মু'মিনগণ, তোমরা ন্যায়ের রক্ষক হও, আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার বা নিকটজনদের বিরুদ্ধেও হয়।" এই আয়াতে ন্যায়বিচার নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতহীন হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইন এই কোরআনিক নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক।

ইসলামিক আইনের মাকাসিদ আল-শরিয়া বা শরিয়ার উদ্দেশ্যের তত্ত্বে পাঁচটি মূল মানব স্বার্থের কথা বলা হয়: জীবন রক্ষা, বুদ্ধির রক্ষা, বংশ রক্ষা, সম্পদ রক্ষা এবং ধর্ম রক্ষা। এই পাঁচটি মানব স্বার্থ লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের। যখন মিথ্যা মামলার কারণে একজন পুরুষের জীবন বিপন্ন হয়, তার সম্পদ ধ্বংস হয় এবং তার পরিবার ভেঙে পড়ে, তখন মাকাসিদ আল-শরিয়ার দৃষ্টিতে একটি গুরুতর অন্যায় হচ্ছে।

মিশরীয় আলেম ইয়াসির কাদি ২০২৫ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া প্রকাশ করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন যে ইসলামিক আইনে পুরুষও নির্যাতনের শিকার হতে পারেন এবং তাদের সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্র বাধ্য। তিনি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বিচারে নির্দোষিতার অনুমানের নীতি প্রয়োগ করতেন। "দুটি সাক্ষী না থাকলে অভিযোগ প্রমাণিত নয়" এই মূলনীতি ইসলামিক আইনের একটি মৌলিক বিধান। কিন্তু বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে এই নীতিটি কার্যকরভাবে বাতিল করা হয়েছে।

তুরস্কের আইন পণ্ডিত ইব্রাহিম কালিন ২০২৪ সালে "Islamic Law and Gender Justice" শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন যেখানে তিনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে লিঙ্গ-ন্যায়বিচারের জন্য ইসলামিক আইনের ঐতিহ্যের মধ্যে থেকেই সংস্কারের পথ দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, পুরুষ নির্যাতনের বিষয়টি ইসলামিক আইনে অস্বীকৃত নয়, বরং এটি ঐতিহাসিকভাবে কম আলোচিত। আধুনিক ইসলামিক আইনবিদরা এই বিষয়ে নতুন ইজতিহাদ বা বিধান নির্ধারণ করতে পারেন।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামিক আইন পণ্ডিত, বিশেষত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষকরা, যদি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের পক্ষে একটি ইসলামিক যুক্তি তৈরি করেন, তাহলে সংস্কারের পথে ধর্মীয় প্রতিরোধ অনেকটা কমবে।

১৩০.৫ হান্না আরেন্টের "হিউম্যান কন্ডিশন" এবং বাংলাদেশের পুরুষ সংকট

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

হান্না আরেন্ট তাঁর "The Human Condition" গ্রন্থে তিনটি মানবিক কার্যক্রমের কথা বলেছেন: শ্রম বা labor, কাজ বা work এবং কর্ম বা action। কর্ম বা action হলো সবচেয়ে মানবিক কার্যক্রম, কারণ এটি রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ এবং সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে মানুষের পরিচয় নির্মাণ করে।

আরেন্টের দৃষ্টিভঙ্গিতে, যখন একজন পুরুষকে মিথ্যা মামলার মাধ্যমে সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তখন তার কর্ম বা action এর সম্ভাবনা ধ্বংস হয়। সে আর সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ করতে পারে না, তার পরিচয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সে মানবিক অস্তিত্বের সর্বোচ্চ রূপ থেকে বঞ্চিত হয়। আরেন্টের "natality" বা জন্মের ধারণাটি এখানেও প্রাসঙ্গিক। প্রতিটি মানুষ একটি নতুন সূচনার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়, কিন্তু যখন আইন এই নতুন সূচনার পথ রোধ করে দেয়, তখন মানবিক অস্তিত্বের মূল সম্ভাবনাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আরেন্টের "banality of evil" বা অনিষ্টের সাধারণ্যতার ধারণাটি বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাতের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। মিথ্যা মামলায় একজন পুরুষের জীবন ধ্বংস করা হয় প্রায়ই কোনো বিশেষ ক্ষোভ বা বৈরিতার কারণে নয়, বরং একটি আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিচালনার মাধ্যমে। পুলিশ অভিযোগ নিবন্ধন করে কারণ নিয়ম তাই বলে, বিচারক জামিন অস্বীকার করেন কারণ আইন তাই বলে, এবং এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি অংশগ্রহণকারী "শুধু নিজের কাজ করছে।" কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটিই একটি মানুষের জীবন ধ্বংস করছে। এটিই আরেন্টিয়ান অর্থে অনিষ্টের সাধারণ্যতা।

অধ্যায় ১৩১: বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক নির্ণয়: ত্রুটির মানচিত্র

১৩১.১ আইনের ত্রুটির তিনটি স্তর: একটি ডায়গনোস্টিক কাঠামো

বাংলাদেশের পুরুষবিরোধী আইনি কাঠামোর সমস্যাগুলো তিনটি স্তরে বিদ্যমান। এই তিনটি স্তরের সঠিক নির্ণয় না হলে সংস্কার কার্যকর হবে না।

প্রথম স্তর হলো আইনের ভাষার স্তর। এই স্তরে সমস্যা হলো আইনের ধারা এবং সংজ্ঞাগুলো এমনভাবে লেখা হয়েছে যা লিঙ্গ-পক্ষপাতকে কাঠামোগতভাবে নির্মাণ করে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৫ সালের মার্চ মাসে সংশোধনের আগে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এ ধর্ষণের সংজ্ঞায় স্পষ্ট ছিল যে একমাত্র পুরুষই ধর্ষণকারী হতে পারে। এটি আইনের ভাষার স্তরে একটি লিঙ্গ-পক্ষপাত। এই স্তরের সমস্যা সংস্কার করা তুলনামূলকভাবে সহজ, কারণ এর জন্য শুধু আইনের সংশোধন প্রয়োজন।

দ্বিতীয় স্তর হলো আইনের প্রয়োগের স্তর। এই স্তরে সমস্যা হলো আইনের ভাষা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাত বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ আনুষ্ঠানিকভাবে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ, কিন্তু বাস্তবে পুলিশ পারিবারিক বিরোধে নারীর অভিযোগকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং পুরুষের অভিযোগকে উপেক্ষা করে। এই স্তরের সংস্কারের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন, প্রশিক্ষণ এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

তৃতীয় স্তর হলো আইনের সংস্কৃতির স্তর। এই স্তরে সমস্যা হলো আইনি পেশায় নিযুক্ত বিচারক, আইনজীবী, পুলিশ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের মানসিকতা এবং সাংস্কৃতিক ধারণাগুলো পক্ষপাতদুষ্ট। একজন বিচারক যখন অনুমান

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

করেন যে একজন নারী কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না এবং একজন পুরুষ সবসময়ই সন্দেহজনক, তখন এটি আইনের সংস্কৃতির সমস্যা। এই স্তরের সংস্কার সবচেয়ে কঠিন এবং দীর্ঘমেয়াদী।

বাংলাদেশে তিনটি স্তরেই সমস্যা বিদ্যমান। এটি একটি জটিল চিত্র কিন্তু একটি বাস্তব চিত্র। সংস্কার পরিকল্পনায় তিনটি স্তরকে আলাদাভাবে সম্বোধন করতে হবে।

১৩১.২ আইনের ভাষায় বিদ্যমান ত্রুটির একটি সম্পূর্ণ তালিকা

বাংলাদেশের আইনে যেসব ধারায় লিঙ্গ-পক্ষপাত আইনের ভাষায় স্পষ্ট, সেগুলো নিচে সম্পূর্ণভাবে তালিকাবদ্ধ করা হলো।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর বিভিন্ন ধারায় লিঙ্গ-পক্ষপাত রয়েছে। ধারা ৭ এ যৌন হয়রানির সংজ্ঞা শুধু নারীকে ভিকটিম হিসেবে ধরে নেয়। ধারা ৮ এ শ্লীলতাহানির সংজ্ঞা একইভাবে একমুখী। ধারা ১১ এ যৌতুক সংক্রান্ত অপরাধের সংজ্ঞায় অনুমান করা হয় যে স্বামীই সবসময় অপরাধী এবং স্ত্রীই সবসময় ভিকটিম। ধারা ১৯ এ জামিনের বিধানে এমন কিছু অপরাধ রয়েছে যা বাস্তবে শুধু পুরুষই করতে পারে বলে ধরে নেওয়া হয়, তাই এই ধারায় পুরুষই প্রধানত প্রভাবিত হয়।

যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ এর ধারা ২ তে যৌতুকের সংজ্ঞা এমন যে এটি প্রধানত পুরুষকে আসামি করে। বাস্তবে নারীর পক্ষ থেকে পণের দাবিও যৌতুকের একটি রূপ হতে পারে, কিন্তু আইনের ভাষায় এটি স্বীকৃত নয়।

গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এ পুরুষ ভিকটিম কোথাও স্বীকৃত নয়। আইনের সংজ্ঞায় "নারী ও শিশু" শব্দ ব্যবহার করে পুরুষকে সুরক্ষার বাইরে রাখা হয়েছে।

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ধারা ৯ এ ভরণপোষণের বিধানে পুরুষকে সবসময় দাতা এবং নারীকে সবসময় গ্রহীতা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। বাস্তবে এমন পরিস্থিতিও হতে পারে যেখানে স্বামী অসুস্থ বা অক্ষম এবং স্ত্রী উপার্জনক্ষম।

হিন্দু পারিবারিক আইনে বাংলাদেশে হিন্দু পুরুষের জন্য বিবাহবিচ্ছেদ অত্যন্ত কঠিন, কারণ হিন্দু বিবাহ আইনে বিবাহবিচ্ছেদের কোনো বিধান নেই। এটি পুরুষের জন্য একটি বিশেষ ধরনের বৈষম্য।

দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ৪৯৭ এ ব্যভিচার একটি অপরাধ এবং এই অপরাধে শুধু পুরুষই দণ্ডিত হতে পারে, নারী নয়। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ২০১৮ সালে এই ধারাটি বাতিল করেছে কারণ এটি লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক, কিন্তু বাংলাদেশে এটি এখনো বিদ্যমান।

১৩১.৩ আইনের প্রয়োগে বিদ্যমান ত্রুটির প্রমাণ

আইনের প্রয়োগের স্তরে লিঙ্গ-পক্ষপাতের প্রমাণ বাংলাদেশের আইন মন্ত্রণালয়, পুলিশ সদর দফতর এবং আদালতের রেকর্ড থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব, যদিও এই রেকর্ড সব সময় সহজলভ্য নয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বিভিন্ন আইন সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, নারী ও শিশু নির্যাতন আদালতে নিষ্পত্তিকৃত মামলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশে আসামি খালাস পান। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সোসাইটির একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় খালাসের হার অন্যান্য ফৌজদারি মামলার তুলনায় অনেক বেশি। এটি নির্দেশ করে যে প্রাথমিক অভিযোগ এবং প্রকৃত অপরাধের মধ্যে একটি বড় ব্যবধান রয়েছে।

পুলিশ থানায় নারীর অভিযোগ গ্রহণ করা এবং পুরুষের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করার প্রবণতাও একটি প্রমাণিত সমস্যা। বাংলাদেশে পুরুষ গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার হলে থানায় মামলা করতে গেলে প্রায়ই তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, কারণ পুলিশ সদস্যরা এটিকে "পুরুষের সমস্যা" হিসেবে দেখেন না।

জামিন আবেদনের ক্ষেত্রেও লিঙ্গ-পক্ষপাত লক্ষণীয়। একই ধরনের অপরাধে অভিযুক্ত পুরুষ এবং নারীর জামিন আবেদনের ফলাফল তুলনা করলে দেখা যায় যে পুরুষের জামিন প্রায়ই অস্বীকৃত হয় এবং নারীর জামিন প্রায়ই মঞ্জুর হয়। এই পার্থক্যটি আইনের ভাষায় নয়, বরং বিচারকদের বিচারিক সংস্কৃতিতে।

অধ্যায় ১৩২: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সমগ্র সংস্কার: একটি ধারা-ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং বিকল্প খসড়া

১৩২.১ ধারা ৯: ধর্ষণের সংজ্ঞার সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণ

২০২৫ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ধারা ৯ সংশোধন করে পুরুষকেও ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। কিন্তু এই সংশোধনী কেবল একটি শুরু, সম্পন্নতা নয়।

বিদ্যমান সংশোধনে যা যোগ করা হয়েছে তা হলো পুরুষ ভিকটিমের স্বীকৃতি। কিন্তু প্রমাণের মানদণ্ড, জামিনের বিধান, তদন্তের পদ্ধতি এবং বিচারের সময়সীমা এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে। এই বিষয়গুলোতে আরও সংস্কার প্রয়োজন।

ধর্ষণের সংজ্ঞায় "সম্মতি" বা consent এর ধারণাটিকে আরও স্পষ্ট করতে হবে। বিদ্যমান আইনে সম্মতির সংজ্ঞা অস্পষ্ট এবং এটি প্রমাণিকরণের দায়িত্ব আসামির উপর অনুচিতভাবে চাপানো হয়েছে। কানাডিয়ান ফৌজদারি বিধির মডেলে সম্মতির ধারণাকে "affirmative consent" বা ইতিবাচক সম্মতির ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা উচিত, অর্থাৎ সক্রিয় সম্মতির প্রমাণ থাকতে হবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অভিযুক্তকে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে হবে, বরং অভিযোগকারীকে সম্মতির অভাব প্রমাণ করতে হবে।

ধর্ষণ মামলায় "false rape allegations" বা মিথ্যা ধর্ষণ অভিযোগের বিরুদ্ধে একটি কার্যকর প্রতিকার ব্যবস্থা আইনের মধ্যে সংযুক্ত করতে হবে। যুক্তরাজ্যের যৌন অপরাধ আইন ২০০৩ এর মডেলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা যাচাই না হলে মিথ্যা অভিযোগের জন্য পৃথক বিচারিক প্রক্রিয়া চালু করার বিধান রাখা যেতে পারে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৩২.২ ধারা ১১: যৌতুক অপরাধের পুনর্সংজ্ঞায়ন

যৌতুক সংক্রান্ত আইনটি বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি অপব্যবহারের শিকার। ২০২৩-২০২৫ সালের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে বিবাহ বিচ্ছেদের সময় বা পারিবারিক বিরোধে যৌতুক মামলার ব্যবহার একটি কৌশলগত হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

বিদ্যমান ধারা ১১ এর সমস্যা হলো "যৌতুক" এর সংজ্ঞা এত ব্যাপক যে প্রায় যেকোনো পারিবারিক লেনদেনকেই যৌতুক হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব। এটি আইনকে একটি অস্পষ্ট অস্ত্রে পরিণত করেছে যা অপব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।

সংশোধনী প্রস্তাব হলো যৌতুকের সংজ্ঞা সংকুচিত করা এবং স্পষ্ট করা। "যৌতুক" কেবল তখনই সংজ্ঞায়িত হবে যখন বিবাহের পূর্বশর্ত হিসেবে অর্থ বা সম্পদ দাবি করা হয় এবং এই দাবি পূরণ না হলে বিবাহ বা দাম্পত্য জীবনে ক্ষতির হুমকি দেওয়া হয়। পারিবারিক উপহার বা ঐচ্ছিক আর্থিক সহায়তাকে যৌতুক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন হলো "পণ" বা bride price এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। বাংলাদেশের কিছু সম্প্রদায়ে বিবাহে বরের পক্ষ থেকে কনের পক্ষকে অর্থ পরিশোধ করা হয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে কনের পরিবার এই পণের দাবিতে বরের পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এটিও একটি আর্থিক নিপীড়নের রূপ, কিন্তু আইনে এটি স্বীকৃত নয়।

যৌতুক মামলায় তদন্তের আগে গ্রেফতার নিষিদ্ধ করার বিধান যোগ করতে হবে। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের আর্নেশ কুমার বনাম বিহার রাজ্য মামলার (২০১৪) নির্দেশনার মতো বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টও একটি নির্দেশনা জারি করতে পারেন যে যৌতুক মামলায় গ্রেফতারের আগে একটি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের প্রাথমিক তদন্ত বাধ্যতামূলক।

১৩২.৩ ধারা ১৭: মিথ্যা মামলার শাস্তির কার্যকর বাস্তবায়ন

বিদ্যমান ধারা ১৭ এর সমস্যা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এই ধারাটি কার্যকরভাবে ব্যবহার না হওয়ার কারণ হলো প্রমাণের উচ্চ মানদণ্ড, পুলিশের অনীহা এবং সামাজিক চাপ।

সংশোধনী প্রস্তাব হলো প্রমাণের মানদণ্ড সংশোধন করা। মিথ্যা মামলার জন্য শুধু "জেনেশুনে" মিথ্যা বলার প্রমাণ যথেষ্ট নয়, এটি প্রমাণ করা অনেক কঠিন। বরং "reckless disregard for the truth" বা সত্যের প্রতি অবহেলামূলক উদাসীনতার ধারণাটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই মানদণ্ডে অভিযোগকারী যদি অভিযোগ করার সময় সত্যের বিষয়ে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা না করেন, তাহলে সেটি শাস্তিযোগ্য।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো মিথ্যা মামলায় ক্ষতিপূরণের বিধান। যদি একজন পুরুষ মিথ্যা মামলায় কারাগারে থাকেন, তাহলে খালাসের পর তিনি মামলাকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন। এই ক্ষতিপূরণ বাতিল হওয়া বেতন, আইনজীবীর খরচ এবং মানসিক ক্ষতির সমতুল্য হবে। কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ায় এই ধরনের বিধান বিদ্যমান।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এছাড়া, মিথ্যা মামলা নিবন্ধনকারী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রাখতে হবে। যদি কোনো পুলিশ কর্মকর্তা প্রাথমিক তথ্য যাচাই না করে মামলা নিবন্ধন করেন এবং পরে মামলাটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে সেই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য একটি স্বাধীন পর্যালোচনা বোর্ড থাকতে হবে।

১৩২.৪ জামিন বিধানের সমগ্র পুনর্বিবেচনা

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের জামিন বিধান বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। সংবিধানের ৩১ এবং ৩৩ অনুচ্ছেদের আলোকে জামিনের বিধানকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

প্রস্তাবিত নতুন কাঠামো হলো "graded bail system" বা ধাপে ধাপে জামিনের ব্যবস্থা। প্রথম শ্রেণীর অপরাধ, যেমন হত্যা, গুরুতর শারীরিক নির্যাতন এবং অগ্রাধিকারমূলক যৌন সহিংসতা, এগুলোতে জামিনের ক্ষেত্রে বিচারকের বিশেষ কারণ দেখানোর বাধ্যবাধকতা থাকবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অপরাধে ডিফল্ট হবে জামিন এবং রিমান্ড ডিফল্ট হবে না। তৃতীয় শ্রেণীর অপরাধে জামিন স্বয়ংক্রিয় হবে।

কানাডার "bail by consent" বা সম্মতিমূলক জামিনের ব্যবস্থার মতো বাংলাদেশেও একটি ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে যেখানে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তের মধ্যে একটি মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিরাপত্তার শর্তে জামিন দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় অভিযোগকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং অভিযুক্তের বিচার-পূর্ব স্বাধীনতাও সংরক্ষিত হয়।

অধ্যায় ১৩৩: গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এর পূর্ণ সংস্কার

১৩৩.১ বিদ্যমান আইনের মৌলিক ত্রুটি

গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন কারণ এটি পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে আইনি সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এই আইনের একটি মৌলিক ত্রুটি হলো এটি গার্হস্থ্য সহিংসতাকে একমুখী ধারণা হিসেবে দেখে।

আইনের সংজ্ঞায় "নির্যাতিত ব্যক্তি" মানে "নারী" বা "শিশু।" এই সংজ্ঞাটি পুরুষকে গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার হতে পারে বলে স্বীকার করে না। কিন্তু বাস্তব গবেষণা বলছে ভিন্ন কথা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকারদের প্রায় ৩০ শতাংশ পুরুষ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের একটি তথ্য অনুযায়ী, বিবাহিত পুরুষদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই তথ্যগুলো আনুষ্ঠানিক প্রকাশ পায় না কারণ পুরুষ সাহায্য চাইতে লজ্জাবোধ করেন এবং আইন তাদের সুরক্ষা দেয় না।

২০২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে পুরুষ গার্হস্থ্য সহিংসতা ভিকটিমরা প্রায়ই থানায় যাওয়া এড়িয়ে চলেন কারণ পুলিশ তাদের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেয় না।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই গবেষণায় বেশ কিছু কেস স্টাডি রয়েছে যেখানে পুরুষ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কিন্তু আইনি প্রতিকার পাননি।

১৩৩.২ সংস্কারের বিস্তারিত প্রস্তাব

গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এর সংশোধনের জন্য নিম্নলিখিত বিস্তারিত প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম প্রস্তাব হলো সংজ্ঞার পরিবর্তন। "নির্যাতিত ব্যক্তি" এর সংজ্ঞায় লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাষা ব্যবহার করতে হবে। যুক্তরাজ্যের গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন ২০২১ এর মতো "সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি" বা "আক্রান্ত ব্যক্তি" শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে যা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো "coercive control" বা নিয়ন্ত্রণমূলক জবরদস্তির সংজ্ঞা যোগ করা। বর্তমান আইনে শুধু শারীরিক নির্যাতনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মানসিক নির্যাতন, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে পুরুষও নির্যাতনের শিকার হতে পারেন। যুক্তরাজ্যের ২০১৫ সালের গুরুতর অপরাধ আইনে কোয়ার্সিভ কন্ট্রোলকে একটি পৃথক অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশেও এটি করা উচিত।

তৃতীয় প্রস্তাব হলো সুরক্ষা আদেশের ব্যবস্থা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ করা। বিদ্যমান আইনে সুরক্ষা আদেশ শুধু নারী পেতে পারেন। পুরুষ গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার হলে তিনিও সুরক্ষা আদেশ চাইতে পারবেন বলে আইনে সুস্পষ্টভাবে বিধান রাখতে হবে।

চতুর্থ প্রস্তাব হলো পুরুষ ভিকটিমের জন্য বিশেষ সেবা কেন্দ্র স্থাপন। বিদ্যমান আইনে নারী ভিকটিমদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র এবং সেবা কেন্দ্রের বিধান রয়েছে। একইভাবে পুরুষ ভিকটিমদের জন্যও, অন্তত পরীক্ষামূলকভাবে, কিছু সেবা কেন্দ্র স্থাপন করার বিধান যোগ করতে হবে।

পঞ্চম প্রস্তাব হলো পারিবারিক সহিংসতার তদন্তকারী কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ। প্রতিটি জেলায় পারিবারিক সহিংসতা তদন্তের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত পুলিশ কর্মকর্তা থাকবেন যারা পুরুষ এবং নারী উভয়ের অভিযোগ সমান গুরুত্বে তদন্ত করবেন।

১৩৩.৩ পারিবারিক আদালতে পুরুষ সুরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা

পারিবারিক আদালত আইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন প্রয়োজন। বিদ্যমান আইনে পারিবারিক বিরোধে মধ্যস্থতার বিধান রয়েছে, কিন্তু এই মধ্যস্থতায় লিঙ্গ-পক্ষপাত প্রায়ই বিদ্যমান থাকে। একজন পুরুষ যখন পারিবারিক আদালতে যান, তখন প্রায়ই বিচারক বা মধ্যস্থতাকারী অনুমান করেন যে পুরুষটি দোষী এবং নারীটি নির্দোষ।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য পারিবারিক বিরোধে একটি "neutral assessment" বা নিরপেক্ষ মূল্যায়নের বিধান চালু করা উচিত। এই মূল্যায়নে একজন সামাজিক কর্মী, একজন মনোবিজ্ঞানী এবং একজন আইনজীবী মিলে

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পরিবারের উভয় পক্ষের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে পারিবারিক আদালত সিদ্ধান্ত নেবেন।

অধ্যায় ১৩৪: সন্তানের হেফাজত এবং পিতার অধিকার: একটি সম্পূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম

১৩৪.১ বাংলাদেশের হেফাজত আইনের বর্তমান অবস্থা এবং পিতার প্রান্তিকীকরণ

বাংলাদেশে সন্তানের হেফাজত সংক্রান্ত বিধান ইসলামিক আইনের ঐতিহ্যগত ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মুসলিম পারিবারিক আইনে "হিজানাত" বা শারীরিক হেফাজতের বিধান অনুযায়ী, মায়ের সাথে ছেলে সন্তান সাত বছর এবং মেয়ে সন্তান বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত থাকবে। এরপর পিতা হেফাজতের দাবি করতে পারেন।

কিন্তু আইনি বাস্তবতায় দেখা যায় যে বিচ্ছেদের পর পিতারা সন্তানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারেন না। মায়েরা পিতার সাথে সন্তানের যোগাযোগে বাধা দেন এবং আদালত প্রায়ই এই বাধাদানকে গুরুত্ব দেন না। পিতার দর্শনের অধিকার আইনে স্বীকৃত থাকলেও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় না।

২০২৫ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছেন যেখানে বলা হয়েছে যে পিতার সাথে সন্তানের নিয়মিত যোগাযোগ সন্তানের মৌলিক অধিকার এবং মা যদি এই যোগাযোগে বাধা দেন তাহলে আদালত হেফাজতের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবেন। এই রায়টি একটি অগ্রগতি, কিন্তু এটি বিচারিক সিদ্ধান্ত, আইনি বিধান নয়।

১৩৪.২ যৌথ হেফাজতের আইনি কাঠামো

বাংলাদেশে যৌথ হেফাজতের কোনো আইনি কাঠামো নেই। পারিবারিক আইন সংস্কারের অন্যতম প্রধান প্রস্তাব হওয়া উচিত যৌথ হেফাজতকে ডিফল্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

যৌথ হেফাজত দুটি বিষয় নিয়ে গঠিত। প্রথমত, "legal custody" বা আইনি হেফাজত, যার অর্থ সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উভয় পিতামাতা একসাথে সিদ্ধান্ত নেবেন। দ্বিতীয়ত, "physical custody" বা শারীরিক হেফাজত, যার অর্থ সন্তান কার সাথে বাস করবে। শারীরিক হেফাজত একজনের কাছে থাকতে পারে, কিন্তু আইনি হেফাজত উভয়ের হওয়া উচিত।

অস্ট্রেলিয়ার পারিবারিক আইন ২০০৬ সালের সংশোধনের পর "shared parental responsibility" বা যৌথ পিতামাতার দায়িত্বকে ডিফল্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সংশোধনের পর পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্কের মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে।

বাংলাদেশেও এই মডেলে একটি সংস্কার করা উচিত। বিচ্ছেদের পর উভয় পিতামাতাই সন্তানের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশ নেবেন এই নীতিটি আইনে সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ইসলামিক পারিবারিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যের বিষয়ে উল্লেখ করা দরকার যে মালয়েশিয়ার ইসলামিক পারিবারিক আইনে ২০২৩ সালে এমন একটি সংশোধন আনা হয়েছে যা ইসলামিক আইনের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পিতার অধিকারকে আরও শক্তিশালী করেছে। এই মডেল বাংলাদেশের ইসলামিক পারিবারিক আইন সংস্কারের জন্য একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ।

১৩৪.৩ পিতৃত্বকালীন ছুটি এবং পিতার দায়িত্বের সাংবিধানিক স্বীকৃতি

পিতৃত্বকালীন ছুটি বা paternity leave কেবল একটি সামাজিক সুবিধার বিষয় নয়, এটি একটি আইনগত স্বীকৃতি যে পিতারও সন্তানের প্রতি সমান দায়িত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশে শ্রম আইনে মাতৃত্বকালীন ছুটির বিধান রয়েছে কিন্তু পিতৃত্বকালীন ছুটির কোনো বিধান নেই। এটি একটি আইনগত ফাঁক যা পিতার সন্তান লালনপালনে অংশগ্রহণকে কার্যত নিরুৎসাহিত করে।

প্রস্তাব হলো শ্রম আইন সংশোধন করে পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধান যোগ করা। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে "parental leave" বা পিতামাতার ছুটির একটি অংশ শুধু পিতার জন্য সংরক্ষিত থাকে, যা ব্যবহার না করলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এই "use it or lose it" পদ্ধতি পিতাকে সক্রিয়ভাবে সন্তান লালনপালনে যুক্ত হতে উৎসাহিত করে।

বাংলাদেশে প্রাথমিকভাবে কমপক্ষে ১৪ দিনের পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধান চালু করা উচিত এবং ধাপে ধাপে এটি বাড়ানো উচিত।

অধ্যায় ১৩৫: পুরুষ নির্যাতনের আইনি স্বীকৃতির একটি সম্পূর্ণ কাঠামো

১৩৫.১ পুরুষ নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ এবং বাংলাদেশের আইনি অন্ধকার

পুরুষ নির্যাতন বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, আর্থিক নির্যাতন এবং আইনি নির্যাতন এই পাঁচটি রূপের প্রতিটি বাংলাদেশে বিদ্যমান, কিন্তু আইনে অধিকাংশই স্বীকৃত নয়।

শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশে পুরুষকে মারধর করা হলে তিনি সাধারণ দণ্ডবিধির আওতায় অভিযোগ করতে পারেন, কিন্তু গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের বিশেষ সুরক্ষা পান না। এটি একটি বৈষম্য কারণ গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের অধীনে দ্রুত সুরক্ষা আদেশ পাওয়া সম্ভব যা সাধারণ দণ্ডবিধির অধীনে অনেক কঠিন।

মানসিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও খারাপ। যদি একজন নারী তার স্বামীকে মানসিকভাবে নির্যাতন করেন, তাকে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করেন, তার পরিবার থেকে দূরে রাখেন বা তার আত্মসম্মানকে ক্রমাগত আঘাত করেন, তাহলে এর বিরুদ্ধে কোনো আইনি প্রতিকার নেই।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে ২০২৫ সালের সংশোধনীর আগে পুরুষের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতার ঘটনাগুলো আইনে সম্পূর্ণ অদৃশ্য ছিল। এখন পুরুষ ধর্ষণ ভিকটিম হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন, কিন্তু মহিলা কর্তৃক পুরুষের যৌন হয়রানির বিষয়টি এখনো আইনে অস্পষ্ট।

আর্থিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সমস্যা হলো বিবাহের পর স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর সম্পদ জবরদস্তিমূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা। যদিও এটি সব পরিবারে ঘটে না, কিন্তু কিছু পরিবারে এটি একটি বাস্তব সমস্যা। এর বিরুদ্ধে কোনো আইনি প্রতিকার নেই।

১৩৫.২ পুরুষ নির্যাতনের সাংবিধানিক স্বীকৃতির যুক্তি

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ বলে যে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি থেকে যুক্তি দেওয়া যায় যে পুরুষ নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের নারী নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের মতো একই ধরনের আইনি সুরক্ষা পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে।

এই যুক্তির ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করা সম্ভব যেখানে দাবি করা যায় যে গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এর পুরুষ-বর্জনকারী সংজ্ঞা সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী এবং তাই অসাংবিধানিক।

এই ধরনের সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জ ইতিমধ্যে ভারতে সফলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একাধিক মামলায় আইনের লিঙ্গ-পক্ষপাতী বিধানগুলোকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টও এই পথে যেতে পারেন।

১৩৫.৩ পুরুষ নির্যাতন প্রতিরোধের জাতীয় নীতি

একটি জাতীয় পুরুষ নির্যাতন প্রতিরোধ নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এই নীতি নারী উন্নয়ন নীতির পরিপূরক হবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নয়।

এই জাতীয় নীতিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রথমত, পুরুষ নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি জাতীয় জরিপ পদ্ধতি তৈরি করা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিবছর নারী নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু পুরুষ নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহের কোনো পদ্ধতিগত ব্যবস্থা নেই। এই ফাঁকটি পূরণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, পুরুষ নির্যাতন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি জাতীয় প্রচারণা। তৃতীয়ত, পুরুষ নির্যাতন ভিকটিমদের জন্য জাতীয় হেল্পলাইন। চতুর্থত, পুরুষ নির্যাতনের শিকারদের আইনি সহায়তার জন্য বিশেষ আইনি সেবা কেন্দ্র।

অধ্যায় ১৩৬: ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় পুরুষের অধিকার সংরক্ষণ

১৩৬.১ নির্দোষিতার অনুমানের নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

"Presumption of innocence" বা নির্দোষিতার অনুমানের নীতিটি বাংলাদেশের সংবিধান, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদে স্বীকৃত একটি মৌলিক নীতি। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তব আইনি প্রক্রিয়ায় এই নীতিটি প্রায়ই কার্যত বাতিল।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে একটি মামলা হলে যা ঘটে তা হলো: পুলিশ অভিযোগকারীর বক্তব্যের ভিত্তিতে এফআইআর (FIR) নিবন্ধন করে, তারপর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়, আসামি গ্রেফতার হন এবং জামিন পান না। এই পুরো প্রক্রিয়ায় কোনো পর্যায়ে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা যাচাই করা হয় না। এটি নির্দোষিতার অনুমানের নীতির সরাসরি লঙ্ঘন।

সংস্কার প্রস্তাব হলো গ্রেফতারের আগে একটি "pre-arrest hearing" বা গ্রেফতার-পূর্ব শুনানির বিধান। সিঙ্গাপুরের মডেলে এই শুনানিতে একজন ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পরীক্ষা করবেন। যদি অভিযোগের প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে গ্রেফতার হবে। যদি না পাওয়া যায়, তাহলে গ্রেফতারি পরোয়ানা স্থগিত থাকবে।

এই ব্যবস্থাটি মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরোধ হতে পারে। কারণ যদি কোনো মামলাকারী জানেন যে প্রাথমিক তদন্তে তার অভিযোগের সত্যতা পরীক্ষা করা হবে, তাহলে মিথ্যা মামলা করার উৎসাহ অনেক কমবে।

১৩৬.২ দ্রুত বিচারের অধিকার এবং মামলার জট

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা বছরের পর বছর ঝুলে থাকে। এই দীর্ঘসূত্রিতা আসামির জন্য একটি বিশেষ সমস্যা কারণ এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কারাগারে থাকেন বা জামিনে থাকলেও সামাজিক এবং পেশাদার জীবনে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হন।

ভারতের ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩ এ নারী এবং শিশু সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশেও এই মডেলে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় সর্বোচ্চ এক বছরের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা আইনে যোগ করতে হবে।

এই সময়সীমার মধ্যে বিচার শেষ না হলে আসামির জামিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে মঞ্জুর হওয়া উচিত যদি না বিশেষ পরিস্থিতিতে তার প্রয়োজন না হয়।

১৩৬.৩ পুলিশ সংস্কার এবং লিঙ্গ-সংবেদনশীল তদন্ত পদ্ধতি

বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীতে লিঙ্গ-পক্ষপাত একটি গুরুতর সমস্যা। পুলিশ সদস্যরা প্রায়ই নারীর অভিযোগকে সত্য এবং পুরুষের অভিযোগকে তুচ্ছ বলে মনে করেন। এই মনোভাব আইনের প্রয়োগে গুরুতর পক্ষপাত তৈরি করে।

পুলিশ সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলো। প্রথমত, পুলিশ প্রশিক্ষণে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ তদন্তের বিশেষ মডিউল যোগ করতে হবে। এই মডিউলে পুলিশকে শেখানো হবে যে লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিটি অভিযোগের

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

সমান গুরুত্বে তদন্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, পুলিশের অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং একটি স্বাধীন সংস্থা এই রেকর্ড পর্যালোচনা করবে। তৃতীয়ত, পারিবারিক বিরোধে পুলিশের প্রাথমিক হস্তক্ষেপে নারী পুলিশ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অধ্যায় ১৩৭: বিচার বিভাগীয় সংস্কার এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বিচারিক দর্শন

১৩৭.১ বিচারকদের অচেতন পক্ষপাতের সমস্যা

বিচারকরা মানুষ এবং মানুষ সামাজিক পূর্বধারণা থেকে মুক্ত নয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে বিচারকরাও "implicit bias" বা অচেতন পক্ষপাতের শিকার হন। এই অচেতন পক্ষপাত তাদের রায়ের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "Project Implicit" নামক একটি গবেষণা প্রকল্পে দেখা গেছে যে বিচারকরাসহ আইন পেশার মানুষেরাও লিঙ্গ, বর্ণ এবং শ্রেণী সংক্রান্ত অচেতন পক্ষপাত ধারণ করেন। বাংলাদেশের বিচারকরাও এর ব্যতিক্রম নন।

বিচারকদের অচেতন পক্ষপাত সমাধানের জন্য দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। প্রথমত, সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ যেখানে বিচারকরা নিজেদের পক্ষপাত সম্পর্কে সচেতন হবেন। দ্বিতীয়ত, কাঠামোগত সংস্কার যেখানে বিচারিক সিদ্ধান্তের উপর একটি স্বাধীন পর্যালোচনা ব্যবস্থা থাকবে।

১৩৭.২ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের ভূমিকা

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিচারক নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে। এই কমিশনের মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় সংস্কারের সুযোগ রয়েছে।

প্রস্তাব হলো বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে "gender-neutral adjudication" বা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বিচারের বিষয়ে একটি বিশেষ মডিউল যোগ করা। এই মডিউলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রথমত, অচেতন পক্ষপাত সম্পর্কে সচেতনতা। দ্বিতীয়ত, পুরুষ ভিকটিমের বাস্তবতা এবং তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ। তৃতীয়ত, নির্দোষিতার অনুমানের নীতির কার্যকর প্রয়োগ। চতুর্থত, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে লিঙ্গ-নিরপেক্ষতার বাধ্যবাধকতা।

এছাড়া, বিচারকদের রায়ে লিঙ্গ-পক্ষপাতের অভিযোগ উঠলে তা তদন্তের জন্য সুপ্রিম কোর্টের অধীনে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা উচিত।

১৩৭.৩ প্রো বোনো আইনি সহায়তা এবং পুরুষের প্রবেশাধিকার

বাংলাদেশে আইনি সহায়তার ব্যবস্থা বিদ্যমান, কিন্তু এটি মূলত নারীদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আইনি সহায়তা অফিস এবং বিভিন্ন এনজিও প্রধানত নারী ক্লায়েন্টদের সেবা দেয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষরা প্রায়ই আইনজীবী নিয়োগের সামর্থ্য রাখেন না, বিশেষত যখন তারা বিনা বেতনে কারাগারে থাকছেন। এই পরিস্থিতিতে তাদের জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রয়োজন।

প্রস্তাব হলো আইনি সহায়তা প্রদান আইন সংশোধন করে পুরুষ ভিকটিমদের স্পষ্টভাবে আইনি সহায়তার অধিকারী করা। বিশেষত নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় অভিযুক্ত পুরুষ যদি আর্থিকভাবে অসামর্থ্য হন, তাহলে তিনি বিনামূল্যে আইনজীবী পাওয়ার অধিকারী হবেন।

অধ্যায় ১৩৮: মিডিয়া, সংস্কৃতি এবং সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের কৌশল

১৩৮.১ মিডিয়ার ভূমিকা এবং দায়িত্ব

বাংলাদেশের মিডিয়া পুরুষবিরোধী কাঠামোকে শক্তিশালী করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। টেলিভিশন নাটকে, সংবাদে এবং সামাজিক মাধ্যমে পুরুষকে প্রায়ই অপরাধী এবং নারীকে শিকার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এই উপস্থাপন সামাজিক মনোভাব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে।

মিডিয়া সংস্কারের জন্য প্রথমে প্রয়োজন মিডিয়া পেশাদারদের সচেতনতা বৃদ্ধি। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এবং বিভিন্ন সাংবাদিকতা বিভাগে "gender-sensitive reporting" বা লিঙ্গ-সংবেদনশীল সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। এই প্রশিক্ষণে পুরুষ ভিকটিমের বাস্তবতা এবং মিথ্যা মামলার সমস্যাটিও অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি চ্যানেলগুলোতে বিষয়বস্তু নির্দেশিকায় এমন বিধান যোগ করা যেতে পারে যা পুরুষের প্রতি স্টেরিওটাইপ চিত্রণকে নিরুৎসাহিত করে। জার্মানির "Werberecht" বা বিজ্ঞাপন আইনে এমন বিধান রয়েছে যা লিঙ্গ-স্টেরিওটাইপ বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করে। বাংলাদেশও এই মডেল অনুসরণ করতে পারে।

১৩৮.২ শিক্ষাব্যবস্থায় লিঙ্গ-সমতার ধারণা এবং পুরুষের অধিকার

বাংলাদেশের স্কুল এবং কলেজ পাঠ্যক্রমে লিঙ্গ সমতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু এই অন্তর্ভুক্তি একমুখী। নারীর অধিকার এবং নারী নির্যাতনের বিষয়গুলো পাঠ্যক্রমে আছে, কিন্তু পুরুষের দায়িত্ব এবং পুরুষের অধিকারের কথা নেই।

একটি সুষম পাঠ্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। প্রথমত, লিঙ্গ সমতার অর্থ হলো নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য সমান মর্যাদা ও অধিকার। দ্বিতীয়ত, পুরুষও নির্যাতনের শিকার হতে পারেন এবং এটি স্বীকার করা সাহসিকতা। তৃতীয়ত, মিথ্যা অভিযোগ একটি গুরুতর অন্যায় যা আইনত শাস্তিযোগ্য। চতুর্থত, পিতার ভূমিকা সন্তানের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পিতার সাথে সন্তানের নিয়মিত যোগাযোগ সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়।

উচ্চশিক্ষায়, বিশেষত আইন এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বিভাগগুলোতে, "men's studies" বা পুরুষ অধ্যয়নের একটি পৃথক বিষয় চালু করা উচিত। এই বিষয়ে পুরুষের সামাজিক ভূমিকা, আইনি অধিকার এবং মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৩৮.৩ সামাজিক মনোভাব পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদী কৌশল

সামাজিক মনোভাব পরিবর্তন একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং জটিল প্রক্রিয়া। আইনি সংস্কার সামাজিক মনোভাব পরিবর্তন করে না, বরং সামাজিক মনোভাব পরিবর্তনের জন্য আলাদা কৌশল প্রয়োজন।

বাংলাদেশে পুরুষ নির্যাতনের বিষয়ে সামাজিক কলঙ্ক একটি বড় বাধা। একজন পুরুষ যদি স্বীকার করেন যে তিনি তার স্ত্রীর দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন, তাহলে সমাজ তাকে দুর্বল বা পৌরুষহীন মনে করে। এই সামাজিক কলঙ্ক পুরুষকে সাহায্য চাইতে বাধা দেয়।

এই কলঙ্ক দূর করার জন্য একটি বহুমুখী কৌশল প্রয়োজন। মসজিদ, মন্দির এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পুরুষ নির্যাতনের বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে হবে। ধর্মীয় নেতারা যদি বলেন যে নির্যাতনের শিকার হওয়া দুর্বলতার চিহ্ন নয়, তাহলে এটি সমাজের উপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলবে।

গ্রামীণ সালিশ ব্যবস্থায় পুরুষের অভিযোগকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে স্থানীয় নেতাদের সচেতন করতে হবে। বাংলাদেশে গ্রামীণ সালিশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা। এই সালিশে যদি পুরুষ নির্যাতন ভিকটিমের অভিযোগও সমান গুরুত্বে দেখা হয়, তাহলে সামাজিক মনোভাব পরিবর্তনে সহায়তা হবে।

অধ্যায় ১৩৯: রাজনৈতিক বাস্তবায়নের পথ এবং প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের কৌশল

১৩৯.১ রাজনৈতিক প্রতিরোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে পুরুষের আইনি অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে সংস্কার প্রস্তাব রাজনৈতিক প্রতিরোধের মুখে পড়বে। এই প্রতিরোধের স্বরূপ বোঝা সংস্কারের কৌশল নির্ধারণের জন্য অপরিহার্য।

প্রতিরোধের প্রথম উৎস হলো রাজনৈতিক দলগুলো। নারীবান্ধব আইনের বিরোধিতা করলে নারী ভোটারদের হারানোর ভয়ে রাজনৈতিক দলগুলো এই বিষয়ে মুখ খুলতে ভয় পায়। কিন্তু এই ভয়টি বাস্তবে অতিরিক্ত কারণ নারী ভোটাররাও ন্যায়বিচারের পক্ষে এবং মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে। সংস্কারের বার্তাটি যদি "নারীর বিরুদ্ধে" নয় বরং "ন্যায়বিচারের পক্ষে" হিসেবে উপস্থাপন করা যায়, তাহলে রাজনৈতিক প্রতিরোধ অনেক কমবে।

প্রতিরোধের দ্বিতীয় উৎস হলো নারী সংগঠনগুলো। কিছু নারী সংগঠন পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়টিকে নারী অধিকারের জন্য হুমকি হিসেবে দেখে। কিন্তু অধিকাংশ সুচিন্তিত নারী অধিকার কর্মী বোঝেন যে মিথ্যা মামলার অপব্যবহার নারীর প্রতি সত্যিকারের সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াইকে দুর্বল করে। তারা সংস্কারের প্রতিপক্ষ নয়, বরং সম্ভাব্য মিত্র।

প্রতিরোধের তৃতীয় উৎস হলো ধর্মীয় রক্ষণশীলতা। কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী যেকোনো পারিবারিক আইন সংস্কারকে পশ্চিমা প্রভাব হিসেবে দেখে। কিন্তু আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে ইসলামিক আইনের নিজস্ব ঐতিহ্য থেকেই লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের যুক্তি দেওয়া সম্ভব। এই ধর্মীয় যুক্তিটি সংস্কারের পক্ষে ব্যবহার করতে হবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

১৩৯.২ একটি কৌশলগত জোট নির্মাণের পথ

সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য একটি বিস্তৃত রাজনৈতিক জোট প্রয়োজন। এই জোটে নিম্নলিখিত শক্তিগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

প্রথমত, ন্যায়বিচারপন্থী আইনজীবী সংগঠন। বাংলাদেশে আইনজীবীদের বেশ কয়েকটি সংগঠন রয়েছে এবং এদের মধ্যে যারা সত্যিকারের ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করেন, তারা এই সংস্কারের পক্ষে কথা বলতে পারেন। সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন যদি পুরুষের আইনি অধিকারের পক্ষে একটি অবস্থান নেয়, তাহলে এটি আইনি সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে।

দ্বিতীয়ত, মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদাররা। বাংলাদেশের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং মনোবিজ্ঞানীরা পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্যের সংকট সম্পর্কে সচেতন। তারা যদি সংস্কারের পক্ষে কথা বলেন, তাহলে চিকিৎসা পেশার বিশ্বাসযোগ্যতা এই আন্দোলনে যোগ হবে।

তৃতীয়ত, একাডেমিক সম্প্রদায়। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইন, সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকরা যদি এই বিষয়ে গবেষণা প্রকাশ করেন এবং সংস্কারের পক্ষে কথা বলেন, তাহলে বিষয়টি একাডেমিক বৈধতা পাবে।

চতুর্থত, নারী অধিকার কর্মীদের একটি অংশ। সকল নারী অধিকার কর্মী সংস্কারের বিরোধী নয়। যারা সত্যিকারের ন্যায়বিচার চান, তারা বুঝবেন যে মিথ্যা মামলার অপব্যবহার নারীর আসল অধিকার আন্দোলনের জন্যও ক্ষতিকর।

পঞ্চমত, ধর্মীয় নেতাদের একটি অংশ। কিছু আলেম এবং ধর্মীয় নেতা ন্যায়বিচারের ইসলামিক ধারণার আলোকে পুরুষের অধিকারের পক্ষে কথা বলতে পারেন।

১৩৯.৩ সংসদীয় কৌশল এবং বিল পাসের পথ

সংসদে সংস্কার বিল পাস করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রয়োজন। বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা রয়েছে এবং আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন করা যেতে পারে।

প্রথম পদক্ষেপ হলো বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আইন সংস্কার কমিশনে পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো। ২০২৫ সালে বাংলাদেশে ৭৮টি অধ্যাদেশ জারি হয়েছে, যা আইনি সংস্কারের একটি সক্রিয় পরিবেশ নির্দেশ করে। এই পরিবেশে পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়টি উত্থাপন করার সুযোগ রয়েছে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো ২০২৬ সালে যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, সেই নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

তৃতীয় পদক্ষেপ হলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাধ্যমে একটি অভিযোগ দাখিল করা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যদি স্বীকার করে যে পুরুষের আইনি অধিকার বাংলাদেশে লঙ্ঘিত হচ্ছে, তাহলে এটি সরকারের উপর আইনি সংস্কারের চাপ তৈরি করবে।

অধ্যায় ১৪০: ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির সামাজিক মনোবিজ্ঞান এবং আইনগত প্রতিকার

১৪০.১ ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির উৎপত্তি এবং বিকাশ

"ভিকটিম কার্ড" ব্যবহারের সংস্কৃতি বাংলাদেশে একটি সামাজিক ঘটনা হয়ে উঠেছে। এটি বোঝার জন্য এর সামাজিক মনোবিজ্ঞানগত উৎপত্তি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

সামাজিক মনোবিজ্ঞানী ক্যাম্পবেল লেয়ার্ড এবং ব্র্যাডলি ক্যাম্পবেল তাদের ২০১৮ সালের "The Rise of Victimhood Culture" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে আধুনিক সমাজে "victim status" বা শিকার-মর্যাদা অর্জন করা একটি সামাজিক মূল্য হয়ে উঠেছে। যখন কেউ নিজেকে শিকার হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন, তখন তিনি সামাজিক সহানুভূতি, আইনি সুরক্ষা এবং রাজনৈতিক সমর্থন পান।

এই "victim status" এর সামাজিক মূল্য যখন বৃদ্ধি পায়, তখন কেউ কেউ মিথ্যাভাবে নিজেকে শিকার হিসেবে উপস্থাপন করার প্রণোদনা পান। এটি সব সমাজে ঘটে, কিন্তু বাংলাদেশে আইনি ব্যবস্থা এই মিথ্যা উপস্থাপনাকে সহজ করে দিয়েছে।

বাংলাদেশে এই সংস্কৃতির বিকাশের কিছু নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথমত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন যেভাবে প্রণীত হয়েছে তাতে নারীর অভিযোগকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্বাস করার একটি আইনি প্রণোদনা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, পুলিশ এবং বিচার ব্যবস্থায় নারী অভিযোগকারীর প্রতি সহানুভূতির একটি সামাজিক প্রবণতা বিদ্যমান। তৃতীয়ত, মিথ্যা অভিযোগকারীর জন্য আইনি পরিণতি কার্যত অনুপস্থিত।

২০২৪-২০২৫ সালের সোশ্যাল মিডিয়া বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে এই বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পুরুষের আইনি সংকটের বিষয়টি আলোচনা হচ্ছে এবং অনেক পুরুষ তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছেন।

১৪০.২ ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার

ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার তৈরির জন্য দুটি পদ্ধতি প্রয়োজন। প্রতিরোধমূলক পদ্ধতি এবং প্রতিকারমূলক পদ্ধতি।

প্রতিরোধমূলক পদ্ধতিতে অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়াকে আরও কঠোর করতে হবে। অভিযোগ দাখিলের সময় অভিযোগকারীকে একটি ঘোষণাপত্রে সই করতে হবে যেখানে বলা থাকবে যে তিনি সত্যিকারের ঘটনার ভিত্তিতে অভিযোগ করছেন এবং মিথ্যা অভিযোগের আইনগত পরিণতি সম্পর্কে তিনি সচেতন। এই ঘোষণাপত্রটি পরবর্তীতে মিথ্যা মামলার মামলায় প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

প্রতিকারমূলক পদ্ধতিতে মিথ্যা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে। মিথ্যা মামলার শিকার ব্যক্তি খালাসের পর ৩০ দিনের মধ্যে মিথ্যা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন এবং এই মামলা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ৬ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি হবে।

১৪০.৩ সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্মানহানির বিষয়ে পুরুষের অধিকার

বাংলাদেশে সামাজিক মাধ্যমে পুরুষকে সম্মানহানির ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। কেউ বিচারের আগেই সামাজিক মাধ্যমে একজন পুরুষকে যৌন নির্যাতনকারী, যৌতুকলোভী বা গার্হস্থ্য সহিংসতাকারী হিসেবে চিহ্নিত করে দেন। এই চিহ্নিতকরণ বিচারিক রায়ের আগেই তার সামাজিক এবং পেশাদার জীবন ধ্বংস করে দেয়।

বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনে সম্মানহানির বিরুদ্ধে বিধান রয়েছে, কিন্তু এই আইনগুলো প্রয়োগ করতে হলে আরও কার্যকর প্রক্রিয়া প্রয়োজন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব হলো "presumptive innocence protection order" বা নির্দোষিতার অনুমান সুরক্ষা আদেশ। যদি কারো বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চলাকালে কেউ সামাজিক মাধ্যমে তাকে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করেন, তাহলে আদালত এই সুরক্ষা আদেশ জারি করতে পারবেন যা সেই প্রকাশনা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেবে।

অধ্যায় ১৪১: পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধে আইনগত দায়িত্ব

১৪১.১ মিথ্যা মামলা এবং পুরুষের আত্মহত্যার সংযোগ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২৪ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশে পুরুষের আত্মহত্যার হার নারীর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এই পরিসংখ্যানটি আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পারিবারিক বিরোধ এবং আইনগত সংকট পুরুষের আত্মহত্যার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

বাংলাদেশে প্রতিবছর এমন অনেক সংবাদ আসে যেখানে দেখা যায় যে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার পর বা পারিবারিক বিরোধের চাপে পুরুষ আত্মহত্যা করেছেন। ২০২৩-২০২৫ সালে বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই ধরনের ঘটনার অনেক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই মৃত্যুগুলোর একটি সরকারি পরিসংখ্যান নেই।

এই সংকটের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা হিসেবে একটি "crisis intervention protocol" বা সংকট হস্তক্ষেপ প্রোটোকল তৈরি করা উচিত। যখন কেউ মানসিক সংকটে রয়েছেন এবং আইনগত সমস্যায় জড়িত আছেন, তখন পুলিশ ও আদালতের মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করার একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি থাকা উচিত।

১৪১.২ পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সাংবিধানিক দায়িত্ব থেকে যুক্তি দেওয়া যায় যে পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি রাষ্ট্রের উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ বলে যে রাষ্ট্র নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নের দায়িত্ব নেবে, যার মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা অন্তর্ভুক্ত। পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা এই সাংবিধানিক দায়িত্বের একটি অংশ।

প্রস্তাব হলো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি "Men's Mental Health Unit" বা পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য ইউনিট স্থাপন করা। এই ইউনিট পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার বিষয়ে গবেষণা করবে, সেবা কেন্দ্র স্থাপন করবে এবং একটি জাতীয় হেল্পলাইন পরিচালনা করবে।

এই হেল্পলাইনে পারিবারিক বিরোধ এবং আইনগত সংকটে থাকা পুরুষরাও সহায়তা পাবেন। হেল্পলাইনে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের পাশাপাশি আইনি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

অধ্যায় ১৪২: জাতীয় লিঙ্গ সমতা কমিশনের একটি নতুন রূপ

১৪২.১ বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে লিঙ্গ সমতার বিষয়ে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মহিলা উন্নয়ন কাউন্সিল এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এই ক্ষেত্রে কাজ করে। কিন্তু এই সব প্রতিষ্ঠান মূলত নারীর উন্নয়নে মনোযোগ দেয়, লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারে নয়।

২০২৫ সালে গঠিত নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনও মূলত নারীর অধিকারে মনোযোগ দিয়েছে। পুরুষের আইনি সংকট এই কমিশনের এজেন্ডায় নেই। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে এই কমিশনের সুপারিশ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সেখানে পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়টি অনুপস্থিত।

১৪২.২ একটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ জাতীয় সমতা কমিশনের প্রস্তাব

প্রস্তাব হলো একটি "জাতীয় লিঙ্গ ন্যায়বিচার কমিশন" বা National Commission for Gender Justice গঠন করা। এই কমিশন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয়, বরং আইন মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করবে।

এই কমিশনের গঠনে নারী এবং পুরুষ উভয়ের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। কমিশনের ম্যান্ডেটে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

প্রথমত, লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইন চিহ্নিতকরণ এবং সংস্কারের সুপারিশ প্রদান। দ্বিতীয়ত, নারী এবং পুরুষ উভয়ের নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ। তৃতীয়ত, লিঙ্গ-পক্ষপাতী বিচারিক সিদ্ধান্তের অভিযোগ তদন্ত। চতুর্থত, পুলিশ এবং বিচার বিভাগের প্রশিক্ষণে লিঙ্গ-নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণ। পঞ্চমত, জাতীয় সংসদে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

কানাডার "Canadian Human Rights Commission" এই মডেলের একটি ভালো উদাহরণ। কানাডার কমিশন লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের অধিকার রক্ষায় কাজ করে এবং এটি আইনি পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অধ্যায় ১৪৩: ভবিষ্যতের আইনি সম্ভাবনা: ২০৩০ সালের মধ্যে একটি সমতাপূর্ণ বাংলাদেশ

১৪৩.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সম্ভাব্য পরিবর্তনের একটি দৃশ্যকল্প

যদি এই পাঠ্যগ্রন্থে প্রস্তাবিত সংস্কারগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাস্তবায়িত হয়, তাহলে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থা কেমন হতে পারে?

একটি আশাবাদী দৃশ্যকল্প: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের জামিন বিধান সংস্কার হয়েছে এবং এখন গুরুতর অপরাধ ব্যতীত সকল মামলায় জামিন ডিফল্ট। গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন লিঙ্গ-নিরপেক্ষ হয়েছে এবং পুরুষ ভিকটিমরাও সুরক্ষা আদেশ পাচ্ছেন। সন্তানের হেফাজতে যৌথ হেফাজতের বিধান চালু হয়েছে এবং বিচ্ছেদের পর পিতারা সন্তানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে কার্যকর আইনি প্রতিকার বিদ্যমান এবং মিথ্যা অভিযোগকারীরা শাস্তির মুখোমুখি হচ্ছেন। বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বিচারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই দৃশ্যকল্পে বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ডের আরও কাছে এসেছে এবং পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য একটি আরও সুষম ন্যায়বিচার ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে।

১৪৩.২ সংস্কারের বাধাগুলো অতিক্রমের সময়সীমা

বাস্তবে সংস্কার একটি ধীর প্রক্রিয়া। নিম্নলিখিত সময়সীমায় বিভিন্ন পর্যায়ের সংস্কার সম্পন্ন হতে পারে।

২০২৬-২০২৭ সালের মধ্যে অর্জনযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা হলো জাতীয় লিঙ্গ ন্যায়বিচার কমিশন গঠন, বিচারকদের প্রশিক্ষণে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ মডিউল যোগ করা, পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্য হেল্পলাইন চালু করা এবং মিথ্যা মামলার পরিসংখ্যান সংগ্রহের পদ্ধতি তৈরি করা।

২০২৮-২০২৯ সালের মধ্যে অর্জনযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা হলো গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন সংশোধন করে পুরুষ ভিকটিমকে অন্তর্ভুক্ত করা, পিতৃত্বকালীন ছুটির আইনি বিধান প্রণয়ন করা এবং যৌথ হেফাজতের পাইলট কার্যক্রম শুরু করা।

২০৩০-২০৩৫ সালের মধ্যে অর্জনযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা হলো নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সমগ্র সংস্কার, মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে কার্যকর আইনি প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং বিচার বিভাগে লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা সূচকের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

অধ্যায় ১৪৪: একটি নতুন সামাজিক চুক্তির দিকে: পুরুষ, নারী এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ

১৪৪.১ সামাজিক চুক্তির পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা

জন লক এবং জ্যাঁ-জ্যাক রুশো থেকে শুরু করে আধুনিক রাজনৈতিক দার্শনিকরা "social contract" বা সামাজিক চুক্তির ধারণা ব্যবহার করেছেন। এই ধারণা অনুযায়ী, সমাজের সদস্যরা পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে একটি অঘোষিত চুক্তিতে আবদ্ধ থাকেন।

বাংলাদেশে বর্তমান আইনি কাঠামো এই সামাজিক চুক্তির একটি বিকৃত রূপ। এই কাঠামোয় পুরুষকে বলা হচ্ছে: "তুমি রোজগার করবে, পরিবার পালন করবে, কিন্তু আইনি সুরক্ষার দিক থেকে তোমার অধিকার সীমিত।" এই চুক্তিটি একপাক্ষিক এবং অন্যায্য।

একটি নতুন এবং ন্যায্য সামাজিক চুক্তিতে পুরুষ এবং নারী উভয়ের দায়িত্ব এবং অধিকার সমানভাবে সংজ্ঞায়িত থাকবে। পুরুষ পরিবারে অর্থনৈতিক অবদান রাখবে এবং একই সাথে সন্তান লালনপালনে সক্রিয় ভূমিকা নেবে। নারী পরিবারে এবং সমাজে সমান মর্যাদায় অংশগ্রহণ করবেন এবং পুরুষের সাথে সমান সুরক্ষা পাবেন। উভয়ই আইনের সামনে সমান এবং উভয়ই আইনের অপব্যবহারের জন্য সমান শাস্তির মুখোমুখি হবেন।

এই নতুন সামাজিক চুক্তি কোনো পুরুষবাদী বা নারীবাদী আদর্শের নয়, এটি মানববাদী আদর্শের। এটি বিশ্বাস করে যে পুরুষ এবং নারী উভয়ই একে অপরের সম্পূর্ণ মানবিক পরিচয় ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেই একটি সত্যিকারের ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়ে উঠবে।

১৪৪.২ পিতৃতন্ত্র এবং মিসান্ড্রির একযোগে প্রতিরোধ

এই পাঠ্যগ্রন্থের শুরুতেই বলা হয়েছিল যে পিতৃতন্ত্র এবং মিসান্ড্রি পারস্পরবিরোধী নয়। একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আইনি মিসান্ড্রি থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব। দশটি খণ্ডের বিশ্লেষণ শেষে এই দাবিটি আরও শক্তিশালীভাবে প্রমাণিত।

বাংলাদেশে পিতৃতন্ত্র নারীকে নিপীড়িত করে এটি সত্য। একই সাথে বাংলাদেশের আইনি কাঠামো পুরুষের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক এটিও সত্য। উভয় সত্যকে একসাথে স্বীকার করে সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে।

এই দ্বৈত সংগ্রামের কৌশল হলো পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই নারীকে সত্যিকারের সামাজিক মর্যাদা দেওয়ার জন্য অব্যাহত রাখতে হবে। একই সাথে মিসান্ড্রিক আইনি কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াই পুরুষকে সত্যিকারের আইনি সমতা দেওয়ার জন্য শুরু করতে হবে। এই দুটি লড়াই পরস্পরের প্রতিপক্ষ নয়, বরং পরিপূরক।

১৪৪.৩ ভবিষ্যতের প্রজন্মের কাছে এই পাঠ্যগ্রন্থের বার্তা

এই পাঠ্যগ্রন্থ রচনার সময় একটি প্রশ্ন সবসময় মাথায় ছিল: ভবিষ্যতের প্রজন্ম কি এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা প্রয়োজন বলে মনে করবে? আশা করা যায় যে তারা করবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এমন একটি সমাজে বড় হোক যেখানে কোনো ছেলে শিশু জেনে বড় হবে না যে একদিন তাকে শুধু তার লিঙ্গের কারণে আইনগতভাবে দুর্বল অবস্থানে থাকতে হতে পারে। যেখানে কোনো মেয়ে শিশু শিখবে না যে মিথ্যা অভিযোগ একটি গ্রহণযোগ্য হাতিয়ার। যেখানে প্রতিটি শিশু শিখবে যে ন্যায়বিচার কেবল একটি শব্দ নয়, এটি একটি সক্রিয় অনুশীলন যা প্রতিটি নাগরিকের জীবনে প্রযোজ্য।

অধ্যায় ১৪৫: আইনতাত্ত্বিক উপসংহার এবং সমন্বিত তত্ত্ব

১৪৫.১ একটি সমন্বিত "লিঙ্গ-ন্যায়বিচার তত্ত্ব" এর নির্মাণ

এই দশ খণ্ডের পাঠ্যগ্রন্থের বিশ্লেষণ থেকে আমরা একটি সমন্বিত "লিঙ্গ-ন্যায়বিচার তত্ত্ব" বা "Theory of Gender Justice" নির্মাণ করতে পারি যা বাংলাদেশ এবং অনুরূপ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য।

এই তত্ত্বের পাঁচটি মূল স্বীকৃতি রয়েছে।

প্রথম স্বীকৃতি হলো দ্বৈত বাস্তবতার স্বীকৃতি। পিতৃতন্ত্র এবং মিসান্ড্রি একসাথে বিদ্যমান থাকতে পারে এবং উভয়কেই একসাথে সম্বোধন করতে হবে।

দ্বিতীয় স্বীকৃতি হলো মানবিক মর্যাদার সার্বজনীনতা। প্রতিটি মানুষ, তার লিঙ্গ নির্বিশেষে, একই মানবিক মর্যাদার দাবিদার এবং এই মর্যাদা আইনে প্রতিফলিত হতে হবে।

তৃতীয় স্বীকৃতি হলো আইনের সীমাবদ্ধতার স্বীকৃতি। আইন একা সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে না। আইন, সংস্কৃতি এবং রাজনীতির একযোগে পরিবর্তন প্রয়োজন।

চতুর্থ স্বীকৃতি হলো প্রসঙ্গের গুরুত্ব। বাংলাদেশের জন্য সংস্কার অবশ্যই বাংলাদেশের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

পঞ্চম স্বীকৃতি হলো ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি। রাতারাতি সবকিছু পরিবর্তন হবে না, কিন্তু প্রতিটি ছোট পরিবর্তন একটি বৃহত্তর রূপান্তরের দিকে নিয়ে যাবে।

১৪৫.২ আইনতাত্ত্বিক দর্শনের একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ

এই পাঠ্যগ্রন্থে আমরা বিভিন্ন আইনতাত্ত্বিক দর্শনের আলোকে বাংলাদেশের আইনি সংকট বিশ্লেষণ করেছি। এখন এই বিশ্লেষণের একটি সমন্বিত মূল্যায়ন উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

পজিটিভিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থার সমস্যা হলো নিম্নতর আইন উচ্চতর আইন অর্থাৎ সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। হার্ট এবং কেলসেনের কাঠামোয় এটি একটি স্পষ্ট আইনি ত্রুটি যা উচ্চ আদালত সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

প্রাকৃতিক আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্দোষিতার অনুমানের নীতি এবং সকলের জন্য সমান আইনগত সুরক্ষার নীতি এমন মৌলিক নৈতিক সত্য যা সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য। বাংলাদেশের লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইন এই মৌলিক নৈতিক সত্যগুলো লঙ্ঘন করে এবং তাই প্রাকৃতিক আইনের দৃষ্টিতে এগুলো প্রকৃত আইন নয়।

ক্রিটিক্যাল লিগ্যাল স্টাডিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশের লিঙ্গ-পক্ষপাতী আইন একটি রাজনৈতিক শক্তির প্রতিফলন। এই আইনগুলো নারী ভোটারদের তুষ্ট রাখতে রাজনৈতিক দলগুলো দ্বারা তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এই রাজনৈতিক কাঠামোটিকে পরিবর্তন না করলে আইনি সংস্কার টেকসই হবে না।

রিপাবলিকান আইনতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশের পুরুষরা আধিপত্যের একটি নতুন রূপের শিকার। তারা মিথ্যা মামলার হুমকির মধ্যে বাস করেন এবং এই হুমকিই তাদের উপর একটি প্রকৃত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। পেটিটের রিপাবলিকান দর্শনে এই ধরনের আধিপত্য নির্মূল করাই ন্যায়বিচারের লক্ষ্য।

ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচের দৃষ্টিভঙ্গিতে মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষের মানবিক সক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এই সক্ষমতার হ্রাস একটি গুরুতর মানবিক ক্ষতি এবং রাষ্ট্র এই ক্ষতি প্রতিরোধে বাধ্য।

এই সকল তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি একটি সমন্বিত বার্তা দেয়: বাংলাদেশের আইনি কাঠামোয় পুরুষের প্রতি বৈষম্য একটি সত্যিকারের এবং গুরুতর সমস্যা এবং এর সমাধান জরুরি।

অধ্যায় ১৪৬: রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং সংস্কারের রাজনীতি

১৪৬.১ ২০২৬ সালের নির্বাচন এবং পুরুষের আইনি অধিকারের প্রশ্ন

বাংলাদেশে ২০২৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে। এই নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ইশতেহার প্রকাশ করবে। এটি একটি সুযোগ যে পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়টি রাজনৈতিক আলোচনায় আসতে পারে।

কিন্তু এই বিষয়টি রাজনৈতিক আলোচনায় আনতে হলে সুনির্দিষ্ট দাবি উপস্থাপন করতে হবে। অস্পষ্ট দাবি রাজনৈতিকভাবে কার্যকর নয়।

সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী দাবি হতে পারে। প্রথমত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের জামিন বিধান সংস্কার করে গ্রেফতার-পূর্ব তদন্তের বিধান চালু করা। দ্বিতীয়ত, গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ করা। তৃতীয়ত, মিথ্যা মামলায় ক্ষতিপূরণের বিধান প্রণয়ন করা। চতুর্থত, পিতৃত্বকালীন ছুটির আইনি বিধান প্রণয়ন করা। পঞ্চমত, জাতীয় লিঙ্গ ন্যায়বিচার কমিশন গঠন করা।

এই দাবিগুলো উপস্থাপন করার সময় সবসময় এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে যে এগুলো নারী অধিকারের বিরুদ্ধে নয়, বরং সামগ্রিক ন্যায়বিচারের পক্ষে।

১৪৬.২ অন্তর্বর্তী সরকারের আইন সংস্কার এজেন্ডায় পুরুষের অধিকার

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

২০২৪ সালে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশে ব্যাপক আইনি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। ২০২৫ সালে ৭৮টি অধ্যাদেশ জারি হয়েছে। এই সংস্কারমুখী পরিবেশে পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়টি উপস্থাপন করার একটি বিশেষ সুযোগ রয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস নাগরিক অধিকার এবং আইনের শাসনের বিষয়ে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর কাছে এই বার্তাটি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব যে পুরুষের আইনি অধিকার একটি মানবাধিকারের বিষয় এবং এটি সংস্কার এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

আইন কমিশন বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইন কমিশনে পুরুষের আইনি অধিকার বিষয়ে একটি বিশেষ অধ্যয়নের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। যদি আইন কমিশন এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে এবং সংসদে পেশ করে, তাহলে এটি আইনি সংস্কারের পথ উন্মুক্ত করবে।

অধ্যায় ১৪৭: সমগ্র পাঠ্যগ্রন্থের উপসংহার: ন্যায়বিচারের অসম্পূর্ণ যাত্রা

১৪৭.১ দশটি খণ্ডের বিশ্লেষণের সারসংক্ষেপ

এই দশ খণ্ডের পাঠ্যগ্রন্থে আমরা যে যাত্রা করেছি, সেই যাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

প্রথম খণ্ডে আমরা এই পাঠ্যগ্রন্থের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করেছি। আমরা মিসান্ড্রির সংজ্ঞা, পিতৃতন্ত্র এবং মিসান্ড্রির পারস্পরিক সম্পর্ক, বাংলাদেশের আইনি ইতিহাস এবং সংবিধানের সমতার প্রতিশ্রুতি বিশ্লেষণ করেছি।

দ্বিতীয় খণ্ডে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি কীভাবে এই আইনের জামিন বিধান, সংজ্ঞার কাঠামো এবং প্রয়োগের পদ্ধতি পুরুষের আইনি অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে।

তৃতীয় খণ্ডে যৌতুক নিরোধ আইনের অপব্যবহার এবং মিথ্যা যৌতুক মামলার রাজনীতি আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ডে পারিবারিক আইনে পুরুষের অধিকার, বিশেষত সন্তানের হেফাজতে পিতার প্রান্তিকীকরণ এবং বিবাহ বিচ্ছেদে পুরুষের সীমিত অধিকার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ডে ফৌজদারি আইনে লিঙ্গ-পক্ষপাত, বিশেষত দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা এবং অন্যান্য বৈষম্যমূলক বিধান পরীক্ষা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ডে পুরুষ নির্যাতনের আইনগত অস্বীকৃতি এবং গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনে পুরুষের অনুপস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

সপ্তম খণ্ডে মিথ্যা মামলার রাজনীতি, মিথ্যা মামলার সামাজিক কারণ এবং মিথ্যা মামলাকারীর বিরুদ্ধে প্রতিকারের অপ্রতুলতা আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম খণ্ডে সামাজিক কাঠামো এবং ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি কীভাবে সামাজিক কলঙ্ক পুরুষকে সাহায্য চাইতে বাধা দেয় এবং কীভাবে মিডিয়া ও সংস্কৃতি এই বাধাকে শক্তিশালী করে।

নবম খণ্ডে আন্তর্জাতিক আইন ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে বিশ্বের অনেক দেশ কীভাবে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ আইনি সংস্কারে সফল হয়েছে এবং বাংলাদেশ কীভাবে এই সাফল্যগুলো থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

এই দশম খণ্ডে আমরা সংস্কারের দার্শনিক ভিত্তি পুনর্নির্মাণ, বিস্তারিত আইনি প্রস্তাব, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, সামাজিক পরিবর্তনের কৌশল এবং রাজনৈতিক বাস্তবায়নের পথ উপস্থাপন করেছি।

১৪৭.২ একটি অসম্পূর্ণ যাত্রার স্বীকৃতি

এই পাঠ্যগ্রন্থ সম্পূর্ণ নয়। এটি একটি শুরু। বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থায় লিঙ্গ-পক্ষপাতের সমস্যাটি এত গভীর এবং বহুমাত্রিক যে একটি পাঠ্যগ্রন্থে তার সম্পূর্ণ সমাধান উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

এই পাঠ্যগ্রন্থের উদ্দেশ্য হলো একটি কথোপকথন শুরু করা। বাংলাদেশে পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়ে একটি সুষম, তথ্যভিত্তিক এবং দার্শনিকভাবে প্রতিষ্ঠিত আলোচনা শুরু হওয়া উচিত। এই পাঠ্যগ্রন্থ সেই আলোচনার একটি প্রথম অবদান।

পরবর্তী অবদান আসবে আইনবিদদের কাছ থেকে যারা এই বিশ্লেষণকে আরও গভীর করবেন। সমাজবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে যারা সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করবেন। মনোবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে যারা পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর আলোকপাত করবেন। রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে যারা এই সমস্যার সমাধানে সাহস দেখাবেন। এবং সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে যারা একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজের দাবিতে কথা বলবেন।

১৪৭.৩ শেষ কথা: ন্যায়বিচারের বিভাজ্যতা

এই পাঠ্যগ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হলো: ন্যায়বিচার বিভাজ্য নয়। যদি একটি লিঙ্গের বিরুদ্ধে অন্যায় থাকে, তাহলে সামগ্রিক ন্যায়বিচার নেই। যদি পুরুষ মিথ্যা মামলার ভয়ে বাস করেন, তাহলে সমাজে প্রকৃত ন্যায়বিচার নেই। যদি নারী আইনের অপব্যবহার করে পুরুষকে ক্ষতি করতে পারেন এবং তার কোনো পরিণতি না হয়, তাহলে সমাজে প্রকৃত দায়িত্ববোধ নেই।

ন্যায়বিচার একটি সমগ্র ধারণা। এটি কেবল নারীর জন্য নয়, কেবল পুরুষের জন্য নয়, সকল মানুষের জন্য। বাংলাদেশকে সেই সমগ্র ন্যায়বিচারের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই পাঠ্যগ্রন্থ সেই যাত্রার একটি ক্ষুদ্র অবদান। একটি যাত্রা যা আমাদের সকলের, কারণ আমরা সকলেই একটি ন্যায়সঙ্গত বাংলাদেশ চাই।

পরিশিষ্ট ক: দশম খণ্ডে প্রস্তাবিত আইনি সংস্কারের সম্পূর্ণ তালিকা

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এ যেসব সংস্কার প্রস্তাব করা হয়েছে তার তালিকা হলো: ধারা ৯ তে ধর্ষণের সংজ্ঞায় সম্মতির ধারণা স্পষ্ট করা এবং মিথ্যা ধর্ষণ অভিযোগের জন্য কার্যকর প্রতিকার যোগ করা। ধারা ১১ তে যৌতুকের সংজ্ঞা সংকুচিত করা এবং স্পষ্ট করা। ধারা ১৭ তে মিথ্যা মামলাকারীর শাস্তির বিধান কার্যকর করা এবং প্রমাণের মানদণ্ড যুক্তিসঙ্গত করা। ধারা ১৯ এ জামিন বিধান সংস্কার করে শুধু গুরুতর অপরাধে জামিন অযোগ্যতা রাখা। একটি নতুন ধারা যোগ করে গ্রেফতার-পূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট স্তরে প্রাথমিক তদন্তের বিধান চালু করা। আরেকটি নতুন ধারায় মামলা সর্বোচ্চ এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তির সময়সীমা নির্ধারণ করা। আরেকটি নতুন ধারায় নির্দোষ প্রমাণিত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের বিধান যোগ করা।

গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ এ যেসব সংস্কার প্রস্তাব করা হয়েছে তার তালিকা হলো: সংজ্ঞায় পুরুষ ভিকটিমকে অন্তর্ভুক্ত করা। কোয়ার্সিভ কন্ট্রোলের সংজ্ঞা যোগ করা। সুরক্ষা আদেশের বিধান লিঙ্গ-নিরপেক্ষ করা। পুরুষ ভিকটিমের জন্য সেবা কেন্দ্রের বিধান যোগ করা। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের বিধান যোগ করা।

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এ যেসব সংস্কার প্রস্তাব করা হয়েছে তার তালিকা হলো: সন্তানের হেফাজতে যৌথ আইনি হেফাজতকে ডিফল্ট নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। পিতার দর্শনের অধিকারকে কার্যকরভাবে নিশ্চিত করার জন্য শাস্তির বিধান যোগ করা।

শ্রম আইনে যে সংস্কার প্রস্তাব করা হয়েছে তা হলো পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধান যোগ করা, প্রাথমিকভাবে কমপক্ষে ১৪ দিন।

নতুন আইন প্রণয়নের প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে জাতীয় লিঙ্গ ন্যায়বিচার কমিশন আইন, পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্য এবং সহায়তা কেন্দ্র আইন এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বিচারিক প্রশিক্ষণ আইন।

পরিশিষ্ট খ: বাংলাদেশের পুরুষ অধিকার আন্দোলনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা

এই পরিশিষ্টে বাংলাদেশে পুরুষের আইনি অধিকারের জন্য একটি সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য একটি ধাপে ধাপে কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম ধাপ হলো সংগঠন গঠন। বাংলাদেশে পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়ে কাজ করার জন্য একটি বা একাধিক নিবন্ধিত সংগঠন গঠন করতে হবে। এই সংগঠনের সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে সকলের জন্য, নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য। সংগঠনের লক্ষ্য হবে ন্যায়বিচার, নারীবিরোধিতা নয়।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

দ্বিতীয় ধাপ হলো তথ্য সংগ্রহ। মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষের ঘটনা নিয়মতান্ত্রিকভাবে নথিবদ্ধ করতে হবে। এই তথ্যভান্ডার সরকার, মিডিয়া এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার কাছে উপস্থাপন করতে হবে।

তৃতীয় ধাপ হলো আইনি লড়াই। সুপ্রিম কোর্টে সাংবিধানিক রিট পিটিশন দাখিল করার বিষয়ে আইনজীবীদের সাথে কাজ করতে হবে। এই পিটিশনে দাবি করতে হবে যে গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের পুরুষ-বর্জনকারী সংজ্ঞা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

চতুর্থ ধাপ হলো রাজনৈতিক সংলাপ। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যোগাযোগ করে এই বিষয়টি তাদের ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাতে হবে। সংসদ সদস্যদের মধ্যে যারা ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করেন, তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে।

পঞ্চম ধাপ হলো সামাজিক সচেতনতা। গণমাধ্যম, সামাজিক মিডিয়া এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুরুষের আইনি সংকটের বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে। এই উপস্থাপনা সবসময় তথ্যভিত্তিক, শান্ত এবং ন্যায়বিচারের ভাষায় হবে।

পরিশিষ্ট গ: পাঠ্যগ্রন্থে ব্যবহৃত প্রধান আইনতাত্ত্বিক ধারণাগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

এই পাঠ্যগ্রন্থে যে মূল আইনতাত্ত্বিক ধারণাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, পাঠকের সুবিধার জন্য তার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

"Presumption of innocence" বা নির্দোষিতার অনুমান হলো আইনের একটি মূলনীতি যার অর্থ হলো যতক্ষণ না আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ অভিযুক্তকে নির্দোষ ধরে নিতে হবে। প্রমাণের ভার অভিযোগকারীর উপর, অভিযুক্তের উপর নয়।

"Due process" বা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া হলো নীতি যার অর্থ হলো কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে হলে একটি নির্দিষ্ট এবং ন্যায্য আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

"Equality before law" বা আইনের সামনে সমতা হলো নীতি যার অর্থ হলো প্রতিটি ব্যক্তি, তার লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ বা সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে, আইনের সামনে সমানভাবে দাঁড়ায়।

"Positive discrimination" বা ইতিবাচক বৈষম্য হলো নীতি যার অর্থ হলো ঐতিহাসিকভাবে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীকে এগিয়ে আনতে সাময়িকভাবে বিশেষ সুবিধা দেওয়া। তবে এটি অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বিধান তৈরির লাইসেন্স নয়।

"Misandry" বা মিসান্ড্রি হলো পুরুষের প্রতি বিরূপ মনোভাব বা পুরুষকে কাঠামোগতভাবে বৈষম্যের শিকার করার ব্যবস্থা।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

"Jurisprudence" বা আইনতত্ত্ব হলো আইনের দর্শনগত বিশ্লেষণ। আইন কী, আইন কেন মানা উচিত, ন্যায়বিচার কী এই প্রশ্নগুলো আইনতত্ত্বের বিষয়।

"Legal positivism" বা আইনি প্রত্যক্ষবাদ হলো দৃষ্টিভঙ্গি যা বলে যে আইন হলো মানুষের তৈরি নিয়ম এবং এটি নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, কিন্তু আইনের বৈধতা নৈতিকতার উপর নির্ভর করে না।

"Natural law" বা প্রাকৃতিক আইন হলো দৃষ্টিভঙ্গি যা বলে যে ন্যায়বিচারের কিছু মূলনীতি প্রকৃতিতে বা যুক্তিতে নিহিত এবং মানুষের তৈরি আইন যদি এই মূলনীতি লঙ্ঘন করে, তাহলে তা প্রকৃত আইন নয়।

"Capability approach" বা সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি হলো আমার্ত্য সেন এবং মার্থা নুসবাউমের তত্ত্ব যা মানব বিকাশকে মানুষের কী করতে পারার এবং কী হতে পারার সক্ষমতার প্রশ্ন হিসেবে দেখে।

"Republican freedom" বা রিপাবলিকান স্বাধীনতা হলো ফিলিপ পেটিটের তত্ত্ব যা স্বাধীনতাকে শুধু হস্তক্ষেপের অনুপস্থিতি নয়, বরং আধিপত্যের অনুপস্থিতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে।

"Critical legal studies" বা সমালোচনামূলক আইন অধ্যয়ন হলো আন্দোলন যা আইনকে নিরপেক্ষ হিসেবে নয়, বরং ক্ষমতার একটি প্রকাশ হিসেবে দেখে।

পরিশিষ্ট ঘ: আইনি সংস্কারের জন্য একটি বিশদ ক্যালেন্ডার

এই পরিশিষ্টে আইনি সংস্কারের জন্য একটি বিশদ সময়ভিত্তিক ক্যালেন্ডার উপস্থাপন করা হলো।

২০২৬ সালে যা করণীয় তা হলো আইন কমিশনে পুরুষের আইনি অধিকার বিষয়ে একটি অধ্যয়নের জন্য আবেদন করা। বাংলাদেশে পুরুষের আইনি অধিকারের বিষয়ে একটি বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করা। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের জামিন বিধান সংস্কারের জন্য সংসদীয় কমিটিতে একটি আবেদন জমা দেওয়া।

২০২৭ সালে যা করণীয় তা হলো সুপ্রিম কোর্টে গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট পিটিশন দাখিল করা। বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণ একাডেমিতে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বিচারের বিষয়ে একটি পাইলট মডিউল চালু করা। পুরুষ মানসিক স্বাস্থ্য হেল্পলাইন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা।

২০২৮ সালে যা করণীয় তা হলো গার্হস্থ্য সহিংসতা আইনের সংশোধনী বিল সংসদে উপস্থাপনের জন্য কাজ করা। পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধান যোগ করার জন্য শ্রম আইন সংশোধনী প্রস্তাব তৈরি করা।

২০২৯-২০৩০ সালে যা করণীয় তা হলো নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের বিস্তারিত সংশোধনী বিল তৈরি এবং সংসদে উপস্থাপন। জাতীয় লিঙ্গ ন্যায়বিচার কমিশন গঠনের জন্য আইন প্রণয়ন।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

চূড়ান্ত কথা: একটি পাঠ্যগ্রন্থের জীবন এবং ন্যায়বিচারের অনুসন্ধান

এই পাঠ্যগ্রন্থ লেখার সময় আমরা সবসময় জানতাম যে এটি একটি বিতর্কিত বিষয়ে লেখা। যে কোনো বিতর্কিত বিষয়ে লিখলেই সমালোচনা আসে। কেউ বলবেন এটি পুরুষবাদী প্রচারণা। কেউ বলবেন এটি নারীর অধিকারের বিরুদ্ধে। কেউ বলবেন এটি বাস্তবতাকে অস্বীকার করে।

এই সমালোচনাগুলোর কোনোটিই আমরা প্রত্যাশার বাইরে মনে করি না। কিন্তু আমাদের একটি জবাব আছে: তথ্য দেখুন। আইনের ধারা পড়ুন। বাস্তব মামলাগুলো পর্যালোচনা করুন। এবং তারপর বিচার করুন।

যদি এই পাঠ্যগ্রন্থ পড়ার পর কেউ বলতে পারেন যে বাংলাদেশে পুরুষের আইনি সংকট বলে কিছু নেই, তাহলে আমাদের যুক্তি পর্যাপ্ত ছিল না। কিন্তু যদি এই পাঠ্যগ্রন্থ পড়ার পর কেউ বলেন যে সত্যিই কিছু একটা ঠিক নেই এবং এটি পরিবর্তন হওয়া উচিত, তাহলে এই পাঠ্যগ্রন্থ তার উদ্দেশ্য পূরণ করেছে।

ন্যায়বিচার একটি চলমান যাত্রা। এই যাত্রায় কোনো চূড়ান্ত গন্তব্য নেই, শুধু প্রতিদিনের সংগ্রাম আছে। বাংলাদেশের নাগরিকরা সেই সংগ্রামে সকলের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়ে তুলতে পারবেন, এই বিশ্বাস এই পাঠ্যগ্রন্থের শেষ কথা।

 ©2026 S M Nazmuz Sakib. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

বাংলাদেশের আইনি কাঠামো ও সামাজিক বাস্তবতার গভীর বিশ্লেষণে এই গবেষণা দাবি করে, একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজেও আইনি ব্যবস্থা পুরুষবিরোধী (মিসান্ড্রিক) হতে পারে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর জামিন অযোগ্য বিধান ও একক সাক্ষ্যের ভরসায় মিথ্যা অভিযোগে পুরুষ আসামিরা নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার আগেই কারাবরণ করেন, যা নির্দোষিতার অনুমান ও ন্যায়বিচারের মূলনীতির লঙ্ঘন। যৌতুক নিরোধ আইন বিবাহবিচ্ছেদ ও সম্পত্তি বিরোধে অর্থ আদায়ের কৌশলগত হাতিয়ারে পরিণত হয়। গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন ২০১০ পুরুষ ভিকটিমকে সংজ্ঞায়ই স্বীকৃতি দেয় না, ফলে নারী কর্তৃক পুরুষের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন আইনগত অদৃশ্য থাকে।

পারিবারিক আইনে সন্তানের হেফাজতে পিতার অধিকার প্রান্তিক, ভরণপোষণের একতরফা দায়িত্ব ও তালাক পরবর্তী আর্থিক বোঝা পুরুষের জন্য অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ফৌজদারি আইনে দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারার মতো বিধান শুধু পুরুষকে ব্যভিচারের অপরাধী করে, যা লিঙ্গ-বৈষম্যের শামিল। মিথ্যা মামলার শিকার পুরুষের জন্য ক্ষতিপূরণের কার্যকর ব্যবস্থা নেই, আর ভিকটিম কার্ড সংস্কৃতি ও মিডিয়া ট্রায়াল সামাজিক কলঙ্ককে আরও গভীর করে।

আন্তর্জাতিক তুলনায় ভারতের আর্নেশ কুমার গাইডলাইন, যুক্তরাজ্য ও কানাডার লিঙ্গ-নিরপেক্ষ গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন, নর্ডিক দেশগুলোর যৌথ হেফাজত মডেল প্রাসঙ্গিক উল্লেখ। সংস্কারের প্রস্তাবের মধ্যে জামিন বিধানের ধারাবাহিক সংস্কার, গ্রেফতারের আগে প্রাথমিক তদন্তের বাধ্যবাধকতা, মিথ্যা মামলায় ক্ষতিপূরণ ও যৌথ হেফাজতকে ডিফল্ট করা অন্যতম। এটি নারীবিরোধিতা নয়, বরং ন্যায়বিচারের সার্বজনীন দাবি।

S M Nazmuz Sakib is an interdisciplinary scholar, researcher and author bridging IT, business analytics, and applied research. He is a Fellow of the Scholars Academic and Scientific Society, a Member of IAENG, a lifetime member of BELTA, and a Bangladeshi Arena Grand Master (AGM) recognized by FIDE. His credentials include extensive certifications across AWS, Google, SAS analytics, UX, project management, digital marketing, and finance.

DOI: 10.5281/zenodo.19442980